

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রপ্রতিভা

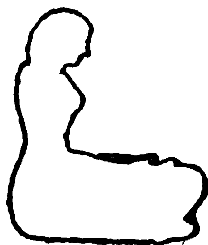
কবি শিল্পী সুরকার রবীন্দ্রনাথ

কানাই সামন্ত

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানি প্রাইভেট লি.
৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড্। কলিকাতা ৭

রবীন্দ্রশতবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষ্যে
প্রথম প্রকাশ : ২২শে শ্রাবণ ১৩৬৮

দশ টাকা



প্রকাশক শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায়
ক্যাশ প্রেস। ৩৩বি মদন মিত্র লেন। কলিকাতা-৬

নিবেদন

বিশাল বিচিত্র রবীন্দ্রকৃতি ও রবীন্দ্রপ্রতিভার আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের কবি কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামীর অনুসরণে আমরাও বলতে পারি— আকাশের অন্ত নেই, পাখির দুটি ডানায় যতটা শক্তি, প্রাণে যতটা উৎসাহ, বারে বারে ততটাই সে পরিক্রমা দিয়ে আসতে পারে; আকাশের সবটাই তবু বাকি থাকে।

যুগে যুগান্তরে মহৎপ্রতিভার যে বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয় নি-- জীবন ও কৃতি, অভীপ্সা সাধনা ও সিদ্ধি, অপ্রকাশ ব্যক্তিস্বরূপ ও বাঙ্‌ময় মূর্তিময় প্রকাশ, সব নিয়েই তার অবিভাজ্য ঐক্য বা সমগ্রতা। সবটাই যে জানা যায়, দেখা যায়, স্পর্শ করা যায় অথবা ধারণার ভিতরে আসে এমন নয়; অনেকটাই তার ধ্যানগোচর মাত্র। আর, তা যদি না হ'ত, কাব্যজিজ্ঞাসার শেষ সীমায় উত্তীর্ণ হয়ে, ধ্বনি বা ব্যঙ্গ্যেই কবিত্বের পরাকাষ্ঠা ব'লে ব্রহ্মাস্বাদসহোদর অনির্বচনীয় কোনো বস্তুর নির্দেশ করতে হত না— আঙুল বাড়িয়ে নির্দেশ করা মাত্র —এটিও অনুমান করা চলে। রসধ্বনি সার্থক কলাকৃতি মাত্রের আত্মার মতো এ কথা সত্যই। অথচ, সীমায় সীমায় সেই অসীমতার উপলব্ধি, রূপে রূপে অঙ্গাঙ্গী-ভাবে মিলিত মিশ্রিত অরূপ-অপরূপের কী-যেন নিগূঢ় পরিচিতি, এটি কোথা থেকে আর কেনই বা —একমাত্র মহৎপ্রতিভা ও সার্বভৌম প্রকাশের সম্মুখীন হয়েই বিশেষভাবে সেটি জানা যায় অথবা মর্মে মর্মে অনুভূত হয় এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সেখানে বিষয় ভাব ভাষা ছন্দ, হেতু বা উপলক্ষ্য, কলা বা কৌশল, এ-সবই গৌণ হয়ে পড়ে— এ-সবের আলোচনাই যথেষ্ট হয় না। অর্থাৎ, শ্রেষ্ঠ কবিকৃতি বা রূপসৃষ্টির আলোচনাটি সত্যই সার্থক হতে পারে না, নিজেও দৃষ্টি বা সৃষ্টির স্তরে উন্নীত না হলে। এ দেশে সাহিত্য-

আলোচনা বা সমালোচনার চমৎকারজনক এই প্রকৃষ্টরীতির পথ দেখিয়েছেন আর রসোজ্জ্বল দৃষ্টান্তের পর দৃষ্টান্ত রচনা করেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। বলাই বাহুল্য সজ্ঞানে অথবা সংকল্পগ্রহণ-পূর্বক তাঁরই পদাঙ্ক-অনুসরণের সাহস হয় না আর চেষ্টাও আমরা করি নি। তবু, আবাল্য রবীন্দ্রসাহিত্যসম্ভোগের যে সুখ, যে হার্দ উপলব্ধি, সময়ে সময়ে তারই কিছু-কিঞ্চিৎ প্রকাশের ইচ্ছা হয়তো স্বাভাবিক ; অন্তরের সেই তাগিদ থেকেই অন্যূন ত্রিশ বৎসর ধ'রে বর্তমান গ্রন্থের এই লেখা-গুলি জ'মে উঠেছে— রবীন্দ্র-শতবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে একত্র সংকলন নেহাতই সৌভাগ্যক্রমে অথবা দৈবক্রমে বলা যায়।

দুই যুগের বেশি সময়ে ভাবনা ও উপলব্ধির কী বিবর্তন হয়েছে লেখক তা কেমন ক'রে বলবে ? একই প্রসঙ্গ বা একই প্রকার মন্তব্য নানা প্রবন্ধে আছে, বোধ করি এ ত্রুটিও অনিবার্য। লেখকের বহু দোষ, ত্রুটি, অসম্পূর্ণতা, বোধ বা বুদ্ধির সীমাবদ্ধতা, সমস্ত মেনে নিয়েই পাঠককে এই লেখাগুলি উপভোগ করতে হবে বা ব্যবহার করতে হবে। ব্যবহারের কথাও আসে বৈকি, যেহেতু—

একাকী গায়কের নহে তো গান,
মিলিতে হবে দুইজনে।
গাহিবে এক জন খুলিয়া গলা,
আরেক জন গাবে মনে।

অর্থাৎ, দুই-পাল্টা মলাটের মধ্যে সম্পূর্ণ একখানি গ্রন্থ ধরে দেওয়া যাচ্ছে এমন কল্পনা করবার দরকার কী ? প্রাণের তাগিদে, মনের আনন্দে, রবীন্দ্রপ্রতিভার চিন্তনে প্রবৃত্ত হয়েছে লেখক— সহৃদয় পাঠক মাত্রেই তার সহযাত্রী ও সহযোগী। এমন না হলে এ লেখায় ফল কী ? কেনই বা গ্রন্থপ্রকাশ ?

এখানেই ক্ষান্ত হওয়া ভালো। মুখবন্ধ প্রবন্ধে পরিণত হলে ঠিক হবে কি ?

অনেক লেখা ইতিপূর্বে সাময়িক পত্রে প্রকাশ পেয়েছে ; তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য— বিশ্বভারতী পত্রিকা, তরুণের স্বপ্ন, কথা-সাহিত্য, গল্পভারতী। লেখক ও পাঠকের মধ্যে প্রাথমিক সম্বন্ধ-বন্ধনে রচনাকার্যে উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে, এজন্য ঐসব সাময়িক পত্রের সম্পাদক বা প্রকাশক -বর্গ আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

'রবীন্দ্রপ্রতিভার নেপথ্যভূমি' প্রবন্ধে 'মালতী-পুঁথি'র আলোচনা-ক্রমে উক্ত পাণ্ডুলিপি থেকে কবিকর্তৃক অনূদিত 'মদনভস্মে'র অপ্রকাশিত পাঠ -সংকলন সম্ভবপর হয়েছে বিশ্বভারতীর মাননীয় উপাচার্য শ্রীসুধীরঞ্জন দাস মহাশয়ের সহৃদয় অনুমোদনে, এজন্য তাঁকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এই পাণ্ডুলিপি, তেমনি অন্যান্য রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি, পর্যালোচনা করবার নানা সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন রবীন্দ্রসদনের কর্তৃপক্ষ ও সুহৃৎস্থানীয় কর্মীগণ এ কথাও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র বা কর্মী -গণের অগ্রজতুল্য পরলোকগত শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর উল্লিখিত প্রবন্ধ-রচনা সম্পর্কে বিশেষ আনন্দ এবং ঔৎসুক্য প্রকাশ করেছিলেন, আজ সে কথাও বার বার মনে পড়ছে। পাঠক দেখবেন পূর্বোক্ত আলোচনার সূত্রেই 'মজুমদার-পাণ্ডুলিপি' থেকেও বহুবিধ সংকলন করতে হয়েছে, একাধিক পাণ্ডুলিপি-চিত্রও এই গ্রন্থে ব্যবহৃত— এজন্য এই পাণ্ডুলিপির স্বত্বাধিকারী ও সংরক্ষক শ্রীসমীরচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সৌজন্য অবশ্যস্বীকার্য।

নানা সময়ে এই-সব প্রবন্ধের রচনায় উৎসাহ দিয়েছেন যাঁরা আলাপে-আলোচনায়, অথবা কার্যতঃ সহযোগিতা করেছেন মুদ্রণ-ব্যাপারে, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন শ্রদ্ধা ও প্রীতি -ভাজন সুহৃৎ— শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী, শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শ্রীসমীরণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশুভেন্দু ঘোষ, শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্য এবং আরও

অনেকে।

এই গ্রন্থের শেষ তিনটি নিবন্ধ সত্যই অনুরোধে বা উপরোধে লেখা হয়েছে সেটি বুদ্ধিমান পাঠক নিজেও বুঝতে পারবেন— উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। তেমনি আরেকটি বাহুল্য কথা এই যে, জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথেরই একটি গৃহকোণে থেকে (এক কালে এই দ্বিতল গৃহেরই নাম ছিল 'বিচিত্রা', লোকমুখে 'লালবাড়ি') রবীন্দ্রপ্রতিভার ধ্যানধারণার সুযোগ হয়েছিল সুদীর্ঘকাল, সেখানেই অধিকাংশ প্রসঙ্গের মনন ও লিখন, এ যদি সৌভাগ্য হয় সে সৌভাগ্য অপ্রত্যাশিত এবং অহেতুক সন্দেহ নেই। কৃতজ্ঞতা কোথায় জানাব? অতীত বর্তমান আর ভবিষ্যৎ কালের বাঙালি জাতি কার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাবে, যে, এ দেশে জন্ম নিয়েছেন ও জীবনসাধনায় নিত্য নিরত থেকেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর? আমরা যারা স্বচক্ষে দেখেছি সে সৌন্দর্য, সেই মহিমা, অজর অমর বাণীরূপ আর শিল্পমূর্তির অসদ্ভাবে আমাদেরও অনায়াসেই মনে হতে পারত— সবটাই ছিল দিবাস্বপ্ন অথবা অবাস্তব কল্পনা। ইতি

কানাই সামন্ত

১৬ জুন ১৯৬১

৫ দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি

কলিকাতা-৭

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

প্রচ্ছদে মুদ্রিত পেন্সিল স্কেচ এবং প্রথম তিনটি রবীন্দ্র-লেখাঙ্কন শ্রীসমীরচন্দ্র মজুমদার -সংরক্ষিত রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি হতে তাঁরই সৌজন্যে ব্যবহৃত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় লেখাঙ্কনের ব্লক যথাক্রমে শ্রীঅরুণচন্দ্র ভট্টাচার্য ও বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের সৌজন্যে পাওয়া গিয়েছে। চতুর্থ এবং পঞ্চম লেখাঙ্কন-দুটি ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের বৈকালী কাব্যে মুদ্রিত; ব্লক এবং পুনর্মুদ্রণের অনুমতি -লাভ বিশ্বভারতী-গ্রন্থন-বিভাগের সৌজন্যে।

প্রচ্ছদ এবং পঞ্চম চিত্র -ব্যতীত রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ -অঙ্কিত সমুদয় চিত্রের ব্লক বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের সৌজন্যে পাওয়া গিয়েছে। ষষ্ঠ চিত্র রবীন্দ্রভারতীর সংগ্রহভুক্ত।

প্রবেশক-স্বরূপ রবীন্দ্রপ্রতিকৃতি, আলোকচিত্রকর শ্রীযুক্ত শম্ভু সাহা এবং ইন্‌ডিয়ান টিউব কোম্পানি (১৯৫৩) লিমিটেডের বিশেষ সৌজন্যে এই গ্রন্থে মুদ্রিত। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় আলোকচিত্র -মুদ্রণের অনুমতি এবং ব্লক দিয়ে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ এই গ্রন্থের লেখক ও প্রকাশককে বিশেষ বাধিত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত আলেখ্যগুলির মধ্যে প্রচ্ছদে মুদ্রিত 'যুগল পাখি'র বিবরণ 'রবীন্দ্রপ্রতিভার নেপথ্যভূমি' প্রবন্ধে ২৫৮ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে; 'অসীম শূন্যে একা' প্রথমভাগ চিত্রলিপির চতুর্থ চিত্র; 'স্বপ্নের গহনে' চিত্র ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০ তারিখে দার্জিলিঙে আঁকা হয় এবং ঐ-তারিখে-লেখা পরিপূরক 'বিচ্ছেদ' কবিতার সহিত 'বীথিকা' কাব্যের রবীন্দ্র-শতবর্ষ-পূর্তি সংস্করণে স্থান পেয়েছে; রবীন্দ্রনাথের আঁকা অবশিষ্ট দুখানি ছবির আকরগ্রন্থ হল 'সে'।

উৎসর্গ

শ্রীদুর্গাদাস শেঠ

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

-উদ্দেশে

কবিতা

বাঙ্ময় রসরূপই কবিতা। রসের সংজ্ঞার্থ-নির্দেশ সুকঠিন। যখন যে-কোনো উপলক্ষে চিত্ত জেগে ওঠে, চিত্তের সেই জাগরণকে অনুভূতি বলে আর সকল প্রকার অনুভূতিই একটা না একটা রসের অনুভূতি। সুতরাং ঐকান্তিক অনুভবকে যথাযথ প্রকাশ করতে পারলেই কবিতা হয়। এক দিকে চাই যথার্থ অনুভূতি, আর-এক দিকে চাই যথার্থ প্রকাশ; একত্র এই দুর্লভ দুটি ক্ষমতার দুর্লভতর সমন্বয় হয়েছে যার সাধনায়, যার স্বভাবে, সেই কবি। রসানুভূতি আর মূর্তিময় প্রকাশ, এর কোনোটিকে বাদ দিলেই কবিতা হয় না। এই মৌলিক সত্য বিস্মৃত হয়ে কাব্যের দোষ-গুণ-বিচারে তার বিষয় ভাব ভাষা ছন্দ প্রভৃতি নিয়ে যা-কিছু আলোচনা তা একেবারেই বন্ধ্যা।

কিন্তু, কোনো কবিতা যে রসেরই রূপ, অথবা রচনার পিছনে যে সত্যকার অনুভূতি আছে, তার নির্ণয় হবে কী ক'রে? কে তা বলবে? অতর্কণীয় ক'রে কেউই তা বলতে পারে না। কারণ, রূপ অর্থাৎ বিষয় ভাব ভাষা ছন্দ— যা'ও বা বিশ্লেষণ করা চলে, রস অথবা রসের অনুভূতি একেবারেই অবিশ্লেষণীয়। কবি-অনুভূতির প্রমাণ কেবল রসিকের সহানুভূতিতে, আলোকের প্রমাণ যেমন উন্মেষিত নেত্রের বিস্ময়ে। কিন্তু, কে অন্ধ আর কে নয় নির্ণয় করা যত সহজ, এ সংসারে কে রসিক আর কে নয় এর নির্ধারণ নিশ্চয়ই তত সহজ নয়। সুতরাং বিশেষ বিশেষ রচনা নিয়ে রস-সম্পর্কিত

মৌলিক তর্কের শীঘ্র কোনো মীমাংসা না'ও হতে পারে; সেজন্য বিপুলা পৃথ্বী আর নিরবধি কালের দূরবর্তী সিদ্ধান্তের প্রতীক্ষা রইল। যে-সব রচনার সম্বন্ধে সেরকম একটা কোনো সিদ্ধান্ত পাওয়া গেছে ব'লেই মনে হয়, তাদেরই দৃষ্টান্তে কবিতায় অন্য কয়েকটি কী গুণ থাকে, আপাতত তারই আলোচনা করব। মনে হয় এই কয়েকটি গুণের সমাবেশ হলেই কবিতার মধ্যেও সে কবিতা বিশেষ মর্যাদার দাবি রাখে; কারণ, বিশিষ্ট সুখই সে সঞ্চারিত করে রসিকচিত্তে।

প্রথমতঃ গভীরতা। যে বাণী গাণ্ডীবধন্বার নিশিত শরের মতো মানবচিত্তের অতিশয় গভীর স্তরে প্রবেশ ক'রে নিগূঢ় ভোগবতীর ধারা উৎসারিত ক'রে দেয় আর মুমূর্ষু তৃষ্ণার শান্তিবিধান করে। ব্যক্তিচেতনার বিভিন্ন স্তর আছে; সব অনুভূতি সব স্তর স্পর্শ করে না। কোনো অনুভূতি উপরিতম ত্বকের অনুভূতি; কোনো অনুভূতি গভীরতম মর্মের। আর, এই ক্ষীণতম ও তীব্রতম অনুভূতির অবকাশে আরও অসংখ্য ঘাটে ঘাটে বেদনার বিচিত্র জোয়ার-ভাঁটায় আরও অনেক ওঠা-নামা আছে। যে হয় ভগীরথ, রসমন্দাকিনীধারার সে অনুগমন করে বিষ্ণুপাদপদ্ম থেকে সাগরসঙ্গম পর্যন্ত; যে তা নয় সে হয়তো করজোড় করে থাকে ব্রহ্মকমণ্ডলুর সম্মুখে, হয়তো সংগীতধ্বনি শোনে গিরিশের জটাজালে, হয়তো ধন্য হয় প্রয়াগতীর্থে অবগাহন ক'রে, হয়তো দিশাহারা হয় সহস্র ধারায় সুরধুনী যেখানে বিভিন্ন, নয়তো ফেনিল ধূসর ঘূর্ণাবর্তে পাক খায় আর ডুবে মরে। একটি বিশেষ রসের কথাই যদি ধরা যায়, প্রেমও হতে পারে কবিতার বিষয় আর কামও। কেবল শ্রেষ্ঠ কবিকুলের রচনাতেই দেখা যায় কামে ও প্রেমে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। দুঃসহ দহনে যেমন কঠিন বিরুদ্ধ দুটি ধাতুর মিলন ঘটে, তীব্র অনুভূতির বেদনায় তেমনি দেহ ও আত্মা

অভিন্ন হয়। তাই তো কবি বিদ্যাপতি বলতে পারেন—

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয় রাখনু,
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।

দ্বিতীয়তঃ ব্যাপ্তি। যে বর্ণরেখাসম্পাতে ফুটে ওঠে বিশাল দেশকাল। বিমল প্রভাতের অপরাজিতা বা দোপাটি ফুলটি সুন্দর। সন্ধানী চিত্তমধুপ তার মর্মমধু পান ক'রে পরিতৃপ্ত হয়; দেখে সেই ফুলটিকে কুটীরাঙ্গনে, বেড়ার গায়ে, শিশিরসজল সুরঞ্জিত শোভায়। কিন্তু মন কেবল মধুকর নয়; সে আবার অনেক-কিছু। রাজহংসের মতো বলিষ্ঠ ডানায় সুদূর শূন্যেও সে ওঠে; যাত্রা করে দক্ষিণসমুদ্রের দ্বীপভূমি থেকে দূর কৈলাসে বা মানসসরোবরের অভিমুখে; নিম্নে চিত্রবৎ প্রসারিত দেখা যায়— গিরি বন সমুদ্র, রজতরেখাকার নদনদী, ঝিনুক-শামুকের সমষ্টির মতো লোকালয়। গভীর অনুভবের প্রয়োজনে হয়তো সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র দেশ-কালের মধ্যেই আবদ্ধ ক'রে দেখতে হয় অনুভূতির বিষয়টিকে; হয়তো তা হয় না। কিন্তু এ কথা নিশ্চিত, কেবল গভীরতার নয়, ব্যাপকতার, বিশালতার এক প্রকার আকর্ষণ আছে। এমন দৃষ্টিভঙ্গী আছে, চৈনিক চিত্রকরের তূলির টানের মতো যার প্রসাদে একেবারেই দেখা যায় একটি দিগন্ত দেশের বা কালের; তখন তারই বিশাল ছন্দে স্পন্দমান দেখি তার অন্তর্গত খুঁটিনাটি বিষয়গুলি সব। সে এক অভিনব দেখা। যেমন অয়শ্চক্রনিভ সমুদ্রের তমালতালীবনরাজিনীলা বেলা-ভূমিকে দেখা গেল দূরের থেকে অলৌকিক একটি কলঙ্কলেখার মতো কালিদাসের ভুবনবিখ্যাত শ্লোকে। তাঁরই অপূর্ব মেঘদূতের গমনপথে যেমন একে একে উন্মোচিত হল সমুদয় ভারতবর্ষের স্মৃত-বিস্মৃত অশেষ অপরিসীম শোভা। বর্তমান যুগের অগ্রগামী কবি হুইট্‌ম্যান এবং কার্পেণ্টারের অবিস্মরণীয় রচনাও স্মরণযোগ্য— 'ভারতযাত্রা,

(*Passage to India*) অথবা 'বহু যুগের পর' (*After Long Ages*)। জগদ্‌ব্যাপী ও যুগ-যুগান্তর-ব্যাপী এই দৃষ্টিভঙ্গীই বিশেষভাবে পরিস্ফুট রবীন্দ্রকাব্যে— সমুদ্রের প্রতি, বসুন্ধরা, শিশুতীর্থ। অথবা—

হায় এ ধরায় কত অনন্ত
বরষে বরষে শীত বসন্ত
সুখে দুখে ভরি দিক্ দিগন্ত
হাসিয়া গিয়াছে ভাসি

ইত্যাদি অপূর্ব শ্লোকমালা। অথবা—

ছন্দে ছন্দে নাচি উঠে সিন্ধুমাঝে তরঙ্গের দল,
শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল,
তব স্তনহার হতে নভস্তলে খসি পড়ে তারা···

স্মরণ করতে হয় রবীন্দ্রনাথের স্বল্পাক্ষর কত প্রকৃতিচিত্র।

তৃতীয়তঃ মূর্তি বা মূর্ততা। বিশ্বসংসারে যেখানে যা রূপ, যেখানে যা জীবন, অব্যর্থভাবে তারই বর্ণনা শুধু নয়, যার নেই কোনো রূপ, নেই কোনো বাস্তবতা, নেই কোনো সুপ্রকটিত বিকাশশীল জীবন, তারও মূর্তি আর জীবন-কল্পনা শ্রেষ্ঠ কবিত্বের আর-একটি শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। সব সময় এ যে কল্পনাই তাও জোর ক'রে বলা চলে না। দেশ কাল প্রকৃতি, অন্তরের ইচ্ছা আবেগ, সংগীতের সুর, সত্যের সদাবিচিত্র উপলব্ধি, কবিচিত্তের দৃষ্টিতে, কল্পনায়, চিরদিনই ঐ-সব মূর্ত, জীবনময়। যেমন—

অমনি নিস্তব্ধ প্রাণে
বসুন্ধরা দিবসের কর্ম-অবসানে
দিনান্তের বেড়াটি ধরিয়া আছে চাহি

দিগন্তের পানে।

এখানে যাঁর কথা বলতে চেয়েছেন কবি, ভূতত্ত্বের পৃথিবীর চেয়ে শত-গুণ সত্য ব'লেই যেন ভূতত্ত্ব এঁর পানে হতবাক্ হয়ে চেয়ে থাকে। অথবা—

ঐ পক্ষধ্বনি
শব্দময়ী অপ্সররমণী
গেল চলি স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করি।

এ ক্ষেত্রেও ছন্দোবদ্ধ কয়েকটি শব্দের মন্ত্রমায়ায় কোন্-এক অলৌকিক জগতেরই দুয়ার অকস্মাৎ খুলে গেল, ভাষান্তরের নজিরে নাইটিঙ্গেলের গানেও যেমন শুনি বরুণলোকের বাতায়ন হঠাৎ খুলে গিয়েছিল দুর্গম সমুদ্রের দুর্জয় তরঙ্গচূড়ায়। উপস্থিত এ ধ্বনি বায়ুতরঙ্গ নয়, অথবা এ স্তব্ধতাও নয় শব্দশূন্যতা। এই সঙ্গে মনে পড়ে ছিন্নপত্রে বর্ণিত যাত্রিণী সন্ধ্যাবধূটিকে : কোন্ অন্তহীন পশ্চিমে তার স্বামীর ঘর; বিশাল পৃথিবীর নিঃশব্দ নির্জন পথে তাই সে যুগ যুগ ধরে চলেছে চেলাংশুকবসনা, মাল্য নিয়ে, অর্ঘ্য নিয়ে, একা। দিনরাত্রির সন্ধিস্থলে একটি মুহূর্ত এ নয় : মূর্তিমতী একটি সত্তা বহির্লোক থেকে অন্তর্লোকে পদার্পণ করল রসিকের; যাত্রা শুধু পৃথিবীর অন্তহীন পথে নয়, চিরমানবহৃদয় মাড়িয়ে।

গ্রীক বা হিন্দুপুরাণে অসংখ্য দেব-দেবীর কল্পনা : সবই কি অলীক? অলীক হোক্ বা না হোক্, এগুলিকে কবিকল্পনার এক দিকের শেষ সীমা বললে অত্যুক্তি হয় না। অবাস্তব ভাবের, রসের, এরূপ জীবন্ত দৃষ্টিগ্রাহ্য বর্ণনায় এক-একটি জাতির জীবন পুষ্ট ও বর্ধিত হয়েচে। অমূর্তিকের এই-সব মূর্তি আজ যদিবা আড়ষ্ট কঠিন হয়ে থাকে, চিরদিন এমন ছিল না; বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গেই অবর্ণনীয়ের বিচিত্র ব্যঞ্জনা ছিল। সেই ব্যঞ্জনার আলোকে দেখলে আজও তা সবই সুন্দর, সবই অপূর্ব।

যা জড় বা অচেতন, আর যা শুধুই ভাব ও চেতনা, তার এই জীবনময় বিগ্রহ-লাভ বিশেষভাবে প্রণিধেয়। প্রাচীন দার্শনিকদের আর তেমনি আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের কথা যদি সত্য হয়, তবে তো সবই অপরিণামী সত্তার ইন্দ্রজাল, অতীন্দ্রিয় শক্তির কম্পন ; অন্তরে বা বাহিরে একাদশ ইন্দ্রিয়ের দ্বারে দ্বারে যা-কিছু আছে, আসলে তার কিছুই নেই— অথবা তার থাকায় না-থাকায় কী যে ভেদ তাত্ত্বিক তা বলেন না, বলতে পারেন না। তবু-যে ইন্দ্রিয়শীল মতিমান মানুষের কাছে এ মায়া সত্য এবং সার্থক চিরঅরূপের চিরন্তন এই রূপাকুতি। সে আকুতির সব কি সফল হয়েছে? অন্তত, কবিচিত্তের বোধ হল 'হয় নি' ; অকৃতার্থ স্রষ্টার দীর্ঘশ্বাসে পূর্ণ তাই এ বিশ্বের আকাশ-বাতাস। কবিকে নিয়ত প্রেরণ করছে সে, 'রূপ দাও, মূর্তি দাও। যার কোনো মূর্তি ছিল না আপনাকে পর ক'রে ক'রে তারই মূর্তি গড়েছেন স্রষ্টা ; তুমিও তেমনি করো, কেবল অনুকরণ কোরো না তাঁর ; প্রত্যাখ্যান কোরো না স্রষ্টা ব'লে যে সম্মান তোমায় দিতে চান তিনি নিজে। হৃদয় দিয়ে দেখলেই অভাবের ভাব জাগে, অরূপের রূপ দেখা যায় ; স্থির শান্ত সমুদ্রে ঢেউ ওঠে আর চলমান হিমশিলার সৃষ্টি হয়।[১] এমনি ক'রেই সৃষ্টি হয়েছে জগতের ; এমনি ক'রেই সৃষ্টি হবে কবিতার, এ কি জানো না? হৃদয় দিয়েই ছাখো। বুদ্ধি দিয়ে, বিচার দিয়ে নয়। প্রলয়ের পথ ও, সৃষ্টির পথ নয়।'

কবিতা সম্বন্ধে শেষ কথাটি প্রথম কথারই পুনরাবৃত্তি, একটু নূতনভাবে, সুতরাং আর-একটু নূতন কথা যোগ ক'রে— কবিতায় রূপান্তর। প্রত্যেক রূপের অন্তরে যে স্বরূপ আছে, প্রত্যেক জীবনের প্রেরণাভূত যে স্বভাব, যা ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য-প্রমাণে বা মনের বিচার-বিশ্লেষণে কখনো ধরা পড়ে না, তারই আকস্মিক উদ্ভাস বা উদ্ঘাটন। তারই ফলে একটি ঘাস বা একটি ধূলিকণায় ব্লেক

দেখেছেন বিশ্বভুবন। ইয়েট্‌স্‌ দেখেছেন বিমূঢ় ক্ষণিক তুচ্ছাতিতুচ্ছ জীবনে চিরশ্রীর চঞ্চল চরণক্ষেপ। অন্য কোনো কবি শুঁড়িখানায় অসম্বৃতা রমণীর ক্ষণিক বাৎসল্য-আবেশে দেখেছেন খৃস্টজননীর দিব্যমূর্তি। আমাদের রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আমাদের অতি পরিচিত জুঁইফুলকে সম্বোধন ক'রে—

অসীম কালের যেন দীর্ঘশ্বাস ব'হেছিস তুই
ও আমার জুঁই !

রূপক কবিতা এক প্রকার আছে, রূপের ছলনায় তাতে অপরূপের কথা বলা হয়ে থাকে— তার কথা বলছি না। ছলনা বা ইংরেজিতে যাকে বলা হয় টেনে-বুনে বিশ্বাস, বেশিদূর তা যায় না, যেতেও পারে না। উদ্‌ধৃত কবিতার কলি সে-জাতীয় নয়। নয় ব'লেই তার অপরিসীম অপূর্বতা। পরিচিত প্রাকৃত একটি জুঁইকে সম্বোধন ক'রে কবি এই উক্তি করেছেন প্রকৃত বিশ্বাসে, পরম দর্শনে। এরূপ দৃষ্টি দিয়ে দেখলে প্রকৃতির অন্তর্গত সবই এমনিভাবে অতিপ্রাকৃত এক সত্যতা লাভ করে থাকে ; দেশ কাল ঘটনাকে নিঃশেষে অতিক্রম করে ; কবি ও রসিকের বিস্মিত দৃষ্টিতে বিদ্যুৎরেখা এঁকে চকিতে ফিরে যায় সেই অমৃতে যা থেকে এসেছিল এই আপাতপ্রতীয়মান মৃত্যুতে।

শুনেছি প্লেটো বলেছেন, কোনো-এক দিব্যলোকে সকলেরই আছে এক-একটি দিব্যরূপ। আসলে কিন্তু পার্থিব আর অপার্থিব রূপ চিরদিন পিঠোপিঠি আছে বা একেবারেই অভিন্ন ; আকস্মিক দিব্যদৃষ্টিতেই ধরা পড়ে। মানবচেতনার পরতে পরতে ভাঁজ খুলে গিয়ে সৃষ্টির পর সৃষ্টি প্রকাশ পায়— সৌন্দর্যের পর সৌন্দর্য, সুখের পর সুখ। অবশেষে নির্নিমেষ মৌন বা একটিমাত্র সানন্দ সম্মতি— ওঁ।[১] এই ওঙ্কার, এই চিরসম্মতি সৃষ্টির আদিতে আর অন্তে। আর, পূর্ণের পদে এই হল প্রাণের পরম প্রণতি।

কবি যে মুহূর্তে কবিতা সৃষ্টি করেন অথবা রসিক যে মুহূর্তে উহার রসাস্বাদন করেন সে মুহূর্তে ব্যাখ্যা বলিয়া কোনো বস্তু নাই। কারণ, জীবন বা জীবনের প্রতিমা-রূপিণী কবিতা প্রাণময়; তাহাতে এক দিকে যেমন দেহ মন আত্মা বলিয়া একান্ত ভেদ কোথাও নাই অন্য দিকে তেমনি ভাষা ভাব (তত্ত্ব) এবং রস এই তিনের সমাবেশে বা যোগাযোগে কোনো একটি জিনিস রচিত হইয়াছে এমন নয়। প্রাণের দ্বারা দেহ মন আত্মা, তেমনি বেগবান্ ও স্বয়ম্ভূ ছন্দে ভাষা ভাব রস অভূতপূর্ব ঐক্য পাইয়াছে। জীবনের তথা জীবনরূপিণী কবিতার প্রকৃতিই হইল এই যে, তাহাকে খণ্ড খণ্ড করা যায় না, করিলেও তাহাতে জীবন থাকে না; সুতরাং, খণ্ডগুলিকে পুনরায় একত্র করিয়া সমগ্রকে লাভ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। তবু, ব্যাখ্যা করা মানুষের মনোধর্ম। কেবল এইটুকু আমাদের জানা থাক্, কবি ও রসিক যে অলোকসামান্য চেতনা বা যে inspired mood হইতে কবিতা সৃষ্টি করেন, উপভোগ করেন, তাহার কয়েক সোপান নিম্নে অবতরণ না করিলে কবিতার ব্যাখ্যা করা, অর্থাৎ তাহার তত্ত্ববিশ্লেষ করা, বাক্য বিন্যাস ও অলংকারাদির তারিফ করা সম্ভবপর হয় না। অলংকারশাস্ত্রের অভিমতে, রসই কাব্যের আত্মা। ঔপনিষদিক শ্লোকে, ঋষিবাক্যে, ইহাও শোনা গেছে—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্-
তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥

আত্মাকে অধ্যয়নে ভাবনায় বা বহু শ্রবণেও লাভ করা যায় না; পরন্তু আত্মা যাহাকে বরণ করেন সেই লাভ করে, তাহারই নিকটে

আত্মা আপন চিন্ময় তনু প্রকাশ করেন। রস কাব্যের আত্মা ; রস কেবল ধ্যানগম্য, অনুভবগম্য। অনুভূতি না থাকিলে কবিতা সৃষ্টি করা ও আস্বাদন করা উভয়ই অসম্ভব ; কপিল কণাদ বা শঙ্করের তুল্য মনীষা থাকিলেও এ ক্ষেত্রে তাহা কোনো কাজেই লাগে না। অনুভূতি থাকিলে তবেই কাব্যপাঠের পূর্বে বা পরে তত্ত্বালোচনার অর্থ হয়— সেই অনুভূতি পরিণত বা অপরিণত, বৃক্ষের ন্যায় পুষ্পে পল্লবে বিকশিত বা বীজের ন্যায় নিহিত ও প্রচ্ছন্ন, যেমনই হউক-না কেন।

আমাদের আলোচনার বিষয় হইল রবীন্দ্রনাথের শাজাহান কবিতা। ইহা কবিপ্রতিভার এক অপূর্ব দান। এই কবিতায় তাঁহার সমগ্র জীবনবেদ, অর্থাৎ জীবন মৃত্যু প্রেম ও মুক্তি সম্পর্কে তাঁহার সমগ্র ধারণাটি, রসে সঞ্জীবিত হইয়া অপরূপ এক মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে।

প্রথমেই দেখা যায় সংসারে সকল বিষয়ের অনিত্যতা। জীবন যৌবন কালস্রোতে ভাসিয়া যাইবে ; সে বিষয়ে দরিদ্র প্রজা আর শাহান্‌শার একই ভাগ্য— রাজশক্তির বজ্রসুকঠিন মুষ্টি শিথিল হইবে, তাহার ঐশ্বর্য-আড়ম্বর ও গর্ব-গরিমা সন্ধ্যারক্তরাগের ন্যায়ই অচিরস্থায়ী। প্রয়োজনের বস্তু প্রয়োজন পূর্ণ না হইতেই লুপ্ত হয় : শক্তির দম্ভ পরাভব মানে— তাহার প্রভুত্ব এবং শৃঙ্খলা (order and efficiency) সংকীর্ণ দেশ কালের গণ্ডী অতিক্রম করিলেই নিরর্থক মূঢ়তা হয়, তাহার উদ্যত ও উদ্ধত বিজয়স্তম্ভ ধূলির আকর্ষণে ধূলি হইয়া যায়, অথবা তাহাকে ঘিরিয়া যে বিস্মৃতির অমানিশা ঘনাইয়া আসে তাহাতে আর নবসূর্যোদয়ের সম্ভাবনা নাই। ইহা মানিলাম ; না মানিয়া উপায় নাই যে। তবু, মানুষের প্রাণ, প্রেমিকের প্রাণ বলে, সম্রাট বা পথের ভিক্ষুক কোন্ ছদ্মবেশে তাহার ইন্দ্রিয়গোচর দেহটা আবৃত সে কথা ভুলিয়াই বলে : আমার ঘরবাড়ি তৈজসপত্র ধনরত্ন যাক্, আমার শক্তির দম্ভ বা ক্ষুদ্র অহমের বোধ দূর হোক,

কিন্তু আমার ভালোবাসার দুর্লভতম ক্ষণ, চকিততম উপলব্ধি, আর কখনো তাহারই আশ্বাসে কখনো তাহারই স্মৃতিতে আমার এক ফোঁটা চোখের জল, একটি ব্যাকুল দীর্ঘশ্বাস —ইহা তো আমি ভুলিতে পারি না, ত্যাগ করিতে পারি না ; ইহাকেই আমি চিরন্তন করিয়া রাখিতে চাই। প্রাণের বা প্রেমের এই আকূতি কি বদ্ধপাগলের প্রলাপোক্তি বলিয়াই মনে হয় না ? কেননা, সৌন্দর্যের উদ্ভাস, প্রণয়ের অনুভূতি, ইহাই যে সংসারের স্বভাবঅনিত্য বস্তুসমূহের মেলায় অনিত্যতম ; ইহার আশ্রয়ভূত ক্ষণটিরও জ্যামিতিক বিন্দুর মতোই ক্ষণকালীন অস্তিত্ব আছে, আয়তন নাই। চিরন্তনতার আকূতি বাতুলতা নয় কি ?

কবিপ্রতিভা, শিল্পীপ্রতিভা বলে : না, তাহা নয়। বাহিরে খুঁজিয়া বেড়াইলে অমরতা নাই। অমরতা যদি থাকে ভিতরেই আছে— অন্তরের অন্তরতম উপলব্ধিতে, তীব্রতম বেদনায়, অহংবিস্মৃত সুখে, চকিততম নিমেষে। সৌন্দর্য অমর, প্রেম অমর। কারণ, জড় উপাদানে অলক্ষ্যসুন্দর চরণদুটি রাখিলেও তাহারা জড়দেহের একান্ত অতীত। মানুষের প্রাণে প্রাণে প্রাণ-ভরা সৌন্দর্যদৃষ্টিতে ও প্রেমের অনুভবে নিমেষেই কালের কী-একটা রুদ্ধ দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া কে আমাদের কালের অতীতে লইয়া যায় ; সেই সাক্ষাদ্দর্শনের আলোকে, সেই অনুভূতির তীব্রতায়, সেই নিমেষমাত্রে আমরা বুঝিতে পারি, যদিও দেশকালের মধ্যেই আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা তবু দেশকালের বাহিরে আমাদের একটা মুক্ত, স্বপ্রকাশ, আনন্দময়, চৈতন্যময় অস্তিত্ব আছে।

মানুষের কবিপ্রতিভা, সৃষ্টিপ্রতিভা বলে : বাহ্যজগতে অমরতা নাই, কেবল জড় উপাদানে 'আনন্দরূপমমৃতম্' সৃষ্টি করা সম্ভব নয়, তবু অন্তরে যদি একবার সৌন্দর্যের প্রেরণায় বা প্রেমের বেদনায় আনন্দময় অমৃতসত্তাকে অনুভব করিয়া থাকো তবে তাহাই স্মরণ করিয়া, এমন ইন্দ্রজাল আমি জানি, জড়ের ভূমিকাতেও এমন-কিছু

আমি সৃষ্টি করিব, সকল লোকেরই যাহাতে সেই আনন্দময় অমৃত-সত্তাকে মনে পড়িবে, তাহাকেই 'আনন্দরূপমমৃতম্' বলিয়া বোধ হইবে। আর-সকল বস্তু যখন ধুলায় মিশাইবে বা যুগান্ত-অন্ধকারে বিলীন হইবে তখনো মানুষের আগ্রহ, মানুষের আকাঙ্ক্ষা ইহাকে ধুলা হইতে দিবে না এবং ইহার চারি দিকে ইহাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নিখিলমানবহৃদয়ের এমন এক নিত্যদীপালিউৎসব চলিবে যে সে আর-এক দিবা।

নশ্বর জীবনের হর্ষবেদনাকুল ও প্রেমময়, সৌন্দর্যপ্রবুদ্ধ ও তন্ময়, ক্ষণগুলিকে কবিপ্রতিভা কী উপায়ে অনশ্বর করিয়া তুলে— ঋতুর পর ঋতুর পুষ্পমঞ্জরী তো ফুটিতে না ফুটিতেই শুকাইয়া ঝরিয়া যায়, হাসিও ফুরায়, কোনো বিচ্ছেদক্রন্দনও চিরদিনের নয়, তবু প্রিয়মুখের সেই অস্থির হাসি, প্রিয়চক্ষের সেই অস্থির মৌক্তিক বর্ষণ, জ্যোৎস্নারাত্রে নিভৃত মন্দিরে প্রিয়জনের কানে কানে সেই প্রিয়নাম ধরিয়া ডাকা, সেই প্রেম, সুরে কথায় রেখায় রঙে, এমনকি পাষাণে— বাঙ্ময়, পুষ্পিত, ভারহীন পাষাণে— চিরদিনের ধন বলিয়া কী ভাবে ভূতীর্থে এই জীবনমৃত্যুর সঙ্গমস্থলে উৎসর্গ করা যায়, কবি শাজাহান কবিতার প্রথমাংশে তাহাই বলিয়াছেন। বলিয়াছেন : চিরঅনিত্যের প্রবাহের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আনন্দ বা প্রেম শিল্পমূর্তিতে সৌন্দর্যের ভাষায় আপনাকে অমর করিয়া যায় ; বণিকের বাণিজ্যব্যাপার ফুরায়, রাজার রাজ্যপাট বল্মীকে আচ্ছন্ন হয়, অগণ্য মানবের জীবনমৃত্যু বালুলেখের ন্যায় মুছিয়া যায়, কিন্তু ইহা যায় না। ইহা কালকে অতিক্রম করিয়া, জন্মমৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া, আপনার বাণী বহিয়া অভীষ্টের পানে অভিসার করে যেখানে সে মিশিয়া আছে প্রভাত-সন্ধ্যার প্রকাশে, রৌদ্রে জ্যোৎস্নায়, সীমাশূন্য বিশ্বসংসারে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধের ইশারায় ইঙ্গিতে প্রতিনিয়ত যে মায়া বা মরীচিকা সৃজন করে তাহার পারে, দেখাশোনার বাহিরে ; সে বলে, 'আজিও

যে তোমায় ভালোবাসি, এখনো ভুলি নাই।'

রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি, রবীন্দ্রনাথের ভাবরসোচ্ছ্বাস এই পর্যন্ত আসিয়া ক্ষণমাত্র বিরত হইয়াছে। অন্য অনেক কবিই ইহার অধিক আর অগ্রসর হইতে পারিতেন কি না সন্দেহ। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথ কি সামান্য কবি, তিনি যে মহাকবি। এ পর্যন্ত তিনি যাহা অনুভব করিয়াছেন ও অপূর্ব ভাষার ইন্দ্রজালে যে ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অলৌকিক সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহার পরেও তিনি যাহা অনুভব করিলেন ও প্রকাশ করিলেন তাহা অলৌকিকতর। কালের নীরঞ্জন কপোলে একটি অশ্রুবিন্দুর ন্যায় তাজমহল দীপ্তি পাইতেছে; মর্মররচিত নবমেঘদূত অবিস্মরণ প্রেমের গানে ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে; তাহার সেই শোভা দেখিয়া, সেই গান শুনিয়া, যে রাজকবির অন্তর হইতে তাহা বাহিরে আসিয়াছে আমাদের তাহাকেই মনে পড়ে। মনে হয়, ইহার বাণীতে বুঝি তাহার চিরদিনেরই বাণী বন্দিনী রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, ইহা ভুল। মানবের আত্মা সংসারী নয়, সুতরাং সে জড়সামগ্রী সঞ্চয় করে না। তাহার অমরতার নিকটে মর্ত গৌরব-গরিমার কোনো অর্থ হয় না; সুতরাং যুদ্ধজয়ের ইতিহাস, শক্তির সাক্ষ্য, সে-সবও সে অবহেলে লুপ্ত হইতে দেয়। মানবাত্মা প্রেমিক বটে; কাজেই এই মর্তসরণীতে যে-কোনো ধূলিকণাটিকে, যে-কোনো ক্ষণটিকে স্বমধুসিঞ্চনে ধন্য করিয়া ভালো-বাসিয়া থাকে। কিন্তু তাহার চরম পরিচয় এই যে, সে পথিক. মুক্তিই তাহার স্বভাব। সংসারের ধূলি, সাম্রাজ্যের আবর্জনা সে-সব তো দিনান্তে সর্বাঙ্গ হইতে ঝাড়িয়াই ফেলিয়াছে, এমনকি পৃথিবীর যেখানে যেখানে সে আপন প্রেমের স্বাক্ষর আঁকিয়া দিয়াছে সেখানেও ঘর বাঁধিয়া বসিয়া নাই। মানবাত্মার শেষ পরিচয় পথিক বলিয়াই, যে জীবনে তাহার প্রকাশ সে জীবন অস্থির; প্রেমেরও শেষ পরিচয় মুক্তিতে। জীবনধারা, কালধারা ধরিয়া— না না, তাহাদের

পথ দেখাইয়া— নিত্যবহমান নিত্যবর্তমানের সঙ্গে এক হইয়া এই প্রেম অনাদি হইতে অনন্তে চলিয়াছে। উপনিষৎ যেমন বলিয়াছেন, ত্যাগের দ্বারাই তাহার ভোগ, আপনাকে মোচন করিয়া আপনার প্রকাশ, অনন্ত দেশে কালে লীলাচ্ছলে কেবল অন্তহীন পাওয়া আর হারানো; যখনই ইহার অন্যথা হয় প্রেম আর প্রেম থাকে না, সে হয় অন্য-কিছু— বাসনা বা আসক্তি, জড়ত্ব বা অবসাদ, মোহ, মূর্ছা। এই রুদ্ধ জীবন ও মুগ্ধ বাসনা হয় একই ঘূর্ণাবর্তে ঘুরিতে থাকে নয়তো একই সহমরণে ভস্মে মৃত্তিকায় পরিণত হয়। কিন্তু, যে প্রেম মুক্তি পায় ও মুক্তি দেয়, যাহাতে অনুরাগ আছে অথচ বাসনা বা আসক্তি নাই, অর্থাৎ যাহাতে আভাসে ইঙ্গিতে বুঝিতে পারি আত্মাই আত্মাকে ভালোবাসিয়া থাকে, একজন মানুষ অন্য একজন মানুষকে ভালোবাসিতে পারে না— সেই প্রেমই লোকে-লোকান্তরে জীবনে-জীবনান্তরে মানবাত্মার যাত্রাপথের পাথেয়, তাহার আত্মোৎসৃজনের অমিত শক্তি, শাশ্বত বীজ, সিদ্ধ মন্ত্র।

এখানে একটি সংশয়ের কথা এই মনে উঠিতে পারে, রবীন্দ্রনাথ ভাবাবেগে পূর্বে যাহা বলিয়াছেন পরে কি তাহারই প্রতিবাদ! ঠিক প্রতিবাদ বলা চলে না। পরে তাহার সংশোধন। অথবা ঠিক তাহাও নয়; কুঁড়ি ফাটিয়া ফুল হাসিয়াছিল, ফুল ঝরিয়া ফল দেখা দিয়াছে। এমনও বলা যায়, যমুনাপ্রবাহে গঙ্গা আসিয়া পড়িয়াছে, পরে সম্মিলিত ধারা অভিসারিণী হইয়াছে সাগরের অভিমুখে।

আলোচনার সারমর্ম হইল এই: সংসারে সবই চলিয়া যায়। ভিক্ষুক যায়, সম্রাট যায়; রাজপাট যায়, বাণিজ্যব্যাপারও থাকে না; সকল সুখদুঃখ সলিলের লেখা মাত্র। এই নিত্যকালীন অনিত্যতার মাঝখানে মানুষ মানুষকে ভালোবাসে; আপন ভালো-বাসাকে, ভালোবাসার চকিত চঞ্চল অশ্রুহাসি-হর্ষশোক-আশাস্মৃতি-অনুভবগুলিকে অলৌকিক বলিয়া বোধ করে, তাই অমর করিয়া

রাখিতে চায়। শিল্পসৌন্দর্যের ভাষাতেই তাহা অমরতা পায়। কালের মাঝখানে দাঁড়াইয়া যেনবা কালের অতীতে এই বাণী সে বহন করে: ভুলি নাই, ভুলি নাই। কিন্তু, তবু তো ভুলিতে হয়। শিল্পসৃষ্টিকে যে অবিস্মরণমন্ত্র দেওয়া হইয়াছে তাহাই সে চিরদিন জপ করিতে থাকুক, বিচ্ছেদকে মৃত্যুকে অতি সুন্দর করিয়া ঢাকিয়া রাখুক, তা বলিয়া আত্মা তো শেখানো শুকের মতো বারংবার একই কথার আবৃত্তি করিতে থাকে না, জীবনও কবরের মাটিতে চাপা দেওয়া হয় না। মানবের আত্মা প্রেমিক ও পথিক। তাই মানবাত্মার যোগ্য যে প্রেম তাহা মুক্তি হইতে পৃথক নয়। সে প্রেম বা সে মুক্তি দেশ কাল পাত্রের বন্ধন হইতে কেবলই আপনাকে ও অন্যকে মুক্ত করে, কেবলই সম্মুখে চলে। অন্য প্রেম, অন্য প্রেমের বাণী, অন্য প্রেমাস্পদ পিছনে পড়িয়া থাকে।

মানবমন জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে যেমন বিরোধ কল্পনা করে, প্রেম ও মুক্তির মধ্যেও তেমনি সামঞ্জস্যসাধন করিতে পারে না। কিন্তু, কবি বা ঋষির দৃষ্টিতে মৃত্যুও যেমন নব নব জীবনের নূতন নূতন দ্বার বলিয়া প্রতিভাত হয়, কাজেই বিরোধ থাকে না, প্রেমও তেমনি আনন্দের বলে দেশ কাল পাত্রের 'অবিচল' সীমা কেবলই অতিক্রম করিয়া যাওয়াতে প্রেম ও মুক্তি অভিন্ন হইয়া উঠে। যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী-সংবাদে ঠিক এই কথাই আছে। আত্মা বলিয়াই পুত্র প্রিয়, আত্মা বলিয়াই পত্নী প্রিয়, অন্য কোনো কারণে নয়। আত্মা সর্বগত আত্মাকেই ভালোবাসে বিচিত্র লীলায়। লীলার জন্য প্রতি পদে স্বতন্ত্র দেশ কাল, স্বতন্ত্র পাত্র পাত্রীর প্রয়োজন আছে সন্দেহ নাই; অথচ গোপন প্রজ্ঞায় জানা থাকে, চরম উপলব্ধিতে বুঝিতে পারি, সে-সবের ভিতরে আত্মা কখনোই বন্দী নয়, প্রতি পদেই তাহার মুক্তি।

বালিগঞ্জ

আশ্বিন ১৩৪০

১৩২১ কার্তিকে 'বলাকা' কাব্যের শাজাহান কবিতাটি লেখা। লেখাটা যে পণ্ডিতদের পক্ষে দুর্বোধ হইবে তাহাই অনুমান করিয়া সাবধানী কবি প্রায় ৩০ বৎসর পূর্বে উহার একটি ব্যাখ্যা[১] লিখিয়া রাখিয়াছিলেন।—

জগতের মধ্যে আমাদের এমন 'এক' নাই যাহা আমাদের চিরদিনের অবলম্বনীয়। প্রকৃতি ক্রমাগতই আমাদিগকে 'এক' হইতে একান্তরে লইয়া যাইতেছে—এক কাড়িয়া আর-এক দিতেছে। আমাদের শৈশবের 'এক' যৌবনের 'এক' নহে, যৌবনের 'এক' বার্ধক্যের 'এক' নহে, ইহজন্মের 'এক' পরজন্মের 'এক' নহে। এইরূপ শত সহস্র একের মধ্য দিয়া প্রকৃতি আমাদিগকে সেই মহৎ একের দিকে লইয়া যাইতেছে। সেই দিকেই আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে, পথের মধ্যে বদ্ধ হইয়া থাকিতে আসি নাই ··· আমি বৈরাগ্য শিখাইতেছি। অনুরাগ বদ্ধ করিয়া না রাখিলে তাহাকেই বৈরাগ্য বলে, অর্থাৎ অনুরাগকেই বৈরাগ্য বলে। প্রকৃতির বৈরাগ্য দেখো। সে সকলকেই ভালোবাসে বলিয়া কাহারও জন্য শোক করে না। তাহার দুই-চারিটা চন্দ্র সূর্য গুঁড়া হইয়া গেলেও তাহার মুখ অন্ধকার হয় না ··· অথচ একটি সামান্য তৃণের অগ্রভাগেও তাহার অসীম হৃদয়ের সমস্ত যত্ন, সমস্ত আদর স্থিতি করিতেছে, তাহার অনন্ত শক্তি কাজ করিতেছে।··· প্রেম জাহ্নবীর ন্যায় প্রবাহিত হইবার জন্য হইয়াছে। তাহার প্রবহমাণ স্রোতের উপরে সীল-মোহরের ছাপ মারিয়া 'আমার' বলিয়া কেহ ধরিয়া রাখিতে পারে না। সে জন্ম হইতে জন্মান্তরে প্রবাহিত হইবে।··· বিস্মৃতির মধ্য দিয়া বৈচিত্র্য ও বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া অসীম একের দিকে ক্রমাগত ধাবমান হইতে হইবে, অন্য পথ দেখি না।

—রবীন্দ্রনাথ

সোলাপুর
২৬ আশ্বিন [১২৯২]

'প্রণাম করিয়া উঠিয়া পাথরের মূর্তির মতো স্থির হইয়া দাঁড়াইল। তাহার মনে রহিল না যে, তাহার মাথার উপর হইতে কাপড় পড়িয়া গেছে। সে যেন দেখিতে পাইল না, নলিনাক্ষ অনিমেষ স্থির দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। তাহার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত ; সে একটি অন্তরের চৈতন্য-আভায় অপূর্বরূপে দীপ্ত হইয়া অবিচলিত কণ্ঠে কহিল : আমি কমলা।'

নলিনাক্ষ চিনিল এবং আমরাও চিনিলাম। প্রলয়ঙ্করী পদ্মার অমাবস্যাঘন গূঢ় গর্ভ হইতে বাত্যাত্রাসিত তরঙ্গের আন্দোলনে তৃণতরুশূন্য জনহীন শুভ্র চরে যে অপরিস্ফুট জীবন এক দিন উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল তাহারই অশ্রুধৌত সৌন্দর্যের জ্যোতির্বিভাসিত পূর্ণস্ফুট পরিচয় আজ পাওয়া গেল।

উন্মথিত বিশ্বসমুদ্রের অতল রহস্য ভেদ করিয়া দেবাসুরের নির্নিমেষ দৃষ্টির বিস্ময়ে এক দিন উঠিয়া আসিয়াছিল এক অপ্সরী আর এক দেবী। ভুবনমোহিনী উর্বশী, আর নিখিলকল্যাণরূপিণী লক্ষ্মী। পৃথিবীর জরামরণশীল হর্ষশোকচঞ্চল সামান্য মানুষের সহিত তাহাদের জ্ঞাতিত্বের বা দৈনন্দিন ব্যবহারের কোনো সম্ভাবনা নাই। উর্বশীর সম্পর্কে কবি তো বলিয়াই দিয়াছেন, সে মাতা নয়, কন্যা নয়, বধূ নয়— কোনো গৃহপ্রান্তে কোনো সন্ধ্যার দীপখানি জ্বালে না, লজ্জায় সুখে সম্ভ্রমে কম্প্রবক্ষে আর নম্রনেত্রপাতে নিস্তব্ধ নিশীথে যায় না বাসরশয্যামুখে। বৃন্তহীন পুষ্প সে। নিরবগুণ্ঠিতা সে ঊষা। আর, বিষ্ণুবক্ষোবাসিনী বৈকুণ্ঠেশ্বরী শ্রী ? তাঁহার অলৌকিক রূপের কোনো বর্ণনা হয় কিনা জানি না। তাঁহার চরণকমলের লাবণ্য— তাঁহার স্মিতনয়নের দৃষ্টি এই নিখিল আলোকে।

সর্বনাশিনী পদ্মা সকল পূর্বপরিচয় ধৌত করিয়া আমাদের

নিকটে এই যাহাকে আনিয়া দিয়াছে সে সামান্যা নারী ; এমনকি, নারীও নয়, যে দিন তাহাকে প্রথম দেখিলাম শৈশবোত্তীর্ণা সে কিশোরী, আপনাকে বা সংসারকে কতটুকুই বা জানে ? সেই স্বল্প পরিচয়টুকু পদ্মা আপন নির্দয়করুণ তরঙ্গে তরঙ্গে ধৌত করিয়া দিয়াছে সত্য ; নিশ্চিহ্ন করিয়া লোপ করে নাই। অর্থাৎ, কমলা রামায়ণ-বর্ণিতা অহল্যাও নয়, যুগ-যুগান্তরের জড়ত্বতন্দ্রা হইতে এক দিন কোন্ নরদেবের পাবনস্পর্শে জাগিয়া উঠিতেই যাহাকে দেখা গেল—

অপূর্বরহস্যময়ী মূর্তি বিবসন,
নবীনশৈশবে স্নাত সম্পূর্ণ যৌবন—
পূর্ণস্ফুট পুষ্প যথা শ্যামপত্রপুটে
শৈশবে যৌবনে মিশে উঠিয়াছে ফুটে
এক বৃন্তে। বিস্মৃতিসাগর-নীল-নীরে
প্রথম উষার মতো।

না, এ দেবী নয়, অপ্সরী নয়, নিসর্গসম্ভূতা অনৈসর্গিক ও অকলঙ্ক সম্পূর্ণতাও নয়, এ আমাদের ঘরের মেয়ে, এমনকি, সাধারণ বাঙালি ঘরেরই মেয়ে। ইহার আশা আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে, দুঃখ সুখ শঙ্কা আছে, সাধ্বস সম্ভ্রম সংশয় সব-কিছু আছে, রক্তমাংসের ক্ষুদ্র দেহে ধুক্-ধুক্-ধ্বনিত প্রাণের একটি উৎস, প্রজ্ঞার একটি আসন এবং প্রণয়-প্রীতির একটি ডায়্‌নামো অধিষ্ঠিত থাকিলে যা না থাকিয়া উপায় নাই।

এই কমলাকে তাহার স্রষ্টা কোনো ছক কাটিয়া নয়, কোনো পূর্বাপর-ভাবনা হইতে নয়, নীতিশিক্ষা দেওয়ার দুর্মর কোনো অভ্যাসে বা আয়াসেও নয়, স্বতই যে ভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন বা সৃষ্ট হইতে দিয়াছেন দিনে দিনে, ক্ষণে ক্ষণে, তাহার কোনো সংক্ষেপসার দেওয়া সম্ভব নয় ; আর, তাহাকে ফেনাইয়া ফাঁপাইয়া বর্ণনের বা

ব্যাখ্যানের চেষ্টা করিবে, সেও তো বদ্ধপাগল। তা হোক, তবু, বিরুদ্ধ বা দ্বিধাগ্রস্ত সমালোচনার সকল আপত্তি ও সংশয় ঠেলিয়া কমলা-চরিত্রের যে অনিন্দ্য সৌন্দর্য, নৌকাডুবি-গল্পের যে কাব্যরমণীয় কল্পনা আজ আমাদের এত ভালো লাগিতেছে— হয়তো নূতন করিয়াই ভালো লাগিতেছে— কারণ, শ্রেষ্ঠ শিল্পীর রচনা তো পুরাতন হয় না, তাহাকে ভূয়ঃ ভূয়ঃ আবিষ্কারের আর শেষ নাই— আমাদের সেই ভালো লাগার প্রসঙ্গে দু-চারিটা বিশেষ কথার অবতারণা হয়তো অসংগত হইবে না। হৃদ্‌গত ভাব ও উপলব্ধিকে ব্যক্ত করিয়া বলাই কঠিন ; তবুও চেষ্টা করিয়া দেখিতে দোষ কী ?

দুই বিপরীতমুখী দৃষ্টিতে দেখিয়া নৌকাডুবি আখ্যান সম্পর্কে দুই-প্রকার আপত্তি বা অনুযোগ উঠিয়া থাকে। ১৩৪৭ সালের অগ্রহায়ণে, অর্থাৎ প্রায় অস্তাচলতটে আসিয়া, রবীন্দ্রনাথ এই গল্পের যে ভূমিকাটুকু লিখিয়াছেন তাহাতেই আপন সর্বান্তর্যামিত্বের পরিচয় দিয়া এই-সব আপত্তিরও আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু, নিজের সৃষ্টির ওকালতি নিজে করা চলে না। সংসারনাট্যের যিনি 'সূত্রধার' তিনি তো প্রথম হইতে শেষ পর্যন্তই চুপ করিয়া থাকেন ; আর, কাব্য নাটক কথার যিনি স্রষ্টা তাঁহাকেও যথেষ্ট বিনয় করিয়া, হয়তো প্রচ্ছন্ন কৌতুককে নানা বাক্যালংকারে সাজাইয়া, ঈষৎ আত্মনিন্দার ছলেই আত্মসমর্থন করিতে হয়।

যাঁহারা পাশ্চাত্যসাহিত্যের উগ্র রসের রসিক, নববাস্তবতার আবিষ্কারে উল্লসিত এবং আধুনিক শিক্ষাদীক্ষার অভিমানে অভিমানী, তাঁহারা বলিবেন, রমেশ হেমনলিনী ও কমলার জীবন লইয়া ভাগ্যের এমন যে নিষ্ঠুর পরিহাস দিয়া গ্রন্থের সূচনা ও অগ্রগতি, কৈ, তাহার পরিণাম তো তেমন ভয়াবহ হইল না এবং সরল গ্রন্থি সহজেই খুলিয়া গেল ! দয়াহীন ক্ষমাশূন্য ঘাতপ্রতিঘাতনিদারুণ সর্বনাশ হইল না কেন ? রমেশ ও হেমনলিনীর ভাগ্যে পরিণামে কী ঘটিল জানি না—

সর্বনাশ যে ঘটে নাই বা ঘটিতে পারিবে না, ইহা একরূপ কল্পনা করিয়া লওয়া যায়— একটা গূঢ়অশ্রু দীর্ঘশ্বাস-ভরা বৈরাগ্যবিধুরতার পানে অথবা একটি বিষাদসন্ধ্যার অন্ধকার -অভিমুখে হয়তো তাহাদের নিঃসঙ্গ নিরুদ্দেশ জীবনপথ হারাইয়া গেল— ঠিক বলা যায় না— কিন্তু, কমলা আর নলিনাক্ষ যে পরস্পরের দ্বারা সার্থক হইল, সম্পূর্ণ হইল, তাহাতে তো আর সন্দেহ নাই। কমলার মনে যে কোনো গ্লানি বা কোনো কলঙ্ক রহিল না, সকল দুঃখের ও সকল দ্বন্দ্বের নিঃশেষ অবসান হইল অশ্রুবিধৌত এক মিলনের প্রভাতে, ইহা এমন সুন্দর, এমন সহজ, আর এমন সম্পূর্ণ যে, শিশুমনোহর রূপকথায় চলিলেও আধুনিক গল্পে উপন্যাসে চলিবে কি? ফলতঃ, ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য না বাস্তব?

বিশ্বাস করিবার ও বিশ্বাস করাইবার ক্ষমতা সকলের সমান নয়। আর, কবির মুখের কথাই কাড়িয়া লইয়া বলিতে হয়: ঘটে যা তা সব সত্য নয়। অর্থাৎ, যাহা-কিছু বাস্তব তাই শুধু সত্য নয়।

মনুষ্যজীবনে অবশ্যম্ভাবী সার্থকতা নাই এমন বলা যায় না। কিন্তু, সেই নিশ্চিত সার্থকতাও সহজে ধরা দেয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনন্ত দেশে কালে, অনন্ত জীবনে, জীবনের বা চেতনার বহুবিচিত্র স্তরে অনুসরণ করিয়া, তবে হয়তো তাহার অকুণ্ঠিত অগুণ্ঠিত সাক্ষাৎকার পাওয়া যায়। শেষ পর্যন্ত কিছুই ব্যর্থ হয় না, কিছুই তমসাচ্ছন্ন থাকে না, কিছুই নষ্ট হয় না সত্য; কিন্তু এ কথারও ষোলো-আনা সত্যতা কেবল সমগ্রের মধ্যে, অখণ্ডের মধ্যে, একের মধ্যে। অন্য ভূমিতে দাঁড়াইয়া অন্য চোখে দেখিলে মায়া-ছায়ার বহু বাধা, বহু ব্যবধান আছে। বাস্তব দৃষ্টি, বাস্তব শিল্প, বাস্তব সাহিত্য ছিন্নবিচ্ছিন্ন খণ্ড ক্ষুদ্রগুলির গণনায় ব্যস্ত ও ব্যাকুল হইয়া সমগ্রের দিশা হারায়; ক্ষুদ্র দিয়া বৃহৎকে, খণ্ড দিয়া অখণ্ড একেকে, ক্ষণিক দিয়া চিরন্তনকে আবরণ করে। কিন্তু, সাহিত্য বা শিল্পের

ইহাই কি কাজ? ইহাই কি বিশেষ কৃতিত্ব? প্রাচ্য, বিশেষতঃ ভারতীয় মানস, সেরূপ মনে করে না। যে রেখাকে আপাতদৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন ও অর্থহীন দেখা যায়, যাহাকে হয়তো অন্যান্য রেখার বিরুদ্ধ ও প্রতিবাদী মনে হয়, অনন্তে প্রসারিত হইলে তাহাই একটি অপরূপ বৃত্ত অঙ্কিত করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কী? অন্যান্য রেখা-বলয়াবলীর সহিত নানা ভাবে মিলিয়া মিশিয়া অপূর্ব এক রেখাছন্দ, রূপালংকার, রচনা না করিয়া পারিবে কি?

অথচ, বাস্তবে অনন্ত অবধি কোনো-কিছুরই অনুসরণ করা যায় না। সাহিত্যেও যায় কিনা সন্দেহ; তবে ইচ্ছা থাকিলে ও কৌশল জানিলে তাহারই ইশারা দেওয়া যায়। সম্পূর্ণ বৃত্তটি আঁকিয়া দেখাইবার ক্ষেত্র না থাকুক, খানিকটা বৃত্তচাপ বা বৃত্তাভাস দেখানো যায় বৈকি এবং যে বুঝিবার সে উহাতেই সবটা বুঝিয়া লয়। ইহাকে কি অবাস্তব বলিব? যদি বা অবাস্তব বলা যায়, অসত্য বলিব কেমন করিয়া? য়ুরোপীয় গল্পে উপন্যাসে ট্র্যাজেডিতে যেরূপ ভাগ্যবিপর্যয়ের— যেরূপ মানুষে মানুষে তথা মনুষ্যে ও সমাজে ঘাতপ্রতিঘাতের— নিশ্চিত পরিণাম হয় বধ নয় বন্ধন, নয় আত্মঘাত, নয় তো ঘোর উন্মত্ততা, প্রাচ্য কল্পনায় তেমন তো কিছু দেখা যায় না। একটি বৈরাগ্যের বিষাদে, একটি আত্মনিবেদনের শমরসে, একটি ক্ষমার মাধুরীতে, একটি মর্মবিগলিত অশ্রুধারায়, অশ্রুধৌত হাসিতে ও চেতনার নিঃশব্দ সঞ্চারে, এক কথায়, কোনো-একটা সার্থকতায় ও সমে, না পৌঁছিয়া কোনো বৃহৎ সৃষ্টিই শেষ হয় না। অভিজ্ঞানশকুন্তলের কথাই ধরা যাক, পাশ্চাত্য মনীষী গ্যেটেও উহার রসের ও সৌন্দর্যের পূর্ণতায় চমৎকৃত। পৃথিবীতে যাহা ভগ্ন, যাহা ছিন্ন, যাহা ধূলিকীর্ণ, যাহা অসম্পন্ন ও শূন্যতায় অবসিত হইতে পারিত তাহা স্বর্গে কি পূর্ণতা পায় নাই? প্রণয়স্বর্গচ্যুত দুষ্যন্তের স্মৃতি-উদ্‌বোধের উপায় বা উপলক্ষ্যটাই বা কী? মাছের পেট চিরিয়া

পাওয়া অঙ্গুরীয়! দুর্বাসার শাপও যেমন অহেতুক, আকস্মিক, অর্থাৎ বহির্জগৎ হইতে প্রক্ষিপ্ত একটা ঘটনা, এই অঙ্গুরীয়-উদ্ধারও কি তেমনি নয়? সে তো বটেই। তবে এগুলি হইল শুধু ছল, রূপলক্ষণা, সীম্বল। ইহারই সাহায্যে কালিদাস দুইটি হৃদয়ের গূঢ়তম গভীরতম আলোড়ন ও উদ্‌বোধ, দুইটি সত্তার বুঝিবা অনন্ত-জীবন-ব্যাপী একটি ইতিহাস, একটি অন্ধ আকর্ষণের কামনা হইতে প্রেম পর্যন্ত উত্তরণের কল্পনাতীত আশ্চর্য কাহিনী, অতি সংক্ষেপে আর অতি সুন্দর করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। জীবনকে, প্রেমকে, সত্যকে এভাবে ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা বাস্তবের নাই।

সুতরাং, কমলার হৃদয় যে ক্ষত-বিক্ষত বিধ্বস্ত-বিভ্রান্ত না হইয়া পারে না, তাহার জীবন যে ছার্‌খার হইয়া যাওয়াই চাই, এ কথায় আমাদের অণুমাত্র আস্থা নাই। তার পর দেখিতে হইবে আশৈশবের শিক্ষা আর সামাজিক ও সাংসারিক পরিবেশ, কমলার মনের গঠন। কমলার চরিত্রটি বা তাহার বিকাশ যেভাবে আঁকা হইয়াছে তাহা অনেকটা অপ্রত্যাশিত, অসংগত, এটা যেন মানিয়া লইয়াই রবীন্দ্রনাথ পূর্বোক্ত ভূমিকায় কৈফিয়ত দিয়াছেন, 'কোনো-একজন বিশেষ মেয়ের মনে সমাজের চিরকালীন সংস্কার দুর্নিবাররূপে এমন প্রবল হওয়া অসম্ভব নয় যাতে অপরিচিত স্বামীর সংবাদমাত্রেই সকল বন্ধন ছিঁড়ে তার দিকে ছুটে যেতে পারে।' তাই যাক,ইহাতে আসলে কোনোরূপ লজ্জার বা ক্ষুণ্ণতার কারণ নাই। সংস্কারমুক্ত মানবমন, সে এমন এক 'সোনার পাথর-বাটি' যাহা কোনো দেশকালপাত্রে হয় নাই, হইবেও না। একরূপ সংস্কারের পরিবর্তে অন্যরূপ সংস্কার, এইমাত্র সম্ভব। কমলার সংস্কারটি এ ক্ষেত্রে কিরূপ? যে সংস্কারে হিমালয়নন্দিনী গৌরী বলিয়াছিলেন: মমাত্র ভাবৈকরসং মনঃ স্থিতম্। 'আমার মন তাঁহাতে ভাবের একরসে অবিচল'। মানুষকে তো আমরা কেবল চোখ দিয়া দেখি না;

কেবল স্থূল ব্যবহারে চিনিয়া লই না ; যুক্তিবিচারে সত্য হউক আর মিথ্যা হউক, অনেকটা অনুমান করিয়া, অনেকটা কল্পনা করিয়া, অনেকটা আশা আকাঙ্ক্ষা মিশাইয়া ও মনোভব আদর্শের প্রক্ষেপ করিয়া, ঈশ্বরের সৃষ্ট বস্তুকে নিজে নূতন করিয়া সৃষ্টি করি এবং অবশ্যই সেই চেষ্টায়, সেই সাধনায়, সঙ্গে সঙ্গে নিজেও নূতন হইয়া উঠি। এই পদ্ধতির একান্ত সত্যমিথ্যা জানিবার অন্য কোনো উপায় নাই ; ফলের দ্বারা, কল্যাণপ্রসূ বা অকল্যাণকর পরিণামের দ্বারা জানিতে হইবে।

ইহা কেবল আপাতদৃষ্টিতেই আশ্চর্যের বিষয় যে, কমলা 'নলিনাক্ষ' এই নামটিকে বীজমন্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়া, 'স্বামী'-রূপ একটা আইডিয়ার আহ্বানে, তাহার পদতলের মাটি, তাহার যা-কিছু এত দিনের জানা চেনা, সমস্তই এক মুহূর্তে ত্যাগ করিয়া একেবারে অচেনা অজানাতে ঝাঁপ দিল। এমনই হইয়া থাকে। প্রাণী হইতে মানুষের ইহাতেই বিশিষ্টতা। সে কেবল দেহ ও প্রাণ নয়। বিশেষ করিয়াই সে হৃদয়, মন, বুদ্ধি। সুতরাং তাহার জীবনে যা-কিছু সার্থকতা, যে-কিছু মহান্ পরিণাম, তাহার মূলে থাকে একটা আদর্শের ভাবনা, একটা আইডিয়ার ইশারা এবং তাহারই উদ্দেশে অসীম সাহস, অক্লান্ত উদ্যম, অশেষ ত্যাগ। 'ঈশ্বর' এরূপ একটা আইডিয়া, 'দেশ' এরূপ একটা আইডিয়া, আমাদের দেশের মেয়েদের কথাই বলিতে পারি— 'স্বামী' তাহাদের পক্ষে এরূপই একটা আইডিয়া। আশ্চর্য এই যে, যাহা একটা ভাব, একটা বিমূর্ত তত্ত্ব, ব্যবহারতঃ তাহাকে জানা ও পাওয়ার সাধনায় কী অক্লান্ত যত্ন, প্রতি দিনের প্রত্যেক মুহূর্তে স্থূল ও প্রত্যক্ষ কত অজস্র খুঁটিনাটির প্রতি কী অভিনিবেশ! বাহির হইতে যে আইডিয়া দেখে সে স্থূল ব্যবহার দেখে না, যে ব্যবহার দেখে সে আইডিয়া বা ভাব দেখে না, এবং উভয়েই সমান ভ্রমে পতিত হয়। (এই ভ্রমের নিরসনে সাকার-

উপাসনার মর্ম বুঝা যায়; সে কথার বিশদ আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। আর্ট্ সম্পর্কে বলা যায়— তাহার একটা বিগৃহীত বক্তব্য আছে, রূপ আছে; তেমনি আছে আবার বিমূর্ত ভাব, রস, ছন্দ, সুর; উভয়েরই উপযোগিতা এবং পূর্বাপর-সম্বন্ধ যে বোঝে সেই বোঝে বিমূর্ত রসের বিগ্রহ-রূপী আর্ট্ জিনিসটা কী।)

কাজেই, হিন্দুর দাম্পত্যজীবনের যে আদর্শ হরগৌরী-রূপে বা রামসীতার জীবনে দীপ্যমান— যে আদর্শের অনুশীলনে পরস্পর শ্রদ্ধা আছে, প্রীতি আছে, পূজা আছে, অন্তর্নিহিত দেবত্বের সন্ধান ও পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন আছে, তাহাকে স্থূলইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের প্রমাণে বা দৈনন্দিন জীবনের ধূলিলিপ্ত ছদ্মবেশ-হেতু অলীক ও অহেতুক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। পতিব্রতা সতীর প্রেমের সাধনায়, একাগ্রতার শক্তিতে, পুরুষের অন্তরে শিবত্বের তথা দেবত্বের উদ্‌বোধ সম্ভব। কারণ, দেবত্ব মনুষ্যত্বেরই অন্তর্নিহিত বস্তু। তাহা নিরর্থ কল্পনা বা আকাশকুসুম নয়। এই উজ্জ্বল আদর্শ এবং তাহাতে সরল অথচ সবল নিষ্ঠা কমলার অন্তরে ছিল। সর্বশরীরে সঞ্চারিত রক্তের প্রবাহেই ছিল। নানা পরস্পরবিরুদ্ধ প্রভাবে ও শিক্ষায়, নাগরিক জীবনের কৃত্রিমতায়, ইহা নষ্ট হয় নাই। মাতুলের সংসারে অনাদরে মানুষ হইয়াছে সত্য, কষ্ট সহিয়াছে, ক্লেশ করিয়াছে, তাহাতে চরিত্রের দৃঢ়তাই বাড়িয়াছে। ব্রত লইয়া ভোরে যখন স্বহস্তে মাটির শিব গড়িয়া পূজা করিয়াছে তখন এক অপরূপ ভাব তাহার মনে জাগিয়াছে। স্তব্ধ হইয়া কোনো সন্ধ্যায় কথকের মুখে রামায়ণকথা পুরাণকথা শুনিয়াছে যে দিন, অন্তরের নির্নিমেষ দৃষ্টিতে এক অলৌকিকের সাক্ষাৎ তার মিলিয়াছে। অন্তর্নিহিত সেই শিক্ষা, সেই স্বপ্ন, সেই বিশ্বাস ও সেই নিষ্ঠা লইয়া আত্মদানোৎসুক পরিপূর্ণ নির্ভরে স্বামীর ঘর করিতে আসিয়াছে, লজ্জায় যে স্বামীকে সে বাসররাত্রের হাস্যালাপ পুষ্পগন্ধ স্নিগ্ধোজ্জ্বলদীপালোক এ-সকলের

মধ্যে চাহিয়াও দেখে নাই— কিন্তু, তাহার অন্তরে থাকিয়া আর-একজন নির্নিমেষ দুটি চোখে আরতি জ্বালাইয়া দেখে নাই যে তাহা কে বলিতে পারে ?

যাহা হউক, ঝড় বহিয়া গেল এবং কুলগ্রাসিনী পদ্মার তরঙ্গ-তাড়নে দুটি দিগ্‌ভ্রষ্ট জীবন দুই দিক হইতে ভাসিয়া নির্জন চরে আসিয়া মিলিল। বয়সের হিসাব অনাবশ্যক ; মনের দিক দিয়া কমলা তখনো বালিকা, পরিপূর্ণ নারী নয়, বর্ষণ-ভরা মেঘের মতো হৃদয়ভারাবনতা রমণী নয়। ইহার পর অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে দেখিতে পাই এই অনভিজ্ঞা বালিকা, স্বামী-বোধে, সহজ সরল বিশ্বাসে, কিভাবে দ্বিধাগ্রস্ত ও অন্যমনস্ক রমেশকে আশ্রয় করিতে গিয়াছে আর কিভাবে বারে বারেই বাধা পাইয়াছে। তাই, রমেশের সহিত তাহার সম্পর্ক ক্ষণে-ক্ষণে-সংশয়াবিষ্ট এক-প্রকার বন্ধুত্বের পর্যায়েই থাকিয়া গিয়াছে ; সুপ্তিচারী পথিকের মতো সে যে কোথায় আছে, কোথায় চলা-ফেরা করিতেছে, কমলা তাহা ভালো বুঝিতে পারে নাই। একটা কোনো আদর্শ মনে থাকিতে পারে, কিন্তু বাহিরে তাহা রাখিবার যোগ্য একটি বেদীও চাই ; তার পর নাহয় সাধনায় ও আরাধনায় বিগ্রহে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা যাইবে। বর্ষণফুল্ল নির্বোধ বল্লরী দেখি, খড়্‌খড়ির ফাঁকে দোতলার আপিস-ঘরেও প্রবেশ করে এবং অধিকর্তাকে স্থিরাসনে না পাইয়া তাঁহার অধিকৃত কুর্শিখানার পায়া জড়াইয়া উঠিতে চায়, কোন্ দিন আচমকা এক-গুচ্ছ ফুল ফুটাইয়া তাঁহাকে হতবুদ্ধি করিবার হয়তো চেষ্টা— যদি না ইতিমধ্যে বেচারি খরধার কাঁচিতে কাটা পড়ে। শাস্ত্রকারেরা যাই বলুন, মানুষের হৃদয় এমন শুক্‌না কাঠের খুঁটি জড়াইয়া উঠিতে পারে না। অন্য একটা সংবেদনশীল হৃদয়ের প্রয়োজন হয়। সেই হৃদয়ের একটা স্বীকৃতি, একটু আভিমুখ্য, খানিকটা প্রশ্রয়ের প্রয়োজন হয়। রমেশের নিকট কমলা তাহা পায় নাই। যতটুকু

পাইয়াছে তাহাও ক্ষণে ক্ষণে দ্বিধায় সংশয়ে ও নৈতিক নিষেধের গোপন গ্লানিতে খণ্ড, ছিন্ন। অথচ, মা বলিয়া, মেয়ে বলিয়া, ভগিনী বলিয়া, যে কেহই কমলাকে একবার স্বীকার করিয়া লইয়াছে তাহারই কাছে তাহার আত্মদান ও হৃদয়দান কত সহজ সে জানে উমেশ-ছেলেটা, জানেন পশ্চিম অঞ্চলের খুড়ামহাশয়, জানে তাঁহার মেয়ে শৈল। এ ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস-সম্ভূত দৃঢ়তার যে অভাব নাই তাহাও সে বুঝাইয়া দিয়াছে রমেশকে, গাজিপুরে বসবাসের সংকল্পে ও উমেশের অত্যাগে।

গাজিপুরে আসিয়া শৈলজার বন্ধুত্বে ও শৈলজার প্রেমতপ্ত হৃদয়ের সংস্পর্শে কমলা প্রথম সেই বুঝিল নিজের জীবনের ব্যর্থতা ও শূন্যতা, পদ্মার চরেরই মতো— তাহাকে বেষ্টন করিয়া নিশিদিন জীবনপ্রবাহ বহিতেছে, সে তৃষিত ; তৃণ নাই, ফলশস্য নাই, কোনো প্রিয়জনের পদপাত নাই। অথচ শৈলজার জীবন কতই ভিন্ন, নারীজীবনের চিরকাঙ্ক্ষিত দুঃখে সুখে কতই পরিপূর্ণ। দূর কক্ষে বা অঙ্গনে যে পদক্ষেপের বার্তা আর কেহ জানিতে পারে না শৈলজার উৎকর্ণ হৃদয় কেমন করিয়া তাহা জানিতে পায়, যেন সে তাহার নিত্যআন্দোলিত হৃদয়েই পড়ে! বঞ্চিত জীবনের, যৌবনের নিঃশব্দ হাহাকার লইয়া এত দিনে কমলার বুভুক্ষু নারীত্ব তাহার অন্তরের গোপন অন্তরে সুপ্তি ও স্বপ্ন হারাইয়া সম্পূর্ণই জাগিয়া বসিল। কে তাহার আপন জন? সে কি এই মানুষ যে তাহার কাছে থাকিয়াও নাই! সে কি এই লোক যাহার শিক্ষিত মনের যুক্তিবদ্ধ ভাষা, 'যদি' 'তবে' ইত্যাদি ন্যায়ের সূত্র, নবপ্রণয়ের প্রথম চিঠি, শৈলজা তো বুঝিতে পারে নাই, আর কমলা বুঝিয়াছে যে দিন, আকস্মিক ঘটনায়, বুঝিয়া লজ্জায় ঘৃণায় আত্মধিক্কারে মাটিতে মিশাইতে চাহিয়াছে।

লক্ষ্যভ্রষ্ট কুড়ানো একখানা চিঠিতে আর-এক দিন আর-একটা ঝড় বহিয়া গেল। আকাশে নয়, অরণ্যে নয়, তরঙ্গউত্তাল পদ্মাবক্ষেও

নয়, কমলার অনাথ জীবনের উপর দিয়া, কমলার নবজাগরূক নারীত্বের পঞ্জর ভেদ করিয়া, তাহার সকল সুখ ও স্বপ্ন জীর্ণ দীর্ণ পত্ররাজির মতো দিগ্‌বিদিকে উড়াইয়া ছড়াইয়া। অবশেষে কমলা যখন সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইল, মৃত্যুর কবল হইতে প্রাণপণ বলে জাগিয়া উঠিয়া যেন নূতন এক জীবন পাইল, তাহার নূতন জন্ম হইল।

পদ্মাগর্ভ হইতে এক দিন প্রভাতে এক কিশোরী উঠিয়াছিল, গঙ্গাতটে এক রমণী আসিয়া দাঁড়াইল আজ সন্ধ্যামুখে—

'কমলা আসন্ন অন্ধকারের সম্মুখীন সেই অস্তগামী সূর্যকে প্রণাম করিল। তাহার পরে মাথায় গঙ্গাজলের ছিটা দিয়া নদীর মধ্যে কিছুদূর নামিল এবং জোড়করপুটে গঙ্গায় জলগণ্ডুষ অঞ্জলি দান করিয়া ফুল ভাসাইয়া দিল। তার পর সমস্ত গুরুজনদের উদ্দেশ করিয়া প্রণাম করিল। প্রণাম করিয়া মাথা তুলিতেই আর-একটি প্রণম্য ব্যক্তির কথা সে মনে করিল। কোনো দিন মুখ তুলিয়া তাঁহার মুখের দিকে সে চাহে নাই; যখন এক দিন রাত্রে সে তাঁহার পাশে বসিয়াছিল তখন তাঁহার পায়ের দিকেও তাহার চোখ পড়ে নাই। বাসরঘরে অন্য মেয়েদের সঙ্গে তিনি যে দুই-চারিটি কথা কহিয়াছিলেন তাহাও সে যেন ঘোমটার মধ্য দিয়া, লজ্জার মধ্য দিয়া, তেমন সুস্পষ্ট শুনিতে পায় নাই। তাঁহার সেই কণ্ঠস্বর স্মরণে আনিবার জন্য আজ এই জলের ধারে দাঁড়াইয়া সে একান্তমনে চেষ্টা করিল, কিন্তু কোনো মতেই মনে আসিল না।'

ইহা নূতন জন্ম নয় তো কী? পুরাতনের তর্পণ সারিয়া, পুরাতনকে শেষ প্রণাম জানাইয়া, কমলা তাহার নিকট বিদায় লইল। না, সে আত্মহত্যা করিল না। তেমন আশাহীন নয় তার হৃদয়, তেমন মেরুদণ্ডহীন দুর্বল চরিত্র নয় তার। কুসুমসুকুমার যদিও কমলার রূপ ও কান্তি, বজ্রসার তার গূঢ় অন্তর। এই সন্ধ্যায় যে একলক্ষ্য অভিসারে সে বাহির হইয়া পড়িল তাহাতে মনে পড়ে

রবীন্দ্রনাথেরই কল্পিত সন্ধ্যাসতীর বর্ণনা—

'একটি সোনার-চেলি-পরা বধূ অনন্ত প্রান্তরের মধ্যে মাথায় একটুখানি ঘোমটা টেনে একলা চলেছে ; ধীরে ধীরে কত শতসহস্র গ্রাম নদী প্রান্তর পর্বত নগর বনের উপর দিয়ে যুগ-যুগান্তর-কাল সমস্ত পৃথিবীমণ্ডলকে একাকিনী ম্লাননেত্রে মৌনমুখে শান্তপদে প্রদক্ষিণ করে আসছে। ·· কোন্ অন্তহীন পশ্চিমের দিকে তার পতিগৃহ !'

মনে হয়, কমলাও যেন তার অদৃষ্টপূর্ব স্বামীর সন্ধানে শতবার পৃথিবীপ্রদক্ষিণের শক্তি বিশ্বাস ও ধৈর্য রাখে। কারণ, চিরদুঃখিনী বৈদেহী যেমন বলিয়াছিলেন—

তিষ্ঠেল্লোকা বিনা সূর্যং শস্যং বা সলিলং বিনা।
ন তু রামং বিনা দেহে তিষ্ঠেৎতু মম জীবিতম্॥

তেমন কমলাও যে বলিতে পারে ; স্বামীকে না পাইয়া, তাঁহারই চরণে নিজেকে সম্পূর্ণ নিবেদন না করিয়া, সে বাঁচিবে কেন !

যাহা হউক, ইহার পর হইতে শুরু হইল কমলার একাগ্র সন্ধান, কমলার একনিষ্ঠ তপশ্চর্যা। সে সন্ধান বহির্জগতের পথে পথে নয় বটে, সে তপস্যা নয় পাঁচ দিকে পঞ্চাগ্নি জ্বালিয়া, তবু তাহার ঋজুতা তীব্রতা ও সিদ্ধিদায়িনী শক্তি কিছুমাত্র কম নয়। বাহিরে তাহার তেমন পরিচয় নাই, অন্তরে তাহা সংহত সত্তার ও জাগ্রত চেতনার আকর্ষণে আপন প্রেমাস্পদকে আপনি টানিয়া আনিয়াছে। একটির পর একটি যে-সব ঘটনা ঘটিতে দেখা গিয়াছে কেবল চোখের দেখাতেই তাহা কাকতালীয়বৎ মনে হইতে পারে, বস্তুতঃ কি তাই ? অন্তরের আহ্বানে বাহির হইতে সাড়া আদায় করিয়া লওয়া, আত্মার শক্তিতেই আত্মীয়কে লাভ করা, এমন তো সংসারেও ঘটিয়া থাকে বহু ক্ষেত্রে বহুজনের জীবনে। আর, সার্থক সাহিত্য-সৃষ্টি— সেখানে তো অবান্তরকে, আকস্মিককে, মায়িককে লইয়া

কারবার নয় ; না, অসত্য কল্পনার কোনো এলেকাই নাই। সত্তার উদ্দেশে সত্তার আহ্বানে ও সত্যের জোরে এরূপ না ঘটিয়া পারে কি ?

'নলিনাক্ষ' এই পুণ্য নামটি কানের ভিতর দিয়া কমলার 'মরমে পশিয়াছিল'। প্রথমে যেভাবে সে স্বামীকে দেখিল, নিষ্পলক দৃষ্টিতে, মনে হয় সর্বদেহমনে নেত্রময় হইয়া দেখিল, তাহার বর্ণনাটুকু তুলিয়া না দিলে কমলাকে সম্পূর্ণ জানা যাইবে না—

'কমলার নিশ্বাস প্রবল হইয়া তাহার বুকের মধ্যে কষ্ট হইতেছিল।··· বিক্ষুব্ধ বক্ষকে শান্ত করিবার জন্য তাহাকে সেইখানে বসিয়া পড়িতে হইল।··· অন্ধকারের ভিতর হইতে বেপথুমতী কমলা নলিনাক্ষের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। চাহিতে চাহিতে তাহার দুই চক্ষে জল আসিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি জল মুছিয়া ফেলিয়া সে তাহার একাগ্র দৃষ্টির দ্বারা নলিনাক্ষকে যেন আপনার অন্তঃকরণের গভীরতম অভ্যন্তরদেশে আকর্ষণ করিয়া লইল। ওই-যে উন্নতললাট স্তব্ধ মুখখানির উপরে দীপালোক মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছে, ওই মুখ যতই কমলার অন্তরের মধ্যে মুদ্রিত ও পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল ততই তাহার সমস্ত শরীর যেন ক্রমে অবশ হইয়া চারি দিকের আকাশের সহিত মিলাইয়া যাইতে লাগিল ; বিশ্বজগতের মধ্যে আর-কিছুই রহিল না, কেবল ওই আলোকিত মুখখানি রহিল, যাহার সম্মুখে রহিল সেও ওই মুখের সহিত সম্পূর্ণভাবে মিশিয়া গেল।'

যোগী ও সাধকেরা হয়তো ইহাকেই ভাবসমাধি বলিবেন। ইহাতে কেবল বাস্তবতা নাই, আছে অপরিমেয় ও অনির্বচনীয় সত্যতা। ইহাতে বুঝিতে পারি, কমলা অসংখ্য সাধারণের অন্যতমা মাত্র নয় ; সে বিশেষ একজন, যাহার তুলনা পাওয়া মুশকিল। সে পরাবলম্বিনী আত্মবিস্মৃতা আশা[১] নয়, যাহার আর্তি ও বেদনা

দেখিয়া মনে পড়ে বৈষ্ণব কবির উক্তি : শিশিরের লতা-হেন বিনি অবলম্বনে উঠইতে কত করু সাধ। কমলার অপরিসীম ত্যাগের শক্তি আছে বলিয়াই পরিপূর্ণভাবে গ্রহণেরও সামর্থ্য ও সৌভাগ্য আছে। যখন সে ভাবিল, হেমনলিনী আসিয়া নলিনাক্ষের ঘরনী হইবে, তখন তো ব্যাকুল ভাবে হাহাকার করিয়া উঠিল না, আশাভিন্নহৃদয়া হইয়া মূর্ছিত হইল না, নলিনাক্ষকে হেমনলিনীকে বা নিজের ভাগ্যকে ক্ষিপ্তচিত্তে ধিক্কার বা অভিশাপ দিতে বসিল না, সে আপন অবিরল-অশ্রু-কলঙ্কিত মুখখানি উর্ধ্বে তুলিয়া প্রার্থনা জানাইল : আমি কোনো কামনা মনের মধ্যে রাখিব না। 'কেবল সেবা করিব। যত দিন জীবন আছে কেবল সেবা করিব। আর কিছু চাহিব না, চাহিব না, চাহিব না। রাত্রে দুই তিন বার ঘুম ভাঙিয়া গেল। ভাঙিবা মাত্রই সে মন্ত্রের মতো আওড়াইতে লাগিল : আমি কিছুই চাহিব না, চাহিব না, চাহিব না। ভোরের বেলায় সে বিছানা হইতে উঠিয়া জোড়হাত করিয়া বসিল এবং সমস্ত চিত্ত প্রয়োগ করিয়া কহিল : আমি আমরণকাল তোমার সেবা করিব, আর-কিছু চাহিব না, চাহিব না, চাহিব না।'

হেমনলিনীকে কায়মনোবাক্যে সে আত্মীয় বলিয়া, বন্ধু বলিয়া, গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইল এবং প্রফুল্লমুখে ক্ষুদ্র সংসারের শত কাজে ফিরিতে লাগিল। পরিপূর্ণভাবে আত্মনিবেদনের সুদুর্লভ শক্তি তাহার আছে; বৈষ্ণবী ভাষায় বলিতে গেলে তাহার প্রেম যে 'কৃষ্ণপ্রীতিইচ্ছা', আত্মসুখইচ্ছা নয়।

এরূপ নিখাদ নিষ্কলঙ্ক প্রেম ব্যর্থ হইতে পারে না। কমলার প্রীতি ও পূজার লক্ষ্য যদি নলিনাক্ষ না হইয়া আর কেহ হইত, ঘটনা যদি এ পথে না আসিয়া অন্য পথে ধাবিত হইত— এ-সকল প্রশ্ন অবান্তর। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, সংসারে অনেক অবান্তর, অসংগত, প্রক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটে, কিন্তু অনন্ত জীবনে সব কিছুই একটি

সুসংগতিতে গিয়া উত্তীর্ণ হয়। এখানে যাহাকে কোলাহল বলিয়া মনে হয় তাহাও অপরিসীম এক সংগীতের অংশবিশেষ; এ লোকে বা লোকান্তরে একটি সমে পৌঁছিলে তাহার অর্থ ও সুষমা বুঝা যাইবে। যে জীবন আজ ভগ্ন ও খণ্ড বলিয়া মনে হইতেছে সেও জানি অন্য অগণ্য ঘটনা-পরম্পরায়, অন্য অজ্ঞেয় উপায়ে ও উপকরণে, এক দিন নীল শূন্যে একটি গুম্বজের শোভায় ও গৌরবে জাগিয়া উঠিবে, একটি অটুট সুন্দর খিলানের অবকাশে সেই অনন্তকেই যেন একটি ফ্রেমে বাঁধিয়া আমাদের গোচর করিবে। সুতরাং, অন্যরূপ ঘটনায় কমলার জীবন হয়তো অন্য রূপ ধারণ করিত, কিন্তু স্বরূপের বদল হইত না এবং তাহার আত্মস্থিত সার্থকতা কেহ ঠেকাইয়া রাখিতে পারিত না।

যাহা হউক, অনুকূল ভাগ্যের প্রসন্নস্মিত দৃষ্টিতলে ক্রমে কমলার জীবনলতায় একটি 'রাঙা-মুকুল', একটি 'প্রেমের মঞ্জরী' জাগিয়া উঠিল। প্রথম স্বামীসন্দর্শনের অনির্বচনীয় উপলব্ধির শেষে কমলা যখন সম্বিৎ ফিরিয়া পায় তাহার সমস্ত প্রাণ মন ভরিয়া দিয়াছিল একটি বিমুগ্ধ বিস্ময়। সেবার অধিকার লাভ করিবার পরে প্রথম যে দিন সে নলিনাক্ষের এক-জোড়া খড়ম আবিষ্কার করিল, 'তাড়াতাড়ি সেই খড়মজোড়াটি তুলিয়া কমলা মাথায় ঠেকাইল এবং ছোটো শিশুটির মতো বুকের কাছে ধরিয়া অঞ্চল দিয়া বার বার তাহার ধুলা মুছাইয়া দিল', সে দিন কি আপনার অন্তরে এক স্বামী-সোহাগিনীরও সাক্ষাৎ সে পাইল না? পরে আর-এক দিন, নলিনাক্ষের ঘরের কুলুঙ্গিতে প্রফুল্ল গোলাপ সাজাইয়া, স্বহস্তে তাহার শয্যা পাতিয়া, সহসা নলিনাক্ষের পদশব্দে চকিত হইয়া 'অঞ্চলে মুখ ঝাঁপিয়া লজ্জায় একেবারে মাটিতে মিশাইতে চাহিল' যখন, তাহার ওই মধুর লজ্জায় নিজের কাছেও নিজে সে ধরা পড়িল আর অন্য-একজনের কাছেও কিছুই তো লুকাইয়া রাখা গেল না।

(পূজারিনী উমাও কিভাবে ধীরে ধীরে এক দিন আপন আরাধ্যের প্রিয়তমা হইয়া উঠিয়াছিলেন, কালিদাস সে কাহিনী সুন্দর ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।)

অবশেষে সকল দ্বিধা সংশয় সংকোচ শঙ্কা সবলে পরিহার করিয়া, বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া, অন্তরের একটি চৈতন্য-আভায় অপরূপ-দীপ্তি-মণ্ডিতা হইয়া, যে দিন সে অগুণ্ঠিত আননে ও অকুণ্ঠিত স্বরে বলিতে পারিল 'আমি কমলা', সে দিন তাহার সকল আবরণ ঘুচিল এবং তাহাকে নিঃশেষে চিনিলাম। 'আমি কমলা' এই দুটি কথাই যথেষ্ট। অতল অকূল বিশ্বসমুদ্রের পঙ্ক ত্যাগ করিয়া, সলিল ভেদ করিয়া, তরঙ্গআক্ষেপের ঊর্ধ্বে ভাবের ও রূপের অম্লান অপরূপ একটি পদ্ম! একাগ্র চেতনার নিবাত নিষ্কম্প একটি শিখা! 'আমি কমলা'! এই দুটি কথা বলিতেই কমলা আপনার সকল শক্তি সংহত করিয়াছিল; ইহার 'পরেই তাহার আপনার কণ্ঠস্বরে তাহার যেন ধ্যানভঙ্গ হইয়া গেল, তাহার একাগ্র চেতনা বাহিরে ব্যাপ্ত হইল।··· তাহার সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, মাথা নত হইয়া গেল··· নড়িবারও শক্তি রহিল না, দাঁড়াইয়া থাকাও যেন অসাধ্য হইয়া উঠিল।··· নলিনাক্ষ আস্তে আস্তে তাহার হাতটি আপনার হাতের উপর তুলিয়া লইয়া কহিল: আমি জানি তুমি আমার কমলা। এসো আমার ঘরে এসো। উপাসনা-ঘরে তাহাকে লইয়া গিয়া তাহার গলায় কমলার গাঁথা সেই মালাটি পরাইয়া দিল এবং কহিল: এসো আমরা তাঁহাকে প্রণাম করি। দুইজনে পাশাপাশি যখন সেই শ্বেত-পাথরের মেজের উপর নত হইল, জানালা হইতে প্রভাতের রৌদ্র দুইজনের মাথার উপরে আসিয়া পড়িল।'

আমাদের আলোচনা এইখানেই শেষ করা গেল। রবীন্দ্ররচনার নানা অংশ সংকলন করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারি নাই।

অথচ, আগাগোড়া গল্পটি উদ্‌ধৃত না করিয়া সকল সৌন্দর্য কেহ কি বুঝাইতে পারিবে? উমেশ ছেলেটা, উমি— যে কচি হাত-দুটিতে ঢল্‌ঢলে সোনার বালা দুটি পরিয়া হাত ঘুরায় আর বলে 'মাসি গ-গ গেছে'— তবে দুধ খায়, শৈলজা, হেমনলিনী, পুত্রগরবিনী ক্ষেমংকরী, পশ্চিম অঞ্চলের খুড়ামহাশয়, বৃদ্ধ অন্নদাবাবু, যোগেন্দ্র— যাহার স্পষ্টবক্তৃত্বে আর সহৃদয় অধৈর্যে প্রায় অতিপরিচিত জনের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাই, 'পানুবাবুর সহোদর-হেন অক্ষয়, নবীনকালী— যাঁর ছেলের কাছে দু মাস অন্তর লাটসাহেবের চিঠি আসে এবং যাহার হুকুমে কত লোকের ফাঁসি হইয়াছে: প্রত্যেকটি চরিত্র আপন অনন্য স্বভাবে বা প্রকৃতিতে আমাদের জানা ও চেনা হইয়াছে। অবশ্য, কমলার মতো ধীরে ধীরে আপনার অকলঙ্ক স্বরূপ সম্পূর্ণ উন্মোচন করিয়া আর-কেহই আমাদের বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়ায় নাই। সংসারে অধিকাংশ মানুষের 'স্বভাব' শুধু জানা যায়; স্বরূপে ফুটিয়া ওঠে লক্ষের মধ্যে বুঝি একজনই।

রমেশ? তাহার কথাও ভুলি নাই। নৌকাডুবি গল্প লইয়া পাশ্চাত্য-সাহিত্যরসিক এক পক্ষের মনে যে আপত্তি উঠিতে পারে, আমরা এ প্রবন্ধে তাহারই কথঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। অন্য করুণহৃদয় পাঠক, বিশেষতঃ পাঠিকা -মণ্ডলী, অনুযোগ করিতে পারেন রমেশ ও হেমনলিনীর জীবনের এ ব্যর্থতা কেন? রবীন্দ্রনাথের মনে কি দয়া নাই? তা, আছে বৈকি। নহিলে, রমেশের নিকট কমলার শেষ-বিদায়-গ্রহণ দৃশ্যটির অবতারণা করিতে হইত না। সেই সাক্ষাতের আরম্ভে ও শেষে ভূমিষ্ঠ প্রণামের দ্বারা কমলা নিজের দিক হইতে সকল ক্ষোভ-ক্ষতির চিহ্ন মুছিয়া দিয়াছে, সকল অপরাধের 'পরে ক্ষমা বর্ষণ করিয়াছে। (স্বয়ংবরসভায় রাজনন্দিনী সুদর্শনার এক-একটি প্রণামের দ্বারা এক-একজন নরপতির নিকট হইতে বিদায়-গ্রহণ, সহসা মনে পড়ে বৈকি। অবশ্য, বাহ্য সাদৃশ্যের

বেশি আর-কিছু আশা করা যায় না। বরং আর-একটি কথা মনে পড়ে, কোনো সাহিত্যে পড়ি নাই, শাস্ত্রে থাকিতে পারে— এ ক্ষেত্রে তাহার উপযোগিতা সহৃদয় সমজ্‌দার বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলিয়াছেন : ইষ্টসাধনার পথে অনেক-কিছু দেখিবে, অনেক-কিছু উপলব্ধি করিবে, প্রত্যেককেই প্রণাম করিবে, কিছুই নিজে হইতে গ্রহণ করিবে না, তোমার ইষ্ট আসিয়া আপনি তোমার অন্তরে ও জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইবেন।) ভূমিষ্ঠ প্রণামে নত হইয়া কমলা মুক্তি দিয়াছে, মুক্ত হইয়াছে। ইহার পরেও রমেশের আপনাকে খুঁজিয়া পাইতে সময় লাগিবে সত্য, হয়তো এ জীবনে তাহার সম্পূর্ণ সার্থকতা না'ও মিলিতে পারে, তা বলিয়া চিরজীবনের জন্য ব্যর্থ হইবে কেন? তা ছাড়া, সার্থকতা ও সুখ এক নয়। সাধারণতঃ যাহাকে সুখ বলা যায় তাহাই সার্থকতা নয়; সার্থকতাই সুখ এ কথা সত্য বটে। সেই সার্থকতার বিশেষ সম্ভাবনা হেমনলিনীর অন্তরে আছে; তাহার মহত্ত্ব কিছু কম নয়; কেবল প্রতিকূল ঘটনা-ঘাতে, বহু দিক হইতে বহু কৃত্রিমতার অবরোধে ও আবরণে বিষণ্ণ, ম্লান। তাহার প্রেমের নিষ্ঠা, তাহার অন্তরাত্মার বল সামান্য নয়; সে যে ব্যর্থ হইবে, আপন সত্তা মন্থন করিয়া আপন সুধা আহরণ করিতে পারিবে না, এরূপ কল্পনা করা যায় না। অতএব অন্যকেও সার্থক করিবে।

হেমনলিনীর দুঃখ অনেকটাই রমেশের সৃষ্ট। রমেশের দুঃখ ও আপাতব্যর্থতা তাহার নিজের সৃষ্টি। মেটার্‌লিঙ্ক্‌ তাঁহার একটি লেখায় বলিয়াছেন, প্রজ্ঞাবান্‌ সাধুব্যক্তির সন্নিহিত দেশকালের সীমানায় কোনো ট্র্যাজেডি ঘটিতে পারে না। রমেশকে তো প্রজ্ঞাবান্‌ বলা যায় না— সে কখনোই আপন মনকে আপনি জানিতে পারে নাই, জানিতে চাহে নাই। অনুরাগ, আসক্তি, দ্বিধা, সংশয়— পরস্পরবিরুদ্ধ নানা ভাবের আন্দোলনে কেবলই কেন্দ্র হারাইয়া,

সত্যের সাহস ও চারিত্রিক ঋজুতা হারাইয়া, অসহায়ের মতো ভাসিয়া গিয়াছে ঘটনাস্রোতে। কাহিনী উপস্থিত যেখানে শেষ হইল তাহার পরে সে যে সম্বিৎ পাইবে না, আপনাকে পাইবে না, সকল আঘাত সকল দুঃখই বৃথা হইবে, এ কথা কে বলিল ?— এবং আপনাকে পাইলেই সব পাওয়া যাইবে।

জোড়াসাঁকো
আষাঢ় ১৩৫৮

উত্তীয়

বালক কিশোর
উত্তীয় তাহার নাম, ব্যর্থ প্রেমে মোর
উন্মত্ত অধীর।

বিগতবিলাসতন্দ্রা সুন্দরী শ্যামা তাহার জাগ্রত যৌবনের প্রথম ও পরম কামনার ধনকে যাহাতে বক্ষে ধারণ করিতে পারে, নির্নিমেষ চক্ষের দৃষ্টি দিয়া নিরুদ্‌বেগে পান করিতে পারে, যাহাতে উভয়ের মিলনে রাজরোষের দুষ্ট ছায়াপাতে অকস্মাৎ কোনো বিঘ্ন না ঘটে, এজন্য এই অপ্রাপ্তযৌবন বালক, বজ্রসেনের অমূলক চুরি-অপবাদ একান্ত অহেতুক-ভাবে নিজে কাড়িয়া লইয়া নিজের অম্লান অপরিণত জীবন যূপকাষ্ঠে বলি দিয়াছে— দিয়াছে, কেননা সে মূঢ়, অবিবেকী, অকরুণ রমণীর যৌবনলাবণ্যে ও স্বাভাবিক ছলাকলায় মুগ্ধ— এই তো তাহার অসম্পূর্ণ পরিচয়। শ্যামা বলিয়াছে বটে আপন প্রণয়-কামনার পরিপূর্তির উদ্দেশে এই অমূল্য জীবনবলি-গ্রহণ তাহার জীবনের সর্বাধিক পাপ, কিন্তু যাহাকে সে 'ওগো সর্বোত্তম' বলিয়া সম্বোধন করিতেছে তাহার জন্য সে কী না করিতে পারে? তাহার প্রেম সোহাগ ও সঙ্গ পাইলে এমন কোন্‌ কলঙ্ক বা আত্মগ্লানি আছে যাহা তাহার চিত্তপট হইতে নিমেষে মুছিয়া যাইবে না? যথার্থ অন্যায়ের বোধ—পাপের বোধ—শ্যামার অন্তরে কতটুকুই বা ছিল, আর পরিপূর্ণ জীবনের— যৌবনের— তরঙ্গব্যাকুল অধীর বন্যাবেগে কোথায় বা টিকিতে পারিবে? ফলতঃ, উত্তীয় কেন প্রাণ দিয়াছে সে হয়তো উত্তীয়ই জানে, কবির কয়েকটি ছন্দোবদ্ধ পদে, শ্যামার উক্তিতে এইমাত্র জানা যায়, সে বালক, সে উন্মাদ, নিষ্ফল কামনায় তাহার মাথার কোনো ঠিকই নাই, এমন কোনো কার্য বা অকার্য নাই যাহা শ্যামার জন্য সে করিতে পারে না। আর-কিছু জানা যায় না

এবং শ্যামা ও বজ্রসেনের ঘাতপ্রতিঘাতনিদারুণ অন্তর্দ্বন্দ্বের দীর্ঘায়িত কাহিনীর কোনো ফাঁকে জানিবার সুযোগও হয় না, হয়তো ইচ্ছাও হয় না। লোকলোকান্তরপ্লাবিনী বৈতরণীর অমাবস্যাঘন নিরাকার ও নিরন্তরধাবমান প্রবাহে সদ্যপ্রস্ফুটিত অম্লান এই একটি পুষ্প এমনি একটা ঘুরপাক খাইয়া নিমেষে ভাসিয়া চলিয়া গেল, রাত্রির নিকষকৃষ্ণ আকাশে উৎপতনশীল উল্কার মতো ক্ষণমাত্র একটি সুবর্ণরেখা আঁকিয়া পরে মুছিয়া দিল, কোনো স্মৃতিশেষ কোথাও রহিল না— না কবির কবিতায়, না রসিকের মনে— এই তো তাহার ক্ষুদ্র ইতিহাস। সত্যই, উত্তীয়কে রবীন্দ্রকাব্যের উপেক্ষিত বলিতে পারিতাম।

এই ভাবোন্মত্ত কিশোর যে করুণহৃদয় কবি -কর্তৃক উপেক্ষিত নয়, বরং তাঁহার অন্তরতম অন্তরের গূঢ়তম, পবিত্রতম, ভাব ও অনুভূতির বিগ্রহ, ধ্যানের বিষয়, লক্ষ্যভ্রষ্ট বাসনাবেদনার আবেগে শ্যামা যদি বা তাহাকে ভুলিয়া যায় কবি যে তাহাকে ভোলেন নাই, ভুলিতে পারেন না, প্রায় চল্লিশ বৎসরের ব্যবধানে সে কথা প্রথম জানা গেল শ্যামা নৃত্যনাট্যে। শ্যামার পূর্বতন রূপ পরিশোধ নাট্য-কল্পনাটিতেও অপ্রত্যাশিতের এরূপ কোনো আভাস পাওয়া যায় নাই। কিন্তু, উত্তীয়কে যখন স্বচক্ষে দেখিলাম, স্বকর্ণে শুনিলাম বেণুবিনিন্দিত কণ্ঠস্বরে তাহার সরল হৃদয়ের ভাবোচ্ছ্বাস, তখন তো সন্দেহের আর-কোনো অবকাশ থাকিল না, অনুমানের কোনো প্রয়োজন রহিল না, সহজেই বুঝা গেল— অল্প কয়েকটি জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতে রচিত, দুঃখসুখে খচিত, এ নাট্যের নায়ক সেই, তাহারই নিঃশেষ আত্মদান ইহার বিষয়। অন্য যতকিছু আয়োজন সে তাহারই জ্যোতির্বিচ্ছুরিত দ্রুতগতি ভ্রমণের উপযুক্ত পটভূমি, যা-কিছু ক্রিয়া কল্পনা সে এই একটি জীবনের পরমাশ্চর্য এক মুহূর্তের প্রস্তুতি ও প্রতিক্রিয়া।

উত্তীয় আপনার কামগন্ধহীন প্রণয়-নিবেদনের পাত্রীকে শুধু

জীবনই দেয় নাই, আপন হৃদয়শোণিতে এই কাহিনীর শীর্ষভাগে সেই চিরপ্রিয়ারই নাম লিখাইয়া লইয়াছে কবিকে দিয়া। অরসিক ব্যক্তি ভুল বুঝিতে পারেন। এমনকি, জানি না, কবি নিজেও ভুল বুঝিয়া থাকিতে পারেন। আত্মছলনার কলাকৌশলে আপনাকে তিরস্কৃত করিয়াছেন কি ?

এরূপ ভাবোন্মত্ত কিশোর, এরূপ কবি— কবি, কেননা, আপন আরাধ্যা দেবীপ্রতিমাকে আপনি সে রচনা করিয়াছে, অন্তত এ কথা সে সহজেই বলিতে পারে 'অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা'— এরূপ বাতুল, জাগতিক জীবনে এবং জীবনদর্পণ কাব্যে কাহিনীতে বারংবার দেখা দিয়াছে সন্দেহ নাই। দুঃখের বিষয় মহাকবি দান্তের মহাকাব্য দুইটির সহিত আমাদের পরিচয় ঘটে নাই, কিন্তু সেই বাণীমন্দিরে অধিষ্ঠিতা বিয়াত্রীচে যে রক্তমাংসে গঠিতা, বাসনাবেদনায় উদ্‌ভ্রান্তা, মানবী শুধু নয়— ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ পার্থিবা মাত্র নয়— এ কথা কাহারও অজানা নহে। দুর্লভ কয়েকটি নিমেষে অনিমেষ দৃষ্টিতে দূর হইতে যাহাকে দেখা গিয়াছে অন্তর্‌দৃষ্টির প্রসাদে দান্তে তাহাকে দেখিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন স্বরচিত ভাবের স্বর্গে, সর্বপ্রকার পার্থিবতার সকল স্পর্শের বাহিরে, অবিনশ্বর সৌন্দর্যে ও গরিমায়, তাই না দান্তে কবি, তাই না কালজয়ী তাঁহার প্রতিভা, অনন্য তাঁহার পরিচয়— পরিণত-বুদ্ধি নাগরিক বলিয়া নয়, যোদ্ধা বলিয়া নয়, কূটনীতিবিদ্ ভাগ্যান্বেষী বলিয়া নয়— এগুলি হয়তো বা তাঁহার বাস্তব পরিচয়, তাঁহার দীর্ঘ জীবনের নিয়তপরিবর্তনশীল নানা রূপ— আসলে তিনি চিরজীবী, কারণ, চিরপ্রেমিক, চিরকিশোর।

বৈষ্ণবেরা বলেন, বয়সের মধ্যে কৈশোর ধ্যেয়, কৈশোরই শ্রেষ্ঠ। চিরপ্রফুল্ল বৃন্দাবনে চিরকিশোর-কিশোরীরই আনন্দলীলা। যুবক-যুবতীর প্রণয়াবেগের ছাঁচে ঢালিয়া **কামগন্ধহীন অন্যোন্য আত্মদানের** সেই কাহিনী বুঝা যায় কিনা সন্দেহ। ইহা জানি একটা কোনো

ভাবে আদর্শে কল্পনায় পরিপূর্ণ অহংবিস্মৃতি আর আত্মনিবেদন কিশোরের পক্ষে যেমন আয়াসনিরপেক্ষ, যেমন স্বতঃসিদ্ধ, তেমন আর কাহারও পক্ষেই নয়। ভোগের ক্ষুধা, অহংসাৎ করিবার আকাঙ্ক্ষা, আপনার কলঙ্কিত হাতের ছাপ বিশ্বের সকল সৌন্দর্যে আঁকিয়া দিবার দুরাগ্রহ— এসব কিছুই তাহার নাই। যেন কোন্ স্বর্গলোক হইতে পথ ভুলিয়া সে আসিয়াছে। এ কথা কে না জানে দেবতার ভোগ কেবল দৃষ্টি দিয়া? কে না জানে—

দিবস রাতি সুরসভার মাঝে যে সুধা করে পান
পরশ তার মেলে না, মেলে না যে, নাহি রে পরিমাণ।

তবে, দেবতার ভোগ যেমন অনাসক্ত তেমনি আত্মস্থ। অথচ কৈশোরের অন্তরে সততই আছে একটি আত্মদানের স্পৃহা; স্বর্গের অমলিন আভাতে তাই মরতার অশ্রুসজল একটি ছায়ার আভাসও দেখা যাইতেছে। তাহারই বেদনায় বিদেশী কবি গাহিয়াছেন—

I can give not what men call love,
but wilt thou accept not
the worship the heart lifts above
and the Heavens reject not—
the desire of the moth for the star,
of the night for the morrow,
the devotion to something afar
from the sphere of our sorrow ?

অন্তরের গভীরতা হইতে উৎসৃষ্ট এই আরাধনা, মর্তে থাকিয়াও অমরতার অভিমুখে এই অভিসার, এই অভাবনীয় কামনা যাহার প্রেরণায় বুঝি পতঙ্গ চায় নক্ষত্রকে, রাত্রি চায় প্রভাত, বিষাদের ধরণী চায় অস্পর্শ অধরার উদ্দেশে আপনাকে নিঃশেষ করিয়া দিতে,

ইহাই যে কিশোরের ধর্ম, কিশোরের স্বভাব, কৈশোরের যথার্থ স্বরূপ ও সংজ্ঞার্থ।

কিন্তু, স্বার্থপর সংসার; বিষাদকুহেলিকাচ্ছন্ন ধরণী; সহজাত অভীপ্সা তাই আপনাকে জানিয়াও যেন জানে না, জানাইতে সাহস করে না, ঈষৎ দ্বিধা ও সংশয় লাগিয়াই থাকে আন্তরিক প্রত্যয়ে— অথবা ভীরুতার বশেই কি মনের কথা মুখ ফুটিয়া বলা যায় না? তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়—

ফিরে যাও কেন ফিরে ফিরে যাও বহিয়া বিফল বাসনা···
কাছে আস তবু আস না বহিয়া বিফল বাসনা!
পারি না তোমায় বুঝিতে—
ভিতরে কারে কি পেয়েছ, বাহিরে চাহ না খুঁজিতে!
না-বলা তোমার বেদনা যত
বিরহপ্রদীপে শিখারই মতো
নয়নে তোমার উঠেছে জ্বলিয়া নীরব কী সম্ভাষণা!

সে তাহার উত্তরে বলে, আপনাকে প্রকাশ করিয়া বা ছলনা করিয়া ঠিক বুঝা যায় না, বলে—

মায়াবনবিহারিণী হরিণী গহনস্বপনসঞ্চারিণী
কেন তারে ধরিবারে করি পণ অকারণ!
থাক্ থাক্ নিজমনে দূরেতে,
আমি শুধু বাঁশরির সুরেতে
পরশ করিব ওর প্রাণমন অকারণ!···
দূর হতে আমি তারে সাধিব,
গোপনে বিরহডোরে বাঁধিব—
বাঁধনবিহীন সেই যে বাঁধন অকারণ!

এই প্রেম, যা আপনাকে জানে না বা জানায় না, তাহাকে ছেলেমানুষি সহজেই বলা যায়, পাগ্‌লামি বা ন্যাকামি বলিলেও

কোনো প্রতিবাদ পাওয়া যাইবে না, অথচ কবি ও ভাবুকেরা কালে কালে ইহাকে বরণীয় মনে করিয়াছেন, স্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন কাব্যে কাহিনীতে। বড়োই লজ্জার বিষয় বলিতে হইবে— ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনে কী যে দাঁড়ায় বর্তমান লেখকের কিছুই জানা নাই, হয়তো রবীন্দ্রনাথও ভালো জানিতেন না। তা ছাড়া, পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের শৈশব অতিক্রান্ত হইয়াছে কিনা সন্দেহ ; তাহার সীমা-সরহদ্দ, তাহার আইন-কানুন, তাহার সূত্র ও সংজ্ঞার্থ এখনও অনেকটা অনিশ্চিত থাকাই সম্ভব— নানা জড়বিজ্ঞানের মতো নয়— কাজেই, আপাতত এরূপ মনে করিলেও আমাদের কাজ চলিবে যে একই অবর্ণ আলোক বিশ্লিষ্ট হওয়াতে যেমন নানা বর্ণচ্ছটায় এই বিশ্বভুবনকে বর্ণনা করিয়া থাকে, মনুষ্যসত্তার অন্তর্নিহিত তেমনি একই চেতনা, একই আনন্দ— সকল অস্তিত্বের মূলে যা চেতনা তাই আনন্দ, একই অনির্বচনীয় বস্তুকে দুই নামে বাচনের চেষ্টা করা হয় সন্দেহ নাই— দেশ কাল পাত্র -ভেদে নানা অবস্থায় নানা ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে প্রতি ক্ষণে প্রতিটি অভিনব মনোভাবে প্রতিবিম্বিত হয়। বিচিত্রবর্ণ রশ্মিগুলির মিলন ও ঐক্য যেমন সূর্যে, বিচিত্র মনোভাব ও মনোবৃত্তির আদিউৎস তেমনি বিশুদ্ধ চেতনা বা বিশুদ্ধ আনন্দ ; সেই ঊর্ধ্বেই তাহাদের বিশুদ্ধ রূপ জানা যায়, পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝি এবং অনন্ত বৈচিত্র্যের অন্তরালবর্তী ঐক্যেরও সন্ধান পাই। সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অসদ্ভাবে, মানবসত্তার মর্তলোকে রহিয়া, অথবা দুঃসাহসভরে পাতালপুরীতেও নামিয়া, তাড়াতাড়ি কোনো একটিমাত্র জৈব বৃত্তি বা জৈব কামনার অক্ষর-পরিচয়ে সমগ্র মানবমনের মহাভারতখানা পড়িয়া ফেলিবার আশা দুরাশা ; একই অভিপ্রায়, একই অর্থ প্রত্যেক শ্লোক হইতে টানিয়া বাহির করা অসংগত ; এবং শ্রদ্ধা, পূজা, প্রীতি, স্নেহ, কামনা, এগুলিকে বিভিন্ন নামে রূপে জানাই ভালো— স্বরূপে জানিতে হইলে ঊর্ধ্বে তাকাইতে

হয়, দুর্নিরীক্ষ দ্যুতির দহনে দৃষ্টি তাহাতে অন্ধ হইতে পারে, তবু নিম্নে ছায়াময় লোকে স্থানে স্থানে নিবিড়তর ছায়াপাতের পর্যালোচনা করিলে চলিবে না। নরনারীর সম্পর্কে কামনার আকর্ষণ, ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্যের অবকাশ বিশেষ একটা বয়সে বড়ো একটা বাস্তব সত্য সন্দেহ নাই। তা বলিয়া সকল বয়সের সকল সম্পর্কে ভূত দেখার মতো ঐ একই মনোভাব বা তাহার উঁকিঝুঁকি ও উস্‌কানি দেখিতে থাকা মানসিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ কি? এ কথা উল্লেখযোগ্য যে, অসুস্থ মনের ডাক্তারি করিতে গিয়াই ফ্রয়েডীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের (?) উদ্ভব এবং মানুষের রোগগ্রস্ত মনই তাহার বিশেষ বিষয়। এ কথাও ভাবিয়া দেখিবার যে, বৈষ্ণব তত্ত্বদর্শীগণ বাৎসল্যে বা সৌহৃদ্যে মধুরের কল্পনা করেন নাই, কিন্তু মধুর বা উজ্জ্বল রসে শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য সকল ভাব সকল রসেরই সমাবেশ দেখিয়াছেন। এদেশীয় আর অন্যদেশীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে কিছু তফাত আছে বৈকি। যাহা হউক, আমাদের অশিক্ষিত বুদ্ধিতে মনে হয় **কামগন্ধহীন প্রেমও হইতে পারে,** দুর্লভ হইলেও শশশৃঙ্গ বা সোনার-পাথর-বাটি-জাতীয় দুঃস্বপ্ন তাহা নয়। দিব্য ঐ ভাব হইতে স্খলন যদি বা হয়, সেই স্খলনটাকেই একান্ত সত্য বলিয়া মানিব কেন? রাত্রি অবশ্যম্ভাবী বলিয়া দিন কি মিথ্যা? মেঘে ঢাকে বলিয়া সূর্য কি কল্পনা? কামগন্ধহীন প্রেম কৈশোরেই স্বাভাবিক। সচরাচর ইহা স্থায়ী হয় না। অথবা লাখের মধ্যে একজনের জীবনে স্থায়ী হইলেও হইতে পারে; একোন লক্ষ লোকের নিভৃত হৃদয়ের নিরুদ্ধ কোনো কক্ষে অবশিষ্ট জীবন ইহা লুকাইয়া থাকে, আপন কল্পপ্রতিমার পায়ে আপনার পূজা দেয় অতন্দ্রিত রহিয়া— জানে না, বহির্মুখ মানবমনের তাহা জানিবার কথাও নয়। তা হোক, তবু ইহাকে মিথ্যা বলিব না। মৃত্যুপরিণামী বলিয়া জীবনকে তো মিথ্যা বলি না।

এই কামগন্ধহীন প্রেমের বিষয়, পূর্বেই বলা হইয়াছে, অর্ধেক

দেবী আর অর্ধেক মানবী, অর্ধেক প্রকৃতির হাতে গড়া আর অর্ধেক প্রেমিকের কল্পনা— কল্পনাও যে সত্য হয় বা কল্পনার আড়ালে যাহা আত্মগোপন করিয়া থাকে তাহা আপাতপ্রতীয়মান বাস্তবের চেয়ে বহুগুণে সত্য হওয়ারও বাধা নাই এ কথা ভুলিলে চলিবে না। কারণ, নিছক কল্পনার জন্য মানুষ কি প্রাণ দিতে পারে? আর, এমন অবলীলায়, এমন হাসিতে হাসিতে, কোনো করুণ প্রার্থনা না রাখিয়া এমন এক অহেতুক সুখে। হউক সে কিশোর, হউক-না উদ্‌ভ্রান্তমতি বালক। জ্ঞানের ভাষায় উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন এই কথা— পুত্রের জন্য পুত্র কিছু প্রিয় নয়, আত্মার জন্যই প্রিয়; পত্নী বলিয়া পত্নী কিছু প্রিয় নয়, আত্মা বলিয়াই প্রিয়। ভাবের ভাষায় অনুবাদ করিয়া লইলে ভাবুকও কিছু অস্বীকার করিবে না এবং উত্তীয়ও বুঝিবে বাংলার কোনো বৈষ্ণব কবির একলার বাণী ইহা নয়, এ যে তারও কথা: তোমায় হিয়ার ভিতর হইতে কে কৈল বাহির!

আপন অন্তরকে বাহিরে দেখিতে পাইলে লোকে স্নানাহার ভুলিয়া যায়, পাগল হইয়া উঠে, তখন সে ওই আত্মপ্রতিমার সেবায় ও পূজায় একনিষ্ঠ ভাবে দীর্ঘ জীবন বাঁচিতেও পারে আর নিমেষ-মাত্রে নিজেকে, নিজের সব-কিছুকে, বিলাইয়া দিতেও পশ্চাৎপদ হয় না। সে জানে প্রেমের তাহার অন্ত নাই, অস্তিত্ব তাহার শরীরী ব্যক্তিত্ব -মাত্রে সীমিত নয়। তাই তো—

প্রিয় যে তোমার, বাঁচাবে যারে, নেবে মোর প্রাণঋণ—
তাহারই সঙ্গে তোমারই বক্ষে বাঁধা রব চিরদিন মরণডোরে।
কেমনে ছাড়িবে মোরে, ছাড়িবে মোরে ওগো সুন্দরী?

রবীন্দ্রনাথের এই রচনায় পরমাশ্চর্য মুহূর্ত একটি, নায়ক একজন, গানও একটি; নাট্যপ্রবাহের সেই উত্তুঙ্গ চূড়ায় উত্তরণের আগে কিশোর উত্তীয়ের মুখে এ কথাটিও শুনিয়া লই—

ন্যায় অন্যায় জানি নে, জানি নে, জানি নে।

শুধু তোমারে জানি, তোমারে জানি ওগো সুন্দরী।

এ উক্তি কেবল উত্তীয়ের মুখেই শোভা পাইয়াছে। নহিলে পরে বজ্রসেনের দ্বারা ধিক্কৃত হইয়া শ্যামা যখন আর্তস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়াছে—

তোমার কাছে দোষ করি নাই, দোষ করি নাই।

দোষী আমি বিধাতার পায়ে,

তিনি করিবেন রোষ, সহিব নীরবে।

তুমি যদি না কর দয়া সবে না, সবে না, সবে না।

তখন পাঠকের বা সামাজিকের চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিলেও বধির নিয়তি সে আর্তনাদে কান দেয় না এবং বিধাতাও জানেন মানুষের ন্যায়-অন্যায়ের 'বিচার' (দণ্ড-পুরস্কারের ব্যবস্থা) মানুষের দ্বারাই হয়, আপনাকে দিয়া, অপরকে দিয়া, মানুষেরই সংসারে। নেপথ্যে দিক্‌লক্ষ্মীগণ করুণ মিনতিতে যখন গাহিয়া উঠিয়াছেন—

সব কিছু কেন নিল না, নিল না, নিল না

নিল না ভালোবাসা— ভালো আর মন্দেরে···

নদী নিয়ে আসে পঙ্কিল জলধারা,

সাগরহৃদয়ে গহনে হয় হারা···

আপনাতে কেন মিটালো না যতকিছু দ্বন্দ্বেরে

ভালো আর মন্দেরে[১]

তখনো জানি প্রেমের চরম পরিণাম এরূপ হইলেও উপস্থিত ভালো আর মন্দ, সুধা আর বিষ, নির্বিচারে গ্রহণ করিতে পারেন একমাত্র ত্রিলোচন শিব; সাধারণ মানুষের জীবনে সে সম্ভাবনা আজও অতিশয় দূরবর্তী। তাহার পূর্বে দুঃখ দেওয়া ও দুঃখ পাওয়া, অবিচার করা আর অবিচার সওয়া, কামনা করার কারণেই কামনার বিষয় হইতে বারংবার ভ্রষ্ট হওয়া— এরূপ ঘটনাপরম্পরার কোথাও কোনো শেষ নাই যেন।

ন্যায় অন্যায় জানি না, ভালো আর মন্দ উভয়কে একই প্রেমের বন্যায় অকূল এক সাগরে ভাসাইয়া লইয়া যাইব, স্পর্ধায় নয়, পরম অহংবিস্মৃতিতে, এ কথা প্রাণ মন দেহ দিয়া, সকল সত্তা ও সব জীবন দিয়া বলিতে পারে এক উত্তীয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তো বলিয়াছেন, যাহার আসক্তি নাই তাহার পুণ্যপাপ নাই। এই স্বর্গভ্রষ্ট দেবকুমারের অন্তরে আসক্তি নাই কথা শুধু এটুকুই নয়— ইহার অন্তরে প্রেম আছে, সেই প্রেমে আসক্তি নাই। অর্থাৎ, দুটি চক্ষে আরতি আছে, ক্ষুধা নাই; দুটি হাতে অলক্ষ্য পুষ্পাঞ্জলি আছে, মুষ্টি বাঁধা নাই; যে সৌন্দর্যপ্রতিমা তাহার সুন্দর অন্তরেরই প্রতিরূপ, কামনার কলুষ-নিশ্বাসে তাহাকে মলিন করিবার কোনো প্রবৃত্তি নাই, মুড়াইয়া খাইবার কোনো আগ্রহ নাই— আছে শুধু তাহার চরণে আপনাকে নিঃশেষে নিবেদন করিবার বিশুদ্ধ ও স্বতঃসিদ্ধ প্রেরণা। পুণ্য পাপ, পার্থিব সুখ দুঃখ, স্বল্পপ্রাণ সার্থকতা আর কুৎসিত ব্যর্থতা ইহাকে কেমন করিয়া স্পর্শ করিবে? ইহার পাওয়া সে তো চোখে দেখিবার নয়, হাতে ধরিবার নয়। চোখের জলে তাই আনন্দের হাসি এমন-ভাবে ঝিকিয়া উঠিয়াছে, বিদায়ের বাঁশিতে মিলনের গান এ কী পূর্ণতানে বাজিতে লাগিল—

আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান—
তুমি জান নাই, তুমি জান নাই, তুমি জান নাই তার
মূল্যের পরিমাণ।
রজনীগন্ধা অগোচরে
যেমন রজনী স্বপনে ভরে সৌরভে,
তুমি জান নাই, তুমি জান নাই, তুমি জা ন নাই
মরমে আমার ঢেলেছ তোমার গান।
বিদায় নেবার সময় এবার হল,
প্রসন্ন মুখ তোলো, মুখ তোলো, মুখ তোলো—

মধুর মরণে পূর্ণ করিয়া সঁপিয়া যাব প্রাণ   চরণে।
যারে   জান নাই, যারে জান নাই, যারে   জান নাই, তার
গোপন ব্যথার নীরব রাত্রি হোক আজি অবসান।

এখানেই এই নাট্যের তুঙ্গতম চূড়া। এই গানই শ্যামা-আখ্যাত সুরের শতনরী হারে একটি অতুলনীয় মধ্যমণি। ইহাকে একটু ঘুরাইলে ফিরাইলে দিকে দিকে যে দ্যুতি ঠিকরিয়া পড়ে, কোনো অধ্যবসায়ী নিবন্ধকারের কোনো নিপুণ ব্যাখ্যার অপেক্ষা তাহা রাখে না। ইহা সুকণ্ঠে যে শুনিয়াছে এই অপরূপ রূপকথার অবারিত মর্মে প্রবেশ করিয়া সে ধন্য। দু-একটি কথা বলিবার লোভ সংবরণ করা তবু দুরূহ।

বিদায় নেবার সময় এবার হল,
প্রসন্ন মুখ তোলো, মুখ তোলো, মুখ তোলো—

হাসিমুখে বিদায় যে নিবে হাসিমুখ না দেখিয়া সে যায় কী করিয়া! শ্যামা আপনা হইতে কখনো কিছুই তো দেয় নাই এই প্রেমোন্মত্ত কিশোরকে— আরক্তকপোল সিক্তপক্ষ্ম সুন্দর মুখখানি ঈষৎ তুলিয়া আজ এই প্রথম ও শেষ একবার কি চাহিবে না? দুটি নির্নিমেষ নেত্রে আরতি জ্বালিয়া, কোনো ছলনার কোনো আড়াল না রাখিয়া, তাহার কিশোর পূজারি একবার তাহাকে অসংকোচে পূজা দিতে পাইবে না? উত্তীয় তো কোনো দিন কোনো অনুযোগ করে নাই, কোনো কামনা জানায় নাই, কোনো অপরাধ লয় নাই, তাহার একমাত্র ব্যথা এই যে তাহাকে জানা হয় নাই, চেনা হয় নাই— এরূপ না-জানার ‘না-বোঝার প্রদোষ-আলোকে’, অর্থাৎ আধো-ছায়ায় আধো-আলোকে, সঞ্চরণের জন্য সে হয়তো নিজেকেই দোষী সাব্যস্ত করিয়াছে— তা হোক, সেই না জানাইতে পারার দুঃখ আজ সে দূর করিতে চায়। একেবারে নিষ্কাম বলা ভুল হইয়াছিল, যৎসামান্য এই কামনাটুকু তাহার আছে। কিন্তু, শ্যামা জানিল কি?

অথবা, কত ক্ষণের জন্যই বা জানিল? প্রাবৃট্‌রাত্রির আকস্মিক বিদ্যুদ্ভাসে ঝঞ্ঝাউদ্‌ভ্রান্ত পথিকের দৃষ্টি যখন ধাঁধিয়া যায়, কী দেখা গেল সে কি তাহা বুঝিতে পারে? কাহাকে দেখিল সে কি কখনো মনে রাখে?—

মনের মানুষ লুকিয়ে আসে, দাঁড়ায় পাশে, হায়—
ভেসে চলে যায় জোয়ারজলে ভাসায়ে ভেলা।
দুর্লভ ধনে দুঃখের পণে লও গো জিনি হে গরবিনী!

হায়, সমুখে আসিয়া দাঁড়াইলেও সে লুকানোই থাকে! সময়ে চেতনা হয় নাই শ্যামার; আপনা হইতে দূর হয় নাই যৌবনতপ্ত রক্তের আবেগ, মর্মের শিরায়-শিরায় শিকড়ে-শিকড়ে জড়িত গূঢ় আসক্তি, বিনিদ্র ব্যাকুল ক্ষুধা। এক প্রেমিক রিক্তহস্তে ও হাসিমুখে বিদায় লইয়াছে; আর-এক প্রিয়তমের নির্দয়করুণ ধিক্কার ও তাড়না অজস্র বর্ষিত হইয়াছে তাহার অন্তরে বাহিরে; ইহার পরে আসক্তির মূল্য, পাপের মূল্য— আসক্তিই মৌলিক পাপ— দুঃখ দিয়া শোধ করিতে বসিয়াছে সে। কবে কোথায় দুর্লভের পরিচয় মিলিল তার, না-চাওয়াতে আর না-পাওয়াতেই তাহাকে পাওয়া গেল, কবি তাহা খুলিয়া বলেন নাই।

উত্তীয় স্পষ্ট যে উদ্দেশ্যে প্রাণ দিয়াছে তাহা যেন সফল হইল না। সফল হইবার কথাও নয়। বিষবৃক্ষে কি অমৃতফল ফলে? কামনার সাগর সেঁচিলে কি অম্লান সৌন্দর্যের প্রতিমা লক্ষ্মীর উদয় হইতে পারে? কখনোই হইতে পারে না তাহা হয়তো বলা যায় না, কিন্তু বিশেষ সাধনপদ্ধতির অপেক্ষা থাকে। সে সাধনা হইল, ভ্রষ্ট লক্ষকে চিরঅভীষ্টে ফিরাইয়া আনিয়া, সকল বঞ্চনাদুঃখ নীরবে সহিয়া, দুঃখকে সুখ বলিয়া মানা— দুঃখেরই তপস্যা গ্রহণ করা। পরিশোধ আর শ্যামা উভয় নৃত্যনাট্যেই এই তত্ত্বের ইঙ্গিতও কবি দিয়াছেন—

কঠিন বেদনার তাপস দোঁহে
যাও চিরবিরহের সাধনায়।

অথবা বজ্রসেনেরই উক্তিতে—

ক্ষমিতে পারিলাম না যে
ক্ষম হে মম দীনতা   পাপীজনশরণ প্রভু··
জানি গো তুমি ক্ষমিবে তারে
যে অভাগিনী পাপের ভারে চরণে তব বিনতা।
ক্ষমিবে না, ক্ষমিবে না   আমার ক্ষমাহীনতা
পাপীজনশরণ প্রভু!

এই দুঃখের দুরূহ তপস্যার পরিণামে নিষ্ফল প্রেমের পরম চরিতার্থতা। সেই পরিপূর্ণ মিলনে কে কাহার সহিত মিলিত হইবে? কেই বা কাহার গলায় মালা দুলাইবে? কে বাঁধ পড়িবে? স্বভাবান্ধ কুসুমেষুর লক্ষহীন শরক্ষেপের কোনো প্রয়োজন থাকিবে কি? কে নায়ক, কে প্রতিনায়ক, কেই বা কাহার প্রিয়তমা, এ তর্ক হয়তো ঘুচিয়া যাইবে; একই আনন্দসুন্দর দেবতার আরাধনায় সকলেই আপনাকে নিবেদন করিবে; সকলেই সকলের সহিত মিলিত হইবে; বিভিন্ন নামরূপের ছলনায় স্বরূপ কোথাও আবৃত থাকিবে না। উত্তীয়ের অতুল অমূল্য জীবনদান নিমেষেই উত্তীয়কে সার্থকতা দিয়াছে সন্দেহ নাই— পরিণামে শ্যামাকেও কৃতার্থ করিবে, আর বজ্রসেনকেও ত্যাগ করিবে না। সেই সার্থকতার রূপ অল্পপরিসর এই বর্তমানে আর প্রত্যক্ষীভূত এই জীবননাট্যমঞ্চে ফুটিয়া উঠিবার অবসর কোথায়? বিশদ আলোচনার বিষয়ও নয়। শ্যামা ও বজ্রসেনকে আপাতসুখদায়ী বিলাসসম্ভোগে আত্মবঞ্চনার অবসর দিল না যে, নির্মম নিষ্ঠুর এক জাগরণের কূলে আছাড় মারিয়া ফেলিল, কিশোরপ্রাণের অহেতুক আত্মদানের উপস্থিত ইহাই হইল সার্থক পরিণাম, শুভংকর প্রতিক্রিয়া।

আমাদের বিমুগ্ধ দৃষ্টি-পথে উত্তীয়ই এক চিত্তচমৎকারী সৃষ্টি-রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাহার আনন্দিত জীবনোৎসর্জনই এ নাটকের বিশেষ ঘটনা। তাহাতে এ কথাও বলিতে হয়, শ্যামা 'ট্র্যাজেডি' নয়, বিয়োগান্ত কাহিনী নয়। প্রেমের দেবতা বিরহ-বিচ্ছেদের হারে মিলনের অম্লান পারিজাত গাঁথিয়া লইয়া গলায় পরিয়াছেন। আর, ইহাই হয়তো এ দেশের সকল কাব্য নাটক পুরাণেতিহাসের চিরাচরিত রীতি। রামায়ণ, মহাভারত, শকুন্তলা, মেঘদূত, সাবিত্রীউপাখ্যান, দময়ন্তীকথা— কোথায় ইহার অন্যথা দেখা যায়? স্পষ্টতই মিলনসুখে সার্থকতায় বা সম্পূর্ণতায় যে কাহিনী শেষ হয় না তাহারও শেষে থাকে সম্পূর্ণতার অভিমুখে একটা কোনো ইঙ্গিত। মহাভারতকে যে আকারে আমরা পাইয়াছি তাহারও অন্তিম অধ্যায়ে সুবিশাল বৈরাগ্যের বিষাদ, না, বিষাদ নয়, উদাস শান্তি একটি আছে— মৃত্যু মোহ ও অবসাদ নাই। বাস্তবে কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে রক্তের লেখা যেমন বহুদিন হইল মুছিয়া গেছে— অনুমান করিতে পারি বসন্তে বসন্তে বিরল বিটপী লতায় ফুলও ফুটে, পাখিও গান করে— তেমনি মানুষেরও মনে জয়পরাজয়-স্মৃতি বিস্মৃতপ্রায়; কেবল ভীষ্মকর্ণের মহত্ত্ব, যাজ্ঞসেনীর দৃপ্তভাব, গান্ধারীর বেদনা মনে পড়ায় মনে মনে বারংবার রোমাঞ্চ জাগিতেছে এবং পার্থ ও পার্থসারথিকে ঘিরিয়া অলৌকিক এক দিব্যজ্যোতি বিলসিত হইতে দেখিতেছি। পাশ্চাত্যের শিক্ষায় ও দীক্ষায় এ যুগে আমরা অনেক অভিনব বস্তু ঘরে আনিয়াছি সত্য, গ্রীক বা এলিজাবেথীয় ট্র্যাজেডির শক্তিতে আর সৌন্দর্যেও অভিভূত হইয়াছি সন্দেহ নাই, তবু রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ কাব্য কাহিনী দেখা যায় একটা কোনো সার্থক পরিণামে বা তাহারই ইঙ্গিতে শেষ হইয়াছে, আর তাঁহার জীবনবেদের সহিত সংগতি রাখিয়া তেমনি তো হইবার কথা —ইহা একাধিক বার বলিলেও দোষ নাই।

জীবনে তথা সাহিত্যে কিশোর- চরিত্রের বা চিত্তবৃত্তির রূপ, বিরল হইলেও, দেশে-দেশে যুগে-যুগে বার-বার দেখা গিয়াছে, এ প্রত্যয়কে যথোচিত যুক্তি দিয়া, বহুশঃ দৃষ্টান্ত দিয়া দৃঢ় করা হয় নাই। দান্তে-বিয়াত্রীচের কাহিনী কিংবদন্তীর মতো সকলেরই কানে আসিয়াছে। তাহা যুগপৎ জীবনের ও কাব্যের বিষয়। আপন আপন কৈশোর-স্মৃতি অন্তরে উজ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারিলে, কিশোর যে কী চায়, কী পায় আর কেমন করিয়া পায়, সে কথা হয়তো শতকরা নিরানব্বই জন প্রৌঢ় বিষয়ী ব্যক্তিও বুঝিতে পারিবেন। এক আশঙ্কা— যাহা অতীত তাহাকে স্বপ্ন বলিয়া, মায়া বা মতিভ্রম বলিয়া, উড়াইয়া দিবার ইচ্ছা ক্ষেত্রবিশেষে স্বতই প্রবল হইয়া থাকে। কবি বা ভাবুক, প্রেমিক বা ঋষি, এ নিয়মের ব্যতিক্রমস্থল। মনে হয় রবীন্দ্রনাথ আপন জীবনে জীবন্ত করিয়া এই ভাবোন্মত্ত কিশোরের রূপ অবিস্মরণীয় সুরের পটভূমিতে, অপূর্ব কৌশলে, বাণীর বর্ণে ও রেখায় আঁকিয়া তুলিয়াছেন। এ বিষয়ে ইহাই তাঁহার অনন্য উদ্যম নয়। নবকৈশোরের পূর্ণতম, সত্যতম রূপ সন্দেহ নাই, প্রথম তবু ইহা নয়। প্রতীকী নাটক রক্তকরবীতে কিশোর এই চিরকিশোরের ভূমিকাতেই দেখা দিয়াছে। জীবনের আনন্দরূপিণী নন্দিনীকে বিরুদ্ধ পরিবেশে কিন্তু সহজ পরিচয়ের আলোকে চিনিয়া লইয়া মুক্তকণ্ঠে সে ডাক দেয়: নন্দিনী! নন্দিনী! নন্দিনী! ফাল্গুনের চূতচম্পকবনে পাখি যেমন সাধা সুরে বার-বার ডাকিয়া উঠে তেমনি তাহার এই ডাক, ইহার অর্থ কী? না, 'আমার যে ডাকতে ভালো লাগে। আর ফুল চাই তোমার? তা হলে আনতে যাই।' যদিও সেই উৎফুল্ল রক্তকরবীর গুচ্ছ নন্দিনী অলকে পরিবে অথবা বুকের আঁচলে লুকাইয়া রাখিবে, যে তাহার নয়নে মনে রঙ লাগাইয়াছে, জীবন্ত যৌবনের যে পরিপূর্ণ মূর্তি, সেই রঞ্জনেরই উদ্দেশে, তবু কিশোরের তাহাতে কোনো

অভিমান নাই। সে তো কিছু নিতে চায় না, সে কেবল দিতেই চায়। বিপদ ও শঙ্কার মুখের উপর তুড়ি মারিয়া অহেতুক প্রীতিতে সে এই ফুল আনিয়া দেয়— কোথায় কোন্ জঞ্জালের পিছনে সমান অহেতুক সুখে এই ফুল ফুটিয়া উঠে— ভাবে, কিসের দুঃখ! কিসের শঙ্কা! একদিন নন্দিনীর জন্য প্রাণ দিবে সে! এবং প্রাণ সে দিল।

প্রতীকের রাজ্য ছাড়িয়া কঙ্করকঠিন্ বাস্তব জগতে ফিরিয়া আসা যাক। মনে করা যাক ঘরে-বাইরে গল্পের অমূল্যকে। তাহাকে অনায়াসেই দর্পিতযৌবন সন্দীপের ছায়া মনে করা যাইত; অন্তত সেরূপ ধারণাই সন্দীপের মনে ছিল। কিন্তু দেখিতে দেখিতে সে সন্দীপের সমকক্ষ হইয়া দাঁড়াইল। না, সমকক্ষতাই বা কেন? যে রমণীমূর্তিতে অমূর্ত ভাব ও কল্পনা বিগৃহীত হইয়া উঠিয়াছে তাহার চক্ষে, তাহারই পূজায়, তাহারই পাদপদ্মে সর্বস্বনিবেদনের আগ্রহে, নিষ্কলুষ ভালোবাসায়, অবশেষে অনন্য এক মহিমায় সে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, উচ্চ এক পদবীতে গিয়া উত্তীর্ণ হইল। তাহার অল্পায়ু জীবনের ইতিহাস অধিক কিছু নয়; অন্তরে বাহিরে নির্মম ও অসুন্দর নানা ঘাত-প্রতিঘাতের অবসর সেখানে নাই; যে-সকল ঘটনার বাহক বা সংঘটক সে, সেগুলিকেও সুমহৎ বলা যায় না; তবু মহৎ তাহার অন্তঃকরণ, অলৌকিক তাহার জীবনভঙ্গী, সেও সচ্ছন্দেই বলিতে পারে আর কার্যতঃ বলিয়াছেও—

ন্যায় অন্যায় জানি নে, জানি নে, জানি নে।
তোমারে জানি।

তাহাতে নিজেই সে উন্নত পদবীতে উঠিয়াছে এমন নয়, মন্ত্রব্যবসায়ী সন্দীপের জাদু-মুগ্ধ বিমলাকেও অনায়াসেই মোহের পঙ্ক হইতে টানিয়া তুলিয়াছে। কামনা ক্রূরতা বিদ্বেষ ও অহম্মুখিতার বিষবাষ্প-ভরা রুদ্ধ কক্ষে সে যেন হঠাৎ একটা জানালার মতো খুলিয়া

গিয়াছে ; বিমলার জীবনে উন্মুক্ত উদার বিশ্বের আলো আসিয়াছে, হাওয়া আসিয়াছে। তাই বিমলা বলিতেছে, 'সে আমার বালক দেবতা, সে আমার কলঙ্কের বোঝা একেবারে খেলাচ্ছলে কেড়ে নিতে এসেছে !' বিমলা বলিয়াছে, 'বাছা আমার, তোমাকে প্রণাম। ভাই আমার, তোমাকে প্রণাম। নির্মল তুমি, সুন্দর তুমি, বীর তুমি, নির্ভীক তুমি, তোমাকে প্রণাম। জন্মান্তরে তুমি আমার ছেলে হয়ে আমার কোলে এসো এই বর আমি কামনা করি।'

শেষ পর্যন্ত অমূল্যও প্রাণ দিয়াছে।

দেখা যাইতেছে, সাহিত্যে, কাজেই জীবনেও চিরকিশোরের রূপ একরূপ নয়, কিন্তু তাহার স্বরূপের কোনো ব্যত্যয় নাই। শেলির পূর্বসংকলিত কয়টি ছত্রে সেই স্বরূপের সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটন দেখিতে পাই। ঊর্ধ্বমুখী কিশোরপ্রাণের মূলমন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছে অল্প এই ক'টি কথায়—

The desire of the moth for the star,
of the night for the morrow,
the devotion to something afar
from the sphere of our sorrow.

ভাঙাচোরা বাংলায় ভাবটা এই—

তারকাহুতাশে ঝাঁপ দিতে যেন পতঙ্গ মরে ঝুরে ;
নিশার হৃদয়ে উষার কামনা ;
প্রাণের আরতি দূরে
চিরদূরে, রহি' বিষাদআতুর এই মরতার পুরে।

মানুষকে তারা না ভাবিয়া, তারাকে যদি মানুষই ভাবি তাহা হইলে উক্ত কবিতার প্রতিধ্বনি পাইতে পারি এইরূপ—

উজ্জ্বল শ্যামল বর্ণ, গলায় পলার হারখানি।

চেয়েছি অবাক মানি
তার পানে···
রচে মরীচিকালোক নাগালের পারে
বালকের স্বপ্নের কিনারে···
হৃদয় ব্যথিল মোর অতিমৃদুগুঞ্জরিত সুরে—
ও যে দূরে, ও যে বহু দূরে,
যত দূরে শিরীষের উর্ধ্বশাখা, যেথা হতে ধীরে
ক্ষীণ গন্ধ নেমে আসে প্রাণের গভীরে।

দূরবিস্তৃত স্মৃতির পটে এই সৌন্দর্যপ্রতিমাই কি সকল-সীমা-উত্তীর্ণ অন্যরূপ ভাবনায় কবিকে উন্মনা করিয়াছে?—

ওই-যে সুদূর নীহারিকা
যারা করে আছে ভিড়
আকাশের নীড়,
ওই যারা দিনরাত্রি
আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী
গ্রহ তারা রবি,
তুমি কি তাদের মতো সত্য নও?

এ সংশয় কিন্তু নিশ্চয়তাসূচক এবং সুপ্তিজড়িত দৃষ্টিকে উন্মীলিত করিবার প্রয়াস বলা যাইতে পারে; কবি নিশ্চিত জানেন ভূলোকে যে সুন্দরীর অপর নাম 'ক্ষণিকা' উর্ধ্বলোকে সে চিরন্তনী, সে অতিশয় সত্য, সে আজ অনন্তে পরিক্রমাপর গ্রহতারারবির সঙ্গিনী। তাহাকে যথার্থই বলা যায়—

নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই,
আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি নীলিমায় নীল।
আমার নিখিল

তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।
নাহি জানি, কেহ নাহি জানে,
তব সুর বাজে মোর গানে,
কবির অন্তরে তুমি কবি।

এ কে, কবির জীবনেতিহাসের বিলুপ্তলেখা ছিন্নবিচ্ছিন্ন কয়েকখানা কাগজ কুড়াইয়া তাহা জানা যাইবে না। উল্টাপাল্টা জোড়া দিয়া দেখিলে কিছু অর্থ বাহির হইবে কি? বাস্তবের বিয়াত্রীচে কে, কাহার কন্যা, কাহার পত্নী, দান্তের সহিত কয়বার তাহার দেখা আর কয়টি কথার আলাপ —এ-সব অসম্পূর্ণ তথ্যে আমাদের লাভ কিছু নাই। কোনো মায়াবীর মায়ায় কালের দুস্তর ব্যবধান সহসা অপসৃত হইয়া চক্ষের সম্মুখেও যদি ইঁহাকে দেখিতে পাইতাম, বিয়াত্রীচেকে দেখিতাম, আমাদের কবি বা ইতালির কবি পূজাপূত যে দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন সে কোথায় পাওয়া যাইবে? সে দেখা আর কে দেখিবে? কাজেই, যাহা সত্যরূপ, যাহা শাশ্বতরূপ, কাব্যে তাহা অমরতা পাইয়াছে; রসিকের প্রাপ্তি তাহাতেই পূরা হইবে। যাহা বাস্তবমাত্র, যাহা মায়িক, তাহা নিঃশেষে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাহাতে দুঃখের কারণ কিছু নাই। ক্ষতি কিছু হয় নাই। সূক্ষ্মকে স্থূলভাবে, সত্যকে মিথ্যারূপে, দেখিবার প্রয়োজন তো নাই। চোখে কি দেখা যায়?—

মন চেয়ে রয় মনে মনে হেরে মাধুরী।
নয়ন আমার কাঙাল হয়ে মরে না ঘুরি।
চেয়ে চেয়ে বুকের মাঝে গুঞ্জরিল একতারা যে—
মনোরথের পথে পথে বাজল বাঁশুরি।
রূপের কোলে ওই-যে দোলে অরূপ মাধুরী।

কূলহারা কোন্ রসের সরোবরে
মূলহারা ফুল ভাসে জলের 'পরে।
হাতের ধরা ধরতে গেলে ঢেউ দিয়ে তায় দিই যে ঠেলে—
আপন-মনে স্থির হয়ে রই, করি নে চুরি।
ধরা দেওয়ার ধন সে তো নয়, অরূপ মাধুরী।

জোড়াসাঁকো
আশ্বিন ১৩৫৮

কৈশোরঅনুরাগের স্বরূপ-উদ্ঘাটনই পূর্বপ্রবন্ধের উদ্দেশ্য ছিল। কবিকল্পিত উত্তীয়-চরিত্রে ঐ জিনিষটি আশ্চর্যসুন্দরভাবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। এই অনুরাগে কামনা নাই। যে শুদ্ধা ভক্তিপ্রীতি লইয়া দেবতার আরাধনা হইয়া থাকে তাহাই মানুষ মানুষকে নিবেদন করিতেছে। প্রণয়পূত দিব্য দৃষ্টি দিয়া পার্থিবার অন্তরে অপার্থিবাকে দেখিতেছে; অপার্থিবার নেপথ্যবর্তিনী সত্তায় বা অস্তিত্বে যদি সংশয় উঠানো যায়, 'তাহাকে সৃষ্টি করিতেছে' এরূপ বলিলেও দোষের হইবে না।

কেবল শ্যামা নৃত্যনাট্যে নয়, রবীন্দ্রনাথের অন্য কয়েকটি রচনাতেও এই কিশোরচিত্তের অপরূপ প্রকাশ। আরাধ্যা দেবী বা মানবী কিশোরকে ভাই বলিয়া, বন্ধু বলিয়া, এমনকি পুত্র বলিয়াও হৃদয়ে গ্রহণ করিয়াছে। অর্থাৎ, কিশোরের দিক হইতে পূজা ও প্রীতি আর নারীর দিক হইতে সৌহৃদ্য, সখ্য, স্নেহ।

আমরা ইহাও জানি, সার্থক কবিকল্পনা স্বয়ম্ভু নয়; জীবনের ভূমিতে তাহার শিকড় থাকে, দৃঢ় প্রতিষ্ঠা থাকে। এ ক্ষেত্রেও তাহার অন্যথা হয় নাই। সত্যই সুন্দর; তাহার দ্বিধা নাই, সংকোচ নাই, গোপনতার কোনো প্রয়োজন নাই। দীর্ঘ জীবনের শেষ পর্যন্তই বলা চলে, কবি আপন বাল্য কৈশোর ও প্রথমযৌবন -ব্যাপী যে সখ্য ও প্রীতির সম্পর্ক বার বার স্মরণ করিয়াছেন, মুক্তকণ্ঠে উল্লেখ করিয়াছেন, কবিতায় গানে প্রবন্ধে বাণীবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা যেমন পবিত্র তেমনি মধুর, তেমনি গভীর: পার্থিব আধারে অপার্থিব সুধা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। রবীন্দ্ররচনাবলির ও রবীন্দ্রজীবনীর অভিনিবিষ্ট পাঠক এ উক্তির সত্যতা অক্ষরে অক্ষরে যাচাই করিয়া লইতে পারেন। প্রবন্ধশেষে আকাশপ্রদীপ ও বলাকা হইতে

কতকগুলি ছত্র সংকলিত হইয়াছে; পাঠকের মূল রচনার সহিত পরিচয় থাকিবার কথা, আর না থাকে তো, শুদ্ধ সংযত রসাবিষ্ট চিত্তে আদ্যন্ত পড়িয়া দেখিবেন— রবীন্দ্রনাথের এই বাল্য ও কৈশোর-সখী, মাতৃহীনের কতকটা মাতৃরূপিণী, ভাবুকের উদ্দীপনা-সঞ্চারিণী, কবির প্রেরণা-দায়িনী, জীবন-যাত্রাপথের ধ্রুবতারা, এই দেবীমানবী— ইঁহার সহিত আত্মার যে আত্মীয়তা তাহা deeply moral, spiritual, এবং অলৌকিক।

মোট কথা, কৈশোরপ্রীতির স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ আপনারই জীবনে, আপনারই অন্তরঙ্গ উপলব্ধিতে জানিয়াছেন। অন্য জীবনে তাহার প্রকাশ অন্যরূপ হইতে পারিত। সাহিত্যেও কবি উহা এক ভাবে প্রকাশ করেন নাই। সাহিত্য জীবনের হুবহু প্রতিচ্ছবি নয়। সত্যে এবং মূলতত্ত্বেই শুধু মিল আছে। আরাধ্যার আরক্তিম পদতল আরক্ততর করিয়া তুলিতে সকলকেই প্রাণ দিতে হয় না, যদিও প্রাণ দিতেই ইচ্ছা হয় বটে এবং সেই ইচ্ছা সাজাইয়া গুছাইয়া চমৎকার কবিতা ও কাহিনী লেখা যায়।

তখনই বড়ো মুশকিল। কে কেমন অর্থ উদ্ধার করে তাহার কোনো ঠিক-ঠিকানা নাই। এ কথা বলিয়াও ফল নাই 'অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্ শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ'— কেননা, কে রসিক আর কে বা অরসিক সে তর্কের মীমাংসা আছে কি?

জোড়াসাঁকো
বৈশাখ ১৩৬০

'যেদিন মাঘের পূর্ণিমা ফাল্গুনে পড়িল, জোয়ারের ভরা অশ্রুর বেদনায় সমস্ত সমুদ্র ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল, সেদিন দামিনী আমার পায়ের ধুলা লইয়া বলিল, সাধ মিটিল না, জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই।'

রমণীহৃদয়ের এই মোহময় আকাঙ্ক্ষার সুস্পষ্ট উচ্চারণে দামিনীর দুঃখসুখ-আশাশঙ্কা-ঔৎসুক্যআবেগ-বিচিত্র মর্তজীবনের শেষ অঙ্ক সব-শেষে আসিয়া ঠেকিল, আকাশে তারার প্রদীপগুলি দূর হইতে দূরে একে-একে নিবিয়া গেল, পূর্ণচন্দ্র বনান্তরে অস্তমিত হইলেন, ও দিকে অনাদিসৃষ্টিসলিলে-পরিপূর্ণ পুণ্যময় সোনার ঘট পূর্বসমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে দোলা লাগিয়া জাগিয়া উঠিবার আগে পরিষ্কৃত দিগঙ্গনে কে যেন কুঙ্কুমরাগ ছড়াইয়া দিল। একটি চাপা দীর্ঘনিশ্বাসে শ্রীবিলাস এই আখ্যানকথন শেষ করিলেন, কী জানি হয়তো আমাদের মতো অসাড়হৃদয় পাঠকেরও চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিল, অথচ অপূর্ব একটি নারীচরিত্রের দুর্লভ পরিচয়-লাভে মনে মনে একটি বিশেষ সুখ ও পরিতৃপ্তির উদয় হইল না কি? দক্ষকন্যা সতী যখন স্বেচ্ছায় যজ্ঞঅনলে দেহবিসর্জন দেন, তিনিও অনুরূপ সংকল্প লইয়াই এক জীবনের লীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন— তিনি দেবী, মহাদেবী, সনাতনী। দেবতা না হইয়াও, আমাদের মাটির ঘরে ক্ষুৎপিপাসাঅধীন রক্তমাংসের দেহ লইয়া কোন্ স্নেহপ্রেমমুগ্ধা তাঁরই পুণ্য পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে চাহিবে না? জন্মমৃত্যুপরিচ্ছিন্ন একটি ক্ষুদ্র জীবনের সীমায় সব-কিছুর সূচনা বা শেষ এমন তো আমরা মনে করিতে পারি না। বিজ্ঞানে দর্শনে কোনোরূপ ভরসা দিক আর না-ই দিক, সুগভীর প্রীতির প্রত্যয়ে, একান্ততম নিগূঢ়তম কোনো-একটি মানব-সম্পর্কের ধারা জীবনে জীবনান্তরে প্রসারিত না করিয়া তো থাকিতে

পারি না। বিশ্বসৃষ্টিতে বহু দোষত্রুটিপূর্ণ মরদেহের আশ্রয়ে এতখানি দুঃখসুখ আনন্দবেদনার উপলব্ধি যদি সম্ভবপর হইয়া থাকে, শূন্যই তাহার পরিণাম এ কথা কখনোই সত্য নয়। অন্তত, এই তো ভারতীয় সংস্কার, এই তো বাঙালি ঘরের প্রাণময়ী প্রেমময়ী রমণীর বদ্ধমূল ধারণা, রক্তের চিরচঞ্চল অণুপরমাণুর স্থির প্রত্যয়।

তবে কি দামিনী যথালব্ধ বহুবিধ সংস্কারে আবৃতা, নানা দেশাচার ও লোকাচারের গণ্ডীতে বন্দিনী, আত্মপ্রত্যয়হীনা, বুদ্ধিহীনা, সাধারণ বঙ্গললনা? তাও নয়। এতটা সংস্কারমুক্ত, স্বতন্ত্র, স্বাধীন-চিত্ত পুরুষ বা স্ত্রী সব দেশে আর সব কালেই দুর্লভ— আমাদের জানা-চেনা সংসারে দুর্লভতর। ইঁহাদের অস্তিত্ব নাই বা ছিল না এরূপ না হইলেও, ইঁহাদের চিনিয়া লইবার ক্ষমতা সকলের থাকে না। ক্ষীণদ্যুতি প্রদীপের আলোকে কাঁথা সেলাই হইতে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত কালে কালে সম্ভবপর হইয়াছে, নারীজীবনের গার্হস্থ্য অগ্নিতে দৈনন্দিন পাকশাকেরও অসুবিধা হয় নাই, ক্বচিৎ কোনো উন্মাদ তাহারই প্রদীপ্ত অঙ্গার ঘরের চালে লাগাইয়া অগ্নিকাণ্ড বাধাইয়াছে হয়তো, কোনো নির্বোধ নিবন্ত চুল্লিতে ফুঁ পাড়িতে গিয়া দেখিয়াছে শুধু ধুলা— শুধু ছাই— চক্ষু রগড়াইয়া সেই ভস্ম মুঠি-মুঠি গায়ে মাখিয়া হয়তো সন্ন্যাসীও হইয়াছে— কিন্তু সে অগ্নিকে শাশ্বত হোমাগ্নিরূপে কে বা দেখিয়াছে, কে বা চিনিয়াছে? উপস্থিত দেশে কালে বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র স্বরূপদ্রষ্টা রূপস্রষ্টা হিসাবে যতটা দেখিয়াছেন বা দেখাইতে পারিয়াছেন, তাহারই প্রসাদে আমাদের ন্যায় স্বভাবান্ধেরও কী-যেন অপূর্ব দর্শনে কদাচিৎ চমক লাগিয়াছে। হায়, তাহারই ফলে জন্মমরণশীল মানবজীবনের সকল রহস্যের নিরসন না হইয়া, রহস্য আরও যেন ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে। এরূপই হয়। অবোধ বুদ্ধিহীনের কাছে রহস্য কিছু নাই, কোনো বিস্ময় নাই মানবজীবনে। আছে অভ্যাস ও প্রয়োজন— সে-সবই অভাবাত্মক।

চিত্তের উদ্‌বোধে, ভাবের আন্দোলনে, অন্তরে বাহিরে, বিশ্বপ্রকৃতিতে ও মানবজীবনে, যে বিস্ময় সুখ ও বেদনা পদে পদে জাগিয়া উঠে কোনো দিন কোনোখানে যেন তার সীমা পাওয়া যায় না।

যথালব্ধ জড়সংস্কারের গণ্ডীতে এই জীবনসত্যের উপলব্ধি সম্ভবপর নয়, এই অপরূপকে দেখা এবং দেখানোর কল্পনা বাতুলতা-মাত্র। সেই অর্থেই বলিতে পারি: সংস্কারমুক্ত কবিচিত্ত এবং কবিদৃষ্টি; তেমনি সংস্কারশূন্য হউক রসিকের মন; অথচ মনুষ্যপ্রকৃতির গোড়া-ঘেঁষা শাশ্বত সংস্কার যেগুলি, যেন অস্বীকার করা না হয়— তাহাতে মানবসত্যকে জানা যাইবে না, মানবধর্মের অনাচরণে জীব হিসাবে, মানুষ হিসাবে, অকৃতকাম ও ব্যর্থ হইব।

মনুষ্যপ্রকৃতির নিজস্ব এই সংস্কার অনাদি, অনন্ত এবং অনির্বচনীয়। অহেতুক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, যেহেতু স্পষ্টই দেখা যায় ছোটো ছোটো জমা-খরচের হিসাব তাহাতে মেলানো চলে না। তাহার লাভক্ষতি বড়ো অপূর্ব। যেহেতু মানবজীবন আসলে প্রাণকেন্দ্রিত এবং হৃদয়বিধৃত, এই সংস্কারও প্রাণের বা হৃদয়ের— বুদ্ধিবিচার যুক্তি-তর্ক দিয়া ইহার প্রতিষ্ঠা বা নিরসন হইতে পারে না। অভ্যস্ত আচার-আচরণ রীতিনীতি ইহার সজাতি বা সগোত্র নহে। এই স্বাভাবিকতার স্বচ্ছন্দ প্রকাশেই কপালকুণ্ডলা সুন্দর; কিন্তু সেই অভিনব সৌন্দর্য উদ্‌ভিন্ন করিয়া তুলিতে, বঙ্কিমচন্দ্র সমাজবহির্ভূত সংসারবহিষ্কৃত এক বন্যপ্রকৃতির বিজন পরিবেশ কল্পনা না করিয়া পারেন নাই। কেননা, ঋষি ও মনীষী বঙ্কিম, তাঁহাকেও যে অবিকৃত মনুষ্যপ্রকৃতির আবিষ্কারে ও স্বভাবধর্মের ধ্যান-ধারণায় বহু তপস্যা করিতে হইয়াছিল, হয়তো বহু বিনিদ্র রাত্রি জাগিতে হইয়াছিল; সহজাত ধী ও হৃদয়বৃত্তির গুণে আপন জীবনমুকুরে নিখিল জীবনের যে স্বরূপটি দেখিবার শক্তি তাঁহার অবশ্যই ছিল, তাহার বাধাও ছিল না কি সমাজে এবং পরিবারে— অতীত ঐতিহ্যে এবং তাঁহার তৎকালীন

পরিবেশে? এ দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথকে বহুগুণে ভাগ্যবান বলা যাইতে পারে। তিনি যেন জন্মাবধি হাতে পাইয়াছিলেন পরিচ্ছন্ন পরিষ্কার একখানি চিত্তপট। অন্য কাল বা অন্য জন অল্পই তাহাতে দাগ দিয়াছে। এজন্য সামাজিক স্বাদেশিক বহুবিধ সংস্কার হইতে তিনি স্বভাবতই মুক্ত ছিলেন। প্রাণের আবেগে কিম্বা প্রীতির ধর্মে যে-সমস্ত সংস্কার তিনি কালে কালে স্বীকার করিয়াছেন, সহ্য করিয়াছেন, তাহাদের অন্তরালবর্তী সত্য সম্পর্কে তাঁহার চেতনা ও উপলব্ধি কখনোই ক্ষীণ অথবা দুর্বল ছিল না। বোধ করি এজন্যই শেষ পর্যন্ত তিনি না হইলেন হিন্দু, না হইলেন ব্রাহ্ম— না হইলেন ইংরেজ-বিদ্বেষী, না হইলেন গোঁড়া 'স্বদেশী'— সচেষ্ট সচেতন দীর্ঘ জীবনের ধ্যান-ধারণায় যে জিনিষ তিনি সত্য বলিয়া, জীবনের ধন বলিয়া জানিলেন, সেটি 'মানুষের ধর্ম'। নিজের পরিচয় দিলেন—

আমি ব্রাত্য, আমি জাতিহারা।

তাঁর সেই আত্মপরিচয়ে কিছু আহত অভিমান যদি বা থাকে, সত্য আছে অনেকখানি। কথাটা উঠিল, তাই ইহাও স্মরণ করা যাইতে পারে যে, কবি ঐ কবিতাতেই বলিয়াছেন—

আমার গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে
সৃষ্টির প্রথম রহস্য— আলোকের প্রকাশ,
আর, সৃষ্টির শেষ রহস্য ভালোবাসার অমৃত।...
আমার পূজা আজ সমাপ্ত হল
দেবলোক থেকে মানবলোকে—
আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে, আর
মনের মানুষে আমার অন্তরতম আনন্দে।

একেই এক প্রকার 'সহজ' পথ বলা চলে, সকল অভ্যস্ত আচার-আচরণ আর অন্ধ সংস্কারের বাহিরে ইহার গতি প্রবৃত্তি এবং পরিণতি।

আরোপিত সংস্কার থাকিলেও, জীবন যখন জাগিয়া উঠে, সকল

সংস্কারের স্বচ্ছ অথবা স্বচ্ছতাপ্রাপ্ত আবরণ ভেদ করিয়া তাহার স্বরূপ দেখা যায়। এই স্বরূপ দেখা এবং দেখানো ইহাই সচেতন কবি ও শিল্পীর শেষ সিদ্ধি ও সার্থকতা। কিভাবে কতটা দেখা গেল, ইহাতেই বোধ করি একজন সিদ্ধ কবি বা শিল্পীর রূপরচনা হইতে আর-একজনের রূপকৃতির ভিন্নতা। আসলে, সজীব মানুষ মাত্রেই সজাতি, সগোত্র। অনন্তবৈচিত্র্যের মধ্যে সেই ঐক্যের আভাস জাগাইয়া তোলা, যে-কোনো উপায়ে হউক, যে-কোনো কবিপ্রতিভার ইহাই একটি বিশেষ উদ্দেশ্য।

ননীবালা এবং দামিনী একরূপ নহে। দুই বিপরীত চরিত্রের দুই নারী, এমন বলিলেও কেহ আপত্তি করিবেন না। কেননা, শচীশের কথায়, ননীবালা সেই নারী যে নিজে মরিয়া জীবনের পাত্র সুধায় ভরিয়া নিল, প্রিয়তমকে দিতে যদিও পারিল না; আর দামিনী— 'মৃত্যুর কেহ নয়, সে জীবনরসের রসিক। বসন্তের পুষ্পবনের মতো লাবণ্যে গন্ধে হিল্লোলে সে কেবলই ভরপুর হইয়া উঠিতেছে ··· সে উত্তুরে হাওয়াকে সিকি-পয়সা খাজনা দিবে না পণ করিয়া বসিয়া আছে।'

বিপরীত বৈকি। তবু, জীবন অর্জন করিতে, অচিরযৌবনে দামিনীও জীবন দেয় নাই কি? দিয়াছে তা নিজেরই সংস্কারমুক্ত সহজ জীবনের গতিভঙ্গে। সহজ— কিন্তু, অভ্যাসের অথবা আরামের এতটুকু নয়। আর, ও দিকে ননীবালা, সামাজিক দৃষ্টিতে সে সমাজ-ভ্রষ্টা, ধর্মভ্রষ্টা, পতিতা রমণী— তার ভুলের বা অপরাধের ইহপরকালে কোনো মার্জনা নাই— কিন্তু, সত্য কি তাই? বুদ্ধিহীন বোধহীন সমাজ যেমনই বলুক, সংস্কারে অন্ধ বা আবদ্ধ দৃষ্টি তাহাকে যেমনই দেখুক, নাস্তিক জগমোহনের দু চোখে আমরা তাহার একি অম্লান অকলঙ্ক রূপ দেখিলাম—

'নিতান্ত কচিমুখ, অল্প বয়স, সে মুখে কলঙ্কের কোনো চিহ্ন পড়ে

নাই। ফুলের উপরে ধুলা লাগিলেও তার আন্তরিক শুচিতা দূর হয় না, তেমনি এই শিরীষ ফুলের মতো মেয়েটির ভিতরকার পবিত্রতার লাবণ্য তো ঘোচে নাই। তার দুই কালো চোখের মধ্যে আহত হরিণীর মতো ভয়, তার সমস্ত দেহলতাটির মধ্যে লজ্জার সংকোচ, কিন্তু এই সরল সকরুণতার মধ্যে কালিমা তো কোথাও নাই।'

জগমোহন এই অপমানিতা অবহেলিতা সন্তানসম্ভবা নারীর মধ্যে চিরকালের যে মাতৃরূপিণীকে দেখিয়াছেন তিনি যে চিরবন্দ্যনীয়া। সংসারজ্ঞানহীনা বিমূঢ়া ননীবালা এতই সহজে ভালোবাসিয়াছে, অপাত্রে এতই সহজে আত্মদান করিয়াছে যে, সেই চিরপূজ্যা মাতৃ-রূপে এতটুকু কলঙ্ক স্পর্শ করে নাই। প্রবঞ্চনার বিনিময়ে সে তো প্রেমই দিয়াছে; এই চরম সর্বনাশ তাহার হয় নাই যে, সেও প্রবঞ্চনা শিখিয়াছে, তাহারও অন্তরাত্মা পাষাণে পরিণত হইয়াছে কিম্বা মারা পড়িয়াছে। প্রতিঘাতময় প্রবল সক্রিয় তার প্রকৃতি নয়, তবু তার প্রেমে আত্মবিলোপকারিণী যে শক্তির সাক্ষাৎ পাওয়া গেল সেই কি কম আশ্চর্য? ইহার কি কোনো যুক্তি আছে? শাস্ত্র মিলাইয়া, দোষ গুণ খতাইয়া, ইহাকে ভালো অথবা মন্দ বলিবে কে? ইহা পবিত্র, ইহা সুন্দর, এ জীবনে না হইলেও জীবনান্তরে ইহার সম্পূর্ণতা ও সার্থকতা অবশ্যই আছে।

বালিকা ননীবালার আন্তরিক পবিত্রতা, চারিত্রিক শুচিতা ও সৌন্দর্য, যত অল্পাক্ষরে, যেমন সহজে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়াছেন এবং দেখাইতে পারিয়াছেন, আমাদের সাহিত্যে আর কোথাও তার তুলনা দেখি না, আর বিশ্বসাহিত্যেও বোধ করি দুর্লভ হইবে। বঙ্কিম ঋষিদৃষ্টিতে এ রূপ দেখিলেও সমাজসংস্থিতির খাতিরে হয়তো ইহার বাঙ্ময়ী প্রতিমা-বিরচনে বিরত থাকিতেন, নয়তো কিছু কৈফিয়ৎ কিছু সতর্কতার বাণী অবশ্যই উচ্চারণ করিতেন— আর,

শরৎচন্দ্রের সংস্কারেই বাধিত। শরৎচন্দ্র সমাজপতিতার মধ্যেও মহনীয় নারীত্বের রূপ সহজেই ফুটাইয়াছেন, কিন্তু কেন জানি না সাবধানে ইহাদের সমাজের বাহিরেই রাখিয়াছেন। হয়তো সে তাঁহার বাস্তববুদ্ধির বিশেষ পরিচয়, কিন্তু সত্যদর্শন আবিল অবরুদ্ধ থাকিয়াছে। শেষ-প্রশ্নের কমল চরিত্রে সর্ব সংস্কার ভাঙিবার চেষ্টা করিয়াছেন অশুভক্ষণে, তাহার ফল হইয়াছে সর্বনাশা। চেকভ ডস্টয়্‌ভ্‌স্কি রঁলা বা টলস্টয় যাহা অবলীলায় সাধন করিতে পারিতেন আমাদের দেশে আমাদের কালে তাহা তেমন সহজে কখনোই হইতে পারে না। আর, সহজে না হইলে, হয়ও না। রবীন্দ্রনাথ একান্তভাবে, অকৃত্রিমভাবে, কবি বলিয়াই তা পারিয়াছেন; অন্তরে বাহিরে স্বরূপ-উদ্‌ঘাটনই তাঁর একমাত্র জীবনব্রত। সেখানে তাঁর দৃষ্টি স্বচ্ছ, রূপকৃতি দ্বিধাহীন স্বচ্ছন্দ।

সমাজদৃষ্টিতে ভ্রষ্টা, পতিতা, নিরয়পথবর্তিনী ননীবালা-যে আসলে শুদ্ধ, পবিত্র, সুন্দর, রবীন্দ্রনাথ ইহা বলিয়া দিলেন না, দেখাইয়া দিলেন, আর আমরাও কৃতার্থ হইলাম। কোনো দিকে কোনো জবাবদিহির কথাই উঠিল না। বালিকা ননীবালার দুর্ভাগ্যের সমব্যথী আমরা হইলাম, তাহার দুষ্কৃতি কোথাও দেখিলাম না।

দামিনীচরিত্রের দীপ্তচ্ছবি ফুটাইয়া তুলিতে দিনের আকাশে শুক্লা চতুর্থীর চাঁদের মতো এই অপূর্ণ নারীজীবনের চরিত্র-চিত্রণ বিশেষ উপযোগী হইয়াছে সন্দেহ নাই। পৃথক্ হইয়াও, অকৃত্রিম নারীস্বভাবের সৌন্দর্যে ও প্রাণে, ভালোবাসিবার সহজ শক্তিতে, উভয়ে এক। অন্তর্নিহিত ঐক্যের বিষয় না ভুলিয়া, পার্থক্যের কথাই এখন বিশেষভাবে অনুধাবন করিতে হইবে—

'দামিনী যেন শ্রাবণের মেঘের ভিতরকার দামিনী। বাহিরে সে পুঞ্জ পুঞ্জ যৌবনে পূর্ণ; অন্তরে চঞ্চল আগুন ঝিক্‌মিক্ করিয়া উঠিতেছে।'

এ ছিল প্রাণের আগুন। শচীশ বলিতেছে—

'ননীবালার মধ্যে আমি নারীর এক বিশ্বরূপ দেখিয়াছি— অপবিত্রের কলঙ্ক যে নারী আপনাতে গ্রহণ করিয়াছে, পাপিষ্ঠের জন্য যে নারী জীবন দিয়া ফেলিল, যে নারী মরিয়া জীবনের সুধাপাত্র পূর্ণতর করিল। দামিনীর মধ্যে নারীর আর-এক বিশ্বরূপ দেখিয়াছি; সে নারী মৃত্যুর কেহ নয়'— নিরুপায়ে অথবা অভিমানে মৃত্যুর শরণ সে লয় না— 'সে জীবনরসের রসিক।' প্রাণের তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া, আঘাতে প্রতিঘাতে দুরন্ত দ্বন্দ্ব বাধাইয়া জীবনকে সে জিতিয়া লয়। 'সে কিছুই ফেলিতে চায় না; সে সন্ন্যাসীকে ঘরে স্থান দিতে নারাজ; সে উত্তুরে হাওয়াকে সিকি-পয়সা খাজনা দিবে না পণ করিয়া বসিয়া আছে।'

ননীবালা একরূপ অপাত্রে প্রেম দিয়াছিল, হিতাকাঙ্ক্ষী বাপ মায়ের হাতে দামিনী পাত্রস্থা হয় যেখানে তার অযোগ্যতা আর-এক প্রকার— সে তো ক্ষুধাতুর হীনস্বার্থ লম্পট নয়, সে দৃষ্টিহীন প্রেমশূন্য অসাড় 'স্বামীদেবতা'। দামিনীকে সে পায় নাই, যেহেতু চাহিয়া দেখে নাই। সংসারে তার মন ছিল না; গণৎকার বলিয়া দিয়াছিল 'কোন্-এক-বিশেষ যোগে বৃহস্পতির কোন্-এক বিশেষ দৃষ্টিতে সে জীবন্মুক্ত হইয়া উঠিবে।' সেদিন হইতে মনে মনে সে না-মন্ত্র জপ করিতেছিল এবং কোন্-এক সুযোগে লীলানন্দস্বামীর শিষ্য হইয়াছিল। জীবন্মুক্তি! জীবনকে ডিঙাইয়া, জীবনের কোনো সর্ত কোথাও পূরণ না করিয়া, সহসা যেন মুক্তিতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়! যখের ধনে ক্রোড়পতি বড়োলোক হওয়ার যে কামনা, এ তারই মতো— মানুষের কল্পিত এই মুক্তির জন্য অন্তরের ত্যাগ লাগে না, বীর্য লাগে না, তপস্যা বলিতেও যে-কোনো কোঁটা-তিলক-ধারী ভব্যিযুক্ত শ্রীগুরুর চরণসেবা আর নির্দিষ্ট তিথিতে তিথিতে উপবাস, নিভৃতে বসিয়া মনে-মনে মন্ত্রআবৃত্তি-সহ জপমালিকার গুটি ঘুরানো।

এ তপস্যার পনেরো-আনাই শারীরিক ও সোজা বলিয়া, আসলে ব্যর্থ। বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন: মনোপুব্বঙ্গমা ধম্মা মনোসেট্‌ঠা মনোময়া। মন এ স্থলে স্থানে বা অস্থানে বাঁধা দেওয়া হইয়াছে, তাহা জড়, সক্রিয় নহে।

মন্ত্র-পড়া সাত পাকের স্বামী হইলেও এই ভবতোষ দামিনীর ভরা জীবনের চৌকাঠ পার হইয়া ভিতরে প্রবেশ করে নাই, দামিনীর জানিবার সুযোগ হয় নাই তার অন্তরে কী ঐশ্বর্য, তার নারী-জীবনের সার্থকতা কতদূর। প্রধানতঃ শৈশব ও কৈশোরের স্নেহ-প্রীতিগুলি নিভৃত নারীহৃদয়ে লালন করিয়া দিন তার কাটিতেছিল; সেখানেও সে বাধা পাইতে লাগিল পদে পদে, আঘাত পাইল। অল্প কথায় তার এই বিবরণ দিয়াছেন আখ্যানকথক—

'যে সময়ে দামিনীর বাপ এবং তার ছোটো ছোটো ভাইরা উপবাসে মরিতেছে সেই সময়ে বাড়িতে প্রত্যহ ষাট-সত্তর জন ভক্তের সেবার অন্ন তাকে নিজের হাতে প্রস্তুত করিতে হইতেছে। ইচ্ছা করিয়া তরকারিতে সে নুন দেয় নাই, ইচ্ছা করিয়া দুধ ধরাইয়া দিয়াছে, তবু তার 'তপস্যা' এমনি করিয়া চলিতে লাগিল। এমন সময় তার স্বামী মরিবার কালে স্ত্রীর ভক্তিহীনতার শেষ দণ্ড দিয়া গেল, সমস্ত-সম্পত্তি-সমেত স্ত্রীকে বিশেষভাবে গুরুর হাতে সমর্পণ করিল।'

অদ্বৈত অথবা মায়া-বাদী সন্ন্যাসীরা স্ত্রীজাতিকে দূরে রাখিয়া চলেন। কিন্তু লীলানন্দস্বামীর রসের সাধনা আর রসদেরও প্রয়োজন, হয়তো সূক্ষ্মাকার লোভও আছে, ফলে দামিনীকে দলের ভিতর লইয়া বড়ো বিপদেই পড়িলেন। এ আগুন কখন্ স্মিতপ্রসাদ বিকিরণ করিবে অথবা 'ভোগ' রাঁধিয়া দিবে আর কখন্ অগ্নিকাণ্ড বাধাইবে তার কিছুই ঠিক নাই। ইহাকে ত্যাগ করা যেমন যায় না, আলুগোছে গ্রহণ করাও তেমনি অসম্ভব।

কিন্তু, দামিনী যে সহজেই দলে ভিড়িয়া যাইত তাহাও নয়। কেননা, নির্‌গুণ ব্রহ্মে লয়প্রাপ্তি অথবা চিন্ময় গোলোকে দিব্যদেহ-লাভ এরূপ কিছুতেই তাহার লোভ ছিল না। সামাজিক নিয়মে মন্ত্রপড়া স্বামী পাইয়াছে, হারাইয়াছে— তাহাতে অন্তরের অন্তরে তার একান্ত কোনো অভাববোধ হয় নাই। সে কি জানিত, কেই বা জানে, মনের মানুষকে পায় নাই বলিয়াই 'পুঞ্জ পুঞ্জ' যৌবনের আবেশে তার দেহই শুধু ফুলবন হইয়া উঠিয়াছে, অথচ যৌবন অপূর্ণ রহিয়াছে, নিগূঢ় অন্তর জাগিয়া উঠে নাই। এমন সময় সে প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা-সম শচীশকে দেখিল এবং স্বভাবতই আকৃষ্ট হইল। হায়, এ আগুন নিজের জ্বালায় নিজে জ্বলিতেছে, কাহাকেও তার প্রয়োজন নাই, কাহাকেও সে আহ্বান করে না, অকৃপণ আলোক এবং উত্তাপ অপক্ষপাতে সর্বত্র বিকীর্ণ করিতেছে— ইহাতে ঝাঁপ দেওয়া মৃত্যুরই নামান্তর পতঙ্গ তাহা বুঝিল না। শচীশও দামিনীকে দেখিল, স্বচ্ছ দৃষ্টিতে কোনো বিশেষের কোনো মোহ নাই তার— তাই বলা চলে, শচীশ শুধু তার 'শোভাই দেখিল, দামিনীকে দেখিল না।' নারীর বিশ্বরূপ বা নারীরূপিণী বিশ্বপ্রকৃতি, এ-সকল তত্ত্বে যেমন দামিনীর বিশেষ রুচি থাকিতে পারে না, বাস্তববাদী শ্রীবিলাসেরও তেমনি বিরূপ প্রতিক্রিয়া। হৃদয় জিতিয়া লইবার খেলায় দামিনী আপনার অজ্ঞাতে তাহাকে দাবাবোড়ের ঘুঁটির মতো ব্যবহার করিলেও, সে জড় বা হৃদয়হীন নয়, সে যে দামিনীকে ভালোবাসিয়াছে। 'চারি দিকের আকাশে একটা চঞ্চলতার হাওয়া উঠিল। একটা অদৃশ্য বিদ্যুৎ ভিতরে ভিতরে খেলিতে লাগিল।' এই গল্পের কথক শ্রীবিলাস আক্ষেপ-সহকারে বলিতেছেন—

'নারীহৃদয়ের রহস্য জানিবার মতো অভিজ্ঞতা আমার হইল না। ...যেখানে মেয়েরা দুঃখ পাইবে সেইখানেই তারা হৃদয় দিতে প্রস্তুত। এমন পশুর জন্য তারা আপনার বরণমালা গাঁথে, যে লোক

সেই মালা কামনার পাঁকে দলিয়া বীভৎস করিতে পারে; আর তা যদি না হইল তবে এমন কারও দিকে তারা লক্ষ করে যার কণ্ঠে তাদের মালা পৌঁছায় না, যে মানুষ ভাবের সূক্ষ্মতায় এমন মিলাইয়াছে যেন নাই বলিলেই হয়। মেয়েরা স্বয়ম্বরা হইবার বেলায় তাদেরই বর্জন করে যারা ... মাঝারি মানুষ। নিজের ব্যবহারে আমাদের লাগায়, এবং হয়তো-বা আমাদের শ্রদ্ধাও করে, কিন্তু—' শ্রীবিলাস কথাটা আর শেষ করেন নাই। শ্রীবিলাসকে দামিনী শুধু যে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করিয়াছে এটাই সত্য নয়, বিশ্বস্ত বন্ধু বলিয়াও গ্রহণ করিয়াছে সন্দেহ নাই— কিন্তু হায়, সেই কি যথেষ্ট!

এখানে চতুরঙ্গের আখ্যায়িকাটি সবিস্তারে বলিবার প্রয়োজন নাই। রবীন্দ্রনাথ নিজে এমন সংহত ভাবে সে কাজ সারিয়াছেন যে, যেভাবে 'চোখের বালি' বা 'নৌকাডুবি' লেখা হইয়াছিল সেই-ভাবেই সব্যাখ্যা সকল বিবরণ দিতে গেলে 'গোরা'র অপেক্ষা বৃহৎ উপন্যাস হইতে পারিত। এ যেন চীনামাটির টবে জাপানী রীতির মহীরুহ, যথাস্থানে ছাড়া পাইলে ইহার শাখা-প্রশাখা-সকল আকাশ স্পর্শ করিত, শিকড় প্রবেশ করিত পাতালে বা নাগলোকে। বিস্তার করেন নাই, সে ভালোই— অন্য একটি উপমা দিয়া বলি, ইহার স্ফাটিক সংহতির সর্ব অঙ্গ হইতে আলো ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছে। ভাব, ভাষা, উপমা, চিত্র এবং চরিত্রের অঙ্কন, ঘটনার বিবৃতি, তাৎপর্য— সকল বিষয়েই ভিতরের এত প্রাচুর্য আর আকারের এমন পরিমিতি সুবিশাল রবীন্দ্রসাহিত্যে আর কোথাও আমরা দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। এ সময় পর্যন্ত, তৎকালপ্রচলিত লেখার ভাষা আর কথ্য ভাষা কী যে নিত্যব্যবহার্য সে বিষয়ে কবি মনস্থির করিতে পারেন নাই। যুগের হাওয়ায় পরিবর্তন আসিয়াছে সে

ভালোই, প্রসঙ্গক্রমে তবু বলিয়া রাখি— যে ভাষায় 'জীবনস্মৃতি' লেখা, যে ভাষায় আবার 'চতুরঙ্গ' লেখা হইল, তাহা এমন সহজ, সাবলীল, হার্দগুণসম্পন্ন যে, তাহাকে কোনোক্রমেই কৃত্রিম বলা যায় না। ন্যায়ের তর্কে বলিতে হইলেও, আন্তরিক প্রতীতিতে অন্যরূপ বলে। ক্রিয়াপদগুলি স্বরবহুল কি সংহত কোনো পাঠকের তাহা মনে থাকে না ; ভাষা যে ভাবের উপযোগী, ভাবেরই অত্যন্ত অনুগত বশীকৃত বাহন —এইটুকু শুধু মনে থাকে। ইহার তুলনায় ক্রিয়াপদ বা সর্বনামের তনুতা-সত্ত্বেও বীরবলী ভাষা কতকটা কৃত্রিম বৈকি, কেননা কথার সঙ্গে সঙ্গে কথনের কৌশলটি ভালোভাবেই জানান দেয়— পরে হয়তো কৌশলটারই প্রশংসা মনে থাকে, কথা ভুলিয়া যাই— ফলতঃ উহা ড্রয়িংরুমের ভাষা (বৈঠকখানা বলিতেও বাধিয়া গেল, সে-যে সেকালের ব্যাপার), শহুরে চাল-চলন জীবনযাত্রার ভাষা— সরলতা বা স্বচ্ছতা উহার বিশেষ লক্ষণ নয়। কেহ ভুল বুঝিবেন না— ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের বিশেষত্বের উপর ভাষার প্রসাদ বা অপ্রসাদগুণ নির্ভর করে না এইটুকুই আমাদের বক্তব্য। (ছিন্নপত্র কি অকৃত্রিম নয়? অথবা রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ আরও অজস্র রচনা ?) লেখকের মানসিক গঠন ও ভাবই ভাষাকে বিশেষত্ব দিতে পারে, তাহার উল্টাটি কখনো হয় না।

চতুরঙ্গ প্রসঙ্গে আর-একটি কথাও এখানেই সারিয়া লওয়া চলে। ১৩২১ বৈশাখে শ্রীপ্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় সবুজ পত্রের সূচনা হইল 'ওঁ প্রাণায় স্বাহা' এই চমকপ্রদ মন্ত্রে। ঐ সংখ্যার শেষে কবি সত্যেন্দ্রনাথ লিখিলেন—

এই সবুজের ছত্রতলে
যৌবনে দাও রাজটিকা।

চিরনূতনের চিরযুবা প্রতিনিধি-রূপে সে রাজটিকা ললাটে গ্রহণ করিলেন কবি রবীন্দ্রনাথ। সবুজ পত্রের একেবারে প্রথম সংখ্যা হইতেই

তাঁহার গল্প কবিতা কখনো বা প্রবন্ধ অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রকাশিত হইতে লাগিল। তাহার ভাব ভাষা বক্তব্য, যেন সকলই নূতন। গল্পের কথাই ধরা যাক— হালদার-গোষ্ঠী, হৈমন্তী, বোষ্টমী, স্ত্রীর পত্র, ভাইফোঁটা, শেষের রাত্রি, অপরিচিতা, সবুজপত্রের সাতটি সংখ্যায় এই সাতটি গল্প শেষ করিয়া অষ্টম সংখ্যায় লিখিলেন জ্যাঠামশায়। চতুরঙ্গের সুসম্পূর্ণ কল্পনা তখনো তাঁহার মনে আসিয়াছিল তাহার কোনো প্রমাণ আমাদের জানা নাই। ননীবালার করুণসুন্দর জীবনের অবসানে দু ফোঁটা অশ্রুর তর্পণে এ প্রসঙ্গ চিরতরে সমাপ্ত হওয়াব বাধা ছিল না। কিন্তু পরবর্তী কয়টি সংখ্যায় 'শচীশ' 'দামিনী' 'শ্রীবিলাস' শিরোনামে ঐ একই কাহিনীর অনুবৃত্তি চলিল-যে এজন্য কবিকে 'দায়ী' করা চলে না। অর্থাৎ, তিনি সংকল্প-গ্রহণ-পূর্বক এই অবিচ্ছিন্ন ঘটনাধাবাব অনুসরণ করেন নাই। ববীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন এমন নয়, জ্যাঠামশায় গল্পের সজীব চরিত্র-গুলি তাঁহাব লেখনীকে কোনোক্রমেই ক্ষান্ত হইতে দেয় নাই, অন্য ঘটনা অন্যান্য চবিত্র আসিয়া জুটিয়াছে। এ তো লেখা নয়, লেখানো। আবার, 'দামিনী' গল্পেব শেষে খানিকটা পরিশিষ্ট যোগ করিয়া শ্রীবিলাসের যাহা-কিছু সুখ দুঃখ, যাহা-কিছু বক্তব্য, সেখানেই ভালোভাবে শেষ করা হইয়াছিল, তাহা গ্রন্থ দেখিয়া, বিশেষতঃ সবুজ পত্র দেখিলে, নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। শেষ কথা শ্রীবিলাস এই বলিলেন: অনেক দিন পরে আমাকে এই আবার দামিনীর প্রয়োজন হইল। সেই প্রয়োজন এখনো চলিতেছে। দুইজনে সমস্ত গুছাইয়া লইতেছি॥ —পাঠক ১৩২১ মাঘের সবুজ পত্র দেখিবেন (পৃষ্ঠা ৬৯২-৯৩)— যে-কোনো কাহিনী ঠিক এই ভাবেই শেষ হইয়া থাকে। কিন্তু, না, মাঘের পূর্ণিমা আবার ফাল্গুনে পা বাড়াইল, আদিগন্ত সমুদ্রে অশ্রুর জোয়ার জাগিয়া উঠিল, দামিনীর জীবনে নববসন্তের সূচনাই হইল, শেষ কোন্ জীবনান্তবে তাহায়ই একটু

ইঙ্গিতে অথবা ব্যঞ্জনায় কবি এই আখ্যানধারা বিশ্বজীবনের সিন্ধু-সংগমে শেষ করিলেন।

দামিনীর গুরু হওয়ার যোগ্যতা লীলানন্দস্বামীর ছিল না, কেননা গুরু হওয়ার লোভ তাঁহার ছিল। দামিনীর স্বাভাবিক আকর্ষণ শচীশের দিকে, যে শচীশ দীপ্ত প্রাণের জ্বালায় অহর্নিশ জ্বলিতেছে— জানে না তার উত্তাপ এবং আলোক কোথায় কতদূর ছড়াইয়া পড়িল। এ আগুন অলৌকিক আর এ আকর্ষণ শুধু নক্ষত্রশিখায় ঝাঁপ দিবার দুরাকাঙ্ক্ষা —এ কথা দামিনীকে বুঝিতে হইল অনেক দুঃখে। এক দিনে বুঝিতে চায় নাই, সমস্ত প্রাণ-প্রকৃতি বিদ্রোহিনী হইয়া উঠিয়াছে, তবু যাহা চিরদূরের তাহার উদ্দেশে প্রণামে নত হওয়া ভিন্ন আর কোনো পথ ছিল না। দামিনীর সাহিত্যচর্চা কিছুটা থাকিলেও, রবিঠাকুরের কাব্যে রুচি কতদূর ছিল জানি না, নহিলে শচীশকে মনে মনে ডাকিয়া বলিত : ওগো মোর না-পাওয়া গো! দামিনীর তরুণ জীবনে তবু সে-ই সকল পাওয়ার অধিক হইয়াছিল।

'সমুদ্রের মধ্যে একটা অন্তরীপ। একেবারে নির্জন নিস্তব্ধ; নারিকেলবনের পল্লববীজনের সঙ্গে শান্তপ্রায় সমুদ্রের অলস কল্লোল মিশিতেছিল।'— সেদিনের সেই অপূর্ব দিনান্তটি পাঠকের মনে আছে কি?—

পথে যেতে তোমার সাথে মিলন হল দিনের শেষে।
দেখতে গিয়ে সাঁজের আলো মিলিয়ে গেল এক নিমেষে।
দেখা তোমায় হোক বা না হোক
তাহার লাগি করব না শোক—
ক্ষণেক তুমি দাঁড়াও, তোমার চরণ ঢাকি এলো কেশে।

গান থামিল। 'আকাশ-ভরা সমুদ্র-ভরা সন্ধ্যার স্তব্ধতা নীরব সুরের

রসে একটি সোনালি রঙের পাকা ফলের মতো ভরিয়া উঠিল। দামিনী মাথা নত করিয়া প্রণাম করিল; অনেক ক্ষণ মাথা তুলিল না, তার চুল এলাইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।'

কিন্তু, কাহার পায়ে মাথা লুটাইয়া দিল দামিনী, জানে কি? অশান্ত হৃদয় কি শান্ত হইল? মর্তজীবনের চিরতৃষা চিরক্ষুধা কি ঘুমাইয়া পড়িল? কর্মক্লান্ত মানুষ যে রাতে অকাতরে ঘুমায়, গুহার আঁধারে সে তখন আবার জাগিয়া উঠে; হয়তো জানে কী চায়, কাহকে চায়— তবু জানে না যে কেন চায়। তাহার লোমশ স্পর্শে, তাহার ভিজা-ভিজা নিশ্বাসে, তাহার অক্টোপাশ-তুল্য লালায়িত বিসর্পিত বন্ধনে বাঁধা পড়িতে গিয়া, সহসা যে জাগিয়া ওঠে, মনে করে— এ একটা আদিম যুগের অজানা জন্তু, ইহার চক্ষু নাই, কর্ণ নাই, মন নাই, আছে একটা অহেতুক অতৃপ্য ক্ষুধা; ইহার কবলে একবার পড়িলে আর রক্ষা নাই। কথা মিথ্যা নয় এবং পূর্ব দিগন্ত হইতে আলো আসিয়া গুহার আঁধার দূর করিয়া না দিলে, সবটাই দুঃস্বপ্ন মনে করিবারও কোনো উপায় নাই। শচীশের কথা বলিতে পারি না, দামিনীর জীবনে এটি কোনো দুঃস্বপ্ন নয়, এটি এক বিশেষ অভিজ্ঞতা, এটি তার নূতন জীবনের সূচনা। নরদেবতার পদপাতে অহল্যাপাষাণী পুনরায় প্রাণ পাইয়াছিল, তেমনি এক প্রিয়পদাঘাতের দীক্ষায় মায়াবিনী আদিম প্রকৃতির মন্ত্রে আবদ্ধ পশুত্বের পাশমোচন হইল, অচেতনে চেতনার সঞ্চার দেখা দিল।

রবীন্দ্রনাথ এই আখ্যায়িকাছলে শুধু রেখাচিত্রই আঁকিয়া গিয়াছেন, পুরাপুরি রঙ লাগান নাই, অথবা স্থূল রূপের নতোন্নতভাব ফুটাইয়া তুলেন নাই। অথচ রূপের সেই রেখাগুলি জীবন্ত, প্রাণ-স্পন্দিত; তাহাদের সীমায় সীমায় সুসম্পূর্ণ গঠনের ব্যঞ্জনা, মূর্ততার অভ্রান্ত উদ্দীপন।

আদিপ্রকৃতি অন্তরে হার মানিলেও, সেই পরাভবস্বীকারে তাহার

গোপন পরিতৃপ্তি ও কৃতার্থতা থাকিলেও, বাহিরে স্বতই তাহা ফুটিয়া উঠিল কি? তা নয়। তেমন হইলে এই জীবননাট্যের রস জমিয়া উঠে না, লীলা অস্থানে শেষ হইয়া যায়। কাজেই শচীশ শ্রীবিলাস দামিনীকে লইয়া— গৌণ ভূমিকায় লীলানন্দস্বামীও আছেন— নানা ঘাত প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া এ আখ্যান বিধিনির্দিষ্ট পরিণামে কবে পৌঁছিত তাহা বলিতে পারি না। এমন সময় এক দুর্ঘটনা ঘটিল— স্বামীজিব কীর্তনের দলে নবীন একজন গায়ক, তাহার স্ত্রী একদিন আত্মহত্যা করিয়া বসিল, তৎপূর্বেই যথোচিত আচারে স্বামীর গোপন প্রণয়ের পাত্রীকে, নিজেরই ভাগিনীকে, এ গৃহেব নবতব বধূরূপে ববণ করিয়া তুলিয়া লইতে ভুলিল না। এ যেন সমস্ত পুরুষজাতিকে আর স্ত্রীজাতিকে ধিক্কাব দেওয়া, ঘবে ঘবে প্রেমহীন দাম্পত্যসম্পর্কেব ছলনাকেই লজ্জা দেওয়া।

আব, ও দিকে ঐকান্তিক ভাবভক্তির চর্চা, নির্ভাজ বসতত্ত্ব এবং রসের ধর্ম— তাহাবই বা সার্থকতা কী? 'দামিনী কহিল, আমাকে বুঝাইয়া দাও, তোমরা দিন বাত যা লইয়া আছ তাহাতে পৃথিবীর কী প্রয়োজন। তোমবা কাকে বাঁচাইতে পাবিলে? তোমবা দিন রাত 'রস' 'রস' করিতেছ, ও ছাড়া আব কথা নাই। বস যে কী সে তো আজ দেখিলে? তার না আছে ধর্ম, না আছে কর্ম, না আছে ভাই, না আছে স্ত্রী, না আছে কুলমান! তাব দয়া নাই, বিশ্বাস নাই, লজ্জা নাই, শরম নাই!'

শচীশ ইহাব কী উত্তব দিতে পারে! বেদনাহত দামিনী হয়তো কিছু অত্যুক্তি করিল। কিন্তু, কর্ম নয়, জ্ঞান নয়, শুধু ভাব এবং ভক্তিব চর্চা— দেশে কালে পরিব্যাপ্ত মানুষেব সুবিশাল ইহলোকের সঙ্গে যোগ নাই বলিলেই হইল, কেবল চিন্ময় কোনো গোলক বা বৈকুণ্ঠের ধ্যানে বুঁদ হইয়া থাকা— ইহার যে ব্যর্থতা কতদূর আর সমুদয়-সমাজ-ব্যাপী তামস প্রতিক্রিয়া কী ভীষণ, রবীন্দ্রনাথ তাহা

মর্মে মর্মে বুঝিয়াছিলেন, দামিনী যদি বা তাঁর নাম কানে না শুনিয়া থাকে কোনোদিন, তবু বুঝিল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায়। সে যেন বলিয়া উঠিল—

যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে,
মুহূর্তে বিহ্বল হয় নৃত্যগীতগানে
ভাবোন্মাদমত্ততায়, সেই জ্ঞানহারা
উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছলফেন ভক্তিমদধারা
নাহি চাহি নাথ!

শঙ্কিত চকিত প্রাণে সে বুঝি বলিতে চায়—

সকল ক্ষীণতা মম করহ ছেদন
দৃঢ়বলে, অন্তরেব অন্তর হইতে
প্রভু মোর! ·
ভকতিবে বীর্য দেহ
কর্মে যাহে হয় সে সফল, প্রীতি স্নেহ
পুণ্যে ওঠে ফুটি।

শচীশকে আর্তকণ্ঠে মুখ ফুটিয়া বলিল—'তোমার গুরু যে পথে সবাইকে চালাইতেছেন সে পথে ধৈর্য নাই, বীর্য নাই, শান্তি নাই। ওই-যে মেয়েটা মবিল বসেব পথে রসেব রাক্ষসীই তো তার বুকের রক্ত খাইয়া তাহাকে মারিল। প্রভু, জোড়হাত করিয়া বলি, ওই রাক্ষসীর কাছে আমাকে বলি দিয়ো না। আমাকে বাঁচাও।'

ভিতরে-বাহিরে-সমান-ভয়ংকরী যে প্রবৃত্তির মুখোষ আজ একেবারে খুলিয়া গিয়াছে, তাবই উদ্যত গ্রাস হইতে বাঁচিবার ব্যাকুলতায় দামিনী শচীশকে বলিল, 'তুমিই আমার গুরু হও, আমি আর কাহাকেও মানিব না। দামিনী শচীশের পায়ের কাছে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া অনেক ক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করিল। গুন্ গুন্ করিয়া বলিতে লাগিল, তুমি আমার গুরু, তুমি আমার গুরু, আমাকে

সকল অপরাধ হইতে বাঁচাও, বাঁচাও, বাঁচাও।'

ঘটনাক্রমে শ্রীবিলাস এখানে উপস্থিত ছিল, দামিনী তাহাকে দেখে নাই। ঘটনাক্রমেই কাতর প্রাণের অর্ধস্ফুট প্রার্থনা কানে শুনিয়াছে— তার কিম্বা শচীশেরও তা শুনিবার কথা নয়। সে মুহূর্তে দামিনীর প্রাণপ্রিয় ইষ্ট বা গুরুদেব তাহার ভিতরেই ছিল অথবা বাহিরে সে তা বলিতে পারে না। মুখে কিছু উচ্চারণ করিতেছে তাহাও সে জানিত না।

এই ঘটনার পবে এই তিনটি প্রাণী লীলানন্দস্বামীর মণ্ডলী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল এবং শচীশেব আত্মসন্ধানের বা সত্যদর্শনের সাধনাও অতিশয় তীব্র হইয়া উঠিল— কখন্ স্নান, কখন্ আহার, কখন্ কোথায় স্থিতি, তাহার কোনো ঠিক-ঠিকানা নাই। স্নেহ-প্রীতিপ্রবণ রমণীহৃদয়ের ব্যাকুলতা তার সুখসাচ্ছন্দ্য-বিধানের চেষ্টায় বারে বারে আহত ও প্রতিহত হয়, কিন্তু কাতরতাপূর্ণ বিরক্তি-উৎপাদন ভিন্ন অন্য কোনো কাজ হয় না। কখনো দ্বিপ্রহরের অসহ্য বিশাল দিগ্‌দাহের মধ্যে অন্নেব থালা সাজাইয়া, কখনো তমিস্রস্রোত-প্রবাহিত প্রলয়ঙ্কর ঝড়ের রাত্রে স্নেহার্ত মাতৃহৃদয় মাত্র সঙ্গে লইয়া, এই পূজারিনি, এই স্নেহপ্রেমময়ী যার অনুসবণ কবে কোনো দিকে তার কোনো নাগাল পাইবার উপায় নাই যে। অন্তর্যামী গুরু তাহাকে যে পথে নিশিদিন ছুটাইতেছেন তাব মানচিত্র আজ পর্যন্ত কোনো শাস্ত্রকার বা দর্শন-বিজ্ঞানের পণ্ডিত ছকিয়া রাখে নাই। অবসরসময়ে সে হয়তো, নদীর জলটি যেখানে 'নীলে নীল, ধারে ধারে চঞ্চল কাদাখোঁচা লেজ নাচাইয়া সাদা-কালো ডানার ঝলক দিতেছে, কিছু দূরে চখাচখির দল' প্রচুর কোলাহল করিয়াও 'কিছুতেই পিঠের পালখ মনের মতো সাফ করিয়া উঠিতে পারিতেছে না', সে-সব দেখিয়া শচীশ আপন চিত্তবিনোদন করে। সেখানে

দামিনীকে দেখিয়া বিস্মিত ও বিরক্ত শচীশ বলে, 'এখানে কেন ?

…খাবার আনিয়াছি।

…খাইব না।

…অনেক বেলা হইয়া গেছে।

শচীশ কেবল বলিল, না।

·· আমি নাহয় একটু বসি, তুমি আর-একটু পরে—

শচীশ বলিয়া উঠিল, আহা কেন আমাকে তুমি—

হঠাৎ দামিনীর মুখ দেখিয়া থামিয়া গেল। দামিনী আর-কিছু বলিল না, থালা হাতে করিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল। চারি দিকে শূন্য বালি রাত্রি বেলাকার বাঘের চোখের মতো ঝক্ ঝক্ করিতে লাগিল।'

স্নেহার্ত হৃদয়ের এ দুঃখ কোনো পুরুষ কোনোদিন বুঝিবে না। 'শচীশের শরীরের জন্য তুমি এত ভাবো কেন' —শ্রীবিলাসের এ প্রশ্ন নিরর্থক। সে যে স্ত্রীজাতি; 'ওই শরীরটাকেই তো দেহ দিয়া, প্রাণ দিয়া, গড়িয়া তোলা' মেয়েদের স্বধর্ম। যাকে ভালোবাসে, স্নেহ করে, তার শরীরের কষ্ট দেখিলে কি মন কাঁদিয়া উঠিবে না!

এখানে প্রশ্ন করা যাইতে পারে, শচীশ দামিনীর কে ? আমরা যতদূর বুঝিয়াছি, অন্তরঙ্গ উপলব্ধিতে শচীশ তার স্বামী, পুত্র, পিতা, গুরু এবং ইষ্টদেবতা সবই। হৃদয়ের এ রহস্য বুদ্ধি দিয়া বুঝা কিম্বা বুঝানো যায় না, লোকাচারে দেশাচারে অথবা নীতিধর্মে ইহার কোনো বিধিনিষেধ থাকিতে পারে না— আমরা নম্রহৃদয়ে ইহার উল্লেখমাত্র করিয়া ক্ষান্ত হইলাম।

সব সময়েই আপন নির্মম ব্যবহারে শচীশ-যে দামিনীকে আঘাত করে এমনও নয়। কখনো দ্বিপ্রহর রাত্রে দামিনী ও শ্রীবিলাসকে ডাকিয়া তুলিয়া, অন্তরের অন্তরে বিদ্যুৎচ্চকিত অপূর্ব এক উপলব্ধির বিস্ময় ও পুলকের বেগ সাম্‌লাইয়া লইতে চেষ্টা করে।

তখন যে ভাষায় যে কথা সে বলে, আনন্দউদ্‌বেলিত কবিবাক্যের সঙ্গেই তার তুলনা, অর্থাৎ উহাকে শ্রুতিগম্য এক প্রকার স্বগতউক্তি বলা চলে। দামিনী কিছু না বুঝিয়াও শিহরিত পুলকিত হয়, মুগ্ধা হরিণী যেমন বাঁশির ভাষা বুঝে না, ভাবেরই আকর্ষণে ঘাড়টি তুলিয়া নিষ্পলক চাহিয়া থাকে।

তবু স্নেহপ্রেমের সদাজাগ্রত এই খবরদাবি, ভক্তিশ্রদ্ধার অকথিত আরাধনা, শচীশের বেশিদিন সহ্য হইল না; বলিতে হইল, 'যাঁকে আমি খুঁজিতেছি তাঁকে আমাব বড়ো দরকাব— আর-কিছুতেই আমার দরকার নাই। দামিনী, তুমি আমাকে দয়া করো, তুমি আমাকে ত্যাগ কবিয়া যাও।'

সে রাত্রে ঠিক কী ঘটিয়াছিল শ্রীবিলাস তাহা জানে না। কিছু দেখিয়া, কিছু অন্ধভাবে অনুমান করিয়া তার 'মনে হইল, আমাব দুর্ভাগ্য বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া আমার গলা টিপিয়া ধরিতেছে।' কিন্তু, পরদিন প্রভাতে দামিনীকে দেখিয়া, নিজের সত্য বা কল্পিত সকল দুঃখই সে ভুলিয়া গেল। 'সে কী চেহারা! কাল রাত্রে ঝড়ের তাণ্ডবনৃত্য কেবল এই মেয়েটিব উপরেই আপনার সমস্ত পদচিহ্ন রাখিয়া গেছে। দামিনী বলিল, শ্রীবিলাসবাবু, তুমি আমাকে কলিকাতায় পৌঁছাইয়া দিবে চলো।' এ যে কী কঠিন ত্যাগ শ্রীবিলাসেব তাহা বুঝিতে বাকি রহিল না। তবু 'যাওয়াই ভালো। পাহাড়টার উপব ঠেকিতে ঠেকিতে নৌকাটি যে চুর্‌মাব হইয়া গেল।' পথে শচীশকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীবিলাস কিছু 'কড়া কথা', সত্য কথা, শুনাইবার উপক্রম করিয়াছিল। 'দামিনী রাগিয়া বলিল, ·· তুমি কেবল আমারই দুঃখের দিকে তাকাও, আমাকে বাঁচাইতে গিয়া তিনি যে দুঃখটা পাইয়াছেন সে দিকে বুঝি তোমার দৃষ্টি নাই? সুন্দরকে মারিতে গিয়াছিল, তাই অসুন্দরটা বুকে লাথি খাইয়াছে। বেশ হইয়াছে, বেশ হইয়াছে, খুব ভালো হইয়াছে।'— এই নিষ্ঠুর

পদাঘাতেই ক্ষুধা-রাক্ষস মারা পড়িয়াছে, শিবসুন্দরের চিরউপাসিকা নারী জাগিয়া উঠিয়াছে— ভাবনা-কল্পনার-অতীত সত্যে ও সৌন্দর্যে দামিনীর জীবন ধন্য হইয়াছে। অন্যের তাহা জানিবার কথা নয়।

জীবনের আসল ঘটনাগুলি ঘটিয়া যায় অন্তর্লোকে,লোকলোচনের অগোচরে।

যা হোক, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার দায় -সমেত বাহিরেও একটা জীবন আছে। দামিনীর আশ্রয় কোথায়, দামিনীর দিন কাটিবে কী লইয়া, কাদের সেবায় স্নেহে ও সাহচর্যে? সামাজিক দৃষ্টিতে সে তো পদে পদে অপরাধী হইয়া আসিয়াছে, তার নিন্দায় তো তার আত্মীয় স্বজনের কান পাতিবাব জো নাই— সুতরাং, মাসি-পিসি ভাই-ভাজ সকলের ঘরেই তার জন্য স্থানের বড়ো অকুলান। লীলানন্দস্বামীর কাছে, অবশ্য, ফিরিয়া যাওয়া চলে— মঠধারী সাধু-সন্ন্যাসীবা অনেকটা সামাজিক স্তুতিনিন্দার ঊর্ধ্বে, যথেষ্ট চতুর হইলে তাঁরা অনেকটা বিষ হজম করিয়াও সুখে স্বচ্ছন্দে দলবৃদ্ধি করিতে পারেন। কিন্তু সেই কি দামিনীর, আজিকার দামিনীর, জীবনের সম্ভবপর সার্থকতা? সে কি কপটাচাব হইবে না? নিজেকে হীন করা হইবে না? এই দ্বিধা সংশয় সংকটের মুখে শ্রীবিলাস সাহস করিয়া একটা আর্জি উপস্থিত করিল। দামিনীকে বলিল, 'যদি আমাব মতো মানুষকে বিবাহ করা তোমার পক্ষে সম্ভব হয় তবে—

ওকি কথা বলিতেছ শ্রীবিলাসবাবু! তুমি কি পাগল হইয়াছ?

মনে করো-না পাগলই হইয়াছি। পাগল হইলে অনেক কঠিন কথা অতি সহজে মীমাংসা করিবার শক্তি জন্মায়। আমি সংসারে অত্যন্ত সাধারণ মানুষদের মধ্যে একজন— এমনকি আমি তার চেয়েও কম, আমি তুচ্ছ। আমাকে বিবাহ করাও যা, না করাও তা, অতএব তোমার ভাবনা কিছুই নাই।

দামিনীর চোখ ছল্‌ছল্‌ করিয়া আসিল। সে বলিল, তুমি যদি

সাধারণ মানুষ হইতে তবে কিছুই ভাবিতাম না।

আরও কিছু ক্ষণ ভাবিয়া দামিনী বলিল, তুমি তো আমাকে জানো।'

শ্রীবিলাস বলিলেন, 'তুমিও তো আমাকে জানো।

এমনি করিয়াই কথাটা পাড়া হইল। যে-সব কথা মুখে বলা হয় নাই তাহারই পরিমাণ বেশি।'

দেশী বা বিদেশী কোর্ট্‌শিপের কোনো আদর্শে ইহাকে ভালোবাসা-বাসি অথবা মন-জানাজানির সংগত বিবরণ বলা চলে না। অথচ ইহাই সত্য, ইহাই পরস্পর-পরিচয়ের গভীর ফল্গুধারার সহসা আলোকে আত্মপ্রকাশ— ইহাতে মোহময় ও রমণীয় কোনো-রূপ ছলা-কলা নাই, তার প্রয়োজনও নাই। আর, বিধবাবিবাহ উচিত কি অনুচিত— শচীশকে দামিনী ভালোবাসে, পূজা করে, চিরজীবন অন্তরের সিংহাসনে রাখিয়া পূজা করিবে সন্দেহ নাই, এ অবস্থায় শ্রীবিলাসের ঘর করিয়া সে দ্বিচারিণী হইবে কি না— এ-সকল প্রশ্নও উঠিল না। চিরন্তন মনুষ্যপ্রকৃতি বিশেষ-দেশ-কাল-গত সামাজিক আচার-বিচারের সহিত সর্বত্র সংগতি রাখিয়া চলে না, কখনো বিচিত্র ছলনার অন্তরালে নিগূঢ় থাকে, কখনো সত্যের সাহসে আত্মপরিচয় দিতেও দ্বিধা করে না— কবি বা ঋষি সর্বদা সেই চিরপ্রকৃতিকে বা সত্যকেই বহুমান দিয়া থাকেন, ইহাতে ভালোই বলো আর মন্দই বলো।

অতঃপর এই গল্পের বক্তা শ্রীবিলাস বলিতেছেন, 'অভাবনীয় পরিহাসে মনোবিজ্ঞানকে ফাঁকি দিবার জন্যই মনের সৃষ্টি। সৃষ্টি-কর্তার সেই আনন্দের উচ্চহাস্য এবারকার ফাল্গুনে' কলিকাতার এক 'ভাড়াটে বাড়ির দেয়াল-ক'টার মধ্যে বার বার ধ্বনিয়া ধ্বনিয়া উঠিল। ··· এবারে' দামিনীর 'সমস্ত জগৎ সংকীর্ণ হইয়া সেইটুকুতে আসিয়া ঠেকিল যেখানে আমিই কেবল একলা। কাজেই আমাকে

সম্পূর্ণ চোখ মেলিয়া দেখা ছাড়া আর উপায় ছিল না। আমার ভাগ্য ভালো, তাই ঠিক এই সময়টাতেই দামিনী আমাকে যেন প্রথম দেখিল। অনেক নদীপর্বতে সমুদ্রতীরে দামিনীর পাশে পাশে ফিরিয়াছি— সঙ্গে সঙ্গে খোল-করতালের ঝড়ে রসের তানে বাতাসে আগুন লাগিয়াছে, 'তোমার চরণে আমার পরানে লাগিল প্রেমের ফাঁসি' এই পদের শিখা নূতন নূতন আখরে স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিয়াছে। তবু পর্দা পুড়িয়া যায় নাই।' পরস্পরকে দেখা হয় নাই। 'কিন্তু, কলিকাতার এই গলিতে এ কী হইল! ঘেঁষাঘেঁষি ওই বাড়িগুলো চারি দিকে যেন পারিজাতের ফুলের মতো ফুটিয়া উঠিল।'

যথাকালে বিবাহ হইল। তাহার পূর্বে যথোচিত মন্ত্রণা করিয়া 'তুইজনে তুই হাত ধরিয়া শচীশকে কলিকাতায় গ্রেপ্তার করিয়া' আনিল। 'ছোটো ছেলে খেলার জিনিষ পাইলে যেমন খুশি হয়' শচীশের ভাবটা সেইরূপ। সে কিছুতেই চুপিসাড়ে কাজ সারিতে দিল না। 'বিশেষত, জ্যাঠামশায়ের সেই মুসলমান-পাড়ার দল যখন খবর পাইল তখন তারা এমনি হল্লা করিতে লাগিল যে পাড়ার লোকে ভাবিল, কাবুলের আমির আসিয়াছে, বা অন্তত হাইদ্রাবাদের নিজাম।'

শেষে শ্রীবিলাস আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন, 'কলিকাতার এই শহরটাই যে বৃন্দাবন, আর এই প্রাণপণ খাটুনিটাই যে বাঁশির তান, এ কথাটাকে ঠিক সুরে বলিতে পারি এমন কবিত্বশক্তি আমার নাই। কিন্তু দিনগুলি যে গেল সে হাঁটিয়াও নয়, ছুটিয়াও নয়, একেবারে নাচিয়া চলিয়া গেল।

'আরও একটা ফাল্গুন কাটিল। তার পর আর কাটিল না।

'সেবারে গুহা হইতে ফিরিয়া আসার পর দামিনীর বুকের মধ্যে একটা ব্যথা হইয়াছিল··· সে কাহাকেও বলে নাই। যখন বাড়াবাড়ি হইয়া উঠিল তাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, এই ব্যথা আমার গোপন ঐশ্বর্য, এ আমার পরশমণি— এই যৌতুক লইয়া তবে আমি

তোমার কাছে আসিতে পারিয়াছি—নহিলে আমি কি তোমার যোগ্য ?'

ডাক্তারে সব-শেষ 'মন্ত্রণা দিল, হাওয়া বদল করিতে হইবে।... দামিনী বলিল, যেখান হইতে ব্যথা বহিয়া আনিয়াছি আমাকে সেই সমুদ্রের ধারে লইয়া যাও— সেখানে হাওয়ার অভাব নাই।

'যেদিন মাঘের পূর্ণিমা ফাল্গুনে পড়িল, জোয়ারের ভরা অশ্রুর বেদনায় সমস্ত সমুদ্র ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল, সেদিন দামিনী' শ্রীবিলাসের 'পায়ের ধুলা লইয়া বলিল, সাধ মিটিল না— জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই।'

আপাতত এখানেই এক স্বতন্ত্র সুন্দর নারীজীবনের কয়েকটি বর্ষা বসন্তের দিনগণনা শেষ হইল। প্রথমে পিতৃগৃহে, পরে স্বামীপরিবারে, সাধুর মঠে, তাহার জীবন কাটিয়াছে। সে যে বিশেষ কেহ বা বিশেষ কিছু এ কথা জানিতে তার বহু বিলম্ব হইয়াছে— কেননা, মানুষ প্রথমতঃ গৃহে বা পরিবারে জন্মায়, সংসারের অতিক্ষুদ্র গণ্ডীতে থাকে ; সে যে বিশ্বপ্রকৃতির কোলে জন্মিয়াছে, সে যে মনুষ্য-প্রকৃতির চিরন্তন সত্যকে সকল বাহ্যিক-সংস্কার-মুক্ত হৃদয়ে ও বুদ্ধিতে জানিয়া বুঝিয়া তবেই সার্থক হইতে পারে, এ কথা কেহ তাহাকে বলে না। আপন জীবনের বেগে দামিনীর আপন স্বরূপ ক্রমে ক্রমে উদ্ঘাটিত হইয়াছে ; তাহাতে সুখ যেমন ছিল, দুঃখেরও সীমা ছিল না— তার রূপ বড়োই অপরূপ, অতুলনীয়। প্রথম পরিচয়ে বড়োই জানা, চেনা, বাস্তব এবং রাগদ্বেষে ও রক্তমাংসে-গঠিত নারী বলিয়া তাহাকে জানি ; সেই বাস্তবতা বা প্রত্যক্ষতা তার কোনো-দিনই ঘুচে না, অথচ ক্রমে দেখিতে পাই তাহাতে রহস্যের শেষ নাই— তেমনি সৌন্দর্যের, সত্যের। 'শেষের কবিতা'র অমিত

ঘড়ায়-তোলা জল আর দিঘির প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন, যে জলে রন্ধন-পান চলে আর যে জলে মন সাঁতার কাটিতে পারে— সেটা কতটা ভাবুক মনের কবিত্বকল্পনা আর কতটা সত্য ঠিক বলা যায় না। লাবণ্যের শেষের কবিতায় বরং দৃঢ়তর প্রত্যয় ও গভীরতর উপলব্ধির আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু ইহারা সকলেই অনেক-বই-পড়া আর অনেক-স্বপ্ন-কল্পনা-চারী নাগরিক নরনারী— ইহাদের কথা স্বতন্ত্র। দামিনীর পরিমিত জীবনের অনেকটাই যদিবা চাঁপাতলার গলিতে কিম্বা শ্যামপুকুর স্ট্রীটে কাটিয়া থাকে, সত্যই তাকে শহুরে মেয়ে বলা চলে না। সে মুখেও কিছু বলে নাই। মুখে বলিবার বিষয়ই নয়। তবু তারই জীবনে ঐ অপরূপ তত্ত্ব নিঃশব্দে অগোচরে সত্য হইয়াছে, সার্থক হইয়াছে। শচীশ ও শ্রীবিলাসকে লইয়া তার ক্ষুদ্র জীবনের পরার্ধ এবং অপরার্ধ— লৌকিক (তা বলিয়া কম রহস্যময় সুন্দর ও মধুর নয়) এবং অলৌকিক— একটি প্রায়-সম্পূর্ণ বৃত্ত অঙ্কিত করিয়াছে। বিশাল রবীন্দ্ররচনালোকে এমন নারীচরিত্র আর আমাদের চোখে পড়ে নাই।

জোড়াসাঁকো

৩০ নভেম্বর ১৯৬০

'শেষ কথা কে বলবে'। অন্তত শ্রীবিলাসের তরফ হইতে আরও কিছু বলিবার আছে।

দামিনীর মৃত্যুর পরে শ্রীবিলাস যে জরাজীর্ণ পুরাতন নীলকুঠিতে আশ্রয় নিল, যেখানে 'কোন্-এক মুসলমান গোমস্তার গোর, তার ফাটলে ফাটলে ঘন ঝোপ করিয়া ভাঁটিফুলের এবং আকন্দের গাছ উঠিয়াছে, একেবারে ফুলে-ভরা— বাসর-ঘরে শ্যালীর মতো মৃত্যুর কান মলিয়া দিয়া দক্ষিনা বাতাসে তারা হাসিয়া লুটোপুটি করিতেছে'— সেখানে নিভৃতে বসিয়া বসিয়া সে জীবনের প্রত্যক্ষবৎ সদ্যঅতীতের ধ্যানধারণা হইতে বুঝিল নিজে সে গৃহী ছিল না আর সন্ন্যাসও তাহার পক্ষে পরধর্ম। সে যাকে লাভ করিয়াছিল সে গৃহিণী ছিল না, গৃহলোপের সঙ্গে সঙ্গেই মায়া হইয়া গেল না। 'সে শেষ পর্যন্ত দামিনী।' মৃত্যুর পরেও শ্রীবিলাসের জীবনে বর্তমান। 'কার সাধ্য তাকে মায়া বলে?' অন্য লোকের ঘর ভাঙে, ঘরণী বিদায় লয়, বৈরাগ্যের উদয় হয়— কেননা, তাদের 'ওসব যে হাতে-গড়া জিনিষ, ঝাঁট পড়িলেই পরিষ্কার হইয়া যায়।'

শ্রীবিলাসের জীবনে দামিনী, দামিনী মাত্র। চিরপুরাতন, চির-নূতন নারী। কবি হইলে শ্রীবিলাস অবশ্যই বলিত— সরল গদ্যে বলিয়াছে বৈকি—

'তুমি-যে তুমিই ওগো,
সেই তব ঋণ
আমি মোর প্রেম দিয়ে
শুধি চিরদিন।'

জীবনের কবি

'মেশিন গানের সম্মুখে গাই
জুঁই ফুলের এই গান'

কবির কণ্ঠে অপ্রাণের ব্যূহবদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে প্রাণের এই যুদ্ধ-ঘোষণা। প্রাণের অনুরাগে কবি বহুপূর্বে বলেছেন—

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে…
ধরায় প্রাণের খেলা চিরতরঙ্গিত…

মরণ কাম্য নয়। স্বধর্মের সচ্ছ সুন্দর উপলব্ধিতে কবি জানেন—

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
অসংখ্যবন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানাবর্ণগন্ধময়। প্রদীপের মতো
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারই শিখায়
তোমার মন্দিরমাঝে। ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন সে নহে আমার।
যে-কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।

জীবনের সফলতাই কবিঅভীষ্ট— প্রকৃতির পরাজয়, প্রাণের বিনাশ বা বিলয়, আত্মার নির্বাণলাভ নয়। মর্ত বা মৃত্তিকা যে মৃত্যুরই উপায়ে ও উপকরণে নির্মিত সে তিনি জানেন, এই অসাড় বিরুদ্ধ

লোকে জীবজীবন 'প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্'। সেই প্রাণের সম্পূর্ণ পরিচয় এ লোকে নেই, নেই মন বা ইন্দ্রিয়ের গোচরে নিত্য-পরিবর্তন-রূপে, কম্পন-রূপে, কালের কবলিত ক্ষুদ্র প্রাণকে মনে হয় তাই মৃত্যুপরিণামী। যে পরমপ্রাণ থেকে এসেছে, অ-দৃষ্ট থেকে নিরন্তর প্রাণকে যে প্রেরণ করছে, তাকে মনে হয় 'মহদ্ ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্'। তাব ভয়েই অগ্নি এবং সূর্য তাপ দিচ্ছে, বায়ু এবং ইন্দ্র ধাবিত, এমনকি মৃত্যুও তার ভয়েই প্রাণকে অনুসরণ করছে এবং সংহরণ করছে শেষে। কিন্তু এটাই সব সত্য নয়। নিখিল প্রাণের হেতুভূত মহাপ্রাণকে জেনেছেন বা পেয়েছেন যোগী-ঋষি-অনুভবীগণ অমৃত ব'লে এবং মৃত্যুর অধিকারে থেকেই অমৃতও হয়েছেন। মিথ্যা নয়, মোহ নয়, কল্পনাপরবশ কবিত্ব নয়, পরম সত্যেরই উদ্‌ঘোষণ হয়েছে কবিকণ্ঠের এই বাণীতে—

মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত।

এই অমৃতধারাসিঞ্চনের শেষ নেই; দেশকালের সীমায় আর অসামগ্রিক খণ্ডিত দৃষ্টিতে যেমনই মনে হোক, মর্তপ্রাণও তাই মৃত্যুর দ্বারা অপরাজিত।[১]

অপরাজিত এবং অমৃত যে, এটাই পরম সত্য; অথচ লোভ আছে, মোহ আছে, কৃপণ কুৎসিত কামনা আছে, কাজেই বাস্তব ক্ষেত্রে পদে পদেই পরাজয় আছে—সেই তমোগ্রস্ত মোহময় পরাজয়কে পরাভূত করতে অ-প্রাণের বিশ্বব্যাপী ব্যূহবদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে একক প্রাণের নিরন্তর সংগ্রামশীলতারও প্রয়োজন আছে—সেই সংগ্রামই ঘোষণা করেছেন কবি বিস্ময়কর অথচ সহজ সুন্দর ঐ উক্তিতে, যখন বলেছেন—

মেশিন-গানের সম্মুখে গাই জুঁই ফুলের এই গান।

এমনি যুক্তিতর্কের অতীত অসীম সাহস থেকেই বলেছে নন্দিনী

জড়শক্তির পুঞ্জীভূত প্রবলতার বিগ্রহরূপী 'রাজা'র সামনে দাঁড়িয়ে, বলেছে অকম্পিত কণ্ঠে—

আমার অস্ত্র নেই, আমার অস্ত্র মৃত্যু।
মুহূর্তে মুহূর্তে আমার সেই মরা তোমাকে মারবে।

মনে রাখা দরকার— 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে' অথবা 'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়' কবির অপূর্ব ব্যক্তিসত্তার অভিব্যক্তি, আনন্দবেদনার উপলব্ধি ও তারই ধ্বনিময় ভাষা, এক কথায় বলতে গেলে রসাত্মক বাক্য বা কবিতা। কিন্তু মেশিন-গানের সম্মুখে দাঁড়িয়ে জুঁই ফুলের গান গাওয়া রসাত্মক ঘোষণা নয় শুধু, ক্রিয়াত্মক ভাব ও ভঙ্গী— সঙ্গীতেই তার পরিসীমা নয়, কবির ক্ষেত্রে নাট্যকল্পনায় তার স্বাভাবিক ও সংগত পরিণাম। অপ্রাণের বিরুদ্ধে প্রাণের এই অভিযান, অর্থাৎ তারই ধ্যান ধারণা, কবি-জীবনের পর্বে পর্বে তাই নানাভাবে নানা দিক থেকে রূপ পেয়েছে একাধিক ইঙ্গিতময় আর বস্তুতন্ত্র নাট্যকল্পনায়। রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' দৃশ্যকাব্যে এর সার্থক সূচনা আর 'রক্তকরবী' নাটকেই এর শেষ সীমা না হলেও চূড়ান্ত অভিব্যক্তি। এটিও আমরা সহজেই বুঝতে পারব যে, প্রকৃতির প্রতিশোধে যে সীমান্ত থেকে যুদ্ধঘোষণা করা হয়েছে, রক্তকরবীতে সে দিক থেকে নয়— বরং বলা যেতে পারে, একেবারে বিপরীত কোটিতে উঠে দাঁড়িয়ে বিদ্রোহের ধ্বজা ওড়ানো হয়েছে, বিপ্লবের প্রতীক তুলে ধরা হয়েছে পেলব সুগন্ধি সুন্দর করবীর ফুলে। জীবনের জয়বার্তা আর মর্তপ্রাণে অমৃতের উপলব্ধি, অমরতার অঙ্গীকার, নানাভাবেই ঝলক দিয়ে গেছে বা প্রকটিত হয়েছে আরও যে-সব নাট্যকল্পনায়, কাহিনীতে, তারও কি গণনা আছে? বিশেষভাবে উল্লেখ করতে পারি—

বাল্মীকিপ্রতিভা	মালিনী
বিসর্জন	অচলায়তন

চতুরঙ্গ	তাসের দেশ
ফাল্গুনী	এবং
মুক্তধারা	চণ্ডালিকা।

সবগুলি কিছু অবিকল একই তত্ত্ব কিম্বা একই ভাবনা বেদনা ঘিরে দানা বাঁধে নি— সবই আমাদের বিশেষ আলোচনার বিষয়ও হতে পারে না। যেগুলিতে মর্তপ্রাণের নিঃসীম মর্ম উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে, যেগুলিতে আছে বিশেষ ইঙ্গিত, বিশেষ ব্যঞ্জনা, আব তার পরেও বাঙ্‌ময় রূপের অপরূপতায় যেগুলি সার্থক নাট্যকল্পনারূপে স্বীকৃত, সেগুলিব সংখ্যা খুব বেশি হবে না। হয়তো, প্রকৃতির প্রতিশোধ, বিসর্জন, রক্তকরবী ও চণ্ডালিকা এই রচনা চতুষ্টয়ের আলোচনাতেই ক্রান্তদর্শী কবিব দেশনা এবং আমাদেবও বক্তব্য বা ধাবণা অনেকটা পরিস্ফুট হযে উঠবে।

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাট্যকাব্যে প্রৌঢ় পরিণত প্রতিভার স্বাক্ষর আছে এমন বলা যায় না, বয়সেও কবি নবীন— মাত্র তেইশটি নিদাঘ বর্ষা শরৎ অতিক্রম করেছেন। নাট্যবচনার উপযোগী কিছু-কিছু ভাবভঙ্গী ও বিচিত্র চরিত্রেব সমাহার হয়ে থাকলেও, বাস্তব-জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁর প্রচুব নয় বা মানবমনের অতলস্পর্শ গভীরতা অবধি প্রসাবিত নয়। তা হোক, কবির সারা জীবনের যে বক্তব্য, যে বাণী, তার একটি সামগ্রিক বোধ কবিচিত্তকে চকিত করে তুলেছে— সে দিক দিয়ে কোনো অস্পষ্টতা বা অসম্পূর্ণতা নেই। সেই মৌলিক বিচারে 'প্রকৃতিব প্রতিশোধ' নাটকের তাৎপর্য অপরিসীম আর সার্থকতাও কিছুমাত্র কম নয়। এ ব্যাপারে আশ্চর্য হবার কোনো কারণ নেই। মানুষের অন্তর্জীবনের যে মূলধন, সচরাচর তার সবটাই মানুষ অনতিক্রান্ত তরুণ বয়সেই পেয়ে যায়—

কৈশোরে বা যৌবনের উপক্রম-মাত্রে। সচেতন মানুষের ক্ষেত্রে জীবনবেদ, জীবনের বাণী, সারা জীবনের প্রেরণা, জীবনদেবতা বা অন্তর্দেবতা অন্তরে প্রেরণ করতে ভোলেন না অথবা দেরিও করেন না— অবশিষ্ট জীবনে সেই প্রেরণাকে কেবল প্রাণময় করে নিতে হয়, সেই বাণীকে নির্মাণ করতে হয় সাকার শরীরী রূপে, কবি ঋষি প্রেমী কর্মী যোদ্ধা বা যোগী যার যে উপায় ও উপকরণ তারই আশ্রয়ে।

মোট কথা, কাঁচা লেখা ব'লে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'কে উপেক্ষা করা চলে না। কবিও তা করেন নি। পরিণত বয়সে 'জীবনস্মৃতি'তে বলেছেন— সারা জীবনে 'আমার কাব্যরচনার এই একটিমাত্র পালা', 'সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলনসাধনের পালা' আর নাট্য-আকারে বস্তুতন্ত্রভাবে তারই মূল সুরটি ধরিয়ে দিয়েছে, তারই অভ্রান্ত ভূমিকা রচনা করেছে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'।—

'এক দিকে যত-সব পথের লোক, যত-সব গ্রামের নরনারী, তাহারা আপনাদের ঘর-গড়া প্রাত্যহিক তুচ্ছতার মধ্যে অচেতনভাবে দিন কাটাইয়া দিতেছে; আর-এক দিকে সন্ন্যাসী, সে আপনার ঘর-গড়া [মন-গড়া] এক অসীমের মধ্যে কোনোমতে আপনাকে ও সমস্ত-কিছুকে বিলুপ্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রেমের সেতুতে যখন এই দুই পক্ষের ভেদ ঘুচিল, গৃহীর সঙ্গে সন্ন্যাসীর যখন মিলন ঘটিল, তখন সীমায় অসীমে মিলিত হইয়া সীমার মিথ্যা তুচ্ছতা ও অসীমের মিথ্যা শূন্যতা দূর হইয়া গেল।'

অবশ্য, সীমা ও অসীমের মিলনের ব্যাপারটি এই নাটকে সামগ্রিক রূপ পেয়েছে এমন বলা যায় না, সেই দিকেই ইঙ্গিত প্রসারিত করে এই জীবনরঙ্গমঞ্চে যবনিকা টেনে দেওয়া হয়েছে। কী জানি হয়তো পরেও আমরা দেখতে পাব— বাস্তবজীবনের রূপায়ণে অরূপ অনির্বচনীয়ের উদ্দেশে অঙ্গুলিনির্দেশ করাই শুধু যায়; তার

বেশি এ দেশে বা অন্য দেশে, এ যুগে বা অন্য কোনো যুগে সম্ভবপর হয় নি। সে যা হোক, জীবনজীবনান্তরের ঘাতপ্রতিঘাতে, বিচিত্র ঘটনার প্রবাহে, এই ইঙ্গিতও কী ভাবে ক্রমশ ফুটেছে এই নাটকে সেটিও পর্যালোচনা করা দরকার।

যে শূন্যবাদ সদ্ধর্মের অন্যতম পরিণতি বা যে মায়াবাদের প্রবক্তা ও প্রবর্তক -রূপে মনীষীশ্রেষ্ঠ শঙ্করের সত্য বা অমূলক খ্যাতি, তার যুক্তিযুক্ততা বা অযুক্তি -প্রদর্শন আমাদের সাধারণবুদ্ধিতে সম্ভবপর নয় এ কথা ঠিক। যেহেতু তার পণ্ডিতজনসম্মত পরিভাষাতেও আমাদের কিছুমাত্র ব্যুৎপত্তি আছে এমন বলতে পারি নে। অথচ মূল বক্তব্য এই শুনেছি— ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা। ব্রহ্ম যদি কেবলই নিরাকার নির্বিশেষ নির্‌গুণ হন আর তাঁর মধ্যে বিলয়ই যদি জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য হয় তা হলে তাঁকে পূর্ণ না ব'লে, শূন্য বলাই শুধু ন্যায়সংগত। সে ক্ষেত্রে মায়াবাদে ও শূন্যবাদে আসলে কোনো ভেদ থাকে কি? নিশ্চিত জবাব আমাদের জানা নেই। এ কথা সত্য যে, বহু শতাব্দ ধ'রে আমাদের এই মহনীয় 'কর্মভূমি'-আখ্যায় আখ্যাত পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে— একান্ত নৈষ্কর্ম্য বা সন্ন্যাস, জীবনপরিহার, ব্যক্তিত্বের বিলয় বা বিনাশ, এক কথায় নির্‌গুণ ব্রহ্মে মুক্তি বা মোক্ষ, এইটেই এ দেশের নরোত্তমগণের শ্রেষ্ঠ জীবনাদর্শ-রূপে প্রশংসিত হয়ে এসেছে। জীবনের অন্য আদর্শ ছিল না বা নেই এমন নয়, কিন্তু স্বভাবতই মোহবদ্ধ সাধারণ জীবের চক্ষেও মোহমুক্তির ঐ দুশ্চর দুরধিগম্য পথই সর্বোত্তম ব'লে মনে হয়েছে। অতিদুঃসাধ্য ব'লেই অতিশয় শ্রেষ্ঠ। সাধারণ মানুষ সে পথে যায় নি বা যেতে পারে নি। সেই অক্ষমতা, জীবনের সর্ব সুখ আর সব সাধনাকে দিনে দিনে মুহূর্তে মুহূর্তে নিঃশব্দ ধিক্কারে লজ্জিত, সংকুচিত, অসার্থক করে নি কি? সংকল্পে সাধনায় ও চারিত্রশক্তিতে সমাজের শ্রেষ্ঠ যারা, 'শূকরীবিষ্ঠা'-জ্ঞানে বিষয় ত্যাগ ক'রে, সংসার

ত্যাগ ক'রে, ঐ আদর্শের আহ্বানে গেরুয়াবসন অঙ্গে তুলে নিয়েছে আর ভস্মীভূত মায়ামমতা ও মানবসম্পর্কের মুঠো-মুঠো ছাই প্রধূমিত ধুনী থেকে তুলে নিয়ে নগ্নদেহের ভূষণ করেছে।

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।...

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাং কর্মচেদহম্

কুরুক্ষেত্রআহবে উদ্‌ঘোষিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই বাণী তাঁরা কানেও তোলেন নি, অর্থও বোঝেন নি— সংগ্রামের থেকে বীবত্ব সংগ্রাম-ত্যাগে ও পলায়নে, শত্রু-মিত্র আমি-তুমি দেহ-মন শুভাশুভ সবই যখন মায়া বা মিথ্যা। সুস্থ স্বাভাবিক সাধারণ যে-মানুষেব কাছে কিছুই স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, মিথ্যা নয়, সেও হয়তো এই নিঃসম্পর্ক নিবাধাব 'সত্যে'ব নিশ্চল বিগ্রহের পাষাণপদতলে দিনান্তে একবাব মাথা ঠুকে আসে, দুটো ধূপদীপ জ্বেলে দিয়ে আত্মধিক্কারের থেকে রেহাই চায়। এইভাবে মানবজীবনের সাধ্যে ও সাধনায়, আচাব-আচরণে ও ভাবনায়, একটা অনাবশ্যক বিবোধেব উদ্‌ভব হয় ও নানা দিকেই নানা নিষ্ফলতাব জঞ্জাল জমে ওঠে।

জীবনের মধ্যে জীবনঅস্বীকারেব এই-যে অনর্থ বিড়ম্বনা, এই-যে শূন্য পবিণাম, তারই স্বরূপ-উদ্‌ঘাটন, তাবই অলীকতা-প্রতিপাদন কবিব উদ্দেশ্য ছিল।

অতি স্থূল ক্ষুৎপিপাসা ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তিব আবেগে চালিত জীবন কত তুচ্ছ, কত অনাবশ্যক আর কত অন্তঃসারশূন্য সন্ন্যাসী সে কথা উপলব্ধি করেছে, আপন অন্তর থেকে স্নেহ প্রেম দয়া মায়া উন্মূলিত ক'রে। রাক্ষসী প্রকৃতি কত ছলনায় না ছলেছে, 'বাসনার বহ্নিময় কষাঘাতে' কত বিপথেই না ছুটিয়েছে! অবশেষে নিরাহারে প্রেম মরেছে প্রাণের মধ্যে, মোহাবেশমুক্ত হয়েছে দৃষ্টি, আজ তাই সন্ন্যাসীব সাধ— মায়ানটী প্রকৃতির রঙ্গভূমে মোহমুক্তি-রূপ প্রতিশোধের গান গেয়ে গেয়ে বেড়াবে সে যত্রতত্র, মোহবদ্ধ জীবকে দেবে বন্ধনচ্ছেদনের

মন্ত্রণা এবং চিরমায়াবিনীর মায়াকে করবে পরাভূত, পদানত। হায় হায়, সন্ন্যাসীর মনে আত্মপ্রতিষ্ঠার এই কামনাটুকু, এই মারবিজয়ের অহমিকাটি, এই-যে মায়াবিনীর সবশেষ আর সব থেকে সাংঘাতিক মায়া সে কথা কেউ তাকে বলে দেয় নি কি?

রামপ্রসাদের গান মনে পড়ে— রামপ্রসাদ অবশ্য ভক্ত ছিলেন, মুক্তি বা মোক্ষ -কামী ছিলেন না— ভবের বাজারে শ্যামা মা ঘুড়ি ওড়াচ্ছেন—

ঘুড়ি লক্ষের দুটো-একটা কাটে ;
হেসে দাও, মা, হাত-চাপড়ি।

অলক্ষ্য সুতোয় বেঁধে ঘুড়ি ওড়ানোই যাঁর বিলাস, সুতো ছিঁড়ে শূন্যে বিলীন হলেও যাঁর পরম কৌতুক, তাঁর সেই বিচিত্র লীলা বুঝবে কে? সে কি মায়া না মহামায়া— চৈতন্যস্বরূপিণী? এ কি সাধ না সাধনাই? রূপে ও অরূপে কোথায় তার রাজত্বের সীমানা? আমরা তো জানি নে, আর বৈরাগ্যাভিমানী সন্ন্যাসীও কিছুই বোঝে নি। মায়ামোহ-পরিহারের কল্পনাই তার মোহ হয়ে রয়েছে, নির্‌দ্বন্দ্ব হয় নি অন্তর, অন্তর থেকে এমন অকম্পিত স্বর ওঠে নি ঊর্ধ্বে—

These clamours still ;
for I would hear the eternal voice
and know
the eternal Will.
This brilliant show
cumbering the threshold of eternity
dispel ···

শান্ত হোক সর্ব কোলাহল—

অনন্তের বাণী যেন শুনি
শাশ্বত আহ্বান।
অনন্তের-দ্বার-রোধী
শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধের জঞ্জাল
ইন্দ্রজাল
দূর হয়ে যাক।[২]

ফলতঃ নির্মমকঠোর বৈরাগ্য বা তীব্র মুক্তিপিপাসা, ঋজুলক্ষ সন্ন্যাস— শত শত বৎসরে যে আদর্শ বা যে সাধনার একান্ত অসদ্ভাব এ দেশে কোনো দিনই হয় নি— তারই নিটোল বিগ্রহরূপে রবীন্দ্রনাথ এই সন্ন্যাসীকে কল্পনা করেন নি। আপনার মধ্যেই তার বিরোধ আছে, কেননা আছে আর-এক জন। এবং এই বিরোধের, এই দ্বন্দ্বের ফাঁক দিয়েই প্রকৃতি কাজ করেছে, স্নেহের কাঙালিনী অনাথা বালিকা এসে আশ্রয় চেয়েছে, এবং কালের উচ্চাবচ পথে ঘটনার প্রবাহে এই নাট্যকাব্য এগিয়ে গিয়েছে তার করুণ বা অকরুণ পরিণামে।

ঝঞ্ঝার আঘাতে পথধুলায় পতিত সুন্দর ফুল আর নীড়ভ্রষ্ট ছিন্ন-পক্ষ ক্ষুদ্র বিহঙ্গম কার মনে না করুণা জাগায়, প্রাণে সমবেদনা? তেমনি তো পিতৃমাতৃহারা, অস্পৃশ্যঅপবাদে সর্বজনপরিত্যক্তা, অকলঙ্ক নির্দোষ বালিকা— তারই সিক্তপক্ষ্ম দুটি চোখের করুণ দৃষ্টিতে নির্মম বৈরাগীব অন্তরে মমতার অঙ্কুর জেগে ওঠে অসতর্ক মুহূর্তে। সামাজিক আচার বিচারের বহির্গত তার কাছে স্পৃশ্য বা অস্পৃশ্য কেউ নয়— একান্ত অসহায় যে আশ্রয় চায়, আশ্বাস চায় প্রাণান্তরসান্নিধ্যে, সে আশ্রয় আর সেই আশ্বাসটুকু দিতে বাধা কোথায়? নিখিল আশা আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়েছে যে, তার পাশে এলেও তার হৃদয়ে স্থান পাবে কে— কে জড়াতে পারবে অলক্ষ্য মায়াজাল? অথচ প্রাণের ধর্ম এই— অন্য প্রাণে জড়িয়ে যাওয়া, মিলতে চাওয়া, মিশতে চাওয়া— এতটুকু প্রশ্রয়ের ছিদ্রপথে দুর্বার

তার গতি। সন্ন্যাসীর বৈরাগ্যউপদেশ ক্ষুদ্র বালিকার ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য আর স্বাভাবিক বোধেরও বিরুদ্ধ। মমতায় ও নির্মমতায়, অন্তরে ও বাহিরে, নিদারুণ দ্বন্দ্ব বাধে সন্ন্যাসীর। বালিকার বড়ো সোহাগের ফুলটি ছিঁড়ে ফেলে, ছুটে এসে লতাটি ছিন্ন করে— তুচ্ছ কারণে এই উগ্রতা, এতটা ক্ষোভ, তার মূলে রয়েছে নিজের মনেরই মধ্যে মমতার সঙ্গে নির্মমতার নিরন্তর নিষ্ঠুর সংগ্রাম। পরাভবভীরু সন্ন্যাসী পালিয়ে বাঁচে নির্জনে, গিরিগুহায়, অরণ্যে। পালাবে কোথা? প্রাণের ভিতরে শোনে স্নেহকাঙাল অবোধ বালিকার কান্না। আবার ফিরে আসে, আবার ছুটে পালায়। সজনে বিজনে, প্রান্তরে পথে-ঘাটে, দেবদ্বারে ও লোকালয়ে, সুখদুঃখময় দৈনন্দিন জীবযাত্রা ও তুচ্ছ লোকাচার, তারই পটভূমে এই একটি নিষ্করুণ দ্বন্দ্ব— এই নাটক, তার পাত্র দুটি— সংসারত্যাগী এক সন্ন্যাসী আর সংসার-পরিত্যক্তা এক অনাথ বালিকা। অবশেষে হার মানতে হল সন্ন্যাসীকে, বলতেই হল—

যাক্, রসাতলে যাক্ সন্ন্যাসীর ব্রত!
হে বিশ্ব, হে মহাতরী, চলেছ কোথায়—
আমারে তুলিয়া লও তোমার আশ্রয়ে।

যেমনি এ কথা বলা, চারি দিকে চেয়ে অমনি মনে হল—

আজি এ জগৎ হেরি কী আনন্দময়!
সবাই আমারে যেন দেখিতে আসিছে!
নদী তরুলতা পাখি হাসিছে প্রভাতে!

চিরদিনের মতো 'গুহা' ছেড়ে, নিজের ভিতর থেকে নিজে বেরিয়ে এসে, সমস্ত সংসারের জীবযাত্রাকল্লোলিত পথের প্রবাহে যোগ দিল সন্ন্যাসী। হৃদয়যন্ত্রের নূতন-বাঁধা তারে এই একই সুর শুধু বেজে চলল—

জগতের মুখে আজি একি হাস্য হেরি !
আনন্দতরঙ্গ নাচে চন্দ্র সূর্য ঘেরি।
আনন্দহিল্লোল কাঁপে লতায় পাতায়,
আনন্দ উচ্ছ্বসি উঠে পাখির গলায়,
আনন্দ ফুটিয়া পড়ে কুসুমে কুসুমে।

শূন্যের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে, প্রীতির অমৃতসলিলে দু-চোখ ধুয়ে— এখন বলাও যায়— সীমার মধ্যেই চকিতে চকিতে অসীমের দরশ পরশ পেল সন্ন্যাসী। কিন্তু, হায়, বালিকাকে তবু আর ফিরে পেল না।—

নয়নআনন্দ মোর, হৃদয়ের ধন,
স্নেহের প্রতিমা ওগো, মা, আমি এসেছি—
ধুলায় পড়িয়া কেন ! ওঠো মা, ওঠো মা—
পাষাণেতে মুখখানি রেখেছিস কেন ?

শত আহ্বানে আর সে সাড়া দিল না ; আর সে বুকে মুখ রেখে হাসল না, কাঁদল না। শূন্যের দিক থেকে পূর্ণের অভিমুখে, জগদ্‌ব্যাপী আনন্দ ও চেতনার অন্তর্লোকে, হাতে ধরে ফিরিয়ে এনেছে সন্ন্যাসীকে ক্ষুদ্র ঐ বালিকা— তখনই চলে গেছে। এই তো প্রকৃতির প্রতিশোধ। প্রতিশোধ হয়তো নয়। জগদ্‌ব্যাপ্ত 'হাঁ' ও জীবনব্যাপী আনন্দে যে-কোনো ছলে পৌঁছে দিয়ে 'না'-মন্ত্রের সাধক ঐ সন্ন্যাসীকে, প্রকৃতির অনাদিকালের উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয়েছে। প্রকৃতির স্বহস্তে গঠিত আনন্দ ও প্রীতির একটি প্রতিমা রইল কি গেল, তাতে কিছু ইতর বিশেষ হল কি ? সন্ন্যাসীর গেরুয়াবাস চিরতরে ঘুচে গেল, অথচ সংসারের অন্য পাঁচ জনের মতো জড়জীবনের স্রোতে, অসাড় অচেতন দিনযাত্রার পথে, গতি হল না তার এ কথা নিশ্চিত। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে সন্ন্যাসীর নবজন্ম হল নূতন চেতনায়, পরিপূর্ণ সত্যে।

হয়তো নিরাকারা প্রকৃতি এসেছিল বালিকার আকারে। বাল্মীকিপ্রতিভায় দেখেছি পাষাণহৃদয় রত্নাকরের হৃদয় গলাতে এমনি বালিকামূর্তিতে এসেছিল বীণাপাণি বাণী।

প্রাণকে স্বীকার, মৃত্যুভীত প্রাণ ব'লে নয়— জীবনঅঙ্গীকার, মর্তজীবন ব'লে নয়— অসীমেরই সীমা ব'লে, অমৃতেরই আধার ও আকার ব'লে। বৈরাগ্যসাধনের অস্বাভাবিক ছন্মচেষ্টা নয়— শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধের আহৃত সুধা ইন্দ্রিয়ের পঞ্চপাত্রে ভ'রে পরম-দেবতাকে নিত্য নিবেদন ক'রে তাঁরই প্রসাদ-রূপে নিরন্তর ভোগ করা। এই অপূর্ব তত্ত্বেরই ব্যঞ্জনাপূর্ণ প্রথম অভিব্যক্তি হল 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাট্যকাব্যে। কবি মিথ্যা বলেন নি— আসলে তাঁর চিরজীবনের এই একটি পালা-গান। সাজ বদ্‌লে দিয়ে, নূতন পাত্র-পাত্রীও যোগ ক'রে— নূতন ঘটনা, বারে বারে এটি তিনি উপস্থিত করেছেন আমাদের সামনে। কলাকৌশল ভাষাভঙ্গীর নব নব বিবর্তন যতই হোক চমৎকার থেকে নূতনতর চমৎকার উৎপাদন ক'রে, মৌলিক ভাবসত্যের বিশেষ বদল হয় নি।

৩

'স্বপ্ন দেখিলাম, কোন্‌-এক মন্দিরেব সিঁড়ির উপর বলির রক্তচিহ্ন দেখিয়া একটি বালিকা অত্যন্ত করুণ ব্যাকুলতার সঙ্গে তাহার বাপকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, বাবা! একি! এ যে রক্ত! বালিকার এই কাতরতায় তাহার বাপ অন্তরে ব্যথিত হইয়া অথচ বাহিরে রাগের ভাণ করিয়া কোনোমতে তার প্রশ্নটাকে চাপা দিতে চেষ্টা করিতেছে'— আমরা জানি ত্রিপুররাজ গোবিন্দমাণিক্যের জীবন-কাহিনীর পটভূমিতে এই স্বপ্নই 'রাজর্ষি' উপন্যাসে পরিণত হয় এবং 'রাজর্ষি'র রূপান্তরে 'বিসর্জন' নাটকের সৃষ্টি। নামেতেই প্রকাশ— রাজর্ষির প্রধান চরিত্র গোবিন্দমাণিক্য আর বিসর্জনের মুখ্যঘটনা

জয়সিংহের আত্মত্যাগ— গোবিন্দমাণিক্য ও রঘুপতি, প্রেম ও হিংসা, প্রাণ ও প্রথা, এদেরই ঘাতপ্রতিঘাতে সেই নিদারুণ পরিণামের দিকে সমুদয় ঘটনাধারার বিবর্তন। রাজর্ষির উপক্রমেই ছিল বালিকা 'হাসি'র মৃত্যু— স্নেহের, প্রেমের, প্রাণের এ সংসারে অপ্রেম বা হিংসার হত্যাউন্মাদনার রক্তচক্ষু দেখে ভীতি ও করুণা; পরে সুদীর্ঘ কাহিনীতে রাজা ও রঘুপতি এই দুই বিরুদ্ধ চরিত্রের নানা সংঘাতের বিলম্বিত লয়ের বিবরণ; সবশেষে মঙ্গলময় পরিণতি। কিন্তু নাটক, বিশেষতঃ ট্র্যাজেডি, এ ভাবে দানা বাঁধতে পারে না, তার যা-কিছু বক্তব্য সেটি অব্যর্থভাবে উপস্থিত করতে পারে না, আর অনিবার্য পরিণামে অতিদ্রুত উত্তীর্ণ হওয়াও অসম্ভব হয়ে পড়ে। দুই কূলের সংকীর্ণ বাঁধনে ছুটে চলে নদী। বিশাল সরোবরে ঊর্মিশিহরণ থাকতেও পারে; কিন্তু তরঙ্গিত কল্লোলিত বেগ, অব্যর্থ প্রগতি, কোথাও ফেনিল-আবর্তসংকুল কোথাও গর্জিত-পাষাণপ্রহত, সে থাকে নদনদীর। আখ্যায়িকায় আর নাটকেও সেই পার্থক্য। সেই প্রভেদ রাজর্ষিতে ও বিসর্জনে। বিসর্জন নাটকখানি বহুবার বহুভাবে সংস্কার করেছেন কবি; বর্তমানে যে রূপে প্রচলিত সেটিকেই আমাদের আলোচনার আধারস্বরূপে গণ্য করা যেতে পারে।—

'এই নাটকে বরাবর দুটি ভাবের মধ্যে বিরোধ বেধেছে— প্রেম আর প্রতাপ।... নাটকের প্রথম অঙ্কে দেখা দিলেন রানী গুণবতী। তাঁর সন্তান হয় নি ব'লে সন্তান লাভ করবার আকাঙ্ক্ষা দেবীকে জানাতে এসেছেন। তিনি দেবীকে বললেন: আমাকে দয়া করে সন্তান দাও। আমার সব আছে, দাসদাসী প্রজা কিছুর অভাব নেই— কিন্তু আমার তপ্তবক্ষে, আমার প্রাণের মধ্যে, আর-একটি প্রাণকে অনুভব করবার ইচ্ছা হয়েছে।... এক দিকে রানী মানত করছেন যে বিশ্বমাতার কাছে ছাগশিশু বলি দেবেন ['বর্ষে

বর্ষে দিব তাঁরে এক শো মহিষ তিন-শত ছাগ'] অন্য দিকে তিনি ·· একটুকু প্রাণের কণার জন্য হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত ভালোবাসাটুকু ভোগ করতে চান।'— চিরান্ধ সংস্কারের প্রভাবে রাজরানী গুণবতীর চরিত্রে রয়েছে এই মূলগত বিরোধ, এই আত্মখণ্ডন— নাটকের অন্তিম দৃশ্যেও তাঁর নিজের ভিতরে তার সম্পূর্ণ নিরসন হল কি না বোঝা যায় না — আর, নাটকের অন্যান্য চরিত্রের ঘাতপ্রতিঘাতে মানুষের মনের ও জীবনের সেই মৌলিক দ্বন্দ্বই অতিশয় স্পষ্টভাবে প্রকটিত, অত্যন্ত নিশ্চিত নিষ্ঠুর অথচ সুসংগত পরিণাম -অভিমুখে ধাবিত।

নবযুগের নবভাবের প্রবক্তা কবি রবীন্দ্রনাথের জীবনবাণী 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকে যে ভাবে যে ভূমিতে উদ্‌ঘাটিত, 'বিসর্জন' নাটকে সে ভাবে বা সে ভূমিতে নয়। সেখানে ছিল সন্ন্যাস ও সংসারের বিরোধ, স্নেহে প্রেমে তার সার্থক সমাধান। সমুদয় নাটকে তার পরিকীর্ণ ব্যঞ্জনা ও নাট্যশেষে তার সার্থক ইঙ্গিত। এ ক্ষেত্রে নিখিল সংসারযাত্রা, মানবজীবনের আশআকাঙ্ক্ষা সুখদুঃখ, সে-সব কেউ অস্বীকার করে নি, 'না' করে নি সত্য— দ্বন্দ্ব বেধেছে প্রভুত্ব নিয়ে। জীবনে কে রাজত্ব করবে— প্রেম অথবা হিংসা, প্রেম অথবা প্রথাসহায় প্রতাপের দম্ভ ও বাসনা, প্রাণ অথবা নানা নামে নামান্তরে যেটি প্রাণঘাতী প্রবৃত্তি। একই সেই সৃজন-প্রলয়ের দ্বন্দ্ব, প্রাণ ও অপ্রাণের, হাঁ এবং না'এর। স্নেহে প্রেমে করুণাতেই সব সমাধান আর মূর্তিমতী হল তা একটি ভিখারিণী বালিকাতে, 'অপর্ণা'তে।

প্রকৃতির প্রতিশোধের সন্ন্যাসীর অন্তর্দ্বন্দ্বময় চরিত্র বা 'split personality' বিসর্জনে বিশ্লিষ্ট হল এক দিকে রঘুপতি আর অন্য দিকে গোবিন্দমাণিক্য-জয়সিংহে। রঘুর দুহিতা বা সমান সুকুমারী হাসি, তাতার অতিক্ষুদ্র দিদি, নবজন্ম নিল পরিণতবুদ্ধি বালিকা-রূপে— কিশোরী অপর্ণা-রূপে। এই নাটকে বৃদ্ধ অন্ধ পিতার এই

কিশোরী কন্যা স্বভাবতই চক্ষুষ্মতী, স্বচ্ছ তার দৃষ্টি অন্তরের জ্যোতি বিকিরণ ক'রে পথে পথে— প্রাণময় স্নেহময় প্রেমময় তার প্রকৃতি হৃদয়ভিক্ষা করে দ্বারে দ্বারে। এক ভাবে বলা যায় নিদারুণ ঘাত-প্রতিঘাত-ময় এই নাট্যলোকে এই অবলা বালাই সব থেকে সক্রিয়, সব চেয়ে বৈপ্লবিক তার ভূমিকা। তার কোনো প্রথাগত সংস্কার নেই, করুণোজ্জ্বল নেত্রতারায় নেই মনোময় কোনো মিথ্যার কোনো কুহেলীআবরণ। বিশ্বপ্রকৃতির বা প্রাণপ্রকৃতির আদিম সত্যে সে স্থিত— স্ব-ভাব-সমুত্থ প্রেরণায় সে সচল। সেই সক্রিয়তম। কেননা, এ কথা তো মিথ্যা নয় যে, যা-কিছু ঘটছে প্রায় সবেরই মূলে আছে এই বালিকা। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকেও যেমন ছিল রঘুর দুহিতা। পাষাণ ভেদ ক'রে যে তৃণাঙ্কুর ওঠে, শীতের তুষার কুহেলী ও জাড্য উপেক্ষা ক'রে প্রথম যে ফুল ফোটে, তাদের যে অপরিসীম সাহস ও শক্তি— মানুষের সমাজে, মানুষের সংসারে আদিপ্রাণসম্ভূত এরও তেমনি। সাংখ্য বা বেদান্তে প্রকৃতিকেই একমাত্র সৃষ্টিস্থিতিবিধায়িনী ক্রিয়ারূপিণী বলা হয় যে, সে তো মিথ্যা নয়। যা হোক, সমুদয় ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বাত্মক আঘাত বিশেষ ভাবে এসে পড়ছে জয়সিংহের চরিত্রে বা জীবনে। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন এই ক্ষত্রিয়সন্তান পারিবারিক স্নেহপ্রীতির পরিবেশে মানুষ হয় নি, পাষাণমন্দিরে পাষাণরূপিণী দেবীপ্রতিমার পদতলে দেশাচার-লোকাচার-রূপ পাষাণপ্রথাব বেষ্টনে বর্ধিত হয়েছে রঘুপতির শিক্ষায় দীক্ষায় ও স্নেহে; রঘুপতিব অন্তরে সেই স্নেহ যদিও অকৃত্রিম— শক্তির উপাসনা, শ্রেষ্ঠতার অভিমান, সমাজশাস্তৃত্বের অহমিকা, বদ্ধমূল বহুবিধ সংস্কার, এ-সবের প্রবলতায় কতটুকু তার সহজ স্বাভাবিক স্ফূর্তি হয়েছে? প্রাণে প্রাণে মমতার বন্ধন, স্নেহপ্রীতির আকর্ষণ, তাকে অনেকটাই আবরণ করে রেখেছে নানা বিরুদ্ধ প্রবৃত্তির প্রবলতা, নানা অভ্যস্ত প্রথার অনুবর্তন।

এই পরিবেশে, স্নেহের-পুতলি-ক্ষুদ্রছাগশিশু-হারা অপর্ণার প্রাণের ব্যথা ও ব্যাকুলতা, চোখের জল আর কান্না, প্রাণহীন প্রথার নামে প্রাণহননে তীব্র ভর্ৎসনাবাক্য ও অভিমান, তারই সংঘাতে— অকৃত্রিম মানবহৃদয়ের সঙ্গে প্রথম প্রবল ও প্রত্যক্ষ পরিচয়ে— জয়সিংহ বলে উঠেছে,—

তোমার মন্দিরে এ কী নূতন সংগীত
ধ্বনিয়া উঠিল আজি, হে গিরিনন্দিনী,
করুণাকাতর কণ্ঠস্বরে!

পাষাণমন্দিরের চতুঃসীমা ছেড়ে, শক্তির উপাসনা ও প্রথার অনুবর্তন ছেড়ে, প্রেমময় প্রাণলোকে বেরিয়ে আসতে স্পষ্ট বাক্যে আর বিনা বাক্যেও সঙ্গে সঙ্গেই ডাক দিয়েছে অপর্ণা। সে ডাকের অর্থ তো বোঝা যায় না—

কোথা যাব এ মন্দির ছেড়ে?
কোথায় আশ্রয় আছে?

অলক্ষ্য 'দৈববাণী'তে তারই উত্তর এসেছে—

যেথা আছে প্রেম।

বলা যেতে পারে, বিসর্জন নাট্যের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের সূচনায় গণনাতীত প্রাণহননের বিনিময়ে বক্ষোলগ্ন এতটুকু প্রাণ-পুত্তলীর জন্য গুণবতীর যে কামনা, আবাল্যের সংস্কারে বিমোহিত না থাকলে, সেটি সহজেই আমাদের অদ্ভুত আত্মখণ্ডন ব'লে মনে হতে পারত, হতবুদ্ধি করে দিত। কিশোরী অপর্ণা এসে আমাদের চোখ খুলে দিল, আমাদের চেতনা দিয়ে গেল। নিষ্ঠুর বাধায় প্রহত, হয়তো বিচূর্ণিত, তবু তো মৃত্যুর অতীত, সর্বজীবের এই জীবননাট্যের নিহিত তাৎপর্যটি কী আমরা পরিষ্কারভাবে দেখলেম ও হৃদয়ে অনুভব করলেম। এই নাটকের মূল সুরটি আমরা শুনতে পেলেম আর মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যও তা অনুভব করলেন।

তার পর, বদ্ধমূল অন্ধসংস্কার ও চেতনা, শক্তিউপাসনা ও প্রাণের প্রেমের প্রেরণা, ব্রহ্মণ্যঅভিমানী রঘুপতি ও উদারহৃদয় রাজা, উভয়ের সংঘাতে প্রতিঘাতে এই নাটকের ঘটনাবলী উত্তরোত্তর দ্রুতবেগে আবর্তিত হয়ে চলেছে এবং সেই আবর্তে সেই তূর্ণগতি প্রবাহে দুটি তরুশাখাবিচ্ছিন্ন ফুলের মতো পাশাপাশি ভেসেছে, পরস্পরকে বারম্বার ছুঁয়ে গেছে আর নির্মম নিষ্করুণ নিয়তি -অভিমুখে ছুটে চলে গেছে জয়সিংহ ও অপর্ণা।

যে দুটি বস্তুর দ্বন্দ্ব নিয়ে এই পঞ্চাঙ্ক ট্র্যাজেডির গতি ও পরিণতি, দুটি কথায় কবি তা নির্দেশ করেছেন— প্রেম ও প্রতাপ। প্রীতি ও শক্তি। অর্থাৎ, একটিতে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়াব প্রেরণা; অন্যটিতে সমস্তই নিজের দিকে টানবার, নিখিল বিশ্বে নিজের অহম্‌কেই সর্বগ্রাসী ক'রে বড়ো ক'রে তোলবার উগ্র কামনা। যে বিশ্বতোমুখ প্রেরণায় মন বুদ্ধি চিত্ত উদার আলোকিত জগতে আলোকের মতোই প্রসারিত হতে চায় আর যে মোহান্ধ কামনার শেষ লক্ষ্য নিজের দিকেই, নিজের 'মহত্ত্ব' ও 'বৃহত্ত্ব', নিজের অহম্। একটিতে প্রসার, অন্যটিতে সংকোচ— পরিণামে হয়তো বিস্ফোরণ। প্রকারান্তবে একেই আমরা বলেছি স্ফূর্তিশীল প্রাণ ও বৈনাশিক অপ্রাণের দ্বন্দ্ব।

অবশ্য, মানুষের সংসারে নরনারীর চবিত্রে এর কোনো একটাই অমিশ্র বিশুদ্ধ স্বরূপে একান্ত হয়ে দেখা দেয় না বা কাজ করে না। কোন্ প্রবৃত্তির পদে মানুষ বিশেষ করে পূজা দিচ্ছে তার থেকেই আমরা ধারণা করতে পারি কোন্ পরিণামে সে মানুষকে নিয়ে চলেছে। বিশ্বে যে মহামায়ার লীলা তাঁকে মহাকালবক্ষোবিলাসিনী সংহাররূপিণী শক্তিরূপেই রঘুপতি পূজা করে এসেছেন। অবশ্য, তিনি ভক্তকে পালন করেন, রক্ষা করেন, বরাভয় দেন, এ মোহটুকু আছে। ভক্তকে তিনি শাস্তা প্রভু ও শক্তিমান করেন। চিরাচরিত রীতির আবেষ্টনে, সংস্কারের আশ্রয়ে, পূজাপদ্ধতির অনুষ্ঠানে, এই শক্তি-

উপাসনার কোনো ব্যাঘাত যতদিন হয় নি, এর সংহারমূর্তিও ততদিন দেখা যায় নি। শুদ্ধ সংযত আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের বহিরাবরণ ভেদ ক'রে উগ্র অহমের আসুরিক রূপও দেখা দেয় নি। বৈনাশিক প্রবৃত্তির বলিরূপে যূপকাষ্ঠে নিবেদিত হয়েছে নিত্যনৈমিত্তিক পূজায় দিনে-দিনে বৎসরে-বৎসরে কেবল অবোলা পশু, অসংখ্য ছাগ মহিষ। (শক্তিসাধনার আরও নিগূঢ় আরও রুদ্রভয়ংকর আগ্রহে নরবলিরও হয়তো বাধা ছিল না।) সমাজের সকলের সভয় সম্ভ্রমের ও শ্রদ্ধার পাত্ররূপে দেবীর পাদপীঠে সমুচ্চ আসনে ছিলেন রঘুপতি ; শ্রেষ্ঠী বা নরপতির থেকে ছিল তাঁর নিষ্কিঞ্চনতার মহিমা। জয়সিংহের প্রতি ছিল তাঁর অপত্যস্নেহ। তাকে শৈশব থেকে মানুষ করেছেন, শিক্ষা দিয়েছেন, শাসন করেছেন, এবং গর্বিত হৃদয়ের একাগ্র স্নেহ-ভালোবাসার আবেগে ও আগ্রহে তাকে একান্তভাবে নিজের করে নিয়েছেন। শক্তিসাধক 'সন্ন্যাসী'র চরিত্রে এই একটি 'দুর্বলতা', আরোপিত স্বভাবের বিরুদ্ধে এই একটু যথার্থ স্বাভাবিকতা। যেজন্য তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছে—

তোরে আমি
ভালোবাসি প্রাণের অধিক— পালিয়াছি
শিশুকাল হতে তোরে মায়ের অধিক
স্নেহে— তোরে আমি নারিব হারাতে।

তা না হলে আহতঅভিমান অহংকারী ব্রাহ্মণের প্রকৃত রূপটি— স্বরূপ অবশ্য নয়, মানুষ উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করলেও মানুষের এ স্বরূপ হতে পারে না— সেই রুদ্ররূপটি জ্বালাময় রক্তরাগে প্রকট হয়েছে রঘুপতির এই রুদ্ধরোষ গর্জনে—

কে বলিল হত্যাকাণ্ড পাপ !
এ জগৎ মহা হত্যাশালা। জানো না কি
প্রত্যেক পলকপাতে লক্ষকোটি প্রাণী

চিরআঁখি মুদিতেছে! সে কাহার খেলা?
হত্যায় খচিত এই ধরণীর ধূলি।
প্রতিপদে চরণে দলিত শত কীট—
তাহারা কি জীব নহে? রক্তের অক্ষরে
অবিশ্রাম লিখিতেছে বৃদ্ধ মহাকাল
বিশ্বপত্রে জীবের ক্ষণিক ইতিহাস।
হত্যা অরণ্যের মাঝে, হত্যা লোকালয়ে,
হত্যা বিহঙ্গের নীড়ে, কীটের গহ্বরে,
অগাধ সাগরজলে, নির্মল আকাশে—
হত্যা জীবিকার তরে, হত্যা খেলাচ্ছলে,
হত্যা অকারণে, হত্যা অনিচ্ছার বশে—
চলেছে নিখিল বিশ্ব হত্যার তাড়নে
উর্ধ্বশ্বাসে প্রাণপণে, ব্যাঘ্রের আক্রমে
মৃগসম, মুহূর্ত দাঁড়াতে নাহি পারে।
মহাকালী কালস্বরূপিণী, রয়েছেন
দাঁড়াইয়া তৃষাতীক্ষ্ণ লোলজিহ্বা মেলি—
বিশ্বের চৌদিক বেয়ে চিররক্তধারা
ফেটে পড়িতেছে, নিষ্পেষিত দ্রাক্ষা হতে
রসের মতন, অনন্ত খর্পরে তাঁর।

উলঙ্গিনী করালিনী কালীর এই মহাভয়ংকরী রূপে, বিশ্বসৃষ্টির এই ছিন্নমস্তা সংহারমূর্তিতে, আতঙ্কে শিউরে ওঠে মানুষ— এতটুকু তার ক্ষুদ্র বুকের ধুক্ ধুক্ ধ্বনিতে অবিরত মৃত্যুরই পদধ্বনি, স্নেহের বা প্রেমের আশ্বাস নয়, কেমন ক'রে বিশ্বাস করবে সে!—

প্রেম মিথ্যা,
স্নেহ মিথ্যা, দয়া মিথ্যা, মিথ্যা আর-সব—
সত্য শুধু অনাদি অনন্ত হিংসা! তবে

কেন মেঘ হতে ঝরে আশীর্বাদসম
বৃষ্টিধারা দগ্ধ ধরণীর বক্ষোপরে—
গ'লে আসে পাষাণ হইতে দয়াময়ী
স্রোতস্বিনী মরুমাঝে— কোটি কণ্টকের
শিরোভাগে, কেন ফুল ওঠে বিকশিয়া ?…
ছি ছি ! ভক্তিপিপাসিতা মাতা, তাঁরে বলো
রক্তপিপাসিনী !

জয়সিংহের প্রতি রঘুপতি-হৃদয়ের এক কোণে যত স্নেহ ভালোবাসা থাক্, তার অন্তরে এই দাবদাহের আগুন ধরিয়ে দিয়ে, তার শ্রবণে মনে এই হিংসামন্ত্রের কালকূট ঢেলে দিয়ে, তাকে আবার আশ্বাস ও সান্ত্বনা দিতে পারে এ ক্ষমতা বিদ্বেষে ও ক্রোধে অন্ধ, উন্মত্ত, রঘুপতির নেই। [illegible]দী প্রাণের নিরাময় নির্মল প্রীতির সুধা ও সান্ত্বনা নিয়ে এল কাঙালিনী মেয়ে। বাহিরের নামে রূপেই সে রিক্ত ও কাঙাল, কেননা সে একা। না হলে, সুধাময়ী নারীপ্রকৃতির যে ঐশ্বর্য তার অন্তরে সে তো সপ্তদ্বীপা ধরণীর অধীশ্বরের ঘরেও নেই। তার অবস্থা—

বসে আছি ভরা মনে !
দিতে চাই, নিতে কেহ নাই !

হায় গো কিশোরী, একি তোমার ভিক্ষাব্রত ! একি তোমার ছলনা ! অতিশয় সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ ছলনা। আর্ত পীড়িত জয়সিংহের কাছে তার কোনো ছলনাই নেই। জয়সিংহকে সে চিনেছে, নিজেকে চেনাতেও সংকোচ করে নি। নারীহৃদয় অনাবৃত করে বলেছে—

জয়সিংহ, তুমি বুঝি একা ! ·
যে তোমার সব
নিতে পারে, তারে তুমি খুঁজিতেছ যেন।…
কত
লোক দেখি, কত মুখপানে চাই ; লোকে

ভাবে, শুধু বুঝি ভিক্ষাতরে...
এত দয়া পাই নে কোথাও, যাহা পেয়ে
আপনার দৈন্য আর মনে নাহি পড়ে।

আপন অন্তরের অতুল ঐশ্বর্য তার আপনার কাছেও অনাবৃত হয়ে যায়। আর কী বলতে পারে বালিকা! 'এসো তুমি, এ মন্দির ছেড়ে এসো' তার এই প্রাণের আহ্বান, অকৃত্রিম প্রেমের আহ্বান, নাটকের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ধ্বনিত। তার বজ্রসার পুষ্পপেলব কোমলতা কেবলই মাথা কুটে মরে দেবীমন্দিরের পাষাণতটে আর রঘুপতির পাষাণের থেকেও নিষ্ঠুর নির্মম নিষেধে। রোষে ক্ষোভে অভিশাপ দিয়ে বলে,—

নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ, ধিক্
থাক্ ব্রাহ্মণত্বে তব। আমি ক্ষুদ্র নারী
অভিশাপ দিয়ে গেনু তোরে, এ বন্ধনে
জয়সিংহে পারিবি না বাঁধিয়া রাখিতে।

রসিকের হৃদয়রঙ্গমঞ্চের সবটা জুড়ে আছে এই রঘুপতি জয়সিংহ ও অপর্ণা চরিত্র, ও দিকে গুণবতী—কেননা এই নাট্যকাব্যের প্রাণস্পন্দন যে মূলগত দ্বন্দ্বে তার অতি প্রবল ও প্রকট রূপ তাদেরই মধ্যে। অপর্ণাব স্বভাবে কিন্তু কোনো দ্বন্দ্ব নেই (রঘুপতির কবলমুক্ত হলে জয়সিংহেরও থাকত না)— মানুষের রোষ ক্ষোভ গর্ব মোহ অহমিকার উন্মথিত উন্মত্ত গর্জনের মধ্যে সে আপন স্বভাবে স্বরূপেই সর্বদা আছে— সমস্ত বিশ্বসৃষ্টির মূল সুরটি নিয়ত তার প্রাণের কুহরে কুহরে বাজছে— তার বাক্যে, তার আচরণে, তার অঙ্গে অঙ্গে, তার প্রতি পদক্ষেপে ও প্রতি দৃষ্টিপাতে ফুটে উঠছে।

কিন্তু পাষাণকঠিন রঘুপতি আর পাষাণে নির্মিত তার উপাস্য দেবীপ্রতিমা।

তবু, জয় হল কার?—

শ্রাবণের অমানিশা। বাহিরে ঝঞ্ঝাবৃষ্টি, বজ্রবিদ্যুৎ— নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের ঝড় বয়ে চলেছে। মন্দিরে একা রঘুপতি রাজরক্তের প্রত্যাশী, কখনো উল্লাসে কখনো শঙ্কায় অধীর, উন্মত্ত।—

আজ বুঝি জাগিয়াছ দেবী!
ওই রোষহুহুংকার! অভিশাপ হাঁকি
নগরের 'পর দিয়া ধেয়ে চলিয়াছ
তিমিররূপিণী।

এই এক দৃশ্য, আর-এক দৃশ্য রাজপ্রাসাদে। আত্মনির্বাসিত রাজা একবস্ত্রে প্রাসাদ ত্যাগ করে গেছেন, রাজাহীন রাজ্যহীন রানী তাঁর প্রতিজ্ঞাপূরণে ব্যস্ত—

বাজা বাদ্য বাজা, আজ রাত্রে পূজা হবে,
আজ মোর প্রতিজ্ঞা পূরিবে। আন্ বলি।
আন্ জবাফুল। রহিলি দাঁড়ায়ে? আজ্ঞা
শুনিবি নে? আমি কেহ নই? রাজ্য গেছে,
তাই ব'লে এতটুকু রানী বাকি নেই
আদেশ শুনিবে যার কিংকর কিংকরী?
এই নে কঙ্কণ, এই নে হীরার কণ্ঠী—
এই নে যতেক আভরণ। ত্বরা ক'রে
কর্ গিয়ে আয়োজন দেবীর পূজার!
মহামায়া এ দাসীরে রাখিয়ো চরণে।[১]

অভিশপ্ত-দ্বারাবতী-তুল্য শূন্য প্রাসাদে উন্মত্তা নারীর দেহ থেকে দিগ্‌-বিদিকে যেন উল্কাবৃষ্টি হচ্ছে, আর নিজেও সে ছুটে যেতে চায় বিনাশ-উজ্জ্বল ভয়ংকর পরিণামে।

তবু, জয় হল কার? নাট্যকার আমাদের কোন্ পরিণামের সম্মুখীন করলেন শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে?

নিরস্ত্র এবং নিঃসম্বল প্রেমেরই জয় হল জয়সিংহের আত্মদানে।

জাতক্রোধ বিদ্বেষ ও হিংসার উদ্যত অন্তিম আঘাত প্রেমই ছুটে এসে বুক পেতে নিল, আপনাতে সংহরণ করল। প্রেমের দ্বারা অপ্রেমকে জয় করার এই-যে তত্ত্ব— শুভবুদ্ধির প্রেরণে, পরম প্রেমে ও বেদনায়, আঘাত আপনাতে নিয়ে আঘাতকারীকে চৈতন্য দেওয়ার এই-যে পদ্ধতি— এ যেমন ভগবান বুদ্ধ এবং খৃস্ট প্রচার করেছেন আর প্রমাণ করেছেন জীবনে, তেমনি মানুষের সংসারে পারিবারিক স্নেহ-প্রেমের ক্ষেত্রেও দৃষ্টান্ত ছিল বা আছে মনুষ্যসৃষ্টির আদিকাল থেকে— রবীন্দ্রনাথ এই নাটকে তারই মর্ম উদ্‌ঘাটন করেছেন।[৫] হিংসা ও অকল্যাণের আঘাতকে প্রত্যাঘাত দিয়ে হয়তো সাময়িকভাবে ঠেকানো যায়, হতবল পদানতও করা যায়, তাকে একেবারেই দূর করা যায় না— অর্থাৎ, কল্যাণে ও প্রেমে রূপান্তরিত করা যায় না। সে পারে শুধু প্রেম ও শুভবুদ্ধি, মৃত্যুঞ্জয় শিবের ভূমিকায় এই মর্ত-পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে, উন্মথিত কালকূটপ্রবাহ নিজে গলাধঃকরণ ক'রে। দেহের মৃত্যুও তার মৃত্যুতরণের অপূর্ব সোপানস্বরূপ হয়।

জয়সিংহের আত্মদানে সেই ধ্রুবসত্যই আর-একবার প্রমাণিত ও প্রকাশিত হল। একান্ত শুভবুদ্ধি থেকেই রাজ্যেশ্বর-রূপে গোবিন্দ-মাণিক্য বিধান জারী করেছিলেন— রাজ -মর্যাদা ও শক্তি, সৈন্যবল, তার স্বপক্ষে ছিল ; শক্তিউপাসক অভিমানী রঘুপতিকে তা কোনো প্রকারেই নত করতে পারে নি। বাহুবলে হিংসাকে রোধ করতে গিয়ে ত্রিপুররাজ্যে, প্রাসাদে ও প্রাসাদের বাহিরে, উগ্রতর হীনতর ও ব্যাপকতর হিংসানলই জেগে উঠেছিল। সে অনলকে নেভালো নিঃস্বার্থবুদ্ধি ব্যথিতচিত্ত লোকহিতব্রত জয়সিংহের বক্ষউৎসারিত রক্তধারা। নিমেষেই চেতনা হল রঘুপতির, চেতনা হল গুণবতীর— মানুষেরই বৈনাশিক প্রবৃত্তির ও শক্তিমদমত্ততার যে বিগ্রহ শিলীভূত আকারে বেদীতে বসানো ছিল, গোমতীসলিলে তাকে বিসর্জন দিতে হল।[৬]

জয়সিংহ প্রাণ দিল চিরপ্রাণের অধিকার অর্জন করতে, অপর্ণা দিল তার প্রাণাধিক প্রিয়কে। মৃত্যুতুল্য মূর্ছা থেকে জেগে উঠে প্রথমেই সে যখন মর্মাহত রঘুপতিকে সম্বোধন করল 'পিতা !', সে কী অদ্ভুত পরিবর্তন ! সে কী মর্মান্তিক দৃশ্য !—

'জননী, জননী, জননী আমার !
পিতা ! এ তো নহে ভর্ৎসনার নাম ! পিতা !
মা জননী, এ পুত্রঘাতীরে পিতা ব'লে
যে জন ডাকিত, সেই রেখে গেছে ওই
সুধামাখা নাম তোর কণ্ঠে, এইটুকু
দয়া করে গেছে ! আহা, ডাক্‌ আর-বার !'

'পিতা, এসো এ মন্দির ছেড়ে যাই মোরা।'

'পাষাণ ভাঙিয়া গেল— জননী আমার
এবার দিয়েছে দেখা প্রত্যক্ষ প্রতিমা !
জননী অমৃতময়ী !'

অপর্ণার মধ্যেই চিরপ্রাণকে, যে প্রাণের প্রেরণে নিরন্তর সৃষ্টি-স্থিতিলয়ের প্রক্রিয়ায় মৃত্যুও প্রতিপদেই অমৃত হয়ে উঠছে সেই বিশ্বব্যাপিণী পরাশক্তিকে, প্রেমকে, মূর্তিমতী হতে দেখে রঘুপতি ধন্য হলেন ; একই জীবনে জন্মান্তর লাভ ক'রে জীবনের পরম সার্থকতার অভিমুখী হলেন। সে সার্থকতা স্নেহে, প্রেমে ও আত্মদানে।

বিসর্জনের প্রথম দৃশ্যেই জানা গেল, মা-হারা ছাগশিশুর রক্তপাতে অপর্ণার মাতৃহৃদয়ের ঐকান্তিক আর্তিতে, রাজা দেখছেন স্বয়ং জীবজননী ত্রিলোকপালিনী দেবীর সর্বজীবে প্রেম ও করুণা ; এই 'বালিকার মূর্তি ধ'রে স্বয়ং জননী' তাঁর কাছে দেখা দিয়েছেন। মানুষের মধ্যেই দেবতার এই আবির্ভাব রঘুপতি সেদিন কোনোমতেই স্বীকার করেন নি, স্বীকার করেন নি প্রেম ও করুণার ধর্ম— 'দূর দূর' ক'রে তাড়িয়ে

দিয়েছেন 'মায়াবিনী কুহকিনী' বালিকাকে। প্রাণাধিক জয়সিংহের মৃত্যুর মূল্য দিয়ে, মর্মান্তিক দুঃখের পরিণামে, এক জন্মেই জন্মান্তরে পৌঁছলেন ব'লেই, অবশেষে গোবিন্দমাণিক্যের সঙ্গে আর কোনো ভেদ রইল না তাঁর। তাই তো বলতে পারলেন—

পাষাণ ভাঙিয়া গেল— জননী আমার
'এবার দিয়েছে দেখা প্রত্যক্ষ প্রতিমা।
জননী অমৃতময়ী !

মৃত্যু নয়, অমৃতই হল তাঁর স্বরূপ।

৪

'বিসর্জন' রচনার পর সুদীর্ঘ কালের ব্যবধানে ক্রান্তদর্শী কবির কল্পনা রূপায়িত হল 'রক্তকরবী' নাটকে। প্রথম রচনা-কালে নামকরণ হয়েছিল 'যক্ষপুরী'। পরে 'নন্দিনী'। এই সাংকেতিক নাট্যের সংকেত-টিকেই মুখ্য ক'রে, নিহিত তাৎপর্যটি রচনার অন্তর্লোকেই গোপন রেখে, রবীন্দ্রনাথ পরে নাম দিয়েছেন 'রক্তকরবী'। প্রত্যেকটি নামের বিশেষ সার্থকতা আছে সে আমরা একটু ভেবে দেখলেই বুঝব।

কিন্তু, তরুণ বয়সের 'প্রকৃতির প্রতিশোধ', পরিণত যৌবনের 'বিসর্জন' আর ষষ্টিবর্ষোত্তর প্রাচীন বয়সে রচিত হল যে 'রক্তকরবী', এ-সকলে পরস্পর যোগ কোথায়! অন্তরে অন্তরে যোগ অবশ্য আছে। কবিচিত্তের বিশেষ আভিমুখ্য বা attitude একই আছে, কিছুমাত্র দিক্‌পরিবর্তন হয় নি তার। তবে, যুগান্তরে বা কালান্তরে মনুষ্য-জীবনের পুনঃ-পুনঃ-পরাবৃত্তিশীল সমস্যা নিয়েছে নূতন রূপ, কবি-প্রতিভার মুকুরে তার প্রতিফলন হয়ে উঠেছে নূতনতর— আর, সমস্যাসমাধানের ইঙ্গিতও তাই রক্তকরবী কাব্যনাট্যে নূতনতম না হয়ে পারে নি।

বিরোধ মানুষের প্রাণে ও মনে, ভোগে ও ত্যাগে, জীবনগ্রহণে

ও সন্ন্যাসে। জীবনের ঋত যে সম্ভোগ প্রতিপদে ত্যাগের সঙ্গেই মিলিত, এমন-কি অভিন্ন, বিরোধ তার শক্তিসঞ্চয় বা বস্তুসঞ্চয়ের সঙ্গে। প্রেমের সঙ্গে বিরোধ প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তি উভয়েরই। প্রবৃত্তিকে অথবা নিবৃত্তিকেই একান্ত ক'রে দেখা, সমগ্রকে খণ্ড খণ্ড ভাবে দেখার ফলে 'সত্য'কে মিথ্যায় পরিণত করা, লোভে মোহে অজ্ঞানে বা অহমিকার বশে— দুর্লভ মানবজীবন ব্যর্থ হতে দেওয়া— এ-সব মানবমনের নিজেরই কৃতিত্ব, নিজস্ব কীর্তি। যে প্রাণকম্পনে বিশ্বসৃষ্টি হয়েছে, যে প্রাণপ্রবাহে সৃষ্টি ডুবে আছে আর ভেসে চলেছে, যে প্রাণ তরুলতায় পশুপক্ষীতে মানুষে সর্বব্যাপী, বিশ্বব্যাপী, যে প্রাণ মৃণ্ময় ঘটে আর মৃত্যুর পাত্রে নিত্যউৎসারিত অফুরন্ত অমৃত মাত্র, সে প্রাণের নয় এ প্রবণতা, এ পরিণতি।

মর্তলোকে প্রাণই অমৃত, প্রাণই আনন্দ— যে আনন্দ থেকে জীব জন্মেছে, যে আনন্দে বেঁচে আছে, নেচে-ছুটে চলেছে— জীবনে মরণে যে আনন্দে তার লুকোচুরি খেলা। এই প্রাণশক্তির, এই আনন্দের জীবন্ত প্রতিমূর্তি বা সাক্ষাৎ প্রতিমা নারী— পূর্ণযৌবনা নারী— তারই অন্য নাম নন্দিনী।

আধুনিক যুগ বা আধুনিকতা, প্রতীচ্য দেশে যার ক্রমপরিণতি ও প্রতিষ্ঠা কিন্তু সারা বিশ্বেই একচ্ছত্র প্রভাব ও প্রসার, যথার্থ সংকট তার কোথায় এবং কিসের? মনোবুদ্ধির অতিবৃদ্ধি এবং ব্যক্তি ও সমাজ -নির্বিশেষে মানুষের জীবনে তার একান্ত প্রভুত্ব— এটাই এ কালের জগদ্ব্যাপী সভ্যতাসংকটের স্বরূপ নয় কি? অরণ্য পর্বত মরু -বাসী বর্বর জীবন পার হয়ে যখনই মানুষ সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে, মনোবুদ্ধির ক্রমিক বিকাশ ও অনুশীলন যুগপৎ তার কারণ ও কার্য -স্বরূপ হয়েছে তাতে কোনো ভুল নেই। মানুষের কাব্য কলা সংগীত মূলতঃ হৃদয়ের উৎসমুখে উৎসারিত, সামগ্রিক মানবজীবনে সমন্বিত— দর্শনে বিজ্ঞানে মানুষের মনোবুদ্ধি

ধাবিত হয়েছে অবচ্ছিন্ন তত্ত্বের বা abstractionএর ঊর্ধ্ব থেকে আরও ঊর্ধ্বস্তরে, উৎকর্ষ থেকে আরও পরমাশ্চর্য উৎকর্ষে। বিজ্ঞানে নাহয় অর্বাচীন কাল বহুগুণে অতিক্রম করেছে প্রাচীনকে, তা ব'লে সেকালে যে বিজ্ঞানচর্চা ছিল না এমন নয়। পতনশীল পদার্থের গতিবেগ ক্রমশই বৃদ্ধি পায়; অনুরূপ কারণেই গোরুর গাড়ির চাকা থেকে বাষ্পশকটে পৌঁছুতে যে সুদীর্ঘ সময় লেগেছে, বাষ্প থেকে বিদ্যুতে পৌঁছুতে তেমন লাগে নি, আর বিদ্যুৎশক্তি থেকে পারমাণবিক শক্তিতে উত্তীর্ণ হয়েছে মানুষ আরও অল্পকালে। অর্থাৎ, এ কালের মানুষ সে কালের থেকে স্বভাবতই বুদ্ধিগুণে উন্নততর এমন মনে করবার কোনো কারণ নেই।

দিনে দিনে প্রাণের ঘটেছে দৈন্য, কেননা মানুষের মানসদৃষ্টির বা মতির হয়েছে দিক্‌পরিবর্তন— এইটেই এ যুগের বিশেষ দুর্দৈব।

মনোবুদ্ধির উত্তরোত্তর বিকাশ বা বিজ্ঞানের দিগ্‌বিজয়ী বল এটা কিছু দোষের নয়— মানুষের জীবনে তাদের প্রভুত্বই সংকট সৃষ্টি করেছে; ভারসাম্য থেকে, সামঞ্জস্য থেকে, সমগ্রতার সুস্থ স্বাভাবিক ছন্দ থেকে জীবনকে করেছে বিচ্যুত। প্রাচীন প্রাচ্য সভ্যতার প্রবল জোয়ারেও এমন কখনো ঘটে নি। উপায় কখনো উদ্দেশ্যের মর্যাদা লাভ করে নি। মন্ত্রী বা সেনাপতি অধিকার করে নি রাজপদ। যন্ত্রীকে চালাতে উদ্যত হয় নি যন্ত্র। প্রাণছন্দ এবং হৃদয়বৃত্তিকে কেন্দ্র ক'রে ব্যষ্টি বা সমষ্টির জীবন ছিল আবর্তিত। বিজ্ঞান দর্শন কাব্য কলা সমভাবে সবই ছিল তার অনুকূল উপায় বা উপকরণ। বিজ্ঞানের তুলনায় দর্শনের উন্নতি হয়তো বেশি হয়েছিল এবং দেশবিশেষে বা যুগবিশেষে বিচারবুদ্ধিঅভিমানী দর্শন অনেক মানুষকে জীবনবিমুখ শূন্যাভিসারের দিশা দেখিয়েছিল, অর্থাৎ দিগ্‌ভ্রম ঘটিয়েছিল, সেও সত্য— সেই ভ্রান্তির স্বরূপই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে জানি 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাট্যকাব্যে, আর প্রাণপূর্ণ

প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে পুনঃপুনঃ 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে' কিম্বা 'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়' এরূপ অপূর্ব কবি-বাক্যে— সবই সত্য, কিন্তু দেশে দেশান্তরে ব্যাপ্ত লোকযাত্রা, সাধারণ মানুষের জীবন, বহু অভাব অসম্পূর্ণতা আক্ষেপ সত্ত্বেও ছিল বিশ্বব্যাপী ও চিরন্তন প্রাণছন্দে বাঁধা। পূর্বোক্ত একদেশদর্শী দর্শনের যুগ জীবনপরিহার ও সন্ন্যাসের আদর্শটি একান্তভাবে বড়ো করে তোলবার পূর্বে, জীবন ছিল অধ্যাত্মচেতনার বশংবদ ও অনুকূল। সমাজজীবনে তাই আংশিক সংকটেরও কারণ ছিল না। কারণ, অধ্যাত্ম কখনো অধিভূতের প্রতিবাদী নয়, বরং পরিপূরক। নেতিমূলক তার পন্থা বা প্রক্রিয়া নয়, ইতি-ইতি বা ওঁ তাব বীজমন্ত্র। ব্যষ্টি ও সমষ্টির প্রাণকে বরং উপচে দেয় সে চেতনায়। তার অভ্রান্ত সাক্ষ্য যেমন আছে বেদে উপনিষদে, লাওৎসের বাণীতে, তেমনি তার রূপ রয়েছে স্থাপত্যে মূর্তিতে চিত্রকলায়, ভাবতে ও ভারতের বাইরে। বৌদ্ধ ধর্ম ও ভাবনার ভিতর দিয়েও সেই মৌলিক প্রেরণা দেশে দেশান্তরে বহু শত বৎসর সতেজ এবং সক্রিয় থেকেছে। বেদের তাৎপর্য খুইয়ে শব্দ নিয়েই যে যুগে মানুষ ভুলে ছিল, যাগযজ্ঞ বা কৃচ্ছ্রসাধনের বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানে ছিল মত্ত, বুদ্ধের আবির্ভাব সেই যুগসন্ধিতে। বুদ্ধপূর্ব বহু শত বা সহস্র বৎসরের ইতিহাস লেখা হয় নি— এই পর্যন্ত জানি আর-এক মহামানব আর-এক যুগসন্ধ্যায় এক মহাহবের পূর্বক্ষণে ঘোষণা করেছিলেন, ক্রিয়া-বিশেষবাহুল্যের অনুরাগী বেদবাদরত অবিপশ্চিতের 'পুষ্পিত' বাক্যে ভুলো না।

মরলোকে প্রাণকেও পোষণ করে অন্তরালে থেকে, প্রেরণ করে অধ্যাত্মচেতনা ; তাকে বিপথগামী বা বিমুখী করতে চায় অহংসর্বস্ব মনোবুদ্ধি, শব্দার্থসম্বল বেদের অথবা বিজ্ঞানের দোহাই পেড়ে। তখনই মানুষের বিপদ ঘটে। নানাভাবে শুষ্ক হয় জীবন, পীড়িত

হয় প্রাণ, ব্যাপক নরমেধযজ্ঞে আর প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তের আত্মঘাতে নিষ্ফল হয় আবহমান সিদ্ধি ও সাধনা এবং অবশেষে অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে বিদ্রোহ, বিপ্লব। কবি বলেন সেই বিপ্লবের নেত্রী ও প্রেরণাদাত্রী হল নারীশক্তি, প্রাণশক্তি; কেননা সৃষ্টিতে সেই হল আদিম ও চিরন্তন। তার বক্ষে আছে কুন্দফুলের হার আর অলকে বিলম্বিত প্রফুল্ল রক্তকরবীর স্তবক। প্রকৃতির প্রতিশোধের অনাথা বালিকা, বিসর্জন নাটকের ছদ্মবেশিনী কিশোরী, আজ যৌবনে প্রাণে পূর্ণ একি তার প্রদীপ্ত রূপ! রূপের প্রভা ও প্রাণের প্রাচুর্য ছাড়া তারও তো সহায় নেই, সম্বল নেই কোনো— তবু, সেই-যে যক্ষপুরী যেখানে সর্দার-মজুর পণ্ডিত-পুরোহিত সকলেই মজগুল সোনার নেশায়, বস্তুসঞ্চয়ের এবং শক্তিসঞ্চয়ের ক্ষ্যাপামিতে, যন্ত্র-দেবতার আরাধনায়, যে যন্ত্রের আবর্তিত চক্রের কেউ বা উপরে চড়ে আর অযুত-নিযুত অনেকেই নিম্নে প'ড়ে নিষ্পিষ্ট জর্জর দেহ নিংড়ে শেষ রক্তবিন্দু ঢেলে দেয় তার চিরতৃষার্ত খর্পরে— দিবারাত্র এমন অমানুষিক কাণ্ড চলে যেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নামে, ভোগবৃদ্ধির নামে, ঊর্ধ্বপ্রকৃতিকে উপেক্ষা ক'রে আর জড়প্রকৃতিকে পরাহত পদানত ক'রে অণুপরমাণু থেকে সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র অবধি প্রভুত্ব-বিস্তারের অপরিসীম উদ্যমে ও আকাঙ্ক্ষায়— এ কালের সেই স্বর্ণ-লঙ্কায়, সেই কুবেরপুরীতে সকলকেই বিমুগ্ধ ও বিচলিত করেছে নন্দিনী কোন্ গুণে! পীড়িত মানবের অন্তরে অন্তরে আছে চিরঅতৃপ্তি-সম্ভূত বিদ্রোহিতা, নন্দিনী তারই সাকার সচল প্রতিমা মাত্র! সেই তার আকর্ষণ, সেই তার শক্তি।

সমস্ত যন্ত্ররাজ্যের অশেষ শক্তিমান অধীশ্বর, সমস্ত সমাজব্যাপী যন্ত্রবশ্যতার জাল বিস্তার ক'রে নিজেও যে দুর্ভেদ্য জালের অন্তরালে স্বেচ্ছাবন্দী, সেও মুগ্ধ, কেননা বিভ্রান্ত— কেননা এর কোনো 'অর্থ' নেই। বর্শাফলার মতো বস্তুভেদী দৃষ্টি নন্দিনীর মুখের উপর রেখে

হঠাৎ বলে ওঠে, 'আমি তোমাকে জানতে চাই।' শুনে শিউরে ওঠে নন্দিনী। হায়, 'যে জিনিষটাকে **মন দিয়ে জানা যায় না, প্রাণ দিয়ে বোঝা যায়'** তার 'পরে ওর দরদ নেই। ও বলে, 'বিধাতা তোমাকেও রূপের আড়ালে অপরূপ করে রেখেছেন। তার মধ্যে থেকে ছিনিয়ে তোমাকে আমার মুঠোর ভিতর পেতে চাচ্ছি, কিছুতেই ধরতে পারছি নে'— [আলো কি কখনো মুঠো বেঁধে ধরা যায়? ডাক্তারি ছুরি চালিয়ে দেহ থেকে প্রাণ কখনো পৃথক্ ক'রে নেওয়া চলে?] 'আমি তোমাকে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেখতে চাই, না পারি তো ভেঙে-চুরে ফেলতে চাই।'

এই হল বুদ্ধির স্বভাব। অথচ, বোধ যে একেবারে লুপ্ত হয়েছে তা নয়। সেই বোধ দিয়ে রাজা এও জানে 'বিশ্বের বাঁশিতে নাচের যে ছন্দ বাজে সেই ছন্দ'ই যেন নন্দিনীতে শরীর ধারণ করেছে। 'সেই ছন্দে বস্তুর বিপুল ভার হাল্কা হয়ে যায়। সেই ছন্দে গ্রহনক্ষত্রের দল ভিখারি নটবালকের মতো আকাশে আকাশে নেচে বেড়াচ্ছে।' উদ্দেশ্যের-ঠুলি-খসা চোখে হঠাৎ কী দেখে নন্দিনীকে বলে, 'সামনে তোমার মুখে চোখে প্রাণের লীলা, আর পিছনে তোমার কালো চুলের ধারা মৃত্যুর নিস্তব্ধ ঝর্ণা।··· সেই গুচ্ছ গুচ্ছ কালো চুলের নীচে মুখ ঢেকে ঘুমোতে ভারী ইচ্ছে করছে।' মুক্ত প্রাণের দিকে চেয়ে বন্দী প্রাণের এই চাপা হাহাকার। পৃথিবী ব্যেপে মরণ বিস্তার করাই যার ব্যবসায়, এ কোন্ ভিন্নতর মরণের পরম মাধুর্যে সে আজ প্রাণে-প্রাণে আকৃষ্ট। রাজা তাই বলে, 'তুমি জানো না আমি কত শ্রান্ত।' জড়পরিণামী উদ্যমের প্রতিক্রিয়ায় এই শ্রান্তি, এই অবসাদ, অবশেষে ব্যর্থতা ও শূন্যতার বোধ, গূঢ় মৃত্যুকামনা— এ-সবই জড়োপাসক, বলদর্পিত, মনঃপ্রধান, অহংকেন্দ্রিত, সুসভ্য জীবনের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ। ধনতন্ত্রে না হয় তো সমাজতন্ত্রে, সমস্ত সমাজে অল্প বা অধিক পরিমাণে ব্যাপ্ত ভোগসুখ আর বাহ্যিক

সর্বব্যাপী শৃঙ্খলা যতই থাক্, কবি বলেন, এ ব্যবস্থা নিজেরই অতিভারে একদিন নিজে থেকে ভেঙে পড়বে। যন্ত্রযুগের সূচনা-কাল থেকে ক্রমে ক্রমে যন্ত্রতন্ত্রের জালে নিজেকে ও সকলকেই বেঁধেছে যে, ভূতগ্রস্তের মতো কোন্ আবেশে, জাল ছিঁড়তে হবে তাকে, ভাঙতে হবে কারাগার— বেরিয়ে পড়তে হবেই উদার উন্মুক্ত প্রাণের পথে আলোকিত বিশ্বভুবনে। সেই ভাঙনের মুখে দাঁড়িয়ে চিরজীবনের পথ দেখাবে আদিম প্রাণ, চিরপ্রাণ। প্রকৃতি থেকে দূরে আসার, স'রে আসার— প্রকৃতিকে প্রেয়সী না জেনে, ভালো না বেসে, ক্রীতদাসী বানিয়ে প্রভু সাজার যে দুশ্চেষ্টা তার বৃত্ত পূর্ণ হবে অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতি উভয়েরই মার খেয়ে, প্রকৃতির প্রতিশোধে। সেই হবে প্রকৃতির প্রকৃত আশীর্বাদ, যথার্থ প্রসাদ।

রঞ্জন? রঞ্জন কে? নন্দিনী যদি হয় প্রাণরূপিণী নারী বা নারী-রূপিণী প্রাণশক্তি, রঞ্জন কি তারই পূর্ণ যৌবন ও পরিপূর্ণতা? সে কি প্রেম? সে কি মানবাত্মা? কী জানি! কবিকল্পনার কিম্বা গানের কিম্বা প্রাণের সব হেঁয়ালিই যে ভেঙে দিতে হবে বা ভাঙা যাবে এমন আমাদের ধারণা নয়। থাক্-না একটু 'অস্পষ্টতা' বা অনির্বচনীয়তা। রসিকের ভাবনা সেখানে ডানা মেলে বিহার করবে। ডানায় যতটা বল ততদূরই যাবে। রক্তকরবীর রঙ ছেঁকে নিয়ে নয়নের অঞ্জন করা যায় না। নন্দিনীর অঙ্গে অঙ্গে তরঙ্গিত যৌবনকে নিঙড়ে নিয়ে, বকযন্ত্রে শোধন ক'রে, পেয়ালা ভ'রে পান করা যায় না। আর, রঞ্জন— সেও বুঝি নীরঞ্জনই হবে।

আর অধিক ব্যাখ্যা করতে চাই নে। এই অপূর্ব সাংকেতিক নাটকের সাংকেতিকতা অক্ষুণ্ণ থাক্। কবি একাধিক ব্যাখ্যা করেছেন আধো-পরিহাসে আর আধো-সহৃদয়তায়। নানা মনীষীও নানাবিধ মন্তব্য করেন নি কি? আর, কলেজের পাঠ্য যখন, 'রক্তকরবী মেড ইজি' সেও একাধিক অবশ্য পাওয়া যাবে।

আধুনিক industrial age বা যন্ত্রযুগের, বিশ্বব্যাপ্ত আধুনিক সভ্যতার, সংকটের স্বরূপ যদি উদ্ভাসিত হয়ে থাকে এই নাটকে, সেই সঙ্গে তার সমাধানেরও কোনো ইঙ্গিত— সেই তো যথেষ্ট।

আধুনিকের কারায় বন্দী জীবন! হঠাৎ শুনতে পাই বাতাসে একি সুর ভেসে আসছে—

'ভালোবাসি ভালোবাসি'
এই সুরে কাছে দূরে জলে স্থলে বাজায় বাঁশি।

এই সুরেতেই সত্যের পরিপূর্ণ ব্যঞ্জনা।

৫

এ কথা বললে অত্যুক্তি হয় না যে, 'রক্তকরবী'তে কবি তাঁর নাট্য-প্রতিভার চূড়ায় পৌঁছেচেন। অন্তত, এ দেশের সাহিত্যে, যুগের বাণী নিয়ে যুগোপযোগী নাট্যরূপের সেই-যে চূড়ান্ত নিদর্শন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। যদিও সাংকেতিক দৃশ্যকাব্য আর বিচিত্র টাইপের বা চারিত্ররূপের তথা আইডিয়া-রূপের সমাবেশ, তবু এই নাটকের নন্দিনী চরিত্র যার-পর-নেই জীবন্ত— কবিকল্পনার মায়া শুধু নয়, কায়াময়ী— রক্তমাংসে গঠিত ও প্রাণস্পন্দিত। বাহুল্যবর্জন ও অচ্ছিন্ন ঘটনাধারার অব্যর্থ দ্রুতি এ রচনায় এক আশ্চর্য বৈদ্যুতিক শক্তির সঞ্চার করেছে।

আমরা দেখেছি— মানুষী সত্তার বিভিন্ন স্তরে আর বিভিন্ন যুগে প্রাণধর্ম ও জীবন সম্পর্কে মানুষের মন-গড়া যে বিরুদ্ধতা জেগেছে বিচিত্র তার রূপ, আর ব্যঞ্জনাপূর্ণ তারই প্রতিরূপ বা রূপান্তর রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন নাটকে। প্রাণমনের বিরোধে যে সংকট জেগেছে 'প্রকৃতির প্রতিশোধে' তার প্রকৃতি আধ্যাত্মিক, বিসর্জনে সামাজিক, রক্তকরবীতে রাষ্ট্রিক বা অর্থনৈতিক, আর আলোচ্য অন্য একখানি নাটকে, চণ্ডালিকায়, তা পুনশ্চ আত্মিক। সংকটের

বৈশিষ্ট্য নিয়ে 'মালিনী' 'অচলায়তন' বা 'তাসের দেশ' অনেকটা মেলে বিসর্জন নাটকের সঙ্গে। অর্থাৎ, এই ক'টি ক্ষেত্রেই অল্পবিস্তর গ্রন্থি বেধে গিয়েছে সামাজিক সংস্কারে, নীতি ও ধর্মের বাহ্যিক আচার আচরণ নিয়ে; মুক্ত প্রাণের ও চেতনাব জগতে বেরিয়ে আসতে বন্দীকে—সে কোনো ব্যক্তিবিশেষই নয়—মরতে হয়েছে বা লড়তে হয়েছে।

মুক্তধারা তো রক্তকরবীর নিকট-সহোদরা, একই যন্ত্রজাঙাল ভাঙবার মন্ত্র সেখানে রয়েছে! অর্থাৎ, সেখানেও সংকটটি রাষ্ট্রিক বা সাম্রাজ্যিক, তথা অর্থনৈতিক।

ফাল্গুনী সংকেতনাট্যের কথাও স্বভাবতই মনে আসে। সেখানে বিরোধ জরার সঙ্গে যৌবনের এবং সমাধান জরার অন্তরেই যৌবনের আবিষ্কারে। অর্থাৎ, সংকট বা সংকটের নিবৃত্তি সে স্থলে মূলতই প্রাণগত বা প্রাণিক।

চতুরঙ্গ বড়ো গল্প, অথচ নাট্যোপযোগী উপাদান তাতে যথেষ্ট ছিল। শচীশ দামিনীকে কেন্দ্র ক'রে, জ্যাঠামশাই আব লীলানন্দ-স্বামীকে ডাইনে বাঁয়ে রেখে, এখানেও গোড়া-ঘেঁষা সমস্যা সন্ন্যাসে ও সংসারে, ত্যাগে ও ভোগে। অর্থাৎ, এখানেও প্রশ্নটি আত্মিক।

সূত্রাকারে এই সাহিত্যবিচারের অপবাধ গুরুদেব ববীন্দ্রনাথ ক্ষমা করুন্। যত সহজ সবল ক'রেই মর্মউদ্‌ঘাটনের প্রয়াস পাই-না কেন, জীবনের বা আর্টেব সকল রহস্যই কোনোমতে নিঃশেষিত হয় না। হলে, রসিকেবা কী নিয়ে থাকতেন, আব ব্যাখ্যাব্যবসায়ীরও কাজ ফুরোত। সূত্রই সব নয় এবং সব সময়েই 'সৃষ্টি' হয়েছে স্বতঃ, কোনো সূত্রের কোনো অপেক্ষা রাখে নি—সে হিসাবে বলা যায় সার্থক কাব্য অথবা কলা এক-এক গাছি বিনি সুতোর মালা। বিনি সুতোর মালা কি? নাহয় বলা যাক—নিরাকার সূত্রে আকারের মালা। সেই সূত্রটি কী হতে পারে ভাষ্যকার তাই অনুমান করতে

সচেষ্ট। তাতে দোষ নেই। বাজীকরের মতো অপূর্ব-চাতুরী-সহকারে নিজেরই করতলে নানা রঙের গুটিকা লুকিয়ে রেখে অন্যের নাক মুখ চোখ থেকে লাল নীল সবুজ সুতো টেনে বার করাটাই অসংগত।

৬

দুটি দৃশ্য এবং চরিত্র নিয়ে রূপায়িত' 'চণ্ডালিকা'য় কাহিনীর দিক দিয়ে কোনো জটিলতা নেই, কোনো বাহুল্য নেই, ঋজুতা বিস্ময়কর এবং সমস্তটির ভাবের গভীরতা ও রসের আবেদন আরও অদ্ভুত। এই নাট্যকাব্যের নায়িকা প্রকৃতি, অস্পৃশ্য চণ্ডালের কন্যা, পূর্ণ-যৌবনা— নায়ক ভগবান বুদ্ধের মুখ্যসহচর আনন্দ। মন্ত্রসিদ্ধ মা ও মেয়ে প্রকৃতির কথোপকথনেই আদ্যন্ত নাট্যব্যাপার গ্রথিত। আনন্দের সাক্ষাৎ আবির্ভাব কেবল শেষ দৃশ্যের শেষে— আদিম প্রকৃতির আকর্ষণে পরাভূত সন্ন্যাসীর পদে আত্মনিবেদন ক'রে স্বেচ্ছায় প্রকৃতি যখন পরাভব মানে, যে তামস মায়ার অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে আনন্দ মাটিতে পঙ্কে নেমে এসেছেন তারও অবসান হয় চণ্ডালী জননীর শেষ নিশ্বাসে, পরম কারুণিক বুদ্ধদেবের বন্দনায় একটিমাত্র মন্ত্র আনন্দ উচ্চারণ করেন এবং রঙ্গমঞ্চের উপরেও যবনিকা নেমে আসে। পরিণামে নিখিল মর্তপ্রকৃতির এই প্রার্থনাই বিশুদ্ধ-ভাবে জেগে উঠেছে যে,—

'মৃত্যুর্মামৃতং গময়।
তমসো মা জ্যোতির্গময়।

হে স্বর্গের জ্যোতি, ছায়াহীন ঊর্ধ্বলোক থেকে আমার কামনার আকর্ষণে নেমে এসো তুমি— ফলে যদি মলিন হও, ক্ষণতরে ছায়াচ্ছন্ন হও, তা হলেও উপায় নেই— নেমে এসে আমার ক্ষুধাকে দূর করো সুধা দিয়ে, চাওয়া নিবৃত্ত করো আমার স্বতউৎসার দেওয়ার আবেগে এবং আমার এই কামনা রূপান্তরিত করো কল্যাণে, প্রেমে।'

পুরুষপ্রকৃতির আকর্ষণ-বিকর্ষণের একই কাহিনীকে দুই বিপরীত প্রস্থানভূমি থেকে দেখার কারণে, যেন সম্পূর্ণ পৃথক্ দুটি পরিপ্রেক্ষিত উন্মোচিত হয়েছে প্রকৃতির প্রতিশোধে আর চণ্ডালিকায়, কবির পূর্বোত্তর বয়ঃসীমার দুটি দৃশ্যকাব্যে। পূর্বে, পুরুষকে দেখানো হয়েছে জীবনের ঘটনার পর ঘটনায়, দৃশ্যের পর দৃশ্যে ; ক্ষুদ্র বালিকাটি রয়েছে নিরাকারা সর্বব্যাপিনী প্রকৃতির অতিক্ষুদ্র প্রতীক বা প্রতিনিধি -রূপে। পরে, চণ্ডালকন্যা প্রকৃতিতে মর্তপ্রকৃতি সাকার শরীরী বললেও চলে— তার আশা, স্বপ্ন, কামনা, কামনাপূর্তির অসম্ভাব্যতা ও ব্যর্থতা আমাদের নয়নমনের সামনে পরতে পরতে সাজিয়ে ধরা হয়েছে পরিস্ফুট প্রত্যক্ষ আকারে ; পুরুষ কখনো সম্মুখে আসে নি বললেও হয়, শুধু তার প্রতিবিম্ব এসে পড়েছে মায়াবিনী প্রকৃতির করধৃত মায়াদর্পণে। প্রথমোক্ত দৃশ্যকাব্যে প্রকৃতির মধ্যে ঊর্ধ্বপ্রকৃতির বা দিব্যপ্রকৃতির আভাসে উদ্ভাসে শেষ পর্যন্ত কৃতার্থ হয়েছে পুরুষ। এই প্রকৃতি কী করে সেই প্রকৃতিতে রূপান্তরিত হতে পারে, প্রকৃতির মধ্যে তারই দুর্বার আবেগ ও আকূতিটুকু কোথায়, সেই উত্তম রহস্যটুকু, সেই পরমতত্ত্বটি, শেষোক্ত নাট্যে আভাসিত হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অর্থাৎ, এ কথা বললে হয়তো খুব অত্যুক্তি হবে না যে, পুরুষের দিক থেকে দেখে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাট্যকাব্যে যে দিব্য পরিণামের আভাসটি দিতে পেরেছিলেন কবি, ইশারায় ইঙ্গিতে রূপে রূপে দেখিয়েছিলেন 'আনন্দরূপমমৃতম্', প্রকৃতির দিক থেকে পর্যালোচনা ক'রে 'চণ্ডালিকা'য় যেন তারই প্রক্রিয়াটি অগ্নিবর্ণে আমাদের মর্মপটে অঙ্কিত করে দিলেন। ফলতঃ, প্রলয়সমাধি থেকে পুরুষ জাগলে শুধু হবে না, প্রকৃতিকেও পুরুষের নিকট পূর্ণ আত্মনিবেদনে হতে হবে চৈতন্যময়ী— উভয় নাট্যকাব্য মিলিয়ে কবির গভীর-উপলব্ধি-সঞ্জাত এই অপূর্ব ধ্যান-ধারণাই আশ্চর্য রূপলাভ করে নি কি ?

না করাই আশ্চর্য। বহু শত বৎসর উজিয়ে কালিদাসের কুমার-সম্ভব কাব্যে বা শকুন্তলা নাটকে রবীন্দ্রনাথ যে কতকটা এই তাৎপর্যই অন্বেষণ করেছেন ও আশ্চর্য মনীষা-গুণে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, এ কথা সকলেরই মনে পড়বে। সেই-সব মর্মব্যাখ্যা রবীন্দ্র-প্রতিভারই ষোলো-আনা উদ্ভাবন এমন মনে না করলে বলতেই হয় —পাত্রপাত্রীর বহু অদল-বদল হয়েছে, কাহিনী চেনা যায় না, তেমনি কলাকৌশল, তবু কতকগুলি বীজসত্য, কতকগুলি মৌলভাবনা যুগ থেকে যুগান্তরে রূপ থেকে রূপান্তরে বিলসিত, বিভাসিত।

নারীতে নারীতে সেই প্রকৃতির, পুরুষে পুরুষে সেই পুরুষের প্রতিফলন আমরা লক্ষ্য করি যে শাশ্বত পুরুষ প্রকৃতি মিলে এই অখিল ভুবননাট্যের নিত্য অনুষ্ঠান। জড়ে জীবে শিব আছেন, আছেন মহামায়া— একীভূত হয়েই ছিলেন ও আছেন, আবার পৃথক্ হয়েও অনন্ত লীলাবিলাসে চঞ্চল —এ কল্পনা আমাদেরই নয়। ভারতের যোগী ঋষি তত্ত্ববিদ্ যুগে যুগে যেটি বলে গেছেন সেটির ব্যাখ্যা করা আমাদের অসাধ্য হলেও, সেটি বোধে বোধ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব না হতে পারে। পুরুষপ্রকৃতির লীলা ভুবনের সর্বত্র যেমন, তেমনি মানবজীবনেরও পর্বে পর্বে, পরতে পরতে। তারই স্বভাব ও স্বরূপ কিছুটা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে প্রকৃতির প্রতিশোধে আর চণ্ডালিকায়।

সংক্ষেপে এমনও বলা যায়— পুরুষের নিবৃত্তিরূপ-মোহ আর প্রকৃতির কামনারূপ-অন্ধতা এরই ব্যর্থতা, অপূর্ণতা, এর থেকেই মুক্তি, যথাক্রমে প্রকৃতির প্রতিশোধে আর চণ্ডালিকায় নাট্যরূপ পেয়েছে। এ কথা তো পূর্বেই বলা হয়েছে— যেমন নিবৃত্তি তেমনি প্রবৃত্তি, যেটি জীবনে একচ্ছত্র প্রভুত্ব বিস্তার করতে চায়, সেটিই জীবনকে অশেষ মিথ্যায় ব্যর্থ ও বিড়ম্বিত করে। সত্য রয়েছে একই কালে প্রকাশ আর অপ্রকাশ, সম্ভূতি আর অসম্ভূতি, ভোগ আর ত্যাগ, প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তি, ইহ আর অমুত্র, উভয়কে মিলিয়ে এবং অতিক্রম ক'রে। সেই

সত্যেই প্রকৃতিপুরুষের নিগূঢ়গভীর মিলন আর একাত্মতা, এক দিকে হৃদিপ্রাণের আর অন্য দিকে মনোবুদ্ধির একতান সংগতি।

এখন, সেকালের ভাষায় বলতে গেলে, প্রস্তুত বিষয়েই প্রবৃত্ত হওয়া যাক।—

চণ্ডালিকার কাহিনীটি নেপালী বৌদ্ধ সাহিত্যের শারদূলকর্ণাবদান থেকে গৃহীত।[১০] ভূমিকায় বলা হয়েছে— তৃষিত আনন্দের বদ্ধাঞ্জলিতে চণ্ডালকন্যা জল ঢেলে দিল। 'তাঁর রূপ দেখে মেয়েটি মুগ্ধ হল। তাঁকে পাবার অন্য কোনো উপায় না দেখে মায়ের কাছে সাহায্য চাইল। মা তার জাদুবিদ্যা জানত। আনন্দ এই জাদুর শক্তি রোধ করতে পারলেন না। রাত্রে তার বাড়িতে এসে উপস্থিত। তিনি বেদীতে আসন গ্রহণ করলে প্রকৃতি তাঁব জন্য বিছানা পাততে লাগল। আনন্দের মনে তখন পরিতাপ উপস্থিত হল। পরিত্রাণের জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে কাঁদতে লাগলেন। ভগবান বুদ্ধ তাঁর অলৌকিক শক্তিতে শিষ্যের অবস্থা জেনে একটি বৌদ্ধমন্ত্র আবৃত্তি করলেন। সেই মন্ত্রের জোরে চণ্ডালীর বশীকরণবিদ্যা দুর্বল হয়ে গেল এবং আনন্দ মঠে ফিরে এলেন।'

দেখাই যাচ্ছে পূর্বপ্রচলিত সাধারণ কাহিনী অসাধারণ হয়ে উঠেছে মহৎপ্রতিভার করস্পর্শে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশেষ বক্তব্যের সঙ্গে সংগত ক'রে কাহিনীর উপসংহারটুকু নূতনভাবে কল্পনা করেছেন। তামসমন্ত্রের প্রভাব, কামলোকের দুর্মোচ্য নাগপাশ, করুণাপরবশ তথাগত তাঁর মন্ত্রপ্রভাবে দূর করলেন না— আর্তি ও করুণা জেগে উঠল মর্তপ্রকৃতির ব্যথিত চেতনাহত প্রাণে এবং তারই আত্মনিবেদনে আনন্দও হৃত চৈতন্য ফিরে পেলেন।

ক্ষণমাত্রের আগন্তুক আনন্দের প্রথম দৃষ্টিপাতেই প্রথম চেতনা পেয়েছে প্রকৃতি, অভূতপূর্ব আত্মআবিষ্কারে চকিত হয়ে মনে মনে

বলে উঠেছে,—

ওগো, তোমার চক্ষু-মেলে মেলে সত্যদৃষ্টি
আমার সত্যরূপ প্রথম করেছ সৃষ্টি। ·
আমি তরুণ অরুণলেখা,
আমি বিমল জ্যোতির রেখা,
আমি নবীনশ্যামল মেঘে প্রথম প্রসাদবৃষ্টি।

কিন্তু, অধীর কামনার উদ্রেকে এ সুখ এ চিত্তপ্রসাদ স্থায়ী হয় নি। বিশেষতঃ যখন দেখল সেই তার আরাধ্য দেবতা বৌদ্ধ শ্রমণদের আগে আগে আবার চলে গেল তার দর্শনতৃষিত চোখের সামনে দিয়ে অজ্ঞাত পরিক্রমাব্রতে, অথচ একবার ফিরে তাকালো না, আর একবার এসে তৃষার জল চাইল না। হতাশায়-ভেঙে পড়ল, মাটিতে মাথা ঠুকে ঠুকে বলতে লাগল প্রকৃতি,—

'এই মাটি, এই মাটি, এই মাটিই তোর আপন! হতভাগিনী, কে তোকে আলোতে ফুটিয়ে তুলেছিল এক মুহূর্তের জন্যে? তাকে কি দয়া বলে! ·

এই প্রতিদিনের চাই চাই চাই, এই প্রতিমুহূর্তের অপমান, বুকের ভিতরে এই খাঁচার পাখির পাখা আছড়ে মরা, একেই বলে স্বপ্ন? যা বুকের সব শিরা কামড়ে ধরে থাকে, ছাড়তে চায় না, তাই স্বপ্ন? আর ঐ ওরা, নেই কোনো বাঁধন, নেই কোনো সুখ দুঃখ, নেই কোনো সংসারের বোঝা— ভেসে চলে যায় শরৎকালের মেঘের মতো— ওরাই আছে জেগে? ওরাই স্বপ্ন নয়?··

মা, তোমার মন্ত্র জীবসৃষ্টির আদিকালের। এদের মন্ত্র কাঁচা, এই সেদিনকার। · তোমার মন্ত্রের টানে খুলবে ওদের মন্ত্রের গাঁঠ। ওঁকে হারতেই হবে, হারতেই হবে।'

'ক্ষুধার্ত প্রেম, তার নাই দয়া, তার নাই ভয়, নাই লজ্জা!' কাম অথবা প্রেম সে বিচারের অবকাশই নেই। প্রয়োজন হলে

নিজেকে জ্বলন্ত অনলে আহুতি দিয়ে সিদ্ধিলাভ করবে, প্রকৃতির কামনার ধনকে আকর্ষণ করে আনবে তার বক্ষে, তার বাহুপাশে, এই সংকল্প নিয়ে চণ্ডালী জননী বসল তার দুশ্চর যাগে— প্রেম নয়, কামনারই যজ্ঞ।

তার পর সর্বত্যাগী উদাসীন ও ক্ষুধার্তা প্রকৃতি দুজনের জীবন নিয়ে বহুজন্মের দুঃখ ক্ষোভ কামনাকে এ জন্মের কয়েকটি মুহূর্তে সংহত ক'রে সেকি কালানলশিখার লেলিহ রসনা-বিস্তার! 'সৃষ্টির দেবতা প্রলয়ের দেবতার চেয়ে ভয়ংকর— আপনকে চাব্‌কাচ্ছেন তাঁর কাজে, আর আগুন কেবলই গোম্‌রাচ্ছে, গর্জাচ্ছে। সপ্তধাতুর কৌটোতে কী আছে তাঁর পায়ের সামনে— প্রাণ না মৃত্যু?' তবু তো প্রকৃতির 'ভাবনা নেই, ভয় নেই, দয়া নেই, দুঃখ নেই— ভাঙছে, জ্বলে উঠছে, গলে যাচ্ছে, ছিট্‌কে পড়ছে স্ফুলিঙ্গ।·· সমস্ত শরীর মন নেচে নেচে উঠল অগ্নিশিখার মতো।'

অবশেষে আসন টলল যখন সন্ন্যাসীর, দুর্বার বাসনা বহ্নি-কষাঘাতে তাড়িয়ে নিয়ে চলল মোহগ্রস্তকে বুদ্ধ-ধম্ম-সংঘের শরণচ্ছিন্ন সর্বনাশে, তখন প্রকৃতির মনেও ভয়— দিশেহারা হয়ে ভাবছে কেবলই, 'তাঁর পথ আসছে শেষ হয়ে— তার পরে? তার পরে কী? শুধু এই আমি! আর কিচ্ছু না! এত দিনের নিষ্ঠুর দুঃখ এতেই ভরবে? শুধু আমি?' মায়াদর্পণে আনন্দের ম্লান নিরানন্দ রূপ দেখে শিউরে উঠছে— কী করেছে অভাগিনী, সর্বনাশী! যে আলো ভিতর-বার উদ্ভাসিত করেছিল তার ক্ষণমাত্রের দুর্লভ ভাগ্যে, কামনা-মলিন হাতে কী কুয়াশা লেপে দিয়েছে তারই দেবদেহে! যে আলো দেখে নিমেষেই প্রাণমন ভুলেছিল, নিজকর্মদোষে তাকেই কি নির্‌জ্ঞানগহ্বরের কালো আঁধারে দিতে চলেছে বিসর্জন!

অসীম অনুশোচনা জাগে প্রকৃতির অন্তরে, দুঃখের পাবকে ও অশ্রুজলস্নানে পবিত্র হয়ে কামনা হয়ে ওঠে প্রেম এবং যে মুহূর্তে সে

নিঃশেষে আত্মনিবেদন করে আরাধ্যের পায়ে— মোহ কেটে যায়, কুয়াশা মুছে যায়, সার্থক হয় জীবন।

বুদ্ধদেবের প্রচারিত ধর্মকে বিশেষ ক'রে সন্ন্যাসের ধর্ম ব'লে স্বীকার করেন নি রবীন্দ্রনাথ। 'মা যেমন একটিমাত্র পুত্রকে নিজের আয়ু দিয়ে রক্ষা করেন সমস্ত প্রাণীতে সেই প্রকার অপরিমিত মানস রক্ষা করবে' —এ কখনো ইহবিমুখ বৈরাগ্যের বাণী হতে পারে না। এই মৈত্রীভাবনা-দ্বারা বুদ্ধদেব ব্যক্তিগত-কামনা-তুষ্ট প্রেমকে সর্বজীবে ব্যাপ্ত করবারই উপদেশ দিয়েছেন। এই প্রাণবান্ উপদেশে, মুক্ত শুদ্ধ জীবনের অনুকূল অভিনব প্রেমমন্ত্রে, শত শত বৎসর দেশে দেশান্তরে নানা জাতির হৃদয় মন অপূর্ব কল্যাণে করুণায় ও সৌন্দর্যে স্ফূর্তি লাভ করেছে। ফলতঃ, রবীন্দ্রনাথ যেমন ইহবিমুখ বৈরাগ্যকেই জীবনের বড়ো আদর্শ বা স্পৃহনীয় পরিণাম ব'লে কোনোদিনই গ্রহণ করেন নি, আলোচ্য নাটকেও তেমনি 'আনন্দ'কে সেই শুষ্ক কঠোর সন্ন্যাসের প্রতীক-রূপে তিনি উপস্থিত করলেন না। প্রতিশোধ-স্পৃহাতেই পুরুষকে আকর্ষণ করে নি প্রকৃতি; স্বভাবউদাসীনের স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে বহু দুঃখের তপস্যায়— নইলে যে তার অকৃতার্থতা ঘোচে না— তার পর জ্যোতির্বিগ্রহরূপেই অন্তরে পেয়েছে ব'লে বাহিরের বাহুবন্ধনে আর সে বাঁধে নি।

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' শেষ হয়েছিল জাগতিক স্নেহপ্রেমের পরিপূর্ণ স্বীকৃতিতে অথচ নিষ্করুণ একটি পরিণামে। 'চণ্ডালিকা' নাট্যকাব্যে সেই রাগবৈরাগ্যের দ্বন্দ্বে, সংসার ও সন্ন্যাসের বিরোধে, শেষ পর্যন্ত একটি অপরূপ কল্যাণসুষমা জেগে উঠেছে। সে যেন 'মহাপ্রেম মহাক্ষেম' -স্বরূপ বুদ্ধেরই প্রসন্নআত্মজ্যোতি।

জোড়াসাঁকো

জন্মাষ্টমী। ১৪ অগস্ট্ ১৯৬০

The children were shouting together
and racing along the sands :
a glimmer of dancing shadows,
a dovelike flutter of hands.

সিন্ধুকূলে নেচে ছুটে শিশুরা খেলা করছে, হেমাভ বালুবিস্তারে পলকে পলকে খেলে যাচ্ছে আলোছায়ার চমক, আকাশে উঠছে শিশুকণ্ঠের কলকাকলি। সেই সঙ্গে কবি দেখলেন আসন্ন গোধূলি-লগ্নের গ্রহনক্ষত্র সবই আলোকে উন্মুখব, চাদকে ধববে বলে ছুটেছে সূর্য, একই নৃত্যের এক আনন্দময় ছন্দ আকাশে আর ধরাতলে। তমঃশ্যামিমার বনভূমি ঘিরে আছে জ্যোতির অবাধপ্রসাবিত ক্রীড়াক্ষেত্র— বিশ্বভুবনেব উর্ধ্বে অধে খুশির শেষ নেই কোনোখানে। অহেতু লীলাব, খেলার সে খুশি ; প্রাণচঞ্চল অঙ্গে অঙ্গে স্বভাবসুন্দর ছন্দ ; ক্ষীবগন্ধি দেহে দেহে ধবে না এমন আনন্দ, কচি কোমল কণ্ঠে কণ্ঠে উচ্ছল লঘুক্ষিপ্র কলবব। বিশ্বসৃষ্টিব এখানেই যা-কিছু অর্থ, এই যেন একমাত্র দর্শনীয়।

আমাদের কবিও ঐ কথাই বলেছেন—

জগৎপারাবারের তীবে শিশুব মহামেলা।

অশরীবী মৃত্যু উড়ে চলে আকাশে ; ডুবুবি বার বার ডুব দেয় মণি-মুক্তাব খোঁজে ; বণিক দেবতার নাম নিয়ে ভাসায় তার বাণিজ্য-পোত ; কখনো ঝড় ওঠে, ভরাডুবি হয় ; এরা খেলা করে, বালুর ঘর গড়ে আর ভাঙে, ঢেউয়ের গর্জনে শোনে দোল্না-দোলানো মাতৃ-কণ্ঠস্বর, যতক্ষণ জেগে থাকে নাচে, ছোটে, কলবর করে, সুখশ্রান্ত শিথিলতনু ঘুমিয়ে পড়ে যখন জানে সে মায়েরই কোলে আছে তবু—শত সূর্য শশী নক্ষত্র জেগে আছে তার শিয়রে। সাকার প্রাণ আর

শরীরী আনন্দ এই-যে শিশু, সযত্নে আগলে আছে একে বিশ্বসংসার।

এ বড়ো আশ্চর্য। জগতে বিরোধ-বিদ্বেষ বিষাদ-হতাশা জরামৃত্যু-আত্মঘাত এ-সবই আছে। সমস্ত জগৎ এত দিনে জীর্ণ বিদীর্ণ শুষ্ক হয়ে তবু একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় নি— জীবন আছে, আনন্দ আছে, আছে পশু পাখি ফুল, আছে শিশু ও রমণী। মানুষের, অর্থাৎ পুরুষের, বল বুদ্ধি বিজ্ঞানের ভরসা যত থাক্, যতই থাক্ তার একগাছি-কেশ-সহস্র-ভাগ-করা আঙ্কিক বিশ্লেষণ আর দার্শনিক বিচারের ক্ষমতা, শিশু ও রমণী বিহনে মানুষের এ সংসার দু দিনও টিকত না। জীববিজ্ঞানীর সঙ্গে অসমকক্ষ বাগ্‌বিতণ্ডায় প্রবৃত্তি নেই; মানলেম জীবপ্রবাহ-রক্ষার জন্য এই তো জগৎপ্রকৃতির ব্যবস্থা। কিন্তু কল্পনা করা যাক, ঈশ্বরের ইচ্ছায় অথবা সর্বশক্তিময়ী প্রকৃতির খেয়ালে স্ত্রীপুরুষের ভেদ যদি না থাকত, স্বয়ম্ভূজীবনধারা বয়ে চলত সচ্ছন্দে, অন্তত মানুষের সংসারে, জীবন কি ক্ষণমাত্র সহনীয় হত। না, কখনোই না।

এ ক্ষেত্রেও বলা চলে— ছলে বলে নয়, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। জগৎ যে নিছক শক্তির প্রকাশ নয়, বিশ্বব্যাপিনী কোনো সূচ্যগ্র বুদ্ধির আঁক কষাও নয়, আনন্দেরই প্রকাশ, ছন্দের দোল— মানুষ তারই সঙ্গে নিজেকে প্রাণে আনন্দে ও ছন্দে, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে, মেলাতে না যদি পারত, এ জগতে তার স্থান হ'ত কেমন করে! মুমুক্ষু যোগী অথবা সিদ্ধ সাধকেরাও কিছু করতে পারতেন না— তাঁরা তো সেই দেহহীন অপ্রকাশের দিকে, প্রলয় বা নির্বাণের দিকে মুখ ফিরিয়েই আছেন। মানুষকে এ জগতে স্থান করে দিয়েছে নারী ও শিশু। উভয়ের মধ্যে খুব বেশি ভিন্নতাও নেই। সে কথা পরে হবে। উপস্থিত খৃস্টউক্তির কতকটা পুনরুক্তি করে বলতে ইচ্ছা করে— যে বলহীন সেই হল বিশ্ববিজয়ী; যে কোমল তাকেই বাধা দেয় বিশ্বে এমন শক্তি কোথাও নেই; যে নিরভিমান তারই উপাসনা-

রত রাজা মহারাজা থেকে পথের ভিখারী ; যে আপনাকে জানে না, চেনে না, সজ্ঞানে চায় না যেন, বিশ্বসংসার তাকেই কোলে ক'রে, বুকে ধ'রে রাখে।

ভুলে যাচ্ছি বৈরাগী পুরুষ বলবেন, 'নারী ও শিশু এ জগতে আমাদের স্থান করে দিয়েছে কী বলছ! বেঁধে রেখেছে হে, ক'ষে বেঁধে রেখেছে!' তা হবে। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে এতদিন যা-কিছু পৌরাণিক ধ্যান ধারণা বিশ্বাস আমাদের ছিল, নব যুগের নতুন কবিরা এসে, তাদের ভাবে ভাষায় ছন্দে গানে, সে-সবই ভুলিয়ে-ভালিয়ে উল্টে-পাল্টে বিষম গোল বাধিয়ে দিয়েছে। তা তো দেবেই। কবি কখনো প্রলয়ের উপাসক হতে পারে? প্রকাশই তার একমাত্র ধর্ম, আনন্দ তার একমাত্র দেবতা— সে কি পারে নারী ও শিশুকে উপেক্ষা করতে? তার জন্ম-জন্মান্তরের সখ্য-সৌহার্দ্য যে ওদেরই সঙ্গে; ওদেরই হাতে হাত ধরে, কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে, অভাষিতেও ভাষা জুগিয়ে, বিশ্বস্রষ্টার উদ্দেশে উল্লাসের অভিনন্দন সে জানায় এই তাঁর সীমাহীন বিশ্বমন্দিরে।

দেশে-দেশে যুগে-যুগে সাধু-অসাধুর মুখে মুখে যে নারীনিন্দা চলে আসছে, এখানে তার প্রবল ও প্রচুর প্রতিবাদের কোনো প্রয়োজন দেখি নে। নারীরূপিণী প্রকৃতি, বিশ্বপ্রকৃতিরই প্রতিমা, সে-সব কথা বড়ো কানে তোলেন না ; অলক্ষিত স্মিতকৌতুকে হেসে চিরাচরিত রীতিতে পুরুষকে মায়াপাশে বাঁধেন— হাসিকান্না সুখ ও দুঃখের অ-শিকল অতি কঠিন বন্ধন— বহু যাতনায় সন্তানকে জন্ম দিয়ে, বহু যত্নে তাকে মানুষ ক'রে, ভক্তিপ্রীতিস্নেহশঙ্কাকুল নানা ভাবে সাধু অসাধু সকলেরই ঘর করেন যুগে-যুগান্তরে দেশে-দেশান্তরে— না হলে মানবলোকে এই জীবপ্রবাহ মুহূর্তমাত্র থাকে না। নারীর পক্ষে দাঁড়িয়ে নূতন করে ওকালতি করার কোনো উপলক্ষ ঘটে নি। উকিলের পারিশ্রমিক তিনি হয়তো পূর্বেই চুকিয়ে দিয়েছেন, পরে না'ও দিতে

পারেন। মোটেই তিনি অবলা নন; সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি তাঁর পক্ষে আছে; তাঁর পক্ষে আছে— আছে তাঁরই বুকে কোলে— অস্ফুট-কলভাষী শিশু, কমনীয় জীবনবৃন্তে সদ্যস্ফুট প্রসূনকল্প তার শোভা।

যুগে যুগে কবি শিল্পীরা কেনই বা নারীর ধ্যান-ধারণায় রত, নারীজাতির উদ্দেশে প্রীতি ও স্তুতি -পরায়ণ, আপাতত সে আমাদের বিচার্য নয়। অতি সীমাবদ্ধ আলোচনার বিষয় হল এই— শিশুকে কী চোখে দেখেছেন কবি রবীন্দ্রনাথ, কী ভাবে অনুভব করেছেন ও প্রকাশ করেছেন, শিশুর প্রতি তাঁর যে সানন্দ অভিনিবেশ বা আকর্ষণ কী তার তাৎপর্য। এই পর্যন্তই, হয়তো তার বেশি কিছু নয়। এ প্রসঙ্গে মায়াময়ী ও কায়াময়ী[১] নারীর কথা আসে কেন? যেহেতু কান টানলেই মাথা আসে, এই মাত্র বলা যায়.।

আলোচনার সুবিধাব জন্য রবীন্দ্রনাথের শিশু-সম্পর্কিত কবিতা-গুলিকে সূচনাতেই তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা উচিত, আর সে কাজ সহজসাধ্যও বটে। বিভিন্ন পর্যায়ে সূক্ষ্মভেদ যেমন না থেকে পারে না, স্থূলভেদ রয়েছে কালগত এবং পরিবেশগত। 'শিশু' কাব্যের মুখ্য কবিতাগুলি, 'জন্মকথা' থেকে 'বিদায়' পর্যন্ত— 'তবে আমি যাই গো তবে যাই' বলে ব্যাকুলা জননীর দরবিগলিত অশ্রুধারা কচি কোমল হাতে একবার মুছিয়ে দিতে চেয়ে শিশু বিদায় নিল যখন স্নেহকোল শূন্য ক'রে— এগুলি শিশু সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রথম রচনা নয়। প্রথম জীবনের রচনাগুলি স্থান পেয়েছে এর পরেই। সেই কবিতাগুলির মধ্যেও এমন অনেক রচনা রয়েছে যা শিশুরই রূপরচনা যে এমন নয়[২]— শিশুকে উদ্দেশ করে বলা, অথবা শিশু ভোলানাথের পরিবেশটি ফুটিয়ে তোলা মাত্র। অন্য কোনো কোনো কবিতায়[৩], বোবা বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যেও যেন বা শিশুর ভাবটি প্রসারিত করে দেখা। এ ভাব পরেও দেখা যায় শারদোৎসব অথবা ফাল্গুনীর

কোনো কোনো গানে, আর—

মাধবী হঠাৎ কোথা হতে
এল ফাগুন দিনের স্রোতে
এসে হেসেই বলে যা ই যা ই যাই।

এই কবিতায়; সুর-সংযুক্ত হওয়ায় গান বলতেও বাধা নেই। যা হোক, পুরাতন রচনা-পর্যায়ে একটি কবিতা গা ঢাকা দিয়ে আছে যা কালক্রমে ও স্বধর্মে অবশ্যই নূতন। সেটি হল—

ছুটি হলে রোজ ভাসাই জলে
কাগজ-নৌকাখানি।

এ তো কবির বড় আদরের শমী, আর কেউ নয়। অন্তর্যামী কবি যেন তারই অন্তরে প্রবেশ ক'রে তারই জবানিতে, 'শিশু'র নূতন কবিতাগুলি প্রায় সবই লিখেছিলেন এ কথা কে না জানে।

'শিশু'র শেষাংশে সন্নিবিষ্ট, প্রথম পর্যায়ের অধিকাংশ কবিতা লেখা হয় বাংলা ১২৯২ সনে 'বালক' মাসিকপত্র-প্রকাশের সমকালে[৪] এবং ১২৯৩ সনে 'কড়ি ও কোমল' কাব্যে স্থান পায়। কবির তৎকালীন পারিবারিক পরিবেশে তাঁর আদরের ধন শিশুগুলি, নানা বয়সের বালক-বালিকা, তাদের উদ্দেশে যে অকৃত্রিম স্নেহোচ্ছ্বাস ও আশিস্‌ধারাবর্ষণ সেগুলি বাদ দিলে, অনূদিত কবিতাগুলিও না ধরলে, অন্য সবই কবির দূরগত বাল্যস্মৃতিরই রূপরসায়ন। সংখ্যায় বেশি না হলেও মর্যাদায় ন্যূন হবে না—

দিনের আলো নিবে এল, সূয্যি ডোবে ডোবে

অথবা—

সাতটি চাঁপা সাতটি গাছে, সাতটি চাঁপা ভাই

বিশেষ ক'রে

লুটিয়ে পড়ে জটিল জটা,
ঘনপাতার গহন ঘটা,

হেথা-হোথায় রবির ছটা— পুকুর ধারে বট

বিস্মৃতিলোকে জেগে ওঠা স্মৃতি, বাস্তবে কল্পনায় মেশা রূপ। কালের ইঙ্গিত যদিও নিরন্তর সামনেই প্রসারিত, ভুল ক'রে কবি কখন যেন আপন বাল্যকালে ফিরে গিয়েছেন। পুরাতন বটের এই ছবিই নেই কি জীবনস্মৃতিতে? লক্ষ্মণের যে মায়াগণ্ডিতে জানকী আবদ্ধ হয়েছিলেন, শ্যামের আঁকা অনুরূপ গণ্ডির মধ্যে সন্তর্পণে থেকে কবি দেখতেন—

'পুষ্করিণী নির্জন হইয়া গেলে সেই বটগাছের তলাটা তাহার গুঁড়ির চারি ধারে অনেকগুলা ঝুরি নামিয়া অন্ধকারময় জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই কুহকের মধ্যে, বিশ্বের সেই একটা অস্পষ্ট কোণে যেন ভ্রমক্রমে বিশ্বের নিয়ম ঠেকিয়া গেছে। স্বপ্নযুগের একটা অসম্ভবের রাজত্ব দিনের আলোর মাঝখানে রহিয়া গিয়াছে। মনের চক্ষে সেখানে যে কাহাদের দেখিতাম এবং তাহাদের ক্রিয়াকলাপ যে কী রকম, আজ তাহা স্পষ্ট ভাষায় বলা অসম্ভব।'

স্পষ্ট ভাষায় বলা যায় না ব'লেই কবি ছন্দোময়ী ব্যঞ্জনাময়ী কবিতার শরণ নিয়েছেন; সেই হল 'পুরোনো বট'। অন্য কয়টি কবিতাতেও এমনি ভাবে এক কালের বালকের শিহরিত পুলকিত নানা দেখাশোনার সঙ্গে নানা না-দেখা না-শোনা বিষয়ের মিশ্রণ ঘটেছে। অবশ্য, রাত্রে বিছানায় শুয়ে সুখসুপ্তি-ঘেরা স্বপ্নের জগতে প্রবেশ করবার আগে প্যারী তিনকড়ি কিম্বা মায়ের খুড়িমার মুখে যে-সব রূপকথা শোনা গিয়েছিল— সোনার কাঠি, রুপোর কাঠি, ব্যাঙ্গমা-বেঙ্গমী, তেপান্তর-প্রান্তরে-পথহারা রাজপুত্তুর এবং সাতভাই চম্পার একটিমাত্র 'প্রাণের বোন' ফোটো-ফোটো পারুল— যে-সব প্রসঙ্গে কখনো বা নিদ্রাবেশ কেটে গিয়ে কল্পনাপটু বালকের চোখ-দুটি থেকে থেকে জ্বল্‌-জ্বল্‌ ছল্‌-ছল্‌ করে উঠত— সে-সবও শৈশবের স্পষ্ট দেখাশোনার মধ্যেই পড়ে না কি? যা হোক, এ-সবই হল

সুমধুর স্মৃতি তারই, নবনবায়মান অপরিচিত জগৎকে আবিষ্কার করতে শুরু করে বালক যা-কিছু ইন্দ্রিয় মন চিত্ত মেলে দিয়ে জেনেছে নিজের বাইরে। আবিষ্কারউৎসুক বিমুগ্ধ বাল্যের ভাব অনুভূতি অভিজ্ঞতা কবি নিজের জীবন থেকেই আহরণ করে সকলের করে দিয়েছেন।

পরবর্তী পর্যায়ে, শিশু কাব্যের নূতন কবিতাগুলিতে, অপূর্বতর ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। স্মৃতি ও কল্পনার সাহায্যে অতীত ভাব ও অভিজ্ঞতার আহরণ নয়, বরং বলতেই হয় শিশুভূত কবি একান্ত-প্রত্যক্ষ, নূতন, আকাঙ্ক্ষা অভিজ্ঞতা অভিলাষকে আশ্চর্য তন্ময়তার গুণে অথচ বিশেষ কবিশক্তির দ্বারা সঙ্গে সঙ্গেই ভাষা দিচ্ছেন— আকার দিচ্ছেন। শিশু যেমন হয়েছেন তেমনি হয়ে উঠেছেন শিশুর মা, সেটি স্পষ্টই ধরা পড়ে একেবারে প্রথম কবিতায়—

খোকা মাকে শুধায় ডেকে,
'এলেম আমি কোথা থেকে,
কোন্‌খেনে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে?'

শিশুর ক্ষুদ্র দেহখানিতে অসীমের কী রহস্য আর আনন্দ প্রাণ পেয়েছে, জীবন পেয়েছে, মায়ের উক্তিতে তা কত চমৎকার ভাবে বলা হয়েছে, দৈনন্দিন গদ্যে তারই পুনরাবৃত্তির ব্যর্থ প্রয়াস করব না। এই কবিতাটিকে শিশুরহস্যের অপূর্ব কুঞ্চিকা-রূপে ব্যবহার করবেন রসিক। তবে কি সব রহস্য উদ্‌ঘাটিত অনাবৃত হয়ে পড়বে? তা কখনো হয়! মানুষের দৈনন্দিন দেখাশোনার চোখ লোক-দেখানো কাচের চোখ বললেই হয়; সে দৃষ্টিতে বিশ্বসংসারে ও মানবজীবনে কোথাও কোনো রহস্য নেই— অন্ধের কাছে যে সবই অন্ধকার। দুর্লভ ক্ষণে ক্ষণে সত্যকার চোখ মেলে মানুষ যখন দেখে, যেখানে সেখানে দৃষ্টি পড়তেই মুগ্ধ পুলকিত হয়ে দেখে রহস্যঘন আনন্দঘন রূপ— সুদক্ষ কোনো সার্জনের সুতীক্ষ্ণ ছুরি দিয়ে কিছুই বিশ্লেষণ

করা যায় না, চিরে চিরে দেখানো যায় না। আর, ভাগ্যে যায় না! নইলে তো কবি বা শিল্পী নামের, প্রেমিক বা ঋষি পদবীর, কেউ থাকত না; তা ছাড়া মায়াময় স্রষ্টাও বুঝি ঝটিতি তাঁর কারবার গুটোতেন। অতএব, রহস্যলোকে প্রবেশ করা যায় যাতে দ্বার খুলে, সেই হল রহস্যের চাবিকাঠি।

কাজেই অনুসন্ধিৎসু পাঠক হয়তো হতাশ হবেন, তবুও রহস্য-বিশ্লেষণের পণ্ডশ্রম অনাবশ্যক, কিছুটা তথ্যের সন্ধানই যথেষ্ট। নূতন কবিতাগুলি বোধ করি সবই লেখা হয় ১৩০৯ অগ্রহায়ণে কবিজায়ার মৃত্যুর পরে,[১] বাংলা ১৩১০ সনে আলমোড়ায়। কবি তখন একাই বাপের হিতবুদ্ধি আর মায়ের সেবা যত্ন দিয়ে অসুস্থ রেণুকার পরিচর্যায় ব্যাপৃত আছেন। শোক দুঃখ তাঁর সমস্ত সত্তাকে কখনোই অধিকার করতে পারে নি— এই কবিতাগুলি লিখছেন, বন্ধু মোহিতচন্দ্র সেন-সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হবে। বন্ধুপত্নী সংগত কারণেই প্রশ্ন করেছিলেন, সব কবিতাই মাতৃহৃদয়ের আদরের ধন খোকাকে নিয়ে লেখা, খুকুমণিকে উপেক্ষা করা হল কেন? কবি তার উত্তরে লেখেন—

'আমার এই কবিতাগুলি সবই খোকার নামে· খোকা এবং খোকার মার মধ্যে ঘনিষ্ঠ মধুর সম্বন্ধ সেইটে আমার গৃহস্মৃতির শেষ মাধুরী— মাতৃশয্যার সিংহাসনে খোকাই[৩] তখন চক্রবর্তী সম্রাট্ ছিল, সেইজন্য লিখতে গেলেই খোকা ও খোকার মার ভাবটুকুই সূর্যাস্তের পরবর্তী মেঘের মতো নানা রঙে রঙিয়ে ওঠে— সেই অস্তমিত মাধুরীর সমস্ত কিরণ এবং বর্ণ আকর্ষণ করে আমার অশ্রুবাষ্প এই রকম খেলা খেলছে— তাকে নিবারণ করতে পারি নে।'

অর্থাৎ, মৃণালিনীদেবীর স্মৃতির উদ্দেশে যে অশ্রুতর্পণ হল 'স্মরণ' কাব্য, প্রকারান্তরে এ কবিতাগুলি তারই আর-এক অঞ্জলি। সে কথা সত্য। এও সত্য যে, প্রায় নিজেরই প্রতিরূপ শমীন্দ্রের মধ্যে

খুঁজে পেয়েছিলেন কবি; যে তন্ময়তা ব্যতীত কোনো সত্যকার রসরূপের সৃষ্টি হয় না, এ ক্ষেত্রে ছিল তা সহজসাধ্য। 'তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে' বলতে না বলতেই যিনি কখনো 'ব্যাকুল' কখনো 'বিজ্ঞ', কখনো 'মাঝি' কখনো 'মাস্টারবাবু', কখনো 'বীরপুরুষ' আর কখনো বা মায়ের 'দুঃখহারী' হয়ে দেখা দিলেন, অন্তর্যামীরূপে তাঁকে অনুভব করতে আর কবিশক্তির গুণে বাঙ্ময় ভুবনে সৃষ্টি করে তুলতে কবির কোনো অসুবিধা ছিল না।

কবিশক্তি কথাটি আমরা একাধিকবার ব্যবহার করেছি। কবিশক্তি বলতে প্রাণময় রূপ কিম্বা রূপান্তর-সৃষ্টির ক্ষমতা, তাতে আর সন্দেহ কী। বিশেষ কথা এই যে, অনুভবী হয় অনেকে, তাদের সকলেই কবি হয় না। মা কি আর সন্তানকে বোঝেন না? তেমন আর কে বোঝে? তবু তিনি কবি বা শিল্পীর মতোই তাকে মনোময় উপাদানে পুনর্বার সৃষ্টি করতে পারেন না। কবি বা শিল্পীর এই প্রতিভা— ধ্যান-ধারণার বস্তুতে লীন হয়েও পৃথক থাকেন। তদাত্মতা না ঘটলে সত্যকে 'জানি' না, আর দ্রষ্টৃত্ব না থাকলে সে সত্যের নূতন ভাবে প্রকাশ করা যায় না, সৃষ্টি হয় না— লবণসমুদ্র মাপতে গিয়ে নুনের পুতলীর যে দশা!

সে যা হোক, ঘটনাক্রমে শিশুর কবিতাগুলি যখন লেখা হয়, কবির মনে তখন বিশেষ করে জাগছে শমীন্দ্র এবং তাঁর জননী মিলে স্নেহমমতার যে নিভৃত ভুবন সৃজন করেছিলেন একদিন, তারই আনন্দবেদনাময় স্মৃতি। নিভৃত, কেননা বিশ্বের অন্য সকলের অস্থির যাতায়াত মাত্র ছিল আর কবির স্থায়ী অবস্থিতিও ছিল অদৃশ্যভাবে। অব্যবহিত অভিজ্ঞতার মতোই জাগ্রত জীবন্ত স্মৃতি থেকে এই কবিতাগুলি। ইতিপূর্বে জ্যেষ্ঠা কন্যা বেলার আলেখ্যলিখন হয়েছে কাবুলিওয়ালা গল্পে কলভাষিণী মিনুর চরিত্রে আর কনিষ্ঠা কন্যা মীরার সম্পর্কেও কিছু কিছু সরস বিবরণ আছে ইন্দিরাদেবীকে

লেখা অনেকগুলি পত্রে, যেমন—

'ক্ষুদ্র ব্যক্তিটি নলিনীদলগত শিশিরবিন্দুর মতো বৃহৎ পৃথিবীর উপর টলমল করচে। · অনতিকাল-মধ্যে খরনখর-সুদ্ধ মোটা মোটা নরম নরম করতল দিয়ে নাক মুখ চোখ চুল গোঁফ দাড়ি যা সম্মুখে পড়তে লাগল তাতেই হস্তক্ষেপ করতে আরম্ভ করে দিলে, কেবল তাই নয়— হুঙ্কারশব্দপূর্বক আগ্রহ-সহকারে নাক চোখ ধরে মুখের মধ্যে পূরে দিতে চেষ্টা করতে লাগল। বিছানার উপর উপুড় হয়ে পড়ে টল্‌টলে মাথা এবং মোটা মোটা হাত পা দিয়ে খানিকক্ষণ আনন্দে সন্তরণও হল।

'মীরার জন্যে আমার কোনো কাজ হবার জো নেই!

'আমাকে থাব্‌ড়ে থুব্‌ড়ে, আমার বুকের উপর নৃত্য ক'রে— আমার দাড়ি গোঁফ, চুলের সিঁথে, লেখবার খাতা, গল্পের প্লট, ভাবের অনুবৃত্তি, সমস্ত দুই ক্ষুদ্র হাতে ঘেঁটে নাস্তানাবুদ করে দিয়ে তবে তিনি আমার গৃহ হতে নিঃসৃত হন।'[৭]

বেলা বা মাধুরীলতা স্থান পেলেন গল্পে, মীরার বহু বিবরণ পাওয়া গেল ছিন্নপত্রাবলীতে, আর অন্যান্য ছেলে-মেয়েদের শৈশব-লীলা ও শিশুভাবের বর্ণনাও অন্য চিঠিপত্রে পাওয়া যায় না এমন নয়।[৭] কিন্তু, এ-সবই গদ্যে, অথচ শমীন্দ্রনাথের অভিষেক হল কবি-কল্পলোকের যৌবরাজ্যে, এ কি শুধু কাকতালীয় ঘটনামাত্র? আকস্মিক? অন্য কোনোরূপ হলে হতে পারত কি? সেই আমাদের জিজ্ঞাসার বিষয়।

এ কথা ভুললে চলবে না— রবীন্দ্রনাথ শমীন্দ্রনাথকেই আবিষ্কার করেন নি শুধু কবিদৃষ্টি দিয়ে, **শমীন্দ্রনাথের মধ্যে আবিষ্কার করেছেন নিজেকে**। স্মরণ করতে হবে যে, ভৃত্যরাজকতন্ত্রে অনেকটা স্নেহবঞ্চিত নিঃসঙ্গভাবে মানুষ হয়েছিলেন তিনি, মাতৃস্নেহের ক্ষুধা তাঁর কিছুই মেটে নি। নতুন বৌঠানের মধুর সখ্যের সঙ্গে স্নেহ মিশ্রিত হয়ে কিছু

তার সান্ত্বনা হয়েছিল বটে, সেও অল্পকালের জন্য। সুতরাং বঞ্চিত বাল্যজীবনের প্রচ্ছন্ন গভীর অভাববোধ থেকেই কবির স্বভাবস্বচ্ছ দৃষ্টি আরও প্রখর মর্মস্পর্শী এবং অন্তর্দর্শী হয়েছিল সন্দেহ নেই। মাতা-পুত্রের সঙ্গে কবির ঐকান্তিক তাদাত্ম্য হয়েছিল তারই ফলে। মনে পড়ে না কি মাতৃপরিত্যক্ত, আজন্মনিঃসঙ্গ, মহাবীর কর্ণের বেদনা ?—

শুনিয়াছি লোকমুখে,
জননীর পরিত্যক্ত আমি। কতবার
হেরেছি নিশীথস্বপ্নে জননী আমার
এসেছেন ধীরে ধীরে দেখিতে আমায় ;
কাঁদিয়া কহেছি তাঁরে কাতর ব্যথায়,
'জননী, গুণ্ঠন খোলো, দেখি তব মুখ'—
অমনি মিলায় মূর্তি তৃষার্ত উৎসুক
স্বপনেরে ছিন্ন করি।

গূঢ়তম গভীরতম উপলব্ধি, আত্ম ও অনাত্মের ভেদ যেখানে লোপ পেয়েছে বললেই চলে, অলীক কল্পনা যাতে একেবারে আমল পায় নি, এমন সম্পূর্ণ সত্যের প্রকাশ তো একমাত্র কবিতাতেই হতে পারে। গদ্যের আধারে এ জিনিষ ধরা যায় না। কবিচেতনার ঊর্ধ্বাকাশে আকীর্ণ সূক্ষ্ম অশ্রুবাষ্পের স্তরে স্তরে আকা হয়েছে এই-যে চিত্ররাজি, জীবনের 'অস্তমিত মাধুরীর সমস্ত কিরণ এবং বর্ণ আকর্ষণ ক'রে' কিসে এত সুন্দর হয়েছে, বর্ষণশেষ ইন্দ্রধনুর ভাগ্যে যাই থাক্-না কেন এমন সুচিরস্থায়ী হয়েছে সহৃদয়হৃদয়সংবেদ্য কবিতারূপে— তার নিগূঢ় কারণ কিছু হয়তো বোঝা গেল।

শিশু সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় পর্যায়ের কবিতাগুলি দেখি 'শিশু ভোলানাথ' কাব্যে। অধিকাংশ কবিতার রচনাকাল বাংলা

১৩২৮ সনের ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিকে। ভাদ্রের শেষ দিকে যেমন কিছু লিখেছেন, কার্তিকের সূচনাবধি তেমনি জের টেনেছেন এই রচনাধারার; অধিকাংশই লেখা হয়েছে শিশিরশীতল, শেফালিসুগন্ধি, সোনালি-আলোকে-সকাল-সন্ধ্যার-দুকূল-প্লাবিত আশ্বিনের দিন-গুলিতে। আশ্বিনে শরৎশ্রী তাঁর আলোককমলাসনে পরিপূর্ণ মহিমায় অধিষ্ঠিতা। আশ্বিনে প্রকৃতির বর্ষণবিধৌত শস্পশ্যামল অঙ্কে বিশ্ব-ব্যাপী শৈশবের ভাবটি লালন করবার দিন। পরিব্যাপ্ত প্রচুর ফল-শস্যের সম্ভাবনা আছে; অথচ তার জন্য কোনো কামনা, কোনো প্রাণপণ প্রয়াস, কোনো আসক্তি লক্ষ্য করা যায় না— স্বচ্ছধারা ভরা-নদীর কূলে কূলে আর আদিগন্ত মাঠে মাঠে সবুজ ধানে ও প্রফুল্ল কাশে খুশির হিল্লোল উঠেছে শুধু, খেলার তরঙ্গ। বিহঙ্গবৈতালিকের গানে গানে বনভূমি প্লাবিত। এই আশ্বিনই ছিল রবীন্দ্রনাথের 'শারদোৎসব'-উদ্‌যাপনের পটভূমি ও পরিবেশ। বিশ্বজীবনের পরি-প্রেক্ষিতে শিশু ভোলানাথের যে লীলাবিলাস, এবার বসলেন তারই ধ্যানে। জীবপালিনী নিখিলপ্রকৃতির প্রাণের নিধি, আনন্দে উদাস হয়ে খুশির সন্ন্যাসে বেরিয়ে এসেছেন অপ্রকাশের থেকে প্রকাশে, সঙ্গে এনেছেন এই কবিভক্তকে।

এই 'কবিতাগুলো খামকা কেন লিখতে বসেছিলুম' তারই জবাবে রবীন্দ্রনাথ বলেন—

'লোকরঞ্জনের জন্যে নয়, নিতান্ত প্রাণের গরজে।··· কিছুকাল আমেরিকার প্রৌঢ়তার মরুপারে ঘোরতর কার্যপটুতার পাথরের দুর্গে আটকা পড়েছিলুম। সেদিন বুঝেছিলুম জমিয়ে তোলবার মতো এতবড় মিথ্যে ব্যাপার জগতে আর কিছুই নেই।··· পৃথিবীতে সৃষ্টির যে লীলাশক্তি আছে সে যে নির্লোভ, সে নিরাসক্ত, সে অকৃপণ ; সে কিছু জমতে দেয় না, কেননা জমার জঞ্জালে তার সৃষ্টির পথ আটকায়; সে যে নিত্যনূতনের নিরন্তর প্রকাশের জন্যে তার

অবকাশকে নির্মল করে রেখে দিতে চায়।...

'আমেরিকার বস্তুগ্রাসের থেকে বেরিয়ে এসেই 'শিশু ভোলানাথ' লিখতে বসেছিলুম, বন্দী যেমন ফাঁক পেলেই ছুটে আসে সমুদ্রের ধারে হাওয়া খেতে তেমনি ক'রে।... আবিষ্কার করেছিলুম, **অন্তরের মধ্যে যে শিশু আছে তারই খেলার ক্ষেত্র লোকে লোকান্তরে বিস্তৃত।... কল্পনায়** সেই শিশুলীলার মধ্যে ডুব দিলুম, সেই শিশু-লীলার তরঙ্গে সাঁতার কাটলুম, মনটাকে স্নিগ্ধ করবার জন্যে, নির্মল করবার জন্যে, মুক্ত করবার জন্যে।'[৮]

'শারদোৎসব' এবং 'ঋণশোধ' নাট্যকাব্যে কবি এই কথাই বুঝিয়েছিলেন যে, বিশ্বব্যাপার রীতিমত কোনো বিষয়কর্ম নয়— বড়ো জোর এই বলা যায় সে আনন্দের ঋণ শোধ করছে সুন্দর ক'রে, সুন্দর হয়ে উঠছে প্রতিক্ষণে আনন্দের দেনা শুধছে ব'লেই। সে যা হোক, দেখা যায় কবি মুক্তির প্রয়াসী স্থূল বৈষয়িকতার কারাগার আর জড়ের বন্ধন থেকে ; তাই ভাবছেন—

ছোটো ছেলে হওয়ার সাহস আছে কি এক ফোঁটা,
তাই তো এমন বুড়ো হয়েই মরি !

যেদিনের কথা মনে পড়ছে—

সেদিন মনে জেনেছিলেম নীল আকাশের পথে
ছুটির হাওয়ায় ঘুর লাগালো বুঝি।

অবশেষে, ছেলের সঙ্গে যিনি আছেন নিত্য-ছেলেমানুষ হয়ে তাঁকেই কি সম্বোধন করে বলছেন ?—

ওরে মোর শিশু ভোলানাথ, মোরে ভক্ত ব'লে
নে রে তোর তাণ্ডবের দলে...
খেলেনা ভাঙার খেলা দে আমারে বলি।
... তোর মত্ত নর্তনের চালে
আমার সকল গান ছন্দে ছন্দে মিলে যাবে তালে।

এটা স্পষ্ট, আপন স্বভাবের উপর নানা কারণে যে অস্বাভাবিক পীড়ন এসে পড়েছিল তারই প্রতিকার খুঁজছেন কবি, তার থেকে মুক্তি চান। সে মুক্তি মানবস্বভাবের মধ্যে যে চিরশিশু আছে তারই উদ্‌বোধনে, জীবনে সকল রকমে তারই খেলাক্ষেত্র-রচনায়। এ কথা ঠিকই রবীন্দ্রনাথের এই ষাট বছর বয়সে যখন তাঁর শিশু খেলুড়েরা কেউ চলে গেছে, কেউ বড়ো হয়ে বিষয়কর্মেই মন দিয়েছে, অতি নিকট সংস্পর্শে ও প্রত্যক্ষভাবে তাঁকে সঙ্গ দান করবার কেউ নেই, তখন কবির এই শাশ্বত শৈশবের ধারাজলে অবগাহন, শিশু ভোলানাথের ধ্যান ও আরাধনা অনেকটাই মনন-সাপেক্ষ, অনেকটাই আত্মগত। মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের প্রাণের শিশুটিকে নাম ধ'রে ডেকেছিল হাসি ও তাতা (ধ্রুব) ; ডাকঘরের ঠাকুরদাদাও তাঁর নিজের আসল স্বভাবটি পুনরাবিষ্কার করেছিলেন বালক অমলকে সঙ্গ দিতে গিয়ে ; 'শারদোৎসব'-উদ্‌যাপনের দিনেও তাঁর ঠিকুজিকোষ্ঠী-গত 'বয়সের হিসাবে পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছরের গরমিল' ঘটিয়েছিল বেহিসেবী বালকের দল তাঁকে ঘিরে নেচে কুঁদে, তাঁকে ঘরের বাইরে টেনে নিয়ে মাঠে বনে আর বেতসিনীর তীরে তীরে। এ দিকে রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যগুণে শমী পলাতক, 'তিন বছরের প্রিয়া'ও এসে পৌঁছোন নি, আশ্রমের শিশুরা পূর্বের মতো আর তাঁকে সঙ্গদান করে না বা করতে পারে না— সুতরাং আত্মগত এবং আত্মসৃজিত অনুভবের ভুবনেই কবিকে লীলাময় বালগোপালের সন্ধান করতে হয়। একাগ্র প্রতিভার গুণে, দূরগামী দৃষ্টির প্রসাদে ও অলোকসামান্য কল্পনার শক্তিতে সে সন্ধান ব্যর্থ হয় না। ফলতঃ, 'খেলাভোলা' 'পথহারা' 'দুষ্টু' 'রাজমিস্ত্রি' 'মর্তবাসী' যে বেশেই দেখা দিন-না চিনতে পারি এ-যে প্রায় সেই শিশু যাকে আমরা বৈজ্ঞানিক বা বীরপুরুষ অথবা মা-জননীর ব্যথাহারী বলে বহুকাল থেকেই জানি— বাল্যসঙ্গিনী ইরু যাকে অনাবিষ্কৃত রাজবাড়ির ইঙ্গিতে আকুল করেছিল, মাকে নিয়ে

নিভৃত দণ্ডকবাসে যাবারও যার সাধ ছিল, যে ছিল কুড়োনো কুকুর-ছানাটিরও সমব্যথী, যার দিকে মনের নয়নে চেয়ে চেয়ে প্রথম মনে হয়েছিল—

এই-যে খোকা তরুণতনু নতুন মেলে আঁখি
হিরণময়-কিরণ-ঝোলা
যাঁহার এই ভুবন-দোলা
তপন-শশী-তারার কোলে দেবেন এরে রাখি।

সত্যই। অথচ, স্বভাবশিশুটির মনের আনাচে-কানাচে কিছু কি তত্ত্বভাবনার অতিসূক্ষ্ম আভাস দেখা দেয় ক্ষণে ক্ষণে? সে কি কবিমানসের কোনো পরিণতিরই পরিচয়? 'শিশু ভোলানাথ' 'শিশুর জীবন' প্রবেশক দুটি কবিতা, কবির জবানবন্দিতেই, কবির গভীর তত্ত্বভাবনাকে আত্মসাৎ ক'রেই রসরূপ পেয়েছে, সে কিছু অপ্রত্যাশিত নয়। আবার, 'তুই আমি' 'দূর' 'সংশয়ী' 'বাউল' 'মর্তবাসী' 'বাণীবিনিময়' প্রভৃতি কবিতাও হয়তো সূক্ষ্মতর ভাবনা থেকেই রূপ পেয়েছে, হয়তো বেশি 'কবিত্বময়' হয়ে উঠেছে, অথবা হয়তো এ-সমস্তই আমাদের তথ্যকুড়োনো মনের দিগ্‌ভ্রান্ত অনুমান মাত্র। নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। তবে, 'মুর্‌খু' ছেলেটি, স্বপ্নে 'পথহারা' ছেলেটি, যে ছেলেটি বলে—

আজকে নাহয় বাবার চিঠি মাসি লিখুন নাকো

যে বলে আবার—

তোমার বুকে মুখটি গুঁজে
ঘুমেতে চোখ আসবে বুজে,
তখন যেন বাবার কাছে যাস নে আবার চলে

হয়তো হাততালি দিয়ে বলে ওঠে—

কে ছিল সেই রানী
আমি জানি জানি জানি

সে যে নেহাতই কল্পনাপ্রবণ অবোধ শিশু, আমাদের চিরচেনা শিশু, তাতে আর ভুল নেই।[৯]

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি।

বিশ্বসৃষ্টির মূলীভূত এই আনন্দ প্রাণরূপে প্রথম জড়বাধা উদ্ভেদ করে পৃথিবীতে দেখা দিয়েছে। মানুষের সংসারে সেই প্রাণের প্রত্যক্ষরূপ বিশুদ্ধভাবে ধরা রয়েছে শিশু এবং নারীর মধ্যে। বৃন্তবিহনে যেমন পুষ্পটি থাকে না এবং তাকে ধরে দেখার সুবিধাও হয় না, নারীকে বাদ দিয়ে শিশুর ভাবনাও তেমনি অসম্ভব ও অসার্থক। এই প্রাণপ্রবাহে অনাদিকাল থেকে সমুদয় ধরাভূমি, সমস্ত মানবের সংসার, নিশিদিন ধৌত হয়ে পবিত্র হয়ে রয়েছে।[১০] মৃত্যু এই প্রাণকে নিবারণ করে না, তাকে নব নব পরিণতিতে নিয়ে যায় মাত্র। এক বিদেশী কবি বলেছেন— এ সংসারে এত দুঃখ, এত আত্মিক ও মানসিক দৈন্য, এত বিপদ ও হতাশার কারণ থাকতেও, বিশ্বস্রষ্টা বা বিশ্বপ্রকৃতির কি এক সুদূর ও সুমহান্ লক্ষ্য আছে, সেটি থেকে তাঁরা লেশমাত্র বিচলিত হন না, আশা ও সংকল্প ক্ষণমাত্র ত্যাগ করেন না, তারই সাক্ষ্য বা প্রমাণ এই দেখি দেশে-দেশে কালে-কালে সেই পুরাতন[১১] শিশুর আবির্ভাব সেই চিরনূতন সৌন্দর্যে ও পুলকে। পাষাণ ভেদ করে জাগে সবুজ দূর্বাদল। শ্যামলসুন্দর 'দুর্বল' প্রাণের এই অপরাজেয় বীর্য। আর এই চিরন্তন শিশু দিনে দিনে তেমনি নূতন, তেমনি আনন্দকিরণে উন্মীলিত যেমন প্রতিদিনের সূর্য। পরিণত মানবতার অন্তরে দেখা দিয়েছে মন; সে মন পরকে এবং আপনাকে সম্পূর্ণ জানবে, আয়ত্ত করবে, এই তার পণ। নিজের সম্পর্কে কতটা কৃতকার্য হয়েছে আজ বলা না গেলেও, অণু পরমাণু পর্যন্ত বিশ্লেষ ক'রে প্রকৃতির অনিঃশেষ তেজের

রুদ্ধ ভাণ্ডারে দ্বার ভেঙে প্রবেশ করেছে এবং গ্রহে গ্রহান্তরে হাত বাড়াতে উদ্যত হয়েছে সে আমরা জানি। দুর্বুদ্ধিপ্রভাবে নিজেই নিজেকে ধ্বংস না করলে সাধনার সিদ্ধিও তার সুনিশ্চিত— এ বিষয়ে ভিন্নমত হবে না। তবু পীড়িত মন-বুদ্ধি নিজেকে বলছে, চিরদিন যেমন বলে এসেছে: ততঃ কিম্? তার পর কী? মানবমানসের জাগ্রতলোকে বা পাতালে, বিশ্বাকাশের অচিন্ত্যদূরবর্তী নক্ষত্রে বা নীহারিকায় এ প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই। ছিল না কোনোদিন। কেবল, জ্ঞানে নয়, ধ্যানে পেয়েছেন ঋষি— চেতনা উদ্ভাসিত ক'রে দেখা দিয়েছে এই সত্য— আনন্দ থেকে যা-কিছু সৃষ্টি, আনন্দেই তার স্থিতি এবং আনন্দেই তার প্রত্যাবর্তন। অজ্ঞান ও জড়তা দূর ক'রে দেখলে, উপলব্ধি করলে, নিখিলসৃষ্টি কেবল এক অনাবিল-আনন্দ-বৃত্ত। কিন্তু দুর্লভ এই ঋষিদৃষ্টি; অন্তরে অন্তরে যদি বা বিশ্বাস করি, স্বীকার করি, এ দেখা আমাদের হয়ে ওঠে না। অথচ প্রাণ আবৃত, মন পীড়িত— প্রাণের আরাম এবং মনের নিবৃত্তি কোথায় সে?

নিরাকারের কী প্রয়োজন ছিল আকারে? আকারলাভেও যথেষ্ট হল না— প্রাণ চাই, বেদনা[১২] চাই, সুখদুঃখ চাই, চাই স্বতন্ত্র গতি এবং নৃত্যের ছন্দ! সেও কি যথেষ্ট হল? বিচারবিশ্লেষণ ক'রে, তন্ন তন্ন করে জানতে চাই; সব-কিছু বাইরে থেকেই আয়ত্ত করতে চাই— যেমন বহির্বিষয়ে তেমনি আপনাতে। 'ঘর কৈনু বাহির আপন কৈনু পর' —বৈষ্ণব কবির এ উক্তি কী বিপরীত ভাবেই সত্য হল মনের দুরাকাঙ্ক্ষায় ও দুঃসাহসে! 'হওয়া'র পরিবর্তে 'করা', বিশেষতঃ 'জানা' —এই কি মানবজীবনের সার্থকতা! স্বরচিত দুর্ভেদ্য দুশ্ছেদ্য জালে বিজড়িত 'রাজা'কে বলতে হয়েছিল শেষে— না, না, না! আনন্দনন্দিনীর সকল প্রাণরস মুষ্টিতে পেষণ ক'রে, বকযন্ত্রে শোধন ক'রে, কাচবুদ্বুদে বন্দী ক'রে ফেলবার দুর্দমনীয়

কামনা থাকলেও, এমন-কি ঐ নন্দিনীর কুঞ্চিত কালো কেশে নিবিষ্ট প্রফুল্ল করবীগুচ্ছের একটি ফুলের একটি পাপড়ির রহস্যও নিঃশেষে আয়ত্ত করা যায় নি। প্রাণ থেকেই প্রাণ জেগেছে, জড় থেকে প্রাণ সৃষ্টি করতে আজ পর্যন্ত বিজ্ঞান কৃতকার্য হল না।

পঞ্চভূতের ষড়যন্ত্র বরং পরিণামে জটিল হয়ে উঠেছে আরও, ষষ্ঠ মনের হস্তক্ষেপে। তাই কবি বলেন, 'সভ্যতার খাতিরে মানুষ মন-নামক আপনার এক অংশকে অপরিমিত প্রশ্রয় দিয়া অত্যন্ত বাড়াইয়া তুলিয়াছে, এখন তুমি যদি তাহাকে ছাড়িতে চাও সে তোমাকে ছাড়ে না।··· আমাদের **ভিতরকার সমস্ত সামঞ্জস্য নষ্ট করিয়া** আমাদের মনটা অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাকে কোথাও আর কুলাইয়া উঠিতেছে না।'[১৩]

প্রাণ থেকে মনের এই একান্ত পার্থক্য এবং পার্থক্যের কারণেই তার প্রতি মনের দুরন্ত আকর্ষণ মানুষ ভুলে থাকতে পারে না, বিশেষতঃ যে মানুষ প্রেমিক অথবা কবি। কবির প্রৌঢ় পরিণত সত্তায় মননশীলতা যেমন এক উৎতুঙ্গ চূড়ায় উপনীত না হয়ে পারে না, তেমনি সত্তার অণু-পরমাণুতে অনুস্যূত প্রাণধর্ম সম্পর্কেও তাঁর পরিচ্ছন্ন চেতনা থাকে— সে যেন তানপুরা যন্ত্রে মূল সুর একটি শ্রুত বা অশ্রুত ধ্বনিতে কেবলই বাজছে; জীবনের চিরবিচিত্র রাগিণী বিভিন্ন স্বরগ্রামে ও দুশ্চর তানকর্তবে যত দূরেই সঞ্চরণ করুক সেই সুরেই সর্বদা বাঁধা আছে, ফিরে ফিরে সেটিকেই ছুঁয়ে যাবে। বিভ্রান্ত বিষয়ী মানুষ, দু দিনেই রুগ্ন বা জরাগ্রস্ত তার দেহ এবং মন, তার থেকে কবি-চেতনার এখানেই ভিন্নতা। অবশ্য, লোকোত্তর প্রতিভার অধিকারী কোনো কবি কখনোই প্রাণস্তরে থাকেন না। প্রাণ দিয়ে প্রাণকে জানা যায় না। প্রেমিক, কবি বা ঋষি তাকে জানেন চেতনা দিয়ে— নইলে তাঁদের প্রেম প্রতিভা ঋষিদৃষ্টি কখনো সার্থক হতে পারে না।

বর্তমান প্রবন্ধকার এখানে আক্ষেপ করে অবশ্যই বলতে পারেন আত্মগতভাবে: মনের ছলনে ভুলি কী ফল লভিনু হায়! চেতনা ব'লে দুর্লভ হীরকদ্যুতি একটি পদ! বিপদ আর কাকে বলে! এ কি ব্যাখ্যা করা যাবে? আপাতত ব্যাখ্যায় কাজ নেই। (মূলগত কোনো কথাই হয়তো নিঃশেষে ব্যাখ্যা করা যায় না।) মনে পড়ে অখ্যাতনামা কোনো কবির অদ্ভুত এক উক্তি—

নারী হয়তো কবি, কিন্তু অন্ধ! চোখ মেলে আপন-পরের সৌন্দর্য সে দেখে না। চোখ বুজে ঘর-দ্বার বেশ-বাস সবই সুন্দর করে তোলে দুটি হাতের আদর দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে। অন্ধ কবি স্পর্শের কবিতা রচনা করে আপনার চার ধারে, স্পর্শেরই কবিতা পাঠ করে সর্বাঙ্গ দিয়ে।[১৪]

আসলে চক্ষুষ্মান কবিকেই আমরা কবি বলি। তিনি মুগ্ধ হন, সংগীতে মুখর হয়ে ওঠেন নারী শিশু এবং ফুল দেখে। তিনের মধ্যে একটি সাজাত্য আছে। বলা চলে ফুলের মধ্যেও আছে শিশুর ভাব আর সুস্থ স্বাভাবিক নারীর মধ্যেও আমরণ একটি শিশুর স্বভাব। শিশু ফুল ভালোবাসে আর নারী ভালোবাসে শিশুকে। নারী শিশু ফুল একত্র যে শোভা ধরে, যে চমৎকার সৃজন করে, তেমন আর কোথায়! এই অপূর্ব ত্রয়ীর, আমরা বলব, শিশুই শ্রেষ্ঠ বিগ্রহ। নিশ্চল বোবা প্রাণ তার মধ্যে নৃত্যপর এবং মুখর হয়েছে যেমন, তেমনি কোনো দিকে একটু আক্রান্ত হয় নি দুর্ভর দুর্ভাবনায়— সকল সংসারও তাকে সযত্নে আগলে রেখেছে। জড়ভারপীড়িত বিষয়ী মানুষও এ কথা জানে না এমন নয়। এখানে এসেই সে তার বৈষয়িকতা কদাচিৎ ভুলতে পারে, ত্যাগ করতে পারে। পীড়িত অন্তরাত্মা যার বলে—

'কে নিবি গো কিনে আমায় কে নিবি গো কিনে'
পশরা মোর হেঁকে হেঁকে বেড়াই রাতে দিনে

সেই মানুষটির পরিণামরমণীয় বাণিজ্যব্যাপারের সমগ্র কাহিনী আমরা কবির জবানিতেই জানতে পারি—

মুকুট-মাথে অস্ত্র-হাতে রাজা এল রথে।··
দুয়ার খুলে বৃদ্ধ এল হাতে টাকার থলি।··

এমন-কি, যখন—

সন্ধ্যাবেলায় জ্যোৎস্না নামে মুকুল-ভরা গাছে,
সুন্দরী সে বেরিয়ে এল বকুলতলার কাছে।

রাজা মহারাজার প্রতাপ, মুনাফার পরিস্ফীতি, সুন্দরের সহাস্য কটাক্ষ বা চোখের জল, কিছুতেই নিঃশেষ করে নিজেকে দেওয়া গেল না— দফায় দফায় ভেঙে ভেঙে নিজেকে হয়তো নানা স্থানেই দেওয়া যায়, কিন্তু সে যে লোকসান করা কেবল, এক জায়গায় সব দিতে পারলে তবে তো সব পাওয়া যাবে— তেমন করে কে পারবে নিতে?—

সাগরতীরে রোদ পড়েছে, ঢেউ দিয়েছে জলে,
ঝিনুক নিয়ে খেলে শিশু বালুতটের তলে।
যেন আমায় চিনে বললে 'অমনি নেব কিনে'।
বোঝা আমার খালাস হল তখনি সেই দিনে।
খেলার মুখে বিনামূল্যে নিল আমায় জিনে।

গোপাল আমার কত সেয়ানা দেখেছ! দুর্ভর জীবনের ফেরিওয়ালাকে হাঁকতেও হয় নি পশরা, আগে ভাগে 'অমনি নেবার' দাবি দিয়ে বসল। এ আবার কেমন কেনা-বেচা! বোঝা ফেলে দিয়ে পশারী যে তখনি তাকে কোলে তুলে নিল সে তো আমরা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি।

শিশুচরিতে এবং শিশুর সাহচর্যে কবি চেয়েছেন মুক্তি, সে আমরা পূর্বেই জেনেছি। সেই আকাঙ্ক্ষাই প্রকারান্তরে প্রকাশ পেয়েছে রূপকের ভাষায় উল্লিখিত কবিতায়।[১৫] রূপক বাদ দিয়ে প্রায়

নিরলংকার ভাবে ভাষায় ব্যক্ত করলে সেটি এরূপ হয়—

তোমার ছুটি নীল আকাশে, তোমার ছুটি মাঠে,
তোমার ছুটি থৈহারা ঐ দিঘির ঘাটে ঘাটে।
তোমার ছুটি তেঁতুলতলায় গোলাবাড়ির কোণে,
তোমার ছুটি ঝোপেঝাপে পারুলডাঙার বনে।
তোমার ছুটির আশা কাঁপে কাঁচা ধানের ক্ষেতে,
তোমার ছুটির খুশি নাচে নদীর তরঙ্গেতে।
আমি তোমার চশমা-পরা বুড়ো ঠাকুরদাদা
বিষয়-কাজের মাকড়্‌ষাটার বিষম জালে বাঁধা।
আমার ছুটি তোমারই ঐ চপল চোখের নাচে,
তোমার ছুটির মাঝখানেতেই আমার ছুটি আছে।[১৬]

ঠাকুরদা-ঠাকুরমার সঙ্গে নাতি-নাৎনীর মধুর সম্পর্কের তাৎপর্যটি পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। এমন-কি, যে মানুষ গৃহপরিবারহীন, আধা-বৈরাগী, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তারও নিভৃত-অন্তঃকরণ-বাসী ঐ শিশু ভোলানাথের দিকেই আকৃষ্ট যে, তারও নানা সাক্ষ্য প্রমাণ আছে আর আছে আমাদের নির্জনের বন্ধু আমিয়েল সাহেবের স্বীকারোক্তি।[১৭] যে ব্যক্তি নিশ্চল, অনুভূতির গুণে ধাবমানের মধ্যেই সে গতিশক্তি লাভ করে। বৃদ্ধ যে, দেহ যার জীর্ণ, তার মনটি উৎসুক উন্মুখ হয়ে থাকে আনন্দময় ও ক্রীড়াপর শিশুর অভিমুখে; কেননা সেই শিশুর ভিতরেই বৃদ্ধের দ্বিতীয় শৈশব, সার্থক শৈশব। (শিশু এবং বৃদ্ধ মিলে একটি যেন বৃত্তের সম্পূর্ণতা।) আনন্দে নেচে বেড়ায় শিশু, হাসে কাঁদে; তার কান্না-হাসি-খচিত চিরবিচিত্র এবং চিরউচ্ছল আনন্দটির পুরোপুরি আস্বাদ পেল কেবল বৃদ্ধ। বৃদ্ধের প্রাণের ভিতরের চিরশিশুটি, যে তার আসল স্বরূপ, সেই তো বাইরে এসে খেলা করছে শিশুর বেশে— তার প্রাণের প্রাণ, নয়নের মণি, আদরের ধন, স্নেহপ্রীতির পুতলি নাতি-নাৎনীর বেশে। সংসারে

আমরা সততই দেখেছি, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সন্তানস্নেহের প্রকাশ অল্প হয়ে প্রবল হয়ে ওঠে পৌত্রাদির প্রতি প্রীতিভালোবাসা। নানা কারণের মধ্যে মুখ্য কারণটি তার এই যে, শিশুর মধ্যেই বৃদ্ধের আত্মআবিষ্কার ঘটে ষোলো আনা ; নূতন দর্পণে সেই পুরাতন ছবিটি দেখেই তো বৃদ্ধের সময় হবে সংসার থেকে বিদায় নেবার। শিশুরাও জানে, বাপ-মায়ের শাসনের শঙ্কা ও সম্ভাবনা থেকে পালিয়ে আশ্রয় নেবার মতো সুদৃঢ় দুর্গ হল ঠাকুরদা-ঠাকুরমার স্নেহ। তারা জানে, এই বৃদ্ধ বা বৃদ্ধার পক্ক কেশ, স্খলিত দন্ত, বলিত অবয়ব, নত বা সংকুচিত দেহ সত্ত্বেও এ যেন তার সমবয়সী— তার সকল খেলাধুলার মধ্যে একটি এর ভাগ আছে। বলা যেতে পারে, আহূত-অনাহূত পরিচিত-অপরিচিত সকলকে অন্ন বেঁটে দেওয়ার আগে একটি যেমন পিতৃভাগ বা ঋষিভাগ রাখে যজ্ঞে।

আর বেশি বকুনির প্রয়োজন দেখি নে। কবির যে ভাব পরিচ্ছন্ন-ভাবে ব্যক্ত হয়েছে তাঁর নানা চিঠিতে, ডায়ারিতে, প্রবন্ধে— তাঁর যে কল্পনা, যে অন্তরঙ্গ উপলব্ধি ও 'প্রবেশ', রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে অজস্র কবিতায় ও গানে— ব্যাখ্যাছলে একেবারে তা আবরণ করে কোনো লাভ নেই। কবিচিত্তের প্রত্যক্ষ পরিচয়-লাভে যাদের বড়ো বেশি আলস্য বা জড়তা, চতুর্দশ-মহলা কাব্যলোকের একেবারে বাইরের দেউড়িতে তাদের নিয়েই আমাদের আসর জমানো। ভিড় দেখে আরও বুঝি ভিড় বেড়ে যায়। কবির সত্য পরিচয় মিলবে, মানবজীবনের সামগ্রিক বোধ হবে, কেবল কবিতায়— তারই কোন্ উদ্‌ধৃতিতে এ প্রসঙ্গ শেষ করি ভাবতে গিয়ে হঠাৎ মনে পড়ল শিশু-তীর্থের উৎসতলাটি—

সেই উৎস থেকে জলস্রোত উঠছে যেন তরল আলোক,
প্রভাত যেন হাসি-অশ্রুর গলিত মিলিত গীতধারায় সমুচ্ছল।…

প্রভাতের একটি রবিরশ্মি রুদ্ধদ্বারের নিম্নপ্রান্তে
তির্যক্ হয়ে পড়েছে।···

দ্বার খুলে গেল।
মা বসে আছেন তৃণশয্যায়, কোলে তাঁর শিশু,
উষার কোলে যেন শুকতারা।
দ্বারপ্রান্তে প্রতীক্ষাপরায়ণ সূর্যরশ্মি
শিশুর মাথায় এসে পড়ল।
কবি দিলে আপন বীণার তারে ঝঙ্কার,
গান উঠল আকাশে—
জয় হোক মানুষের,
ওই নবজাতকের,
ওই চিরজীবিতের।'[১৮]

ভক্ত খৃস্টানেরা এই শিশুকেই দেখেছে দেশে-দেশে যুগে-যুগে জননী মেরীর কোলে, যে শিশু একাধারে ঈশ্বরের পুত্র এবং নিখিল-মানবেরও সন্তান। এই শিশুতে জীবনের সকল আশা ও স্বপ্ন শরীরী, এই শিশুতে সকল অকল্যাণ থেকে মুক্তি।

'আমি' এবং 'আমার মন' উভয়ে মিলে যে বাক্যালাপ হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের লেখা তারই বিবরণে এ কথা হয়তো আরও স্পষ্ট হবে। সবে তখন শরৎপ্রভাতের শুকতারা দেখা দিয়েছে, তরুতলে দু-চারটি শিউলি ফুল ঝরেছে—

দেখা দিল লেজ দুলিয়ে ভোরবেলাকার একটি দোয়েল পাখি।

আর কী?

আর, একটি শিশু, সে খিল্ খিল্ করে হাসতে হাসতে মায়ের কোল থেকে ছুটে পালিয়ে এল বাইরের আলোতে।

'তুমি যে বললে আগমনী, সে কি এরই জন্যে?'

'হাঁ, এরই জন্যেই তো প্রতিদিন আকাশে বাঁশি বাজে, ভোরের বেলায় আলো হয়।'

'এরই জন্যে এত জায়গা চাই?'

'হাঁ গো, তোমার রাজার জন্যে সাতমহলা বাড়ি, তোমার প্রভুর জন্যে ঘরভরা সরঞ্জাম। আর, এদের জন্যে সমস্ত আকাশ, সমস্ত পৃথিবী।'

'আর, মস্ত-বড়?'

'মস্ত-বড় এইটুকুর মধ্যেই থাকেন। ঐ তো বিধাতার বর নিয়ে আসে। সমস্ত পৃথিবীর আশা নিয়ে, অভয় নিয়ে, আনন্দ নিয়ে।'[১৯]

জোড়াসাঁকো

১৩৬৬

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।
এ সমুদ্রে আর কভু হব নাকো পথহারা।
যেথা আমি যাই নাকো তুমি প্রকাশিত থাকো,
আকুল এ আঁখি-'পরে ঢালো গো আলোকধারা।
ও মুখানি সদা মনে জাগিতেছে সংগোপনে
আঁধার হৃদয়মাঝে দেবীর প্রতিমা -পারা।
কখনো বিপথে যদি ভ্রমিতে চাহে এ হৃদি
অমনি ও মুখ হেরি শরমে সে হয় সারা।
চরণে দিনু গো আনি এ ভগ্নহৃদয়খানি,
চরণ রঞ্জিবে তব এ হৃদি-শোণিতধারা।

অল্প দু-একটি শব্দের পরিবর্তনে ও শেষ দুটি ছত্র বাদে এটি রবীন্দ্রনাথের রচিত অতিপরিচিত একটি ব্রহ্মসংগীত। আর, অপরিবর্তিত আকারে এটি তরুণ কবির ভগ্নহৃদয় গীতিকাব্যের উৎসর্গপত্র-রূপে ভারতী পত্রিকার ১২৮৭ কার্তিক সংখ্যায় মুদ্রিত। ভগ্নহৃদয় কাব্য পরে যখন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হল, 'শ্রীমতী হে—'র উদ্দেশে উপহার দিতে গিয়ে কবি নূতন কবিতায়' নূতন উৎসর্গপত্র রচনা করলেন, দশটি ছত্রের বক্তব্যকে ভাষান্তরে ত্রিশটি ছত্রে বিশদ করলেন, তারও হৃদয়ভাবের গভীরতা আর স্বচ্ছ আন্তরিকতা কিছুমাত্র কম না হলেও, অল্পপরিসরে যে সংহতি নিয়ে যেমন প্রীতি পূজা ও নির্ভরের ভাবটুকু ফুটে উঠেছে সংকলিত কবিতায়, তার সঙ্গে বোধ করি কোনো তুলনাই হয় না। কিন্তু দুটি রচনারই ছত্রে ছত্রে যুগপৎ প্রীতি ও পূজার ভাব, সৌন্দর্য ও কল্যাণের অভিমুখে নিবিড় গভীর আকুষ্টি, আশ্চর্যভাবে ফুটে উঠেছে-যে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

উন্নতচরিত্রের অম্লান মুকুরে মানবজীবনের মহনীয় উর্ধ্বগতি প্রকৃতি ও পরিণাম পর্যালোচনা করলে দেখা যায়— একই অভিন্ন লক্ষ্যের দিকে আকর্ষণ করে নিয়ে যায় প্রবুদ্ধ মানবাত্মাকে সত্য, কল্যাণ, প্রেম, আনন্দ, শান্তি বা সৌন্দর্যসুষমা। অল্পদর্শী অল্পবুদ্ধি জন কল্পনা করে বহু দেবতা, বিভিন্ন পূজাপদ্ধতি। তা হোক, এরা তবু একই পরমদৈবতের নানা রূপ, নানামুখী প্রকাশ ; লক্ষের মধ্যে যে দু-একজন ভাগ্যবান সজাগ সচেতন হয়ে যে-কোনো দিব্য আবির্ভাবের আভাস পায় প্রাণের প্রাণে, আহ্বান শোনে অন্তঃকর্ণে, পথে বেরিয়ে পড়ে জড়জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডী থেকে, থামতে জানে না— ফিরতে জানে না কোনোরকম পিছনের টানে, দুদিন আগে বা পরে, জীবযাত্রার সূচনায় বা শেষে, ভ্রান্ত নানাত্বের ধারণা তাদের অবশ্যই লীন হয়ে যায় একত্বের উপলব্ধিতে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার স্থান এ নয়, আমাদের যোগ্যতাও অপ্রচুর, এটুকু শুধু লক্ষ্য করা দরকার— অতি তরুণ বয়সেই রবীন্দ্রনাথের অলৌকিক কবিসত্তাকে সত্য এবং কল্যাণের দিকে আকর্ষণ করে নিয়ে চলেছে সৌন্দর্য এবং প্রীতি।[২] এবং সেই সৌন্দর্যপ্রীতি শুধু-যে স্থলে জলে আকাশে, স্বভাবের মধুক্ষরা রূপে রূপান্তরে, বিলসিত বিকসিত হচ্ছে, হৃদয়-মনের গহনে গহনে অশরীরী আবেগে ও আবেশে সতত লুকোচুরি খেলছে তাই নয়, বলা যায় না কি ?—

অন্তরে বাহিরে বিশ্বে শূন্যে জলে স্থলে
সর্ব ঠাঁই হতে সর্বময়ী আপনারে
করিয়া হরণ, ধরণীর এক ধারে
'ধরিয়াছে' একখানি মধুর মুরতি !

কবিগুরু আমাদের ক্ষমা করুন— সংশয়ের ছলে যে ভাবনা তাঁর মনে এসেছিল প্রত্যয়ের আকারে তা আমাদের গোচর হল। অথচ, অরূপ অপরূপের এই গোচরতা কখনোই একান্ত হতে পারে না,

চিরন্তন হতে পারে না, এবং রবীন্দ্রনাথের জীবনেও হয় নি। 'কখনো বা ভাবময় কখনো মুরতি'— এর বেশি হয়তো মহাপ্রাণ মহাকবির জীবনেও ঘ'টে ওঠে না। মানুষের জীবন নিয়ে জীবনদেবতার এই বিচিত্র লীলাবিলাস, এই কৌতুক। জীবনে যা স্থিরভাবে ধরা যায় না, ছোঁওয়া যায় না, তারই সুস্থির মূর্তি দেখি চিত্রে ভাস্কর্যে ও কবিতায়, অজন্তার ভিত্তিতলে বা সিস্‌টিন চ্যাপেলে, ম্যাডোনায় বা মোনা লিসার ছবিতে— দান্তে বা শেলির কবিতায় যেমন, তেমনি রবীন্দ্রনাথের নিখিল কবিকৃতিতে। সুরদাস তুলসীদাস বিল্বমঙ্গল চণ্ডীদাস প্রত্যেকের জীবনসাধনায় প্রাণসঞ্চারিণী প্রেরণার শিখাটি কবে কোথায় কিভাবে প্রত্যক্ষ হয়েছে তারই নানা কাহিনী আছে— বাস্তবতথ্য কল্পনা ও কিংবদন্তী -মিশ্রিত। তার মূলে এই সত্যটিই আছে যে, আসলে যা নিরাকার নিরবয়ব, হঠাৎ কোথাও প্রতিবিম্বিত ও প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে; পরে সে থাক্ বা না'ই থাক্ দৃষ্টির সম্মুখে, তার প্রেরণা কখনো নিঃশেষিত হয় না— তারই তীব্র আনন্দে ও তীব্রতর যন্ত্রণায় একবার চেতনা ও গতিশক্তি পেয়েছে যে জীবন কোথাও সে থামে না। ঐ-যে সাকার প্রেরণা, বিভিন্ন জীবনে বিচিত্র নামে রূপে অবশ্যই আমরা তাকে নির্দেশ করে থাকি— কখনো সে গুরু, কখনো বন্ধু, কখনো সখী বা প্রেয়সী— কিন্তু সেই পরিচয়মাত্রে তা সীমাবদ্ধ নয়। তারই অলৌকিক স্পর্শ-প্রবুদ্ধ দর্শন-ধন্য জীবনে তার যে নিত্য নূতন উপলব্ধি ও ভাবান্তর তাও দার্শনিক অথবা মনস্তাত্ত্বিক কয়েকটি বাঁধাধরা সংজ্ঞা বা ছকের মধ্যে ফেলে ব্যাখ্যা করতে বসা, সেও অবিবেকী মূঢ়ের হঠকারিতা মাত্র। কেননা, মনের উপরিতলের ভাসা-ভাসা যেসব ভাব ভাষা ও বোধ সেগুলিই শুধু নির্দিষ্ট কতকগুলি উপাদানে গঠিত, নিশ্চিত কোনো-না-কোনো পরিণামে চালিত— তাদের ব্যাখ্যায় বা বিশ্লেষণে তেমন কোনো দুরূহতা থাকে না; কিন্তু মানবজীবনের মূলগত যে-কোনো প্রেরণা, গভীর অন্তস্তলের

যে-কোনো উপলব্ধি, তা বহু বিচিত্র অদ্ভুত-অপরিজ্ঞাত মাল-মশলার রসায়নে সৃজিত, অপ্রত্যাশিত আশ্চর্য তার পরিণাম, জীবন—হয়তো জীবনান্তর -ব্যাপী তার প্রভাব, অবর্ণ রবিরশ্মির সঙ্গেই তার তুলনা চলে— জীবনের নানা ক্ষণের নানা ঘটনার তেশিরা কাচের ভিতর দিয়ে তার নানা বর্ণের বিচ্ছুরণ, আর না হলেও অলক্ষ্য প্রক্রিয়ায় না জানি কিভাবে সে নীল পীত অরুণ শ্যাম ধূসর কত বিচিত্র বর্ণেই না বিশ্বরূপের বর্ণনা করে।

এ প্রসঙ্গের কোনো শেষ নেই। আমরা ধরে নিয়েছি যে, আমাদের আলোচনার ক্ষেত্রটি যথেষ্ট সীমাবদ্ধ। তবু যা 'তত্ত্বকথা'র অবতারণা করা গেল তার প্রয়োজন অল্প হতেও পারে, অথচ প্রাসঙ্গিকতা আছে।

রবীন্দ্রনাথ ভগ্নহৃদয় 'গীতিকাব্য' ভারতীতে ছাপবার সময় বিনা নামে যাঁকে উৎসর্গ করেছিলেন তাঁকেই উপহার দিয়েছেন পরে ছদ্ম-নামের আদ্য অক্ষরটি মাত্র উল্লেখ ক'রে, তিনি যে তরুণ কবির নতুন বৌঠান কাদম্বরীদেবী এ কথা রবীন্দ্রজীবনের আলোচনাকারী সকলেই জানেন। 'হে' বা গ্রীক-পুরাণোক্ত 'হেকেটি' জাদু ইন্দ্রজাল রহস্য ও রাত্রির অধিষ্ঠাত্রী, ভূত-প্রেত-গণেরও অধীশ্বরী৺, সুতরাং আমাদের ভোলানাথ শিবের ঘরণী ব'লেও তাঁকে হয়তো নির্দেশ করা চলে— এই নামান্তরেও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়সমাজে তিনি পরিচিতা ছিলেন। কাদম্বরীদেবী সম্পর্কে গ্রহতারাময়ী রহস্যময়ী রাত্রির এই অভিধা যে সার্থক মনে হয়েছে সে কিছু বিস্ময়ের বিষয় নয়— কী জানি এই আদরের নামকরণ তরুণ রবির কি না—উদ্ধৃত কবিতার প্রথম ছত্রেই পরিচয় দিয়েছেন কবি ধ্রুবতারা ব'লে। শহরের রাস্তাঘাটের হদিশ পাহারাওআলা বা ডাক-পেয়াদাকে জিজ্ঞাসা করলেও হয়তো বা জানা যায়; চিররহস্যময় জীবনের আনন্ত্যে দিশা দেখাতে আসে কদাচিৎ কোনো জনের দুর্লভভাগ্যে রহস্যময়ী কোনো নারী— জীবনের সত্য

ও কল্যাণ ধরে ঘনীভূত সৌন্দর্য ও প্রীতির আকার। দৈনন্দিন জীবনের সকালে সন্ধ্যায়, স্নেহে ভালোবাসায় সাহচর্যে, প্রয়োজনে এবং অপ্রয়োজনে, বাঙালি ঘরে দেওর-ভাজের আদর-কৌতুক-মিশ্রিত বিচিত্র ব্যবহারে, সামান্যভাবে যেমনই বুঝে থাকুন, দেশকালের দূর থেকে দূরে প্রসারিত পরিপ্রেক্ষিতে ক্রমশ কিপর্যন্ত গভীর নিবিড় মধুর পবিত্র ভাবে অনুভব করেছেন সেই তুলনাতীত সম্পর্কটিকে, তারই আভাস পাওয়া যায় প্রথমোদ্ধৃত কবিতায় আর তা ছাড়া দীর্ঘ কবিজীবনের অনেক রচনায় ও অনেক উক্তিতে।

এই রহস্যময়ী দেবী, এই অপূর্ব প্রভা এবং প্রভাব -ময়ী রমণী, কবিজীবনের অনেকটা অধিকার করে থাকেন নি বাস্তবে— তাতে আসলে কোনো লোকশানও হয় নি। সাময়িক ভাবে দিবা দ্বিপ্রহরের আলো যদিবা অমাবস্যার অন্ধকার-সদৃশ হয়ে উঠে থাকে অকস্মাৎ, দুঃসহ আঘাতই বিমলতর বিশুদ্ধতর চেতনায় ও শ্রেয়তর পরিণামে জাগিয়ে তুলেছে শক্তিমান্‌কে, নিরন্তরধাবিত কালের গতিচ্ছন্দে অস্খলিত পদে ছুটে চলেছে জীবন, এবং যে 'তেইশ বছরের শোক'কে বাহ্যতঃ ভুলে গেছেন এক কালে, তাঁর জীবনে সেটি যে অবিচল শান্তির একটি ভূমিকা বিছিয়ে দিয়েছে কবি তা জেনেছেন, পরিণত বয়সে আপাতবিস্মরণের পর্দাটি একদা একটু সরে যেতেই ছন্দে সুরে গেয়ে উঠেছেন সহসা—

ভুলে থাকা সে তো নয় ভোলা ;
বিস্মৃতির মর্মে বসি রক্তে মোর দিয়েছ যে দোলা।
নয়নসম্মুখে তুমি নাই ;
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।
আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল।
আমার নিখিল

তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।
কবির অন্তরে তুমি কবি।

কবিতা রচনা করে চলেছে একজন, সেই কবিকে রচনা করবার যদি কেউ থাকে সে কি সামান্য! এ কবিতায় যা বলেছেন কবি, মানুষের সংসারে এর বেশি একে অন্যকে আর কী বা বলতে পারে! অথচ, জীবনবিকাশের গূঢ় অগোচর প্রক্রিয়া এমন কোনো স্বচ্ছ মুকুরে সর্বদা প্রতিভাত হয় না। পূর্বেই জেনেছি জীবনের জীবন্ত তাৎপর্য—

জ্বলিছে নিবিছে যেন খদ্যোতের জ্যোতি
কখনো বা ভাবময় কখনো মুরতি।

সময়ে সময়ে আক্ষেপ ক'রে এমনও বলতে হয়েছে—

গেল না ছায়ার বাধা, না-বোঝার প্রদোষআলোকে
স্বপ্নের চঞ্চলমূর্তি জাগায় আমার দীপ্ত চোখে
সংশয়মোহের নেশা।

আকুল আগ্রহে কবি বলে উঠেছেন—

খোলো খোলো, হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিকা,
খুঁজে নিতে দাও সেই আনন্দের হারানো কণিকা—

আমার সেই 'ক্ষণিকা'কে। কারণ, মানবজীবনের পরমআশ্চর্য রহস্য এই যে, কোন্ অলক্ষ্যের দূতী, প্রীতির প্রতিমা যখন—

দীপখানি তুলে ধ'রে মুখে চেয়ে ক্ষণকাল থামি
চিনেছে আমারে
তারই সেই চাওয়া সেই চেনার আলোক দিয়ে আমি
চিনি আপনারে।

স্বরূপের তো কথাই নেই, আপনার রূপও আপনি দেখা যায় না। যে আর-একজন এসে এই আপনাকে চিনিয়ে দেয় তার দিকে শুধুই থাক্ স্নেহ বা প্রেম, সুন্দর মুখের ও চোখের একটি শুধু হাসি, একটি কথা, চকিত হর্ষ বা বিষাদের এক ফোঁটা অশ্রু— এ তো এমন কিছু

নয়, হিসেবী জমা-খরচের পাকা খাতায় যার এতটুকু অঙ্কপাত হতে পারে— অথচ যার জীবনের পাতায় অলক্ষ্য রশ্মির রেখাক্ষরে এ কাহিনী লেখা হল সে কি কোনোদিন এ কথা ভুলতে পারে?— হোক সে ক্ষণিকা, হোক সে কায়াধারিণী মায়া মাত্র, আদি ও অন্ত সবই রহস্যে আবৃত। এঁরই পরিচয় দিতে গিয়ে কখনো বলেছেন কবি—

উজ্জ্বল শ্যামলবর্ণ, গলায় পলার হারখানি।
চেয়েছি অবাক্ মানি
তার পানে।
বড়ো বড়ো কাজল নয়নে
অসংকোচে ছিল চেয়ে
নবকৈশোরের মেয়ে;
ছিল তার কাছাকাছি বয়স আমার।·
দেহ ধরি মায়া
আমার শরীরে মনে ফেলিল অদৃশ্য ছায়া
সূক্ষ্মস্পর্শময়ী।

অন্যভাবে বলেছেন অন্যত্র—

যখন দেখা হল তার সঙ্গে চোখে চোখে
তখন আমার প্রথম বয়েস;
সে আমাকে শুধালো, 'তুমি খুঁজে বেড়াও কাকে?'··
কচি শ্যামল তার রঙটি;
গলায় সরু সোনার হারগাছি,
শরতের মেঘে লেগেছে ক্ষীণ রোদের রেখা।
চোখে ছিল একটা দিশাহারা ভয়ের চমক
পাছে কেউ পালায় তাকে না ব'লে।
তার দুটি পায়ে ছিল দ্বিধা, ঠাহর পায় নি

কোন্‌খানে সীমা তার আঙিনাতে।

দেখা হল।

সংসারে আনাগোনার পথের পাশে

আমার প্রতীক্ষা ছিল শুধু ঐটুকু নিয়ে।

তার পরে সে চলে গেছে।

যার ভয় ছিল অন্যে পালাবে ব'লে, সকলের আগে নিজেই সে চলে গেছে। অন্যকে আত্মআবিষ্কারে উদ্‌বুদ্ধ করেছে, অথচ নিজেকে চিনিয়ে যায় নি— চেনবার মতো অবসর দেয় নি।

যশোধরার প্রেম আর সুজাতার পূজানিবেদনের পরমান্ন, ভগবান্‌ তথাগতের জীবনেও ও দুটির তাৎপর্য বড়ো অল্প নয়। কাদম্বরীদেবীর অচিরজীবনের সাহচর্য, তাঁরই নবকৈশোরের অমল স্পর্শ, স্নেহ সখ্য ভালোবাসা, উৎসাহবাক্য আর অনুক্ত উদ্দীপনা— রবীন্দ্রনাথের কৈশোরে ও যৌবনে তাঁর পবিণতিমুখী কবিপ্রতিভাকে উদ্‌বোধিত ও উদ্দীপিত করেছে, জীবনপথের দিক দেখিয়েছে তাঁর পথ চলার প্রথম সূচনাকালে আব সম্ভবতঃ তার অন্যান্য পর্বেও— তারই কয়েকটি লক্ষগোচর সূত্র আমরা বিশাল রবীন্দ্রসাহিত্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখতে পাই। অতঃপর সেই হবে আমাদের আলোচনার বিষয়।

এই আলোচনার উপক্রমেই আমরা লক্ষ্য করি কাদম্ববীদেবী সামনে উপস্থিত থেকে যতটা উৎসাহ এবং প্রেরণা জুগিয়েছেন, ততোধিক সজাগ সচেতন করে তুলেছেন কবিপ্রতিভাকে কবির দৃষ্টি-পথের থেকে সরে গিয়ে দূর দেশে এবং শেষ পর্যন্ত অতিদূর কালে। সন্ধ্যাসঙ্গীত-প্রভাতসঙ্গীত, কড়ি ও কোমল, বলাকা-পলাতকা এবং সব-শেষে বোধ করি লিপিকা-পুনশ্চ— প্রতিভার অন্তরে অন্তরে অপূর্ব প্রাণসঞ্চারিণী এই শক্তির আশ্চর্যজনক ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়ার সাক্ষ্য বহন করছে। উল্লিখিত কাব্যগুলির প্রত্যেকটিতে রবীন্দ্র-প্রতিভার বিশেষ বিশেষ উত্তরণ সূচিত হচ্ছে; অন্তর্‌বর্তী আরও বহু

সোপানমালা নেই এমন নয়— ভাবময় কর্মময় জীবনে নানা ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে, অন্তরে বাহিরে নানা শক্তির সংবেগে, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসাধনা নিত্যই নবরূপ নিয়েছে, অভূতপূর্ব পথে গিয়েছে— অশীতিবর্ষের জীবনে এ প্রতিভা কখনোই যেন তার তারুণ্য বা নূতনতা হারায় নি, অপ্রত্যাশিত চমৎকার -সৃজনে বিরত হয় নি— এসব আমাদের কল্পনা না হলেও এ কথা সত্য যে, উল্লিখিত কয়েক স্থলে প্রতিভার একেবারে নূতন প্রয়াণ লক্ষ্য করা যায়। নাটকের নূতন দৃশ্য অথবা নূতন গর্ভাঙ্ক শুধু নয়, নূতন অঙ্কই যেন উন্মোচিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের জীবন ও প্রতিভা বহুমুখী এবং বিচিত্ররূপী হলেও, আসলে কবিজীবন আর কবিপ্রতিভাই বটে। তার অন্তরতম কিম্বা সত্যতম বিকাশের ধারা কবিতা থেকে কবিতায়। অতএব স্বভাবতই রবীন্দ্রকাব্যগুলি থেকেই আমরা বর্তমান প্রসঙ্গে বিশেষ ইঙ্গিত ও অভ্রান্ত অভিজ্ঞান আবিষ্কার করতে পারব এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

প্রাণপূর্ণ কবিতার বেলায় ছন্দ নয় শুধু মাত্রা যতি ও প্রস্বনের বিচিত্র সমাবেশ ও সমন্বয়। সার্থক ছন্দেই কবিতার জীবনচ্ছন্দ বা প্রাণস্পন্দন, সেই প্রাণের আকর্ষণেই কবিতা অ-পূর্ব দেহধারণ করে ও অ-লৌকিক রসাত্মার আবির্ভাবে যথার্থ কবিতা হয়ে ওঠে রসিক-মাত্রেই তা জানেন।—

নূতন ছন্দ অন্ধের প্রায়
ভরা আনন্দে ছুটে চলে যায়,
নূতন রাগিণী জেগে উঠে তায়
নূতন রাগিণী-ভরে।
যে কথা ভাবি নি বলি সেই কথা,
যে ব্যথা বুঝি না জাগে সেই ব্যথা,

জানি না এসেছি কাহার বারতা
কারে শুনাবার তরে।

এ কথায় লেশমাত্র অত্যুক্তি ঘটে নি। কবির ছন্দ যে মাত্রা গুনে গুনে হিসাব করে পদক্ষেপ করে না, আবেগের অন্তঃপ্রেরণাতেই অব্যর্থ গতি পেয়ে থাকে, অপ্রত্যাশিত সব আনন্দবেদনার ধারক বাহক হয়ে ওঠে, মানুষের মুখের কথাকেই ভরে তোলে কথার অতীত সুরে— রবীন্দ্রনাথ বা অন্য সচেতন কবি এ কথা অন্য অনেক স্থলে বলেছেন আর এই হল সার্থক কবিকৃতি সম্পর্কে অন্যতম মূলগত·বিচার বা বিশ্লেষণ। কবিতা লেখার হাতে-খড়ি হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের বালক বয়সে।

মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে

কিম্বা—

হাপুস্ হুপুস্ শব্দ, চারি দিক নিস্তব্ধ,
পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে

এমন-সব প্রাঞ্জল বৈদর্ভী রীতির রচনায় হাত মক্স ক'রে, বড়ো বড়ো কাঁচা অক্ষরে 'নীল খাতা'টি ভ'রে, আর 'লেট্স্ ডায়ারি'র পাতায় পাতায় পৃথ্বীরাজপরাজয়ের বীরকরুণরসের কাহিনী লিখে, প্রথম যৌবনেই 'কবিকাহিনী' 'বনফুল' 'ভগ্নহৃদয়' 'নলিনী' প্রভৃতি বিবিধ আখ্যানকাব্য গীতিকাব্য আর নাটক রচনা ক'রে ও প্রকাশ ক'রে, তৎকালীন ভাবুক ও শিক্ষিতসমাজে উত্তরোত্তর যথেষ্ট কবিখ্যাতি লাভ করেছিলেন-যে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অথচ আপন কবিতা খুঁজে পায় নি কবি, কেননা নিজস্ব ছন্দেই বরণ করে নেওয়া হয় নি নিজের কবিতা এ কথা বলা মিথ্যা হবে না। জানা অজানা নানা কবির নানা প্রভাবের ভিতর দিয়ে শক্তিসঞ্চয় করেছে আর বেড়ে উঠেছে সম্ভাবনাময় কিন্তু মোহাবিষ্ট অপরিণত প্রতিভা। রবীন্দ্রছন্দোনির্ঝরিণীর তথা ভাবমন্দাকিনীর প্রথম স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে

'সন্ধ্যাসঙ্গীতে' কবি স্বয়ং সেটি বলে রেখেছেন 'জীবনস্মৃতি'কথায়। বলেছেন—

'এক সময়ে জ্যোতিদাদারা দূর দেশে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন; তেতালার ছাদের ঘরগুলি শূন্য ছিল। সেই সময় আমি সেই ছাদ ও ঘর অধিকার করিয়া নির্জন দিনগুলি যাপন করিতাম। এইরূপে যখন আপনমনে একা ছিলাম তখন, জানি না কেমন করিয়া, কাব্য-রচনার যে সংস্কারের মধ্যে বেষ্টিত ছিলাম সেটা খসিয়া গেল।··· একটা স্লেট লইয়া কবিতা লিখিতাম। সেটাও বোধ হয় একটা মুক্তির লক্ষণ।··· স্লেট জিনিষটা বলে, ভয় কী তোমার! যাহা খুশি তাহাই লেখো-না, হাত বুলাইলেই তো মুছিয়া যাইবে।··· এমনি করিয়া দুটো-একটা কবিতা লিখিতেই মনের মধ্যে ভারী একটা আনন্দের আবেগ আসিল; আমার সমস্ত অন্তঃকরণ বলিয়া উঠিল, বাঁচিয়া গেলাম, যাহা লিখিতেছি এ **দেখিতেছি সম্পূর্ণ আমারই**।·· প্রথম এই আবিষ্কার করিলাম যে, যাহা আমার সকলের চেয়ে কাছে পড়িয়া ছিল তাহাকেই আমি দূরে সন্ধান করিয়া ফিরিয়াছি। কেবল-মাত্র নিজের উপর ভরসা করিতে পারি নাই বলিয়াই নিজের জিনিষকে পাই নাই।··· আমার কাব্য লেখার ইতিহাসের মধ্যে এই সময়টাই আমার পক্ষে সকলের চেয়ে স্মরণীয়।'

'সন্ধ্যাসঙ্গীত' এ কালে আমরা পড়ি না। রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কাব্য-সঞ্চয়নেও ঐ কাব্যের একটিমাত্র কাটাছাঁটা কবিতা দেখা যায়। অথচ রবীন্দ্রপ্রতিভা-বিকাশের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে সন্ধ্যাসঙ্গীতের সার্থকতা কত দূর সে দিকে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করাও দরকার। এজন্যই, এ সম্পর্কে পরিণত বয়সেও রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছেন তার থেকে এতটা উদ্‌ধৃতি দিতে হল।[৪]

সন্ধ্যাসঙ্গীতের তিন বৎসর পরে মুদ্রিত হয় অথচ লেখা হয় কবির তেরো থেকে আঠারো বৎসর বয়সের মধ্যে, অর্থাৎ সন্ধ্যাসঙ্গীতের

পূর্বে, 'শৈশবসঙ্গীতে'র কবিতাবলি। বিহারীলাল-প্রবর্তিত নূতন 'তিন মাত্রা'র ছন্দ এ কাব্যে রবীন্দ্রনাথ বহুল ব্যবহার করেছিলেন। সন্ধ্যাসঙ্গীতে মৌলিক ভাবাবেগের স্বভাব-বশে সেটি স্বতই ত্যাগ করেছেন। ত্যাগ করেছেন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আরও অনেক প্রভাব— সঙ্গী ও স্বজন যাঁরা কাব্যরচনায় উৎসাহ দিতেন তাঁদের প্রত্যাশা-পূরণের ও রুচি-বিনোদনের সকল সজ্ঞান সংকল্প। ফলতঃ অপরিজ্ঞাত অপ্রকাশিত 'পৃথ্বীরাজপরাজয়' থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত যে ছাঁদে রচিত হয়ে উঠছিল কবিকৃতি, তাতে এমন মনে করলেও বিশেষ ভুল হবে না যে, 'আমি নাবব মহাকাব্য-সংরচনে' এমন একটা সংকল্প সত্যই কিশোর কবির মনের মধ্যে ছিল। আর, মাইকেল মধুসূদনদত্তের পদাঙ্ক-অনুসরণে সেকালের অনেকেই তো সেই পথেরই পথিক ছিলেন। মহাকাব্য না বললেও গাথা বা আখ্যান-কাব্য বলতেই হবে। বিহারীলাল বা দ্বিজেন্দ্রনাথের মতো যাঁরা স্বতন্ত্র পথের পথিক ছিলেন তাঁরাও একান্তভাবে ভাবাবেগের দ্বারা প্রেরিত ছিলেন না ; অর্থাৎ, আবেগ কল্পনা ও মননের ত্রিবেণী-সংগম ছিল তাঁদের কবিকীর্তিতে। অথচ বাস্তবে জলে জল যেভাবে মিলে মিশে এক হয়, তাঁদের কাব্যে উল্লিখিত ত্রিবিধ প্রেরণা সব সময় যে তেমনি একটা পরম ঐক্য লাভ কবত তাও বলতে পারি নে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে নিহিত ছিল অলৌকিক লিরিক প্রতিভা ; তারই আদর্শরূপে প্রতিভাত হতে পারে (পদাবলী সাহিত্য ও নূতন-পুরাতন গীতিসাহিত্য বাদ দিলে) বাংলাদেশে এমন উল্লেখযোগ্য কবিকৃতি সেদিন ছিল না অথবা অল্পই ছিল। স্বভাবগত সূক্ষ্ম মিল থাকলেও গান তো লিরিক কবিতা নয়— ভাব ও কল্পনার অনেক বেশি প্রসার ও বৈচিত্র্য সেখানে প্রত্যাশিত। জীবনের আনন্দবেদনাহত চকিত মুহূর্তের প্রাণটুকু শুধু একটি কটাক্ষে বা এক ফোঁটা চোখের জলে ধ'রে দেওয়াই তার কাজ নয়, জীবনের অনেকখানিকে সাকার ও

প্রত্যক্ষ করে তোলা, অঙ্গে প্রত্যঙ্গে সজীব প্রাণময় ক'রে তোলা, তার বিশেষ সাধনা ও সার্থকতা। একীভূত ভাবনা বেদনা কল্পনার আশ্চর্য সেই জীবৎসত্তা, সেই লিরিক কবিতা, এই বাংলাদেশে তখনো তার অলৌকিক অদ্বিতীয় কবিকে একান্তভাবে কামনা করছিল। যা হোক, ভগ্নহৃদয়ে এসেই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা তার বিশেষ ক্ষেত্রে মুক্তি পেতে ব্যাকুল হয়ে পড়ল— ক্ষীণপ্রাণ আখ্যান হয়ে উঠল ভাবাবেগময় লিরিকের মালিকা। যেন বা আখ্যানকথনের 'কল্পনাটি গেল ফাটি হাজার গীতে'। সেই লিরিক-রচনা তখনো কিন্তু ষোলো-আনা সত্য হয়ে ওঠে নি, সচেতন হয়ে ওঠে নি, হয়তো আরোপিত এক নাটকীয়তার দোষেই সম্পূর্ণ অকৃত্রিম ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে নি। 'ভগ্নহৃদয়' পার হয়ে 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'। এই কাব্যে রবীন্দ্র-কবিপ্রতিভা ধার-করা অথবা কল্পনাচাতুর্যে-বানানো কোনোরূপ ভাব ভাষা ছন্দের শরণ না নিয়ে, প্রশ্রয় না খুঁজে, অকৃত্রিম আন্তরিকতার আবেগেই স্বকীয় ভাবনা-বেদনার প্রাণবান্ দীপ্তিমান্ রূপ দিয়েছে। এটি কেবল বর্ষীয়ান কবির সাক্ষ্য-হেতুই স্বীকার্য নয়, যে-কোনো সুধীজন সেদিনের সন্ধ্যাসঙ্গীতের পাতা উল্টে পাল্টে নিজেই সত্য ব'লে মানতে বাধ্য হবেন। ফেনোচ্ছল উচ্ছ্বাস বা আবেগ আছে, শিল্পোচিত সংহতি নেই, স্ফটিকস্বচ্ছ কাঠিন্য ও দ্যুতিবিকিরণের বিভূতি অল্প— সমকালীন বাংলা কাব্যকৃতির পটভূমিকায় তবু কত-যে স্বানুভব-সিদ্ধ এবং চমৎকারজনক তা সংক্ষেপে বলা যায় না আর বিশদ আলোচনার সময় বা সুযোগ আমাদের নেই। শুধু গ্রন্থশেষে মুদ্রিত 'উপহার' কবিতার দু-চার ছত্র এখানে সংকলন করব; এটি যে কাদম্বরী-দেবীকে উদ্দেশ ক'রে বলা সে বিষয়ে আমাদের মনে কোনোই সন্দেহ নেই।—

ভুলে গেছি কবে তুমি ছেলেবেলা একদিন
মরমের কাছে এয়েছিলে,

স্নেহময় ছায়াময় সন্ধ্যাময় আঁখি মেলি
একবার শুধু চেয়েছিলে।
স্তরে স্তরে এ হৃদয় হয়ে গেল অনাবৃত,
হৃদয়ের দিশি দিশি হয়ে গেল উদ্‌ঘাটিত,
একে একে শত শত ফুটিতে লাগিল তারা,
তারকা-অরণ্য-মাঝে নয়ন হইল হারা!
বুঝি গো সন্ধ্যার কাছে শিখেছে সন্ধ্যার মায়া
ওই আঁখি দুটি—
চাহিলে হৃদয়-পানে মরমেতে পড়ে ছায়া,
তারা উঠে ফুটি।
আগে কে জানিত বলো কত কী লুকানো ছিল
হৃদয়নিভৃতে,
তোমার নয়ন দিয়া আমার নিজের হিয়া
পাইনু দেখিতে।
কখনো গাও নি তুমি, কেবল নীরবে রহি
শিখায়েছ গান,
স্বপ্নময় শান্তিময় পুরবী রাগিণী-তানে
বাঁধিয়াছ প্রাণ।
আকাশের পানে চাই, সেই সুরে গান গাই
একেলা বসিয়া,
একে একে সুরগুলি অনন্তে হারায়ে যায়
আঁধারে পশিয়া।

অকৃত্রিম কবিত্বের আকর্ষণ-বশতই গোনা দু-চার ছত্রের সংকলনে ক্ষান্ত হওয়া গেল না। সুমধুর কবিত্ব আছে, কিন্তু সেটি অ-বাস্তব বা অ-মূলক মনে করার কোনো কারণ নেই; বরং তার বিপরীত। কবিমনে-কাদম্বরীদেবীর-স্মৃতি-বিজড়িত একমাত্র এই কবিতারই ঈষৎ

পরিবর্তিত কয়েক ছত্র সন্ধ্যাসঙ্গীতের প্রতিনিধি-রূপে 'সঞ্চয়িতা'য় স্থান পেয়েছে। মূল কবিতার শেষ কয়টি ছত্রে তরুণ কবি যা বলেছেন, সেও এক দিকে যেমন কবিত্বের করুণমাধুরী-মাখা অন্য দিকে তেমনি নিভৃত ব্যক্তিহৃদয়ের সরল সুন্দর অভিব্যক্তি—

সেই পুরাতন চোখে মাঝে মাঝে চেয়ো সখি
উজলিয়া স্মৃতির মন্দির,
এই পুরাতন প্রাণে মাঝে মাঝে এসো সখি—
শূন্য আছে প্রাণের কুটীর।
নহিলে আঁধার মেঘরাশি হৃদয়ের আলোক নিভাবে—
একে একে ভুলে যাব সুর, গান গাওয়া সাঙ্গ হয়ে যাবে।

'সন্ধ্যাসঙ্গীত' যে কবি রবীন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী বাণীসাধনায় সাধা গলার সর্বপ্রথম গান, নিজেরই সুরে কথায় নিজেরই নিগূঢ় মর্মের অকৃত্রিম উচ্ছ্বাস, বাহিরের অথবা অন্যের সকল প্রভাব সেখানে নিশ্চিহ্ন বা নিঃশেষিত, এইটুকু আমাদের কাছে অতিশয় স্পষ্ট।

নতুন বৌঠান-শূন্য নতুন বৌঠানের ছাদের ঘরে ও 'নন্দনকাননে' এই কবিতাগুলির অতর্কিত আবির্ভাব। তাঁর প্রত্যক্ষে উপস্থিতির অভাবই পরিণামে তাঁর অশরীরী স্থিতিকে চারি দিক থেকে আরও বুঝি জাগিয়ে দিয়েছে ভক্ত কবিটির ভাবমগ্ন মানসে। তাঁর মুখের সমালোচনা— বড়ো ঠাকুর বা বিহারীলালের সার্থক সৃষ্টির তুলনায় তাঁর স্নেহের রবির নবীন প্রয়াসের প্রায়-অকরুণ 'অপক্ষপাত' আলোচনা— কবিতা শুনতে শুনতে অমেয়উজ্জ্বল দুটি চোখে থেকে থেকে যে পুলক ও প্রশংসা ঝলকিত হয়ে উঠেছে মুখের কথায় তারই প্রতিবাদ বৈ নয়— স্মিত কৌতুক ব্যতীত কিশোর কবিপ্রতিভাকে আত্মআবিষ্কারে উস্‌কিয়ে দেবার গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল না যে তাই বা কে বলবে— যা হোক, সে-সবের কিছুই যখন বাহ্যতঃ প্রত্যক্ষ নয়, বিশুদ্ধ প্রীতি ও স্নেহের প্রেরণাটুকু শুধু সক্রিয় আছে প্রতিভার গভীর

অন্তরে, নির্নিমেষ দৃষ্টিটুকু কেবল মুকুরিত হয়ে আছে মর্মমূলে, তখনই নবীন কবির রচনায় এসেছে নূতন সুর, নূতন কথা, সত্য-সত্যই নূতন কবিতা। এগুলির লেখা শুরু হয় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে তেতলার ছাদে বা ঘরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও কাদম্বরীদেবীর অনুপস্থিতিতে আর সমাপ্তি হয়েছিল কাদম্বরীদেবীরই প্রীতিস্নেহের পক্ষপুটচ্ছায়ে ফরাশ-ডাঙার গঙ্গাতীরে।—

'বিলাতযাত্রার আরম্ভ-পথ হইতে যখন ফিরিয়া আসিলাম তখন জ্যোতিদাদা চন্দননগরে গঙ্গাধারের বাগানে বাস করিতেছিলেন; আমি তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। · আমার গঙ্গাতীরের সেই সুন্দর দিনগুলি গঙ্গার-জলে-উৎসর্গ-করা পূর্ণবিকশিত পদ্মফুলের মতো একটি একটি করিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কখনো বা ঘনঘোর বর্ষার দিনে বিদ্যাপতির 'ভরা বাদব মাহ ভাদর' পদটিতে মনের মতো সুব বসাইয়া বর্ষার রাগিণী গাহিতে গাহিতে বৃষ্টিপাতমুখরিত জলধারাচ্ছন্ন মধ্যাহ্ন খ্যাপার মতো কাটাইয়া দিতাম; কখনো বা সূর্যাস্তের সময় আমরা নৌকা লইয়া বাহির হইয়া পড়িতাম, জ্যোতিদাদা বেহালা বাজাইতেন, আমি গান গাহিতাম; পুরবী রাগিণী হইতে আবম্ভ করিয়া যখন বেহাগে গিয়া পৌঁছিতাম তখন পশ্চিমতটের আকাশে সোনাব খেলনার কারখানা একেবারে নিঃশেষে দেউলে হইয়া গিয়া পূর্ববনান্ত হইতে চাঁদ উঠিয়া আসিত। আমরা যখন বাগানের ঘাটে ফিরিয়া আসিয়া নদীতীরের ছাদটার উপরে বিছানা করিয়া বসিতাম তখন জলে স্থলে শুভ্র শান্তি, নদীতে নৌকা প্রায় নাই, তীরের বনরেখা অন্ধকারে নিবিড়, নদীর তরঙ্গহীন বনরেখার উপর আলো ঝিক্ ঝিক্ করিতেছে। আমরা যে বাগানে ছিলাম তাহা মোরান সাহেবের বাগান নামে খ্যাত ছিল। · বাড়ির সর্বোচ্চতলে চারিদিক-খোলা একটি গোল ঘর ছিল।· সেখানে বসিলে ঘনগাছের মাথাগুলি ও আকাশ ছাড়া আর-কিছু চোখে

পড়িত না। তখনো সন্ধ্যাসঙ্গীতের পালা চলিতেছে ; এই ঘরের প্রতি লক্ষ করিয়াই লিখিয়াছিলাম—

অনন্ত এ আকাশের কোলে টলমল মেঘের মাঝারে
এইখানে বাঁধিয়াছি ঘর তোর তরে কবিতা আমার।'

কোনো কোনো অধ্যাত্মসাধনপন্থায় স্ত্রীজাতীয়া-গুরু-করণের প্রথা প্রচলিত আছে। অর্বাচীন রীতি নয়, বেদবিধির চেয়ে প্রাচীন হওয়ার বাধা দেখি নে। এ রীতি তন্ত্রের, যে তন্ত্রসাধনা বৈদান্তিক ইহবিমুখতার বিপরীতমুখী— মায়াবাদী নয়, লীলাবাদী— জগৎকে, জীবনকে অস্বীকার করার পরিবর্তে রূপান্তরিত করে গ্রহণ করাই, ইহলোকে বা চিন্ময় কোনো লোকে, যে ক্ষুরধারদুরূহ সাধনপন্থার পরাকাষ্ঠা ও পরাগতি। অধ্যাত্মসাধক না হয়েও কবিসম্প্রদায়-যে কতকটা ঐ পথেরই পথিক, অনুরূপ হ্লাদিনীশক্তির প্রেরণেই সঞ্জীবিত ও সঞ্চালিত, এ কথা মিথ্যা নয়। প্রতিভার প্রাণনে ও উদ্‌বোধনে অনুরূপ গুরুকরণের কার্যকারিতা তাই দেশে-দেশে যুগে-যুগে স্বীকৃত। ব্যাপারটি স্বতই ঘ'টে থাকে, হিসাব ক'রে নয়— সত্যকার কবিও কেউ হিসাব ক'রে হয় না— এই গুরুকরণের আকার প্রকার ও উপলক্ষ্য সেও জনে-জনে আর কালে-কালে বিচিত্র এ কথা বলাই বাহুল্য। নিকটে ও দূরে, প্রত্যক্ষভাবে আর অন্তরালে, অতি অ-পূর্ব এই শক্তির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া। প্রায়শঃ দূরে ও অন্তরালে থেকেই, অন্তর থেকেই এ কার্যকরী হয় বিশেষভাবে ও সার্থকভাবে। রবীন্দ্রনাথ বলেন— 'অনন্ত আকাশের ফাঁক না পেলে বাঁশি বাজে না।' আমরা অন্য দিক থেকে আর-একটি কথা বলি, অলৌকিক প্রভাব যে প্রভাময়ীর ভিতর দিয়ে সক্রিয়, সচরাচর তিনিও জানেন না ওর আসল প্রকৃতি। গুরু মন্ত্র দেন শিষ্যের কানে বা প্রাণে ; কখনো এমনও হয় যে, সেই ভাগ্যবানের যে সত্যদর্শন বা তত্ত্বোপলব্ধি ঘটে তা গুরু-অগোচর,

গুরুর স্বপ্নেরও অগোচর। যে-কোনো অলৌকিক প্রতিভার অধিকারী কবির জীবনে এ ঘটনা বার বার ঘটেছে, আর রবীন্দ্রনাথের জীবনেও।

যা হোক, নিবিড়-প্রীতিবন্ধনে-বাঁধা গঙ্গাতীরের ভাবুক-পরিবারটিই কিছুদিন পরে চলে এল কলিকাতায় দশনম্বর সদরস্ট্রীটের এক বাড়িতে, জাদুঘরের কাছাকাছি। সন্ধ্যাসঙ্গীতের বিষাদ বেদনা আকূতি সহসা লীন হল নবপ্রভাতসঙ্গীতের আনন্দউচ্ছাসে ও আলোকে। কাদম্বরী-দেবীর অপূর্ব সংসারে, তাঁরই স্নেহপ্রীতিমধুর সান্নিধ্যে ঘটলেও, কবি-প্রতিভার এই বিশেষ প্রতীতি ও পরিণতির জন্য এ ক্ষেত্রে তাঁকেই আমরা "দায়ী" করব না। কারণ, ব্যাপারটি সত্যই দিব্যদর্শনের পর্যায়ে পড়ে-- যোগী বা ভক্ত বহু তপস্যায় ও আরাধনায় কদাচিৎ লাভ করে থাকেন— রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন তাঁর জন্মজন্মার্জিত বহু-পুণ্যফলে এবং তাঁর সমস্ত জীবনের ধারা ও কাব্যের ধারা স্বপ্নভঙ্গে নির্ঝরের মতো পুঞ্জিত তমিস্র এবং পাষাণরাশি সবলে বিদীর্ণ করে অপূর্বপথে অনন্তের অভিসারে বয়ে গিয়েছিল। যে অলৌকিক দর্শন থেকে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' হল সেটি কেউ প্রদীপ ধরে দেখিয়ে দেয় নি, জীবনের পরমসন্ধিক্ষণে আকাশে উষার মতোই তার স্বতঃ প্রকাশ ও অব্যাহত প্রভাব। আনন্দবিদ্যুতের সেই স্পর্শ যেমন অতর্কিত তেমনি অনিবার্য, তেমনি জীবনব্যাপী তার নিঃশব্দ সঞ্চার। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, বিশেষতঃ নতুনবৌঠান, কবির জীবনে এই সুদুর্লভ মাহেন্দ্রক্ষণটি পৌঁছবার ক্ষেত্রটি, এসে ফিরে না যায় তার অনুকূল পরিবেশটি, নিজেরা না জেনেও রচনা করে তুলেছিলেন এ আমরা অবশ্যই বলব।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা চলে, নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে, তেমনি বাল্মীকি-প্রতিভার শেষে, মনে হয়, কবি আশ্চর্য ভবিষ্যদ্‌দৃষ্টির বলে নিজের সারা জীবনের একটি অপূর্ব মানচিত্র অব্যর্থ তূলিকাপাতে এঁকে

গেছেন। সে জীবন আজ যখন তার নির্দিষ্ট শমে এসে সুবিশাল ভাবসাধনার বৃত্তটি সম্পূর্ণ করেছে, একটির সঙ্গে অন্যটি মিলিয়ে দেখে আমাদের বিস্ময়ের সীমা নেই।

কাদম্বরীদেবী॰ এসেছিলেন ঠাকুর-পরিবারে ন বছরের বালিকাটি। প্রাচীন বয়সের রবীন্দ্রনাথ বালক বয়সের প্রথম পরিচয়ের চিত্র এঁকেছেন এই ভাবে স্মরণের বর্ণে ও রেখায়—

ছিল তার কাছাকাছি বয়স আমার।
একখানি শাদা শাড়ি কাঁচা কচি গায়ে,
কালো পাড় দেহ ঘিরে ঘুরিয়া পড়েছে তার পায়ে।·
সাহস হল না কথা কই।··
তার পরে একদিন
জানাশোনা হল বাধাহীন।

কিন্তু, তারও পরে বলতেই হয়েছে—

তবু ঘুচিল না
অসম্পূর্ণ চেনার বেদনা।
সুন্দরের দূরত্বের কখনো হয় না ক্ষয়।
কাছে পেয়ে না-পাওয়ার দেয় অফুরন্ত পরিচয়।

এ তো হল কবির কাব্যে সারসত্যের পরিচয়। শাদা চোখের দেখায় এঁর যে পরিচয় উদ্‌ঘাটিত তার সঙ্গে কতটা মিল আছে তা জানা যাবে অন্যত্র। অবনীন্দ্রনাথ বলেন—

‘সন্ধ্যেয় বসত জ্যোতিকাকা-মশাইদের বৈঠক। এ বৈঠকের চেহারা ছিল আর এক রকম; সেখানে আসতেন তারক পালিত, ছোটো অক্ষয়বাবু, কবি বিহারীলাল। রবিকা বয়সে ছোটো হলেও এই বৈঠকেই যোগ দিতেন। এখানে মেয়েদেরও প্রবেশাধিকার ছিল। নতুন কাকীমা অর্থাৎ জ্যোতিকার স্ত্রী ছিলেন এই বৈঠকের

কর্ত্রী। এখানে চলত গান, বাজনা, কবিতার পর কবিতা -পাঠ।'[৬]

কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর পত্নী শরৎকুমারী বলেন—

'প্রকৃতপক্ষে ভারতী জ্যোতিবাবুরই মানসকন্যা। · জ্যোতিবাবুর তেতলার ছাদে টবেব গাছ সাজাইয়া বাগান করা হইয়াছিল, 'তিনি' নাম দিয়াছিলেন নন্দনকানন। সন্ধ্যার সময় পরিবারস্থ সকলেই সেখানে মিলিত হইতেন। নিত্যনিয়মিত গীতবাদ্য বিদ্যালোচনার মতো মাঘোৎসব, জন্মোৎসব, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহব্যাপারও তখন নিত্যকর্মের মধ্যেই ছিল। তা ছাড়া নাট্যাভিনয়, বিদ্বজ্জন-সমাগম, বসন্তোৎসব, এমন-কি হোলিখেলাবও বিরাম ছিল না। তেতলায় পরিবারস্থ বয়স্থদিগের মেলা এবং বাগানে ছোটো ছেলে-মেয়েদের খেলাধুলা ছুটাছুটি। তখন ছিল শুধু হাসিখেলা, শুধু মেলামেশা। ফুলের তোড়ার ফুলগুলিই সবাই দেখিতে পায়, যে বাঁধনে তাহা বাঁধা থাকে তাহাব অস্তিত্বও কেহ জানিতে পারে না। মহর্ষিপবিবারেব গৃহলক্ষ্মী শ্রীযুক্ত জ্যোতিবিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী ছিলেন এই বাঁধন। বাঁধন ছিঁড়িল— ভারতীর সেবকেরা আর ফুল তোলেন না, মালা গাঁথেন না, ভারতী ধুলায় মলিন।'[৭]

কাদম্বরীদেবী বিহারীলালের ভক্তপাঠিকা ছিলেন, আর কবিও তাঁর ব্যক্তিত্বে, কাব্যরসবোধে ও সম্ভ্রমপূর্ণ হার্দ্য ব্যবহারে মুগ্ধ হতেন এটুকু অনুমান কবা যায়। বিহারীলালেব 'সাধের আসন' কাব্যখানি মহর্ষিপরিবারেব এই গৃহলক্ষ্মীর উপহৃত আসন উপলক্ষ্য করেই লেখা ; সে আসনে তিনি কবিব 'সারদামঙ্গল' কাব্যের কয়েকটি ছত্র ছুঁচের ফোঁড়ে ফুটিয়ে তুলে জানতে চেয়েছিলেন—

'হে যোগেন্দ্র, যোগাসনে
ঢুলু ঢুলু ঢুনয়নে
বিভোর বিহ্বলমনে
কাহারে ধেয়াও ?'

বিহারীলাল বলেন, 'বাটীতে আসিয়া তিনটি শ্লোক লিখি। সেই আসনদাত্রী এখন জীবিত নাই! তাঁহার মৃত্যুর পরে উত্তর সাঙ্গ হইয়াছে!'

কাদম্বরীদেবী দেহত্যাগ করেন ১২৯১ সনের বৈশাখে, মাত্র পঁচিশ বৎসর বয়সে। দিনে দিনে আত্মার যিনি আত্মীয় হয়ে উঠছিলেন, অকালে তাঁর এই অতর্কিত প্রয়াণে রবীন্দ্রনাথের জীবন হঠাৎ কতটা শূন্য হয়ে গিয়েছিল, নির্মেঘ দ্বিপ্রহরে যেন সূর্যের জ্যোতি নিভে গিয়েছিল, সংযতমিত বাক্যে তারই আভাস দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতির 'মৃত্যুশোক' অধ্যায়ে।—

'আমার চব্বিশ বছর বয়সের সময় মৃত্যুর সঙ্গে যে পরিচয় হইল তাহা স্থায়ী পরিচয়। তাহা তাহার পরবর্তী প্রত্যেক বিচ্ছেদশোকের সঙ্গে মিলিয়া অশ্রুর মালা দীর্ঘ করিয়া গাঁথিয়া চলিয়াছে।·· মৃত্যু যখন মনের চারি দিকে হঠাৎ একটা 'নাই' অন্ধকারের বেড়া গাড়িয়া দিল তখন সমস্ত মনপ্রাণ অহোরাত্র দুঃসাধ্য চেষ্টায় তাহারই ভিতর দিয়া কেবলই 'আছে' আলোকের মধ্যে বাহির হইতে চাহিল। কিন্তু, সেই অন্ধকারকে অতিক্রম করিবার পথ অন্ধকারের মধ্যে যখন দেখা যায় না তখন তাহার মতো দুঃখ আব কী আছে।'

মৃত্যুশোকের এই একান্ত তীব্রতার কোনো তুলনা ছিল না সত্য। তবু এটাই যে শেষ কথা নয়, রবীন্দ্রনাথের সত্যসুন্দরের-একনিষ্ঠ-সাধনা-ময় দীর্ঘ জীবন তারই সাক্ষ্যবাহী এ কথা আমরা জানি।—

'তবু এই দুঃসহ দুঃখের ভিতর দিয়া আমার মনের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে একটা আকস্মিক আনন্দের হাওয়া বহিতে লাগিল, তাহাতে আমি নিজেই আশ্চর্য হইতাম। জীবন যে একেবারে অবিচলিত নিশ্চিত নহে, এই দুঃখের সংবাদেই মনের ভার লঘু হইয়া গেল।··· যাহাকে ধরিয়াছিলাম তাহাকে ছাড়িতেই হইল, এইটাকে ক্ষতির দিক দিয়া দেখিয়া যেমন বেদনা পাইলাম তেমনি সেই ক্ষণেই মুক্তির

দিক দিয়া দেখিয়া একটা উদার শান্তি বোধ করিলাম। ··সেই বৈরাগ্যের ভিতর দিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য আরও গভীররূপে রমণীয় হইয়া উঠিয়াছিল। কিছুদিনের জন্য জীবনের প্রতি আমার অন্ধ আসক্তি একেবারেই চলিয়া গিয়াছিল বলিয়াই, চারি দিকে আলোকিত নীল আকাশের মধ্যে গাছপালার আন্দোলন আমার অশ্রুধৌত চক্ষে ভারী একটি মাধুরী বর্ষণ করিত। জগৎকে সম্পূর্ণ করিয়া এবং সুন্দর করিয়া দেখিবার জন্য যে দূরত্বের প্রয়োজন, মৃত্যু সেই দূরত্ব ঘটাইয়া দিয়াছিল। আমি নির্লিপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়া মরণের বৃহৎ পট-ভূমিকার উপর সংসারের ছবিটি দেখিলাম এবং জানিলাম তাহা বড়ো মনোহর।'

অপ্রত্যাশিত এবং নিদারুণ দুঃখআঘাতেব অভিজ্ঞতায় রবীন্দ্রনাথ পরাভূত হলেন না, বরং এতদিনে যেন স্বপ্নময় ভাবময়, কখনো বিষাদ-কুহেলী-আবৃত কখনো হাসিঅশ্রু খচিত এবং অহেতুহর্ষ-সচকিত বাল্যকৈশোর পার হয়ে বলিষ্ঠ সত্যে ও যৌবনে উপনীত হলেন। অশ্রুত কণ্ঠে মূর্ছিত প্রাণের কানে কানে অশরীরিণী কে যেন বলে গেল—

মুক্তির নৈবেদ্য গেনু রাখি
রজনীর শুভ্র অবসানে··
শুধু সে মুক্তির ডালিখানি
ভরিয়া দিলাম আজি আমার মহৎ মৃত্যু আনি।

প্রতিভার বিশেষ একটি পরিণতিতে উত্তীর্ণ হতে পারলেন কবি, তারই উল্লেখ করে জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন—

'জীবনের যাত্রা ক্রমশই ডাঙার পথ বাহিয়া লোকালয়ের ভিতর দিয়া যে-সমস্ত ভালোমন্দ সুখদুঃখের বন্ধুরতার মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইবে তাহাকে · হালকা করিয়া দেখা আর চলে না। এখানে কত ভাঙাগড়া, কত জয়-পরাজয়, কত সংঘাত ও সম্মিলন! এই-সমস্ত

বাধা বিরোধ ও বক্রতার ভিতর দিয়া আমার জীবনদেবতা যে-একটি অন্তরতম অভিপ্রায়কে বিকাশের দিকে লইয়া চলিয়াছেন'—

আমরা জানি জীবনব্যাপী অশ্রান্ত তপস্যার সেই প্রক্রিয়া, অবিচ্ছেদে চলেছিল রবীন্দ্রজীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

যা হোক, কবিপ্রতিভার এই স্পৃহনীয় সংহতি ও পরিণতির প্রথম কথা ও সুর আমরা শ্রবণ করি 'কড়ি ও কোমল' কাব্যে। কড়ি ও কোমলের সঙ্গে তৎপূর্ববর্তী যে-কোনো বাংলা কাব্যের তুলনা করে আমরা যখন মুগ্ধ হই, যখন সচ্ছন্দ সবল কবিকণ্ঠের অবাধ সুরবিহারে—মীড়ে মূর্ছনায় আলাপে— অনন্যতা লক্ষ্য করি, তখন ভুলে যেন না যাই কবি রবীন্দ্রনাথ দৈবক্রমে বা অবলীলাক্রমে সহসা এ শক্তি ও সাচ্ছন্দ্য অর্জন করেন নি, ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকেই তার সব মূল্য শোধ করতে হয়েছে এক চরম দুঃখের অভিজ্ঞতায়।

জীবনের এই পরম অভিজ্ঞতার স্পষ্ট বা ইঙ্গিতময় প্রকাশ দেখা যায় ঐ সময়ের অথবা আরও দশ বছর পরের যে-সমস্ত রচনায় সে হল— সরোজিনী-প্রয়াণ[৮], পুষ্পাঞ্জলি[৯], ঘাটের কথা[১০], রাজপথের কথা[১১], রুদ্ধগৃহ[১২], পথপ্রান্তে[১৩], উত্তর প্রত্যুত্তর[১৪], হায় (গান)[১৫], বিদেশী ফুলের গুচ্ছ, পুরাতন[১৬], নূতন[১৭], ভবিষ্যতের রঙ্গভূমি, কোথায়[১৮], পাষাণী মা, স্নেহস্মৃতি[১৯], নববর্ষে[১৯], দুঃসময়[২০], মৃত্যুর পরে[২০] ইত্যাদি। 'পুষ্পাঞ্জলি' ভারতী পত্রে প্রকাশ পায় ১২৯২ বৈশাখে, মনে হয়, কাদম্বরীদেবীর উদ্দেশে সাম্বৎসরিক স্মৃতিতর্পণ বা শ্রদ্ধা-নিবেদনের উপলক্ষে। এটি যে এক বৎসর পূর্বে শোকের প্রথম অভিঘাতেই লেখা এরূপ অনুমান করা অসংগত হবে না।[২১] 'পুরাতন' 'নূতন' প্রভৃতি কবিতা কড়ি ও কোমলে সংকলিত, এগুলির প্রত্যেকটিতে সদ্যোবিয়োগব্যথার তীব্রতার সংযত প্রকাশ আদ্যন্ত লক্ষ্য করা যায়। দুঃখবোধের সঙ্গে সঙ্গেই আছে দুঃখকে জয় করবার সংকল্প, যা-কিছু ব্যক্তিগত ক্ষয়ক্ষতি তাই বিশ্বসৌন্দর্যে ও বিশ্বজীবনে লীন

ক'রে দেবার প্রবণতা, ফলতঃ যিনি নিখিল সৃষ্টির অধীশ্বর আর জীবনে জীবনে অন্তর্যামী তাঁরই মঙ্গলময় বিধান নম্রহৃদয়ে মেনে নেবার ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা। 'বিদেশী ফুলের গুচ্ছ' অনূদিত কবিতার সমষ্টি বৈ নয় ; লক্ষ্য করবার বিষয় হল— প্রায় প্রত্যেকটি কবিতায় বিষাদ শ্রান্তি নিরাশা বিচ্ছেদ বিরহ অথবা মৃত্যুর সুরই ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ, বিদেশী কবিতগুলিব নির্বাচনে কবির তৎকালীন মানসিক অবস্থা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। কবি 'পুরাতন' কবিতার শুরু করেছেন এই ভাবে—

হেথা হতে যাও পুরাতন,
হেথায় নূতন খেলা আরম্ভ হয়েছে।

আব 'নূতন' কবিতা শেষ কবেছেন এই ভাবে—

সংসাব জীবনময়, নাহি হেথা মরণের স্থান।
আয় রে নূতন, আয়,
সঙ্গে করে নিয়ে আয় তোর সুখ তোব হাসিগান।··
যে যায় সে চলে যাক,
সব তার নিয়ে যাক, নাম তার যাক মুছে দিয়ে।

যে কবিতার আবম্ভ হয়েছে—

হায়, কোথা যাবে!
অনন্ত অজানা দেশ, নিতান্ত যে একা তুমি,
পথ কোথা পাবে!

তারই দীর্ঘশ্বাসসমীবিত শেষ কথা এইটুকু—

যাবে যদি, যাও যাও, অশ্রু তব মুছে যাও,
এইখানে দুঃখ রেখে যাও!
যে বিশ্রাম চেয়েছিলে তাই যেন সেথা মিলে,
আরামে ঘুমাও!

'স্নেহস্মৃতি' প্রভৃতি কবিতা চিত্রা কাব্যে স্থান পেয়েছে। নিভৃত মনের

মণিকোঠায় প্রিয়জনের সুস্মিতমূর্তি যে এতটুকু ম্লান হয় নি, দশ বৎসরে যে অতীত সুখদুঃখের কিছুই ভোলা যায় নি, সেই জননী-ভগিনী-সখী-সমা দেবী-মানবীর স্মৃতিতর্পণে আজও তেমনি ক'রেই যে অশ্রুবারি চক্ষের কূলে কূলে পূর্ণ হয়ে ওঠে-- সে বিষয়ে আর কোনো সংশয় থাকে না। বস্তুতঃ দশ বৎসর পূর্বের ঘটনাই যেন নয়, যেন প্রত্যক্ষ, যেন আজ ১৩০১ সনের বৈশাখে সেই হৃদয়বিদারক বিচ্ছেদ পুনর্বার অথবা প্রথমবার চোখের সামনে ঘটছে, এমনি আমাদের ধারণা হয়। 'মৃত্যুর পরে' কবিতায় মর্মান্তিক বেদনার যথেষ্ট সংযত প্রকাশ আছে সন্দেহ নেই, ব্যক্তিবিশেষেব ক্ষয়ক্ষতিকে একটি নৈর্ব্যক্তিক বিশ্ব-ভূমিকাতে দেখবার প্রয়াস আছে, অবশেষে বুক ফেটে তব্ এই জিজ্ঞাসাই জেগেছে—

ওই দূর দূরান্তবে অজ্ঞাতভুবন 'পরে
কভু কোনোখানে
আব কি গো দেখা হবে আব কি সে কথা কবে
কেহ নাহি জানে।

প্রসঙ্গক্রমে বলি, কড়ি ও কোমলে 'বিরহীর পত্র', 'প্রাণাধিকা শ্রীমতী ইন্দিরা'র উদ্দেশে তিনটি 'পত্র' ('শিশু' কাব্যের শেষে 'মঙ্গলগীত' শিরোনামে সংকলিত) বা 'আশীর্বাদ' ('শিশু' কাব্যে সংকলিত) ইত্যাদি রচনায় যে গভীর গম্ভীব উদাত্ত বোধ, যে বলিষ্ঠ-সুন্দর ভাবপ্রসাদ, সেই সঙ্গেই যে অতিসুকুমার স্নেহ প্রীতি দবদ ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে সেও বিশেষভাবেই নূতন। সেও শোকের আঘাতে দীর্ণ মহাপ্রাণের উৎসমুখেই ফোয়ারার মতো উর্ধ্বে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। ফলতঃ, মৃত্যুকে তেমন ক'রে অনুভব করলেন, প্রত্যক্ষ করলেন কবি এই প্রথম। তার পরিণাম যে কী তা 'জীবনস্মৃতি'তে নিজেই অতি সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন— আর, তাঁর পরবর্তী ভাবসাধনার সর্বাঙ্গীণ ব্যাপ্তি ও গভীরতায়, সংযম ও শক্তিতে,

ধৃতি ও শান্তিতে, সবল আনন্দে তা স্বতই প্রমাণিত হয়।

পূর্ণপরিণত রবীন্দ্রপ্রতিভার পরম লক্ষ্য সব-সময় এক ও অভিন্ন থাকা সত্ত্বেও নানা দিক্‌-পরিবর্তন, কাব্য থেকে কাব্যান্তরের সোপান বেয়ে ক্রমিক উত্তরণ— কোনো ব্যক্তিবিশেষের নয়— একটি দেশের ও জাতির একটি যুগের ভাবসাধনার সঙ্গে অভিন্ন বলা চলে। নূতন কালের নূতন এক মহাভারতেও তা লিপিবদ্ধ হতে পারে— আপাতত তার বিস্তারিত সূচীপ্রণয়ন মাত্র সমাধা হয়েছে শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের চার-খণ্ড 'রবীন্দ্রজীবনী'তে। বলাই বাহুল্য, আমাদের অত্যল্প শক্তি নিয়ে আমরা সেই অলিখিত 'ইতিহাস' লিখতে বসি নি। রবীন্দ্রজীবনে বিশেষ একটি পভাব, তার সুদূরপ্রসারী কতকগুলি ফলাফল, তারই সম্পর্কে কিছু তথ্য ও ইঙ্গিত যদি দেওয়া যায় তা হলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। রবীন্দ্রপ্রতিভা নিজেরই গুণে আর নিজেরই শক্তিতে ক্ষুদ্র বীজ থেকে সুবিশাল অক্ষয়বটের মতো ক্রমপরিণতি লাভ করেছে। তার যথার্থ হেতু তার অন্তরেই, অথচ বাহিরেও কী বিশেষ কার্যকারণসংযোগ ঘটেছিল, কেমন অনুকূল মৃত্তিকা জল বায়ু উত্তাপ এবং আলোক জুটেছিল, সেটিও তো জানবার বিষয়। অন্তরকে বাহিরে শরীরীভাবে দেখা মানবমনের, বিশেষতঃ কবি ও শিল্পী-মনের, বিশেষ একটি প্রবণতা। কবিজীবনের আলোচনায় কাদম্বরীদেবীর স্নেহপ্রীতি ও সাহচর্যের, জীবন ও মৃত্যুর, সেই দিক দিয়েই বিশেষ তাৎপর্য। না হলে এই একই সূত্রে সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যের ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণের চেষ্টা বাতুলতা বৈ নয়। মানুষের জীবন ও মানস সহজবোধ্য 'চারুপাঠ প্রথমভাগ' হতে পারে না, নির্‌ভুল-প্রমাণ-সাপেক্ষ জ্যামিতিক উপপাদ্যও নয়। কথায় বলে— একটি অতিসূক্ষ্ম বালুকণাকে আশ্রয় ক'রে শুক্তির অভ্যন্তরে যে রসক্ষরণ হয় তারই পরিণাম লাবণ্য-টলটল নিটোল মৌক্তিক।

শুষ্কেন্ধনে একটিমাত্র স্ফুলিঙ্গ উড়ে প'ড়ে বিশাল বহ্ন্যুৎসবের সৃষ্টি হতে পারে। অথবা তার চেয়ে বলা ভালো - রসায়নশাস্ত্রে যাকে ক্যাটালিটিক এজেন্ট্ বা অনুঘটক বলে, একটি 'বস্তু' অবিকৃত থেকেও যখন অন্যান্য বস্তুতে ভাবান্তর ও রূপান্তর ঘটায়, মানব-সংসারের মধ্যে একের জীবনে অন্যের অনুরূপ কার্যকারিতা আমরা কি লক্ষ্য করি নি? মানবজীবন-বিকাশের মূলীভূত এমন সম্বন্ধ-সংঘটনকে পরবর্তী যাবতীয় মুখ্য ঘটনারই মুখ্য কারণ ব'লে স্থির-নিশ্চয় করলেও যেমন মিথ্যার প্রশ্রয় দেওয়া হবে, গৌণ মনে ক'রে একেবারে উপেক্ষা করলেও প্রমাদের অন্ত থাকবে না।

মানুষ যেহেতু মনোময় সত্তা, হাত দিয়ে হাত ছোঁওয়াই নয়, মন দিয়ে মন ছোঁওয়া যায়— দৃষ্টির অন্তরালে চলে গিয়েও অন্তরের অন্তরে থাকে— সেই-যে মনোময় চিন্ময় স্পর্শ, সেই-যে অশরীরী প্রভাব, তারই অন্তঃশীল অতিসূক্ষ্ম ধারার অনুসরণের সম্ভাবনা নেই আর সার্থকতাও অল্পই। যেহেতু, 'বস্তু' যত সূক্ষ্ম হয় ততই হারিয়ে ফেলে আপন নামরূপ ও স্বতন্ত্র পরিচয়, বিশ্বজীবনের তলে তলে যে-সব নিগূঢ়-গোপন শক্তি সব দেশে সব কালেই সক্রিয় রয়েছে তারই সঙ্গে মিলে-মিশে হয় অভিন্ন।

কড়ি ও কোমল থেকে মানসী, সোনার তরী, চিত্রা— চৈতালি থেকে কথা, কাহিনী, কল্পনা, ক্ষণিকা-- নৈবেদ্য থেকে স্মরণ, শিশু, উৎসর্গ, খেয়া— আর তারও পরে গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি— প্রায় তিনটি দশকের অজস্র এবং অপূর্ব কবিকৃতির ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে অবশেষে কবিকে আমরা প্রায় ঋষির পদবীতে উন্নীত করে দেখতেও প্রস্তুত হয়েছি মনে মনে। জেনেছি তাঁকে মহামনীষী ও জীবনসাধক ব'লে। কিন্তু, কবির অন্তরে ব'সে অতন্দ্র কবিপ্রতিভা ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে বুঝি ভাবছিল সেদিন: ততঃ কিম্! রবীন্দ্রনাথ কবি, তিনি তো ঋষি নন। তিনি চিরজীবনের প্রেমিক চিরনবীন প্রাণ,

তিনি তো পুরাতন অভ্যাসের গণ্ডীতে পাকা ঘর বেঁধে কোনো-রকম পুনরাবৃত্তি করতে রাজী নন। এ দিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন। বাতাসে হয়তো বারুদের গন্ধ পেয়েছিলেন কবি। কিন্তু, যুদ্ধ নয় শুধু মানচিত্রে-নির্দিষ্ট কোনো জনপদে বা ভূভাগে। কোন্ জগদ্‌ব্যাপী সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে ডাক দিলেন কবি নবীন-কাঁচা'কে? সে কি চিরনবীন চিরকিশোর আপনাকেই নয়? অকুণ্ঠচিত্তে বলে উঠলেন—

তোমার শঙ্খ ধুলায় প'ড়ে কেমন ক'রে সইব? ··
লড়বি কে আয় ধ্বজা বেয়ে, গান আছে যার ওঠ্-না গেয়ে,
চলবি যারা চল্ রে ধেয়ে— আয়-না রে নিঃশঙ্ক। ··
যৌবনেরই পরশমণি করাও আবার স্পর্শ।
দীপক তানে উঠুক ধ্বনি দীপ্ত প্রাণের হর্ষ।
দুই হাতে আজ তুলব ধরে তোমার জয়শঙ্খ।

'কী জানি কী ঘটে'— আমাদের মনে মনে জেগে উঠল এই শিহরণ। রবীন্দ্রনাথের কাছে আমাদের প্রত্যাশার কোনো শেষ হয় নি—

কেবল ভেবেছি দেবে, দেবে,
আরও কিছু দেবে।

কিন্তু, কী যে দেবেন সে কি কবি নিজেও জানতেন? প্রাগ্‌যুদ্ধ য়ুরোপের প্রবল প্রচুর জীবনের সিন্ধুদোলায় দোল খেয়ে পশ্চিম থেকে পূর্বে এনেছিলেন বটে সেই দোলা রক্তের প্রবাহে, সেই বেগের আবেগ সঞ্চারিত হয়েছিল কবিব প্রাণে ও গানে। তাঁর নিজস্ব ভাবনাধারার সঙ্গে এর বিরোধ ছিল না, আর যদি বা থেকে থাকে— স্থিতি ও গতি, তান এবং তাল, শেষ পর্যন্ত এক পূর্ণের পরিক্রমায়, একটি সামগ্রিক গানে, মিলিয়ে নেবার মতো শক্তি ও প্রতিভা রবীন্দ্রনাথের ছিল। কিন্তু, নূতন গান বাঁধবেন ঠিক

কোন্ ছন্দে আর কোন্ লয়ে? সে কি অ-পূর্ব নূতন না হলেও চলবে?

অল্পকালের মধ্যে আকস্মিক একটি ঘটনায় যে নূতন ছন্দ পাওয়া গেল কবিতার, যার প্রেরণাবলে যেন এক ছুটেই নূতন শিখরে পৌঁছল রবীন্দ্রকবিকৃতি, 'বলাকার ছন্দ' বলেই তার সহজ সরল পরিচয়। ক্ষুদ্র ঘটনা, দু কথায় তার বিবরণ দেওয়া শেষ হয়ে যায়। ১৯১৪ খৃস্টাব্দের জুলাই মাসে বা ১৩২১ শ্রাবণে যুরোপে বিশ্বযুদ্ধ বাধল। পূজাবকাশে শান্তিনিকেতন ছেড়ে কবি বের হলেন ভ্রমণে গয়ায়, গয়া থেকে উত্তরভারতের নানা স্থলে। এই ঘোরাঘুরির মধ্যেই এক সময় গঙ্গা-যমুনা-সংগমে প্রয়াগে বা এলাহাবাদে এসে পৌঁছলেন। কবির বাল্যসহচর ও ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, কবি তাঁরই জামাতা প্যারীমোহনের বাড়িতে ছিলেন বোধ করি সপ্তাহ-তিন। সে বাড়িতে স্বর্গীয়া নতুনবৌঠানের একখানি প্রতিকৃতি ছিল; তারই রহস্যময় নির্বাক্ দৃষ্টি কবির অন্তরতম অন্তরে প্রবেশ ক'রে কী প্রশ্ন জাগিয়ে তুলল, বর্তমান-ভোলা কিশোর-কবিকে কী কথা বলল, তারই প্রতিপ্রশ্নে আর প্রত্যুত্তরেও বটে রবীন্দ্রনাথ বলে উঠলেন—

তুমি কি কেবল ছবি শুধু পটে লিখা?
ওই যে সুদূর নীহারিকা
যারা করে আছে ভিড়
আকাশের নীড়,
ওই যারা দিনরাত্রি
আলো হাতে চলিয়াছে আধারের যাত্রী
গ্রহ তারা রবি,
তুমি কি তাদেরই মতো সত্য নও?

এটি 'বলাকা' কাব্যের প্রথম কবিতা, অর্থাৎ প্রবহমাণ 'পয়ারে'

অসমমাত্রার ছত্রে ছত্রে মিল রেখে আর দ্রুত মধুর মন্দ্রধ্বনি জাগিয়ে রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম রচনা। বহিরঙ্গের বিচারে গিরীশ ঘোষের নাটকের ছন্দের সঙ্গে এর মিল থাকতে পারে, তৎপূর্বে রাজকৃষ্ণরায় আর মাইকেলও ব্যবহার করেছেন, মিল না রেখে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং একবার এ ছন্দের প্রয়োগ করেছিলেন 'মানসী কাব্যে— তবু কবির পরিণত প্রতিভায় আন্‌কোরা নূতনের চমক নিয়েই এ ফিরে এল নূতন সঞ্জীবনীশক্তি অর্জন ক'রে, কবির নিরলস দীর্ঘ জীবনের সকল তপঃশক্তির বিদ্যুতে পূর্ণ হয়ে।

চিরপরিচিতা চিত্রিতার দৃষ্টিপাতমাত্রে কবির অন্তঃকরণে যে প্রবল আলোড়ন উপস্থিত হল, মনে হয় কোন্ বিস্মৃত জন্মই যেন জেগে উঠল, তার প্রকাশ সম্ভব হল না অভ্যস্ত কোনো বাক্‌ছন্দে আর পুবাতন কোনো ভাবনাবও ছাঁদে। যেমন অপ্রত্যাশিত নূতন উপলব্ধি তেমনি নূতন তার ভাব ভাষা ছন্দ ও সঙ্গীত। প্রায় সমস্ত 'বলাকা' কাব্যের সেটি বিশেষ বাহন, অর্থাৎ ঐ একই ছন্দে লেখা হয়েছে তাজমহল বা শাজাহান সম্পর্কে দীর্ঘ কবিতাটি, 'বিচার', 'চঞ্চলা', 'বলাকা' ও 'ঝড়ের খেয়া'— অন্যান্য কবিতার উল্লেখ নাহয় না-ই কবা গেল। গতিব তত্ত্বই এখানে জীবনের সত্য হয়ে উঠেছে, গতি সঞ্চারিত হয়েছে বিশ্বের সর্বত্র, যার ফলে—

পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ। ·

তৃণদল
মাটির আকাশ-'পরে ঝাপটিছে ডানা।
মাটির আধার নীচে কে জানে ঠিকানা
মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।

সমস্ত বিশ্বভুবনকেই কবি দেখেছেন তার নিরবচ্ছিন্নগতিশীল স্বরূপে। সম্বোধন করেছেন—

হে বিরাট নদী,
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল
অবিচ্ছিন্ন অবিরল
চলে নিরবধি।
স্পন্দনে শিহরে শূন্য তব রুদ্র কায়াহীন বেগে।

সর্বব্যাপী গতির এই-যে উপলব্ধি, 'বলাকা'র ছন্দও তার উপযোগী। বাংলা জোড়মাত্রার ছন্দকে যতদূর মুক্তি দেওয়া সম্ভব তা দেওয়া হয়েছে। (মিল দেওয়া না-দেওয়ায় ছন্দের স্বরূপ বা স্ব-ভাব কিছু বদলায় না এবং রবীন্দ্রনাথ যেহেতু শুধু কবি নন, শ্রেষ্ঠ গীতিকারও বটে, মিলের দ্বারা একটি প্রচ্ছন্নপ্রায় গীতঝঙ্কার রেখে চলা তাঁরই বিশেষপ্রতিভাসংগত।) বলাকার ছন্দ দাঁড়ে নেই বা সুবৃহৎ কোনো খাঁচাতেও নেই, মুক্ত পক্ষে উড়ে চলেছে আকাশ থেকে আকাশে। রবীন্দ্রছন্দের এই নূতন মুক্তির ফলে রবীন্দ্রকাব্যের এক মহনীয় নূতন অধ্যায়, আর আমরা দেখেছি কাদম্বরীদেবীর রহস্যস্মিত দৃষ্টিপাতে তারও সূচনা।

'বলাকা'য় অপূর্ব কাব্যরূপ পেয়েছে যে গতিবাদ সে সম্পর্কে একটু আমাদের বক্তব্য আছে এই যে, এটি যত প্রবলভাবেই এখন উপস্থিত হয়ে থাক্ আমাদের সামনে, যতই সাগরপারের থেকে 'নূতন আমদানি' মনে হোক, এটি রবীন্দ্রভাবনায় তথা রবীন্দ্রমানসে চিরদিনই বর্তমান ছিল।

পারবি না কি যোগ দিতে এই ছন্দেরে
খসে যাবার, ভেসে যাবার, ভাঙবারই আনন্দে রে

এটি কবির চিরপুরাতন জিজ্ঞাসা। ঈশানের পুঞ্জমেঘে আসন্ন ঝড়ের বেগে কী মত্ততা জাগিয়েছিল সে আমরা ভুলি নি, আর 'যেতে নাহি দিব' কবিতাতেও দেখেছি—

প্রলয়সমুদ্রবাহী সৃজনের স্রোতে

হুহু করে তীব্রবেগে চলে যায় সবে
পূর্ণ করি বিশ্বতট আর্ত কলরবে।

কিন্তু, নিরন্তর বিদায়ের বিশ্বব্যাপী এই বেদনাকে কবি তাঁর চার বছরের ম্লানমুখী মেয়ের ছলছল নেত্রেই যে প্রথম দেখেছিলেন এমন নয়। 'চব্বিশ বছর' বয়সে মৃত্যুশোকের আঘাত এল অতর্কিতে; তখনকার কবিমানসের একটি প্রতিমা নির্মাণ করলে না জানি সে কেমন দেখাতো। আপন অন্তরের অন্তরে তারই মুখে চোখে কবি মূর্তিমতী দেখেছিলেন বিশ্বের বেদনাকে; বিশ্বের সর্বকালীন খ'সে যাওয়ার, ভেসে যাওয়ার, জ্বলবার আনন্দেই প্রজ্জ্বলন্ত সূর্যতারার নিরন্তর ধেয়ে যাওয়ার তত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে নিজেকে স্থায়ী সান্ত্বনাও দিয়েছিলেন, শাশ্বত নিজেকে দেখেছিলেন নিজের বাইরে। এজন্যই বলতে পেরেছিলেন—

'জগতের মধ্যে আমাদের এমন 'এক' নাই যাহা আমাদের চির-অবলম্বনীয়। প্রকৃতি ক্রমাগতই আমাদিগকে এক হইতে একান্তরে লইয়া যাইতেছে— এক কাড়িয়া আর-এক দিতেছে।··· শতসহস্র একের মধ্য দিয়া প্রকৃতি আমাদিগকে সেই এক মহৎ এক'এর দিকে লইয়া যাইতেছে।·· আমি বৈরাগ্য শিখাইতেছি। অনুরাগ বদ্ধ করিয়া না রাখিলে তাহাকেই বৈরাগ্য বলে, অর্থাৎ বৃহৎ অনুরাগকেই বৈরাগ্য বলে।··· প্রেম জাহ্নবীর ন্যায় প্রবাহিত হইবার জন্য হইয়াছে। তাহার প্রবহমাণ স্রোতের উপরে সীল-মোহরের ছাপ মারিয়া 'আমার' বলিয়া কেহ ধরিয়া রাখিতে পারে না।·· বিস্মৃতির মধ্য দিয়া বৈচিত্র্য ও বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া অসীম একের দিকে ক্রমাগত ধাবমান হইতে হইবে, অন্য পথ দেখি না।'

১২৯২ সালের ২৬ আশ্বিন তারিখে সোলাপুর থেকে রবীন্দ্রনাথ এ চিঠিখানি লেখেন। এমন নির্মম গতিবাদের সূত্র এবং ভাষ্য আর কী হতে পারে? মহৎপ্রাণে দীর্ণ 'মম'তার উৎসমুখেই এর নিঃসরণ।

'বলাকা'র অন্তর্নিহিত তত্ত্বের এটিতে এমন এক প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা রয়েছে যে একদা, মনে পড়ে, 'এ কথা জানিতে তুমি ভারতঈশ্বর শাজাহান' এই কবিতা নিয়ে তত্ত্বজিজ্ঞাসু এক বন্ধুকে কৌতুক ক'রে বলেছিলাম – কবি জানতেন আগ্রায় তাজমহল দেখে এসে ১৪ কার্তিক ১৩২১ তারিখে তিনি যে কবিতা লিখবেন সেটি পণ্ডিতজনের নিকটে বড়ো দুর্বোধ হবে, বহুভাষণ কিম্বা নির্ভাষণ— অধ্যাপকেরা পড়বেন এই উভয়সংকটে, কাজেই করুণাপরবশ হয়ে ও বিশেষ বিবেচনা ক'রে সাদাসিধে গদ্যে ভাবী কবিতার ব্যাখ্যাটি লিখে রাখলেন কবিতা লেখার প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে।—

যে প্রেম সম্মুখপানে
চলিতে চালাতে নাহি জানে··
পথের ধুলার মতো জড়ায়ে ধরেছে তব পায়ে,
দিয়েছ তা ধূলিরে ফিরায়ে।···
যতদূর চাই
নাই নাই সে পথিক নাই।
প্রিয়া তারে রাখিল না, রাজ্য তারে ছেড়ে দিল পথ,
রুধিল না সমুদ্রপর্বত।
আজি তার রথ
চলিয়াছে রাত্রির আহ্বানে
নক্ষত্রের গানে
প্রভাতের সিংহদ্বার-পানে।

একই ভাব, যা-কিছু পার্থক্য ভাষায় ও ভঙ্গীতে। ফলতঃ, 'রুদ্ধগৃহ' 'পথপ্রান্তে' 'উত্তর প্রত্যুত্তর' আর সমকালীন বহু কবিতা সবেরই ভাবনা ও ভাষা মনের নিরাকার থেকে আকার পেয়েছে, দানা বেঁধে উঠেছে, রবীন্দ্রনাথের নতুনবৌঠানের যে মৃত্যু অভিঘাতে, সে'ই কবিকে বিশেষ করে দীক্ষিত করেছে এই মৃত্যুঞ্জয়মন্ত্রে— তারই নূতনতম এবং

প্রাণপূর্ণতম উচ্চারণ বলাকা কাব্যে।

সুতরাং বলাকার ছন্দ শুধু নয়, তার হৃৎস্পন্দ, তার ভাবও একই কার্যকারণসূত্রে রবীন্দ্রনাথের জীবনের একটি বিশেষ ঘটনার সঙ্গেই যুক্ত, এ বিষয়ে কোনো সংশয়ের অবকাশ নেই।

কবি আকৈশোর জানতেন 'জগতস্রোতে' সবই ভেসে চলেছে, দিগ্‌বিদিকে আনন্দের তরঙ্গ উঠেছে, বিশ্বজীবনের সেই স্রোতে ভেসে গিয়েই ব্যক্তিজীবনের পরম সার্থকতা। কিন্তু এ হল চিন্তায় জানা, ভাবুকতায় জানা। অত্যন্ত সত্য করে জেনেছিলেন, চরম দুঃখবোধের মূল্য শোধ করে জেনেছিলেন আরও পরে— সে কথাই আমরা এই মাত্র উল্লেখ করেছি।

আবেগ ও চিন্তা, সামগ্রিক জীবনদর্শন ও প্রাণপূর্ণ অনুভূতি, উভয়েব একীভূত প্রেরণায় রবীন্দ্রকাব্যকৃতির যে বিস্ময়কর পর্বের সূচনা হল বলাকায়— পলাতকা, শিশু ভোলানাথ, পূরবী, মহুয়া এবং বনবাণী পাব হয়ে প্রায় সার্ধ এক দশক সময়ে সেটি এসে পৌঁছল পরিশেষ কাব্যে। জীবনে রবীন্দ্রনাথ বারম্বার বলেছেন—

যদি বারণ করো তবে গাহিব না।

বহুবার অনুভব করেছেন—

যাহা কিছু ছিল সব দিনু শেষ ক'রে··
কাল কী আনিয়া দিব যুগলচরণে!

তেমনি কোন্ সমাপ্তির সম্ভাবনায় বোধ করি তাঁর এই নূতন কাব্যেব ললাটে লিখে দিলেন— 'পরিশেষ'। কেননা, চিরতরুণ প্রতিভার অন্তরে ভাব ও রসের প্রেরণা নিঃশেষিত না হলেও, পঞ্চেন্দ্রিয় এবং মনোবুদ্ধিকে বিস্মিত পুলকিত করে অহর্নিশি দশ দিকে অলক্ষ্য মধু-বর্ষণ হতে থাকলেও, যেমনটি হয়েছে শৈশবে কৈশোরে, নূতন ভাষায় ও ছন্দে, নূতন ভঙ্গীতে, নূতন প্রকরণে নির্মীয়মাণ অভিনব আধাব

না পাওয়া গেলে অতি বড়ো প্রতিভারও সৃজনাবেগ এক সময় স্তব্ধ হবে না কি? এ সংসারে নূতন বিষয় তো কিছুই নেই; স্মরণাতীত কাল থেকে মানুষের সামনে যে শোভা, যে মাধুরী, যে সত্য ছিল আজও তাই আছে— নূতন প্রতিভার শক্তিতে বারে বারে তার নূতন প্রকাশ হয় মাত্র। সেই নূতনতার চমৎকার ক্ষয় হলে বা মুছে গেলে প্রকাশের প্রেরণাও ঘুচে যায়। তাই সচেতন কবি বা শিল্পী নিত্য-নূতন উপায়-উপকরণের সন্ধান করেন। ভাবের নূতন ভাষা চাই, ভাষার নূতন ছন্দ। রবীন্দ্রপ্রতিভারও এই ছিল সুচিরপ্রবণতা। নূতন ভাষা ও ছন্দের গুণে বারে বারে নিজেকে নূতন ক'রে চিনেছে ও চিনিয়েছে।

যখন কবি ভেবেছিলেন অন্তরে বাহিরে যত-না ভাবের ঐশ্বর্য আর রসের সংবেদন থাক্, আর বুঝি নূতন ভাষা নেই নূতন ছন্দ, নিজের প্রতিভার প্রতি তিনি অবিচারই করেছিলেন— একটু ভুল বুঝেছিলেন। সে ভুল ভাঙতে দেরি হয় নি। পরিশেষের পরেও তাই 'পুনশ্চ'।

মাত্রা ও যতির নিয়মসংযমে বাঁধা ছন্দকে বহুভঙ্গিম মুক্তি যতদূর দেওয়া যায়, 'বলাকা'য়, পরে 'পলাতকা'য়, কবি তারই পরীক্ষা করে অদ্ভুত সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। কবিতার ছন্দকে আর বুঝি অবাধ প্রসাবিত করা সম্ভব নয়। তাই একদিন কবি গদ্যের আধারেই সজ্ঞান-সচেতন-ভাবে কাব্যবস্তু ধরে দিতে উদ্যত হলেন। ফলে পূর্বপরিচিত গদ্যভঙ্গীর ঈষৎ ভাবান্তর ও সুরান্তর হল না যে তাও নয়। এর অতি পুরাতন আর অতি নূতন নজির আছে দেশ-বিদেশের সাহিত্যে সে তো অনেকেই জানেন আর কবিও জানতেন। বাংলা-ভাষায় এটি আমদানি করতে অনুরোধ করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথকে, তিনি করেন নি। অবনীন্দ্রনাথ কবির অনুরোধে বা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই এই ছন্দের যে প্রয়োগ ও পরীক্ষা করেছিলেন সেও সম্পূর্ণ সমর্থন পায় নি রবীন্দ্ররুচির। কাজেই কবি স্বয়ং এ কাজে প্রবৃত্ত হলেন।

রবীন্দ্র-কাব্যরচনার মোটামুটি বিবরণে যাঁরা মন দিয়েছেন, এ-সব তথ্য তাঁদেরও জানা আছে। কিন্তু, গদ্যছন্দ ব্যবহারের আর-একটি নিগূঢ় উপলক্ষ্য বা প্রেরণা, আরও প্রচ্ছন্ন কাহিনী, সে হয়তো অনেকেই লক্ষ্য করেন নি।

যে কার্যকারণসূত্রে নতুনবৌঠান কাদম্বরীদেবীর অম্লানচ্ছবি অন্তরে নূতন ক'রে প্রত্যক্ষ করলেন কবি এলাহাবাদে এসে, বাংলা ১৩২১ সনের শরৎশেষে, সংশয়ের কোনো কারণ থাকে না যে, সেই সূত্রেই মনে স্পষ্ট জেগে উঠল তাঁর তেইশ-চব্বিশ[২২] বছর বয়সের শোক, সেদিনের অন্তর্লীন সেই অশ্রুমন্দাকিনীর অন্তের-অশ্রুত কলধ্বনি, আর তারই কথঞ্চিৎ প্রকাশ 'পুষ্পাঞ্জলি'তে— যে লেখা বহু-পুরাতন ভারতী পত্রিকার ধূলিমলিন শ্রীহীন জীর্ণ কতকগুলি পৃষ্ঠার মধ্যে কোথায় লুকিয়ে আছে। বড়ো ব্যক্তিগত ব'লেই বোধ করি আজ পর্যন্ত এ রচনা কোনো গ্রন্থে তুলে দিতে সংকোচ ঘোচে নি। অথচ ওর কি কোনো মূল্য নেই? ওর মধ্যে জীবনের কোনো সত্য নেই? জীবনের সেই দুঃসহ শোক আজ যখন পরিব্যাপ্ত শান্তিতে পরিণত হয়েছে, ওকেও কি নূতন বেশ পরিয়ে বরণ করে নেওয়া যাবে না? সেদিনের ব্যথা নির্জন বনের ছায়াতলে গোপনে বসে ছিল, পথিকের-পদপাত-হীন গহনে পথের চিহ্ন যেখানে ঘাসে ঢেকে গিয়েছে — ঐ করুণবেদনার হাতখানি হাতে তুলে নিয়ে চিরকিশোর কবিকে আজ বলতেই হল, একি তোমার অপূর্ব রূপ! একি রূপান্তর! নূতন সুরে ও ছন্দে সেই বলা'ই 'লিপিকা'র প্রথম অংশের কতকগুলি রচনায় ধরা রয়েছে। আসলে এখানেই হয়েছে 'পুনশ্চ' প্রভৃতি কাব্যের আধারভূত নূতন গদ্যছন্দের উৎপত্তি। এ কথাও কবিই বলেছেন 'পুনশ্চ' কাব্যের ভূমিকায়, আর আমরাও দেখি— 'পায়ে চলার পথ' 'সন্ধ্যা ও প্রভাত' 'একটি দিন' 'একটি চাউনি' 'কৃতঘ্ন শোক' 'সতেরো বছর' 'প্রথম শোক' এই-সব রচনায়। উল্লিখিত রচনার

কোনো-কোনোটি 'পুষ্পাঞ্জলি'র অংশবিশেষের ভাষান্তর বললেও অত্যুক্তি হয় না, কোনোটি ভাবান্তর, আর শেষোক্ত রচনাটি হল সেদিনের সেই শোকের একটি নবীভূতা প্রতিমা নির্মাণ ক'রে এ দিনের একটি নূতন 'কবিতা'।

১৩২১ আশ্বিনে (?) এলাহাবাদে আগমন এবং ১৩২৬ আষাঢ়-অগ্রহায়ণে 'লিপিকা'র উক্ত রচনাবলীর সাময়িক পত্রে ক্রমিক প্রকাশ —উভয়ের মধ্যে বেশ কয়েক বৎসরের ব্যবধান আছে জানি। কিন্তু একটি ঘটনার অসদ্ভাবে আর-একটি যে ঘটত না এটাও ঠিক। কবিচিত্তের চেষ্টা কোনো ক্ষেত্রে দ্রুত আর কোথাও বা মন্থরভাবে চলে। বিস্তারিত হেতু-প্রদর্শনের স্থান এখানে নেই, আর এ সম্পর্কে সব তথ্যও আমরা জানি নে। যা হোক, ১৩২৬ সনের কাছাকাছি কোনো সময়ে 'পুষ্পাঞ্জলি'র রূপান্তর-সাধনের আবেগে নূতন গদ্যছন্দ এল লেখনীর মুখে, ভাষাশিল্পী তাতে পুলকিত হয়ে উঠেছিলেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। 'লিপিকা'র লেখাগুলির রচনাকালের পারম্পর্য এখনো জানা যায় নি। রচনা আর প্রকাশের পারম্পর্যে অনেকটাই মিলবে কিনা কে জানে! প্রথমে পাই 'তোতাকাহিনী'। এটির উপক্রমে একটু ভঙ্গীময় গদ্যছন্দের আভাস আছে তা হয়তো বলা যায়। তার পরেই পূর্বোক্ত 'প্রথম শোক'।—

বনের ছায়াতে যে পথটি ছিল
        সে আজ ঘাসে ঢাকা।
সেই নির্জনে হঠাৎ
        পিছন থেকে কে বলে উঠল,—
            আমাকে চিনতে পারো না?
তার চোখের কোণে একটু
        ছল্‌ছলে আভা দেখা দিলে, যেন
            দিঘির জলে চাঁদের রেখা।

গদ্যছন্দের অশ্রুত সঙ্গীত মৃদুগুঞ্জনের আভাসে জেগে উঠছে অতীতের করুণমধুর স্মৃতির অনুরণনে। সেই বিবাগিনী স্মৃতির অলক্ষ্য অঙ্গুলি-স্পর্শেই ক্রমশ আরও পরিস্ফুটভাবে বেজেছে এই নূতন রাগিণী পরবর্তী 'পায়ে চলার পথে' 'মেঘলা দিনে' 'মেঘদূত' প্রভৃতি রচনায়। বিলুপ্ত দিনের ভাবনাবেদনা অপূর্ব রূপ পেয়েছে কাব্যানুবন্ধী গদ্য-ছন্দে। একই সময়ে (কার্তিক ১৩২৬) বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশ পেয়েছে 'বাঁশি' 'কৃতঘ্ন শোক' 'সতেরো বছর' 'সন্ধ্যা ও প্রভাত' আর তারই পরে (অগ্রহায়ণ ১৩২৬) 'একটি চাউনি' এবং 'একটি দিন'। 'পুষ্পাঞ্জলি'র জন্মান্তর অথবা রূপান্তর দেখি এই কথিকা-গুলিতে—

'বাঁশির গানের মধ্যে, হাসির মধ্যে, লোকজনের আনন্দের মধ্যে, চারি দিকে ফুলের মালা ও দীপেব আলোব মধ্যে, সেই ছোটো মেয়েটি [ন বছরেব বালিকাটি] গলায় হাব পরিয়া, পায়ে দুগাছি মল পবিয়া বিবাজ করিতেছিল।'

'যখন সেখানকার মালা-বদলের গান
বাঁশিতে বেজে উঠল
তখন এখানকার এই কোনেটিব দিকে
চেয়ে দেখলেম—
তাব গলায় সোনার হার,
তাব পায়ে দুগাছি মল,
সে যেন কান্নার সরোবরে
আনন্দের পদ্মটির উপর দাঁড়িয়ে।'

-

'সূর্যদেব, তুমি কোন্ দেশ অন্ধকার করিয়া এখানে উদিত হইলে? কোন্খানে সন্ধ্যা হইল? এ দিকে তুমি জুঁইফুলগুলি ফুটাইলে, কোন্-

খানে রজনীগন্ধা ফুটিতেছে?'

'এখানে নামল সন্ধ্যা।
সূর্যদেব, কোন্ দেশে
কোন্ সমুদ্রপারে
তোমার প্রভাত হল?
অন্ধকারে এখানে কেঁপে উঠছে রজনীগন্ধা,
বাসরঘরের দ্বারের কাছে
অবগুণ্ঠিতা নববধূর মতো—
কোন্‌খানে ফুটল ভোরবেলাকার কনক-চাঁপা?
জাগল কে?
নিবিয়ে দিল সন্ধ্যায়-জ্বালানো দীপ,
ফেলে দিল রাত্রে-গাঁথা সেঁউতিফুলের মালা।'

-

'যে গেছে সে আমাকে কত দিন হইতে জানিত! আমাকে কত প্রভাতে, কত দ্বিপ্রহরে, কত সন্ধ্যাবেলায় সে দেখিয়াছে। কত বসন্তে, কত বর্ষায়, কত শরতে আমি তাহার কাছে ছিলাম! যে আমাকে সে জানিত সে সেই সতেরো বৎসরের খেলাধুলা, সতেরো বৎসরের সুখদুঃখ, সতেরো বৎসরের বসন্ত বর্ষা। সে আমাকে যখন ডাকিত তখন আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের অধিকাংশই, আমার এই সতেরো বৎসর তাহার সমস্ত খেলাধুলা লইয়া তাহাকে সাড়া দিত। এমন তো আরও সতেরো বৎসর যাইতে পারে!'

'আমি তার সতেরো বছরের জানা।
কত আসাযাওয়া, কত দেখাদেখি, কত বলাবলি—
তারই আশেপাশে কত স্বপ্ন, কত অনুমান,

কত ইশারা—
তারই সঙ্গে সঙ্গে কখনো বা ভোরের
ভাঙাঘুমে শুকতারার আলো,
কখনো বা আষাঢ়ের ভর-সন্ধ্যায়
চামেলি ফুলের গন্ধ, কখনো বা
বসন্তের শেষ প্রহরে ক্লান্ত নহবতের পিলু-বারোয়াঁ—
সতেরো বছর ধরে এই সব
গাঁথা পড়েছিল তার মনে।
আর,
তারই সঙ্গে মিলিয়ে
সে আমার নাম ধরে ডাকত।
ঐ নামে যে সাড়া দিত সে তো একা
বিধাতার রচনা নয়।
তার পরে আরও সতেরো বছর যায়।'

আর অধিক উদ্ধৃতির প্রয়োজন নেই। পরে পরে 'পুষ্পাঞ্জলি' আর 'লিপিকা'র এক-একটি অংশ আমরা পাঠকের কাছে ধরে দিয়েছি। নিজের অথবা অন্যের বহু দিনের বদ্ধমূল সংস্কার-বশতঃ, সম্ভবপর আবৃত্তির নিয়মের 'লিপিকা'র বাক্যগুলি ভেঙে ভেঙে বিভিন্ন ছত্ররূপে সাজান নি বা সাজাতে সাহস করেন নি কবি।[২৩] উত্তরকালীন আমাদের সাহসও বেশি আর সংকোচও অনাবশ্যক। যা হোক, আমরা দেখতে পাচ্ছি কোন্ পথে কিভাবে 'গদ্যছন্দ' এল বাংলা সাহিত্যে আর কী-এক তিরস্করণীমন্ত্রে তার আবির্ভাব রইল প্রায় লুকোনো। অবশেষে ১৩৩৯ সালে দ্বিধা ও সংশয় ঘুচে গেল, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এই নূতন ছন্দের প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে পড়ল, এবং তারই ফলে 'পুনশ্চ' 'শেষ সপ্তক' 'পত্রপুট' 'শ্যামলী' কাব্যে আমরা যে নূতন কবিত্বসম্পদের

প্রাচুর্যে চকিত হয়ে উঠলাম, অনেকে উগ্র প্রতিবাদও করলেন, তা করুন— এর আকার প্রকার সবই নূতন। এর বিষয়বস্তু ও প্রকৃতি সম্পর্কে যা কিছু বলবার সবই প্রায় অনুপম ভঙ্গীতে নানা উপলক্ষ্যে বলে গেছেন কবি। আমরা এটুকুই পুনরুক্তি করতে পারি— এই গদ্যছন্দের গুণে কাব্যলোকের সীমানা অনেক দূর পর্যন্ত বাড়িয়ে, প্রায় সমগ্র সংসারসীমার সামিল করে দেওয়া সম্ভবপর হয়েছে। এ সময়ে প্রথাসিদ্ধ ছন্দে কোনো কোনো কবিতা লিখেছেন কবি; অভ্যস্ত নৈপুণ্য ও ভাবসিদ্ধি যতই থাক্ তাতে, মনে-মনে খুশী হতে পারেন নি, সেটিকেই শেষে তাই গদ্যছন্দে রূপান্তরিত ক'রে তৃপ্তি পেয়েছেন ও মুদ্রিত কাব্যগ্রন্থে স্থান দিয়েছেন— পূর্বতন 'রীতিমত' কবিতার দিকে ফিরে তাকান নি।[২৪]

কল্পনা করা যেতে পারে, তাঁর কাঁকন-পরা হাতের করুণস্পর্শ আজও যে সূক্ষ্ম-আকারে তাঁর প্রাণপ্রিয় রবিকে জাগ্রত সচেতন করে তুলেছে, তার প্রতিভাকে নূতন পথে সঞ্চালিত করেছে —এতে অলক্ষলোকবাসিনী নতুনবৌঠানের উজ্জ্বল চোখ-দুটি ক্ষণমাত্র কৌতুকে ঝিকিয়ে উঠে পরক্ষণেই অশ্রুতে ছল্‌ছল্ করে উঠেছিল।

'পুনশ্চ' 'শেষ সপ্তক' 'পত্রপুট' 'শ্যামলী'র পরে রবীন্দ্রনাথের কবিতা কখনো বিচরণ করেছে মায়াময় ছায়াময় নির্জন পূর্বস্মৃতির বিতানে, কখনো ভাবসমৃদ্ধিপূর্ণ মননে, আর কখনো বা কৌতুকী খেয়াল-খুশির পথে বিপথে। ('প্রান্তিক' 'রোগশয্যায়' 'আরোগ্য' 'জন্মদিনে' বা 'শেষ লেখা' কেন যে এর ব্যতিক্রমস্থল সে আমরা অবশ্যই জানি।) রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রাণপূর্ণ প্রবাহ বিশেষভাবে ধাবিত হয়েছে গানে গানে। সে ক্ষেত্রে তার সরসতা, সজীবতা, এমন-কি প্রাণোচ্ছলতা, শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল বললেও কম বলা হয়— দিনে দিনে বেড়েছে বৈ কমে নি। অর্থাৎ, রবীন্দ্রপ্রতিভার সৃজনবেগ

মুখ্যতঃ রয়েছে সংগীতের খাতে।[২৭] সেই গানের বিষয়বস্তু এক দিকে যেমন বিশ্বপ্রকৃতি, চেতনাময়ী, আনন্দময়ী— আর-এক দিকে তেমনি অন্তঃপ্রকৃতি বা মানবপ্রকৃতি, প্রেমে পূজায় সুখে দুঃখে ও আনন্দে উচ্ছলিত উদাস। দেহ মন চেতনা নিয়ে যেমন জেগে আছেন গীতি-কবি নিত্যবর্তমানে, নিত্যঅতীতটিও তেমনি বারে বারেই মনে পড়ে, আর—

কেন নয়ন আপনি ভেসে যায় জলে।
যেন সহসা কী কথা মনে পড়ে,
মনে পড়ে না গো, তবু মনে পড়ে।

এটি অতি-পুরোনো গানই বটে। এই গানই গুণ গুণ স্বরে গেয়ে উঠেছেন শ্বেতকেশ শ্বেতশ্মশ্রু কবি এ কথা কবির স্মৃতি-কথায় মৈত্রেয়ীদেবী লিপিবদ্ধ করেছেন। অবশ্য, চোখে জল দেখা যায় নি, চোখে মুখে বরং স্মিত কৌতুক খেলা করেছে —এটি অনুমান করা যায়। অশ্রু অন্তঃশীলা মাত্র। একমাত্র নূতন নূতন গানের কথায় ও সুরে তার আত্মআবিষ্কার। এ কথা বার বার বলা হয়েছে— আর্টের মায়ামুকুরে মানবজীবন যখন প্রতিফলিত হয় তার পূর্বেই তার থেকে মুছে যেতে থাকে বিশেষ ব্যক্তির নাম রূপ ও পরিচয়। যে শিল্পরূপ যত সার্থক আর যত উন্নত, যেমন তার গূঢ়সূচনা না হ'লেই নয় বিশেষ ব্যক্তিসত্তায়, তার শেষও অবশ্য হওয়া চাই নির্বিশেষ বিশ্ব-সত্তায়, উদ্ভাসিত বিশ্বজীবনে— তা সকল কালের সব মানুষেরই প্রাণ-স্পন্দনে সঞ্জীবিত। পরিণামে তা নৈর্ব্যক্তিক। শিল্পরূপের এই-যে ব্যক্তিসত্তাসঞ্জাত নৈর্ব্যক্তিতা চরমে পৌঁছয় তা গানে, এ হয়তো না বললেও চলে। সুতরাং রবীন্দ্রসঙ্গীতসৃষ্টির কল্পলোকে অনধিকার প্রবেশ ক'রে ব্যক্তিজীবনের সূত্র আমরা কোথায় খুঁজে পাব আর কেনই বা খুঁজতে যাব? সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে পথে যেতে যে তুলনাহীনারে কবি দেখেছিলেন শুনতে পাই, তিনি কি

সত্যি কেউ? অথচ তাঁরই মধ্যে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানের কে আছে, কে বা নেই, কে বলতে পারে! আকাশের সমস্ত আলো অন্ধকার, পৃথিবীর আদিগন্ত শ্যামলতা, নীলসিন্ধুর উচ্ছল তরঙ্গ আর বাউল বাতাসের অশরীরী হিল্লোল —এ-সবই ঐ তুলনাহীনার কায়া ধরে নি যে এ কখনো হলপ ক'রে বলা যাবে না।[১৬] জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার এমন-যে সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্মতর বিবর্তন, কল্পনাতীত রূপান্তর, তার কথা যদি মনে রাখি তবেই বুঝব রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের গানগুলিতে কী আনন্দবেদনার কিম্বা আনন্দায়িত বেদনার অভিব্যক্তি; তবু বুঝব না কে সে, যার হাত থেকে নিয়েছেন 'বাদল-দিনের প্রথম কদম-ফুল', যাকে মিনতি করেছেন 'বিজন ঘরের কোণে' দীপখানি জ্বেলে দিয়ে যেতে, বারে বারেই যে এসেছে তবু আসে নি, যে প্রিয়ার ছায়া—

আকাশে আজ ভাসে হায় হায়!
বৃষ্টিসজল বিষণ্ন নিশ্বাসে হায় হায়!

আসলে সে আসে নি কোনোদিন জীবনে, আসবারও নয়। আপন আত্মার মধ্যে ধ'রে যখন যে-কোনো রহস্যময়ী অপরিচিতাকেই জিজ্ঞাসা করেছেন কবি 'তুমিই কি সেই'—

উত্তরে সে হেনেছিল চকিত বিদ্যুৎ;
ইঙ্গিতে জানায়েছিল, 'আমি তারই দূত!
সে রয়েছে সব প্রত্যক্ষের পিছে,
নিত্যকাল সে শুধু আসিছে।'

অন্তত রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের আলোচনায় যতদূর দেখতে পাই এ সম্পর্কে এই হয়তো শেষ কথা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, সমুদ্রেরই ঢেউ, ঢেউয়ের সমুদ্র নয়। আমরা তাই বলব, শেষ পর্যন্ত দেখা যায় **ভাবেরই রূপ, রূপের ভাব নয়।** কবির ভাষায় যিনি 'জীবনদেবতা', যিনি অন্তর্দেবতা, তাঁরই চকিত ছায়া এসে পড়ে

কখনো কখনো বাইরে। আধারবিশেষে প্রতিফলিত হয় সেকি দিব্যরূপ! মন দিয়ে যখন তাকে আবার ধরতে যাই, কোথায় থাকে বাস্তব, কতটা মেশে কল্পনা, সে কি কেউ বলতে পারে? বহির্জগতের বিষয় সে নয়, পুরোপুরি বাইরে কখনোই ধরা দেয় না। রূপ ছেড়ে আবার তাই নির্বিশেষ ভাবেরই শরণ নিই।

সেখানে গোলাপ-চাঁপা বকুল-করবী কুন্দ-কমল জুঁই-মল্লিকা সব ফুলের সব নামরূপ মুছে ফেলেও সূক্ষ্ম ঘ্রাণে পাই বিশুদ্ধ সৌরভ। একই কালে সব ফুলের আর কোনো ফুলেরই নয়— তাই কি তাকে নন্দনপারিজাতের গন্ধও বলা যায় না? বিবিধ ফুলেব মধু, ইক্ষু-খর্জুরের রস, আর নানা পরিপক্ক ফলের স্বাদও, তেমনি নানাভাবেই মিষ্ট হয়ে থাকে— মিষ্টতা বলতেই সব স্বাদ নিয়ে সব-আস্বাদনের-অতীত অলৌকিক একটা কিছুর ধারণা আমাদের মনের মধ্যে নেই কি? তেমনি নারী কখনো জননী কখনো জায়া, কখনো কন্যা কখনো ভগিনী, কখনো বান্ধবী আর কখনো নারী মাত্র— বাস্তব সম্পর্কে না হলেও কবি বা প্রেমিকের ধ্যান-ধারণায় বিশ্ব- সৌন্দর্যের ও আনন্দের প্রতিমা মাত্র— জীবনের সকল সম্পর্কের সারভূতা আর সকল সম্বন্ধেরই অতীত। বিশ্বের সর্বত্র আভাসিত অতীন্দ্রিয় অপরূপ এই রূপ, দ্যুলোক-ভূলোকের সর্ব স্থল থেকে আহৃত এই মাধুরী, এর উপলব্ধি শুধু অন্তরে, এর প্রকাশ কাব্যে ও সঙ্গীতে— এর নিঃশেষ তাৎপর্য হয়তো কবি জানেন, হয়তো তিনিও জানেন না। এ কথা সত্য যে, ভক্তের আগ্রহে আরাধনায় বিগ্রহ জাগ্রত জীবন্ত হয়ে উঠলেও বিগ্রহ তবু দেবতা নয়। সিদ্ধ সাধকের দুর্লভ ভাগ্যে দেবতার আবির্ভাব সর্বত্র।

জোড়াসাঁকো। কলিকাতা
৭ জুন ১৯৬০। পুনর্লিখন ৩ জুলাই ১৯৬০





শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী

*মনের ভিতরে ভিতরে ক্রমশ যে-একটা সজীব পদার্থ সৃষ্ট হয়ে উঠছে তা অনেক সময় অনুভব করতে পারি। ·· একটা নিগূঢ় চেতনা, একটা নূতন অন্তরিন্দ্রিয়। আমি ক্রমশ আপনার মধ্যে আপনার একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পাবব, আমার সুখ-দুঃখ অন্তর-বাহির বিশ্বাস-আচরণ সমস্তটা মিলে জীবনটাকে একটা সমগ্রতা দিতে পারব। শাস্ত্রে যা লেখে তা সত্য কি মিথ্যা বলতে পারি নে, কিন্তু সে-সমস্ত সত্য অনেক সময় আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী— বস্তুত আমার পক্ষে তার অস্তিত্ব নাই বললেই হয়। আমার সমস্ত জীবন দিয়ে যে জিনিষটাকে সম্পূর্ণ আকারে গড়ে তুলতে পারব সেই আমাব চরম সত্য। জীবনের সমস্ত সুখদুঃখকে যখন বিচ্ছিন্ন-ক্ষণিক-ভাবে অনুভব কবি তখন আমাদের ভিতরকার এই অনন্ত সৃজনরহস্য ঠিক বুঝতে পারি নে নিজের ভিতরকার এই সৃজনশক্তির অখণ্ড ঐক্যসূত্র যখন একবার অনুভব করা যায় তখন এই সৃজ্যমান অনন্ত বিশ্বচরাচরেব সঙ্গে নিজের যোগ উপলব্ধি করি ; বুঝতে পারি যেমন গ্রহ নক্ষত্র চন্দ্রসূর্য জ্বলতে জ্বলতে ঘুরতে ঘুরতে চিরকাল ধরে তৈরি হয়ে উঠছে, আমার ভিতরেও তেমনি অনাদিকাল ধরে একটা সৃজন চলছে— আমার সুখদুঃখ বাসনাবেদনা তার মধ্যে আপনার স্থান গ্রহণ করছে— এর থেকে কী হয়ে উঠবে জানি নে, কারণ আমরা একটি ধূলিকণাকেও জানি নে, কিন্তু নিজের প্রবহমাণ জীবনটাকে যখন নিজের বাইরে অনন্ত দেশকালের সঙ্গে যোগ করে দেখি তখন জীবনের সমস্ত দুঃখগুলিকেও একটা বৃহৎ আনন্দসূত্রের মধ্যে গ্রথিত

*বর্তমান প্রবন্ধে, ছিন্ন বাক্যাংশ ব্যতীত, ছিন্নপত্রাবলীব সকল উদ্‌ধৃতির সূচনায় * চিহ্ন এবং শেষে ক্ষুদ্র হরপে সংকলিত পত্রের সংখ্যা দেওয়া হয়েছে।

দেখতে পাই— আমি আছি, আমি হচ্ছি, আমি চলছি, এইটেকেই একটা বিরাট বৃহৎ ব্যাপার বলে বুঝতে পারি। আমি আছি এবং আমার সঙ্গে আর সমস্তই আছে, আমাকে ছেড়ে এই অসীম জগতের একটি অণুপরমাণুও থাকতে পারে না; আমার আত্মীয়দের সঙ্গে আমার যে যোগ, এই সুস্নিগ্ধ সুন্দর শরৎপ্রভাতের সঙ্গে তার চেয়ে কিছু কম ঘনিষ্ঠ যোগ নয়, সেই জন্যে এই জ্যোতির্ময় শূন্য আমার অন্তরাত্মাকে তার নিজের মধ্যে এমন করে পরিব্যাপ্ত করে নেয়— নইলে সে কি আমার মনকে তিলমাত্র স্পর্শ করতে পারত? নইলে তাকে কি আমি সুন্দর বলে অনুভব করতুম? আমার সমস্ত বাসনা-স্বপ্নকে তার মধ্যে পরিপূর্ণ আকারে প্রতিফলিত করতে পারতুম? আমার সঙ্গে আর অনন্ত জগৎপ্রাণের সঙ্গে যে চিরকালের নিগূঢ় সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধের প্রত্যক্ষগম্য বিচিত্র ভাষা হচ্ছে বর্ণ গন্ধ গীত— চতুর্দিকে এই ভাষার অবিশ্রাম বিকাশ আমার মনকে লক্ষ্য-অলক্ষ্য-ভাবে ক্রমাগতই আন্দোলিত করছে— কথাবার্তা দিনরাত্রিই চলছে ॥২৩৮

স্থান শিলাইদহ, কাল ১৩০২ সনের ২৪শে আশ্বিন, আর কার এই লিপিবদ্ধ স্বগতোক্তি সে বোধ হয় ভাবজ্ঞ রসজ্ঞ আমার কোনো পাঠককেই বলে দিতে হবে না। 'জলের মধ্যে এমন অগাধ পরি-পূর্ণতা— স্থলের মধ্যে এমন শ্যামশ্রী— আকাশে এমন নির্মল নীলিমা' যে মনে হয় 'এই নবযৌবনা ধরণীসুন্দরীর সঙ্গে কোন্-এক জ্যোতির্ময় দেবতার ভালোবাসা-বাসি চলছে', এমন এক শরৎপ্রভাতে অগাধ-পরিপূর্ণ পদ্মা কূলের কাছে এসে মৃদু তরঙ্গাভিঘাতে দোলা দিয়ে দুলিয়ে যাচ্ছে তাঁব সাধের তরণী 'পদ্মা'— না, হয় তো ঠিক বলা হল না, শুধু তো সাধের নয়, একাগ্র তন্ময় সাধনারও। কবি রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার স্বরূপটি কেমন, তাঁর জন্মার্জিত স্বভাবটি কেমন, আর

সেই স্বভাব থেকেই স্বতউদ্‌ভূত স্বধর্মের অর্থ এবং অভীপ্সা কিরূপ— সে-সবই এই একখানি চিঠির স্বচ্ছতম মুকুরে অতি উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছে। আর, বলতে বাধা কী— ছিন্নপত্রের, বিশেষতঃ নবপ্রকাশিত 'ছিন্নপত্রাবলী'র কোনো একখানি বিচ্ছিন্ন চিঠিতে নয়, প্রায় পাতায় পাতায় ছত্রে ছত্রে এই একই ব্যক্তিস্বরূপের ব্যঞ্জনা, এই একই প্রতিরূপ অম্লান ঔজ্জ্বল্যে প্রতিবিম্বিত। 'ব্যক্তি' শব্দের মূলগত অর্থ 'প্রকাশ', সে হিসাবে এ সংসারে রাম শ্যাম যদু মধু অমলা কমলা সকলকেই পূরো 'ব্যক্তি' অথবা পূর্ণায়মান 'ব্যক্তি' বললে অত্যুক্তি করা হয় মাত্র। রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে তেমন নয়। তাই রবীন্দ্রনাথ যে অনন্যসাধারণ ভাবুক বা মনীষী, বড়ো কবি বা বড়ো শিল্পী, এটাই তাঁর আসল পরিচয় নয়। অতুলনীয় জীবনশিল্পী তিনি; সমস্ত জীবনটি সৌন্দর্যে প্রেমে শান্তিতে সামঞ্জস্যে এবং সীমাবিহীন ভূমার একটি উপলব্ধিতে সুন্দর ক'রে, পূর্ণ ক'রে, রূপময় ছন্দোময় ক'রে তোলাই তাঁর সারা জীবনের সাধনা ছিল— এ সাধনা পেয়েছিলেন নিজের অনাদি জীবনের সংস্কার থেকে, নিজের নিগূঢ় অন্তর থেকে, সৌভাগ্যক্রমে— শুধু 'রবি'র সৌভাগ্য নয়, দেশে-দেশে কালে-কালে তুমি আমি সে তিনি সকলেরই সৌভাগ্য— সমস্ত স্থল-জল আকাশ-আলো রাত্রি-দিন বিভিন্ন-ঋতু-পর্যায় জাতি-সমাজ ও পরিবার সবই তাঁর অনুকূল হয়েছিল। (স্বদেশে বিদেশে ব্যক্তিবিশেষ বা গোষ্ঠী-বিশেষ যখন যতটুকু প্রতিকূলতা জাগিয়ে তুলেছিল তারও প্রয়োজন ছিল।) এ প্রসঙ্গে 'বোবা' ও 'জড়' প্রকৃতির উল্লেখ সর্বাগ্রে করতে হল ; কেননা এ কথা তো মিথ্যা নয়— এই সীমাহীন রহস্যময়ী প্রকৃতি আমাদের কবির কাছে আশ্চর্যভাবে বাঙ্ময়ী ও চৈতন্যময়ী হয়ে উঠেছিল। জীবনশিল্পী, সাধক ও কবি রবীন্দ্রনাথ, এ জীবনে কানে-কানে প্রাণে-প্রাণে কোনো-একটি নিগূঢ়দীক্ষা, প্রাণপূর্ণ মন্ত্র, কোথাও যদি নিয়ে থাকেন সে এই রূপময়ী ছন্দোময়ী অপূর্বমায়াময়ী প্রকৃতির

কাছ থেকেই।

যে চিঠির বিস্তারিত উদ্‌ধৃতি দিয়ে প্রসঙ্গের সূচনা, ছিন্নপত্রে ৫ অক্টোবর ১৮৯৫ তারিখের চিঠির অঙ্গীভূতরূপে তার অনেকটাই পাওয়া যাবে ; সে ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ কিছু নূতন কথাও যোগ করেছেন এবং সব-শেষে বলেছেন— 'জগতের সঙ্গে সরল সহজ সম্বন্ধের মধ্যে অনায়াসে দাঁড়িয়ে যেন বলতে পারি 'আমি ধন্য'।' আমরা জানি জীবনব্যাপী কর্ম ও ভাবের সাধনায় শেষ নিঃশ্বাসেও তিনি এ কথা বলতে পেরেছিলেন ; সে বাণী বার বার কবিতা হয়ে উঠেছিল, গান হয়ে বেজেছিল—

এই জীবনে ধন্য হলেম তোমায় ভালোবেসে।

কেবলই মনে হয়েছিল—

তার অন্ত নাই গো যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ।

সেই আনন্দের বেদনাতেই জীবনের সীমান্তে এসে বলেছেন—

কার পানে পাঠাইবে স্তুতি
ব্যগ্র এই মনের আকূতি।···
বলে : আমি আনন্দিত।
ছন্দ যায় থামি।
বলে : ধন্য আমি।

নিখিল অস্তিত্বের মূলে যে প্রেম, যে আনন্দ, রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনের সাধনায় ও সাহিত্যে সেই কথাটাই বিশেষ উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছে।

উদ্‌ধৃত পত্রের প্রায় প্রত্যেকটি বাক্য বা বাক্যাংশ নিয়ে বহু বহু তত্ত্বের জাল বুনে বহুবিধ ব্যাখ্যাই করা যায় ; সে-সব যে অযৌক্তিক বা অবাস্তব হবে এমনও নয়। কিন্তু, এই আশঙ্কা স্বভাবতই মনে আসে, পাছে ভাষ্যমেঘে ভাস্বর সত্যকেই আবরণ করে। কারণ, নম্রহৃদয়ে স্মরণ করতে হয়— কবি এখানে কোনো দার্শনিক তত্ত্বের

কোনো সূত্র দেন নি, পরন্তু সত্যের উপলব্ধিকেই যথাসম্ভব সহজ সুন্দর অকৃত্রিম ভাবে ব্যক্ত করেছেন একটি শ্রদ্ধাশীল বিশ্বস্ত হৃদয়ের গোচরে। কোনো ব্যাখ্যা না ক'রে একটির পর একটি উদ্‌ধৃতির মালা গেঁথে গেলেও, কে এমন অবোধ আছে কবিচিত্তের সম্যক্‌ পরিচয় পাবে না— কবি রবীন্দ্রনাথের আনন্দময় চৈতন্যময় সত্তার অব্যবহিত স্পর্শ অন্তরে অনুভব করবে না— তাঁকে সখা ব'লে, সঙ্গী ব'লে, আত্মার আত্মীয় এবং গুরু ব'লে গ্রহণ না ক'রে থাকতে পারবে? ববীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন বটে 'পাঠকরা আমাকে ভালো করে জানে না, আমার অনেক কথাই তারা ঠিকটি বুঝবে না এবং নম্রভাবে বোঝবার চেষ্টাও করবে না'— তাই, সে ক্ষেত্রে তাঁর 'মনের ভাবগুলি তেমন সহজে ভাষায় প্রবাহিত হতে চায় না এবং যতটুকু প্রকাশ হয় তাব মধ্যে অনেকখানি ছদ্মবেশ থেকে যায়'— বুঝেছিলেন 'আমাদের সব চেয়ে যা শ্রেষ্ঠ প্রকাশ সে আমবা কাউকে নিজের ইচ্ছা-অনুসারে দিতে পারি নে। আমাদেব ভিতরে সব চেয়ে যা গভীরতম উচ্চতম অন্তবতম সে আমাদের আয়ত্তেব অতীত আমবা দৈবক্রমে প্রকাশ হই, আমরা ইচ্ছা করলে চেষ্টা কবলেও প্রকাশ হতে পারি নে'— তাই একটি মাত্র প্রীতিস্নেহেব পাত্রীর কাছে তাঁব নিবিড় গভীর গম্ভীর উপলব্ধির কথাগুলি দিনে দিনে অকপটে বলে গেছেন, আর আজ হয়তো আমরা অনেকেই তা সমান অকপট চিত্তে গ্রহণ কবতে, বিশ্বাস কবতে, দূরতম আভাসেও কিছুটা 'বোধে বোধ' করতে প্রস্তুত হয়ে উঠেছি। কেননা, ববীন্দ্রনাথের সমস্ত জীবন ও সাধনা আজ আমাদের কাছে অবারিত, উদ্ভাসিত। দিনে-দিনে বৎসবে-বৎসবে কালে-কালে রবীন্দ্রনাথকে যারা গ্রহণ করতে পারবে, গ্রহণ করে কৃতার্থ হবে, রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাদের সৃষ্টি করেছেন, করে চলবেন— আমবা জানি মহৎপ্রতিভার এটিও অন্যতম অবশ্যম্ভাবী কার্য।

'ছিন্নপত্র' তথা 'ছিন্নপত্রাবলী'র চিঠিগুলি ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরাকে

লিখেছিলেন কবি সেপ্টেম্বর ১৮৮৭ থেকে ডিসেম্বর ১৮৯৫ সনে। ১২৯৪ শ্রাবণের শেষ থেকে ১৩০২ পৌষের সূচনা অবধি। নব-প্রকাশিত গ্রন্থে ২৫২ খানি চিঠি বা চিঠির অংশ আছে, আর শেষ চিঠির তারিখ হল ১৫ই ডিসেম্বর বা ১লা পৌষ। রবীন্দ্রনাথের আয়ুর অঙ্ক সপ্তবিংশ থেকে ক্রমে ক্রমে পঞ্চত্রিংশ পূর্ণ করতে চলেছে; আর স্নেহের ইন্দিরা তাঁর, কিশোরী ছিল এই পত্রালাপের সূচনাকালে, ১৩০২ পৌষের মাঝামাঝি এসে তেইশ বছরে পা দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের আশি বছরের জীবনে এই আট বৎসর কয় মাসের স্বরূপপরিচয় বা তাৎপর্য, তার বিশেষ সৌন্দর্য বা সার্থকতা —সে কি আমরা ভেবে দেখেছি? মনে হয় এই বিশেষ কালপর্বটি লক্ষ্য ক'রেই উত্তরকালীন এক কবি মুগ্ধবিস্ময়ে বলে উঠেছেন—

মনে পড়ে প্রস্ফুট পদ্মের মতো
পদ্মার স্রোতে ভাসানো তোমার দিনগুলি হে কবি!
ভাবি, তেমন দিন আর কি কখনো হবে?
তেমন প্রভাত? তেমন সন্ধ্যা?
সেই কূলপ্লাবিনী উন্মাদিনী নটী
উত্তাল তরঙ্গমৃদঙ্গের কলরঙ্গে বহমানা;
সেই জনপদগ্রাসিনী সর্বনাশিনী ভৈরবী
রৌদ্রদীপ্ত তরবারির মতোই শাণিত খরধার;
সেই সমুদ্রস্বয়ম্বরা অভিসারিণী
আশ্বিনপূর্ণিমায় স্বপ্নবিহ্বলা, অবলুপ্তসীমা,
আবেগঅবরুদ্ধগদ্‌গদবাণী—
সেই পদ্মা দিগন্তবিসর্পিত ইঙ্গিতে যে
ডেকে নিয়েছিল তোমায় আপন বক্ষের নিরন্তবেগবান
ছন্দোহিন্দোলে;
করতালি হেনেছিল সপ্রেম সোহাগে তোমার তরণীর সর্ব অঙ্গে;

আস্তীর্ণ করে দিয়েছিল উর্মিলবালুকার সুধাশুভ্র আস্তরণ
দিক্‌হীন চরের উদাসী ঝাউবনে ;
শুক্রসমুদিত সন্ধ্যায় তোমার
নিস্তব্ধ ধ্যানের কিনারে গেঁথেছিল
অনাদিঋকের মৃদুমন্দ উদ্‌ঘোষণ—
তোমার সেই পদ্মা আমি তো দেখি নি কবি !
কেউ কি দেখেছিল ?

ক্ষমা কোরো, পাঠক, তৃতীয় এক ব্যক্তির না-দেখার সাক্ষ্য টেনে আনার হয়তো বিশেষ কোনো সার্থকতা নেই ; রবীন্দ্রনাথের আলোচ্য গ্রন্থের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে উজ্জ্বল বর্ণে বর্ণে ও অশ্রুত সুরে এই কালের কথা আদ্যন্ত লিপিবদ্ধ আছে। কোথা থেকে কোন্‌টুকু আহরণ করা যাবে, কোথায় থামতে হবে, তার কোনোই দিশা পাওয়া যায় না —এইমাত্র অসুবিধা। তা হোক, ছিন্নপত্রাবলীর আলোচনায় আর এই সময়ের অন্যান্য প্রকাশিত রচনায়, তেমনি এই কালে কবিজীবনের ঘটনা-পরম্পরার যতটা বিবরণ আমাদের জানা আছে তাতেও দেখতে পাই— এটি রবীন্দ্রনাথের জীবনে বড়ো সুখের ও শান্তির কাল, কেননা স্বধর্মে (সেই সঙ্গে বিবিধ কর্মে) পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের কাল, এক দিকে প্রকৃতির সঙ্গে আর-এক দিকে মানবলোকের সঙ্গে অত্যন্ত সহজ সুন্দর প্রগাঢ় মিলনের ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার কাল— নিছক কবিস্বভাবের পরিপূর্ণ একটি সৌষম্যে ও সামঞ্জস্যে ছন্দোময় আনন্দময় জীবনটি স্থিতি ও গতি -শীল। এটা যদি আমরা মেনে নিই যে, মহাজীবনের গতিপথ সততই চলেছে এক হার্মনি থেকে বৃহত্তর বা মহত্তর অন্য হার্মনির অভিমুখে, তা হলে বুঝতে কষ্ট হবে না পরে কেন এই প্রায়-অবিমিশ্র সুন্দর সামঞ্জস্য ভেঙে গিয়েছিল— এসেছিল দুঃখ এবং শোক, বৈষয়িক সঙ্কট এবং বিরোধ, অন্তরে বাহিরে নানারূপ আলোড়ন এবং আন্দোলন, এবং জন্মার্জিত কবিস্বভাবটি

অম্লান অক্ষুণ্ণ রেখেও দুশ্চর দুরূহের সাধনায় দুর্গম বন্ধুর পথে ফিরতে হয়েছিল কেন, বিপুল বিশাল পৃথিবীর পথে পথে, বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত। এ-সবই আমাদের ধারণা করা চাই, সেই সঙ্গে মনে রাখা চাই বালিয়া কটক পতিসর সাজাদপুব শিলাইদহের এই সুন্দর উজ্জ্বল সংগতিময় সংগীতময় দিনগুলি। দায়-দায়িত্ব-শূন্য জীবনের দিন বলতেই ইচ্ছা হয়; আসলে তা নয়— ট্রেনে স্টীমারে নৌকায় বা পাল্কিতে এক লোকালয় থেকে আর-এক লোকালয়ে এই-সব গমনাগমনের লক্ষগোচর উদ্দেশ্য একটা অবশ্যই আছে, ঠাকুর-পরিবারেব বিপুল এজমালি সম্পত্তি বা জমিদারি তারই দেখাশুনা করা। কিন্তু হাঁসের পালখে যেমন জল লেগে থাকে না, যা-কিছু জটিল বিষয়কর্ম অশেষ নৈপুণ্যের সঙ্গে সমাধা ক'বেও তার দাগ কতটুকু লেগে থাকত তাঁর মনে! সজনে বা নির্জনে কবি রবীন্দ্রনাথ সর্বদাই থাকতেন নিজের ভুবনে। সে ভুবন হয়তো তাঁর নিজের সৃষ্টি, হয়তো ঈশ্বরের। অন্যের অলক্ষগোচর সেই জগতেব সঙ্গে কবির ছিল বিশেষ সম্পর্ক, চোখে চোখে আলাপ চলত সর্বক্ষণ।—

॰যেখানে চন্দ্রালোক পড়ছে সেইখানেই আমার জমিদারি; অথচ জ্যোৎস্না বলছে 'তোমাব জমিদারি মিথ্যে', জমিদারি বলছে জ্যোৎস্না সমস্তই ফাঁকি! আমি ব্যক্তি ঠিক মাঝখানে॥ ১৮২

পুনশ্চ—

॰হঠাৎ এক-একবাব অল্প ক্ষণের মতো সমস্ত জ্যোৎস্নামণ্ডিত শান্তিপূর্ণ দৃশ্যটি এবং অনন্ত-আকাশ-পূর্ণ নিস্তব্ধতা আমার সম্মুখে এসে উপস্থিত হয় · সমস্ত মনের মধ্যে এক আশ্চর্য পরিপূর্ণতা এসে উপস্থিত হয়— একটা যেন সুবৃহৎ সুকোমল সুগভীর আলিঙ্গনে আমার মনের আকণ্ঠ প্রচ্ছন্ন হয়ে যায়, একটা নিঃশব্দ নিস্তব্ধ একান্ত প্রেম আমাকে নক্ষত্রলোক থেকে এসে আবৃত করে দেয়। · এই একটা সুগম্ভীর সুবিশাল আবির্ভাব আমার নিজের কাছেই আশ্চর্য বোধ

হয়, আমার দুই পাশের দুই সঙ্গীকে তখন ভারী অসংগত মনে হয়। আমরা তিনজনে একত্রে বেড়াচ্ছি অথচ, কিছু ক্ষণের জন্যে, তারা যেখানে বেড়াচ্ছে আমি সেখানে নেই। আমাকে আমার জ্যোৎস্নামগ্ন গম্ভীর মৌন জগৎ কথাবার্তার ক্ষণিক অবসরে হঠাৎ জানিয়ে দেয়, 'মনে কোরো না তোমার সঙ্গী কেবল দুজন আছে, আমরাও যেমন সেই চিরদিন দাঁড়িয়ে থাকি তেমনি আজও দাঁড়িয়ে আছি—

আমি নিশিদিন হেথা বসে আছি,
তোমার যখন মনে পড়ে আসিয়ো।' ১৯৯

আমরা এইমাত্র বলেছি, এ সময়ে কবিস্বভাবের পরিপূর্ণ একটি সৌষম্যে ও সামঞ্জস্যে, ছন্দে ও আনন্দে, কবির জীবনটি ছিল স্থিতি ও গতি -শীল। অন্তরে অন্তরে এই-যে সর্বব্যাপী শান্তি ও সামঞ্জস্যের ভূমিকা -রচনা, সুখ ও সৌন্দর্যের হেতুভূত 'অহেতু' আনন্দের ছন্দে স্থিতি ও গতি —এটি রবীন্দ্রনাথের পক্ষে স্বাভাবিক হয়েও সহজ হয় নি।—

'মনটা একান্ত অস্থির হয়ে আছে— বেঁচে থাকতে ভালো লাগছে না।

'মনটা এমন শূন্য উদাস হয়ে আছে! ইচ্ছে করছে এই ঘুমোতে গিয়ে আর যদি ঘুম না ভাঙে তো বেশ হয়— ঠিক বেশ হয় না, সকলকে একবার দেখতে এবং সকলের কাছে একবার মাপ চাইতে ইচ্ছে করে।

'কাল সমস্ত রাত ধরে ভয়ানক স্বপ্ন দেখেছি। ঠিক এই রকমের স্বপ্ন আমি কতবার দেখেছি··· এই এক রাত্তিরের মধ্যে ঠিক যেন মাস-খানেক অসহ্য কষ্ট পেয়েছি এমনি মনে হচ্ছে।

'কাল রাত্তিরে আবার সেই রকমের স্বপ্ন দেখেছিলুম। স্বপ্নে বোধ হচ্ছিল মনের কষ্টে আমি যেন ঊর্ধ্বশ্বাসে চীৎকার করে কোথায় ছুটে চলেছি। ঠিক এই ধরণের স্বপ্ন কতবার দেখেছি তার ঠিক নেই।'

এগুলি সবই-যে রবীন্দ্রনাথের উক্তি সে কি আমরা কল্পনা করতে পারি? অথচ দ্বিতীয় বারের ইংলন্‌ড্‌প্রবাসকালে (১৮৯০ সনে) ২২ সেপ্টেম্বর থেকে ১২ অক্টোবরের মধ্যে এ-সবই তিনি স্বহস্তে ডায়ারির পাতায় লিপিবদ্ধ করেছিলেন[১]— পরিচিত বন্ধুবান্ধব অথবা অপরিচিত পাঠকের উদ্দেশে নয় সে কথা সত্য। ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের মর্মান্তিক দুঃখও, নৈর্ব্যক্তিক রসরূপে উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত, সর্বসমক্ষে প্রকাশের কোনো কারণ দেখেন নি কবি রবীন্দ্রনাথ। মানসিক বিষাদ মুখে চোখে মেখে ঘর আধার করা অথবা আর পাঁচজনের সুখশান্তির এতটুকু হানি করা, এ ছিল তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। বুদ্ধিহীন বা হৃদয়হীনের হাতে বহু আঘাত সহ্য ক'রে 'নিন্দুকের প্রতি নিবেদনে' বোধ হয় একবারই মুখ ফুটে বলেছিলেন—

কত প্রাণপণ দগ্ধহৃদয় বিনিদ্রবিভাবরী
জানো কি, বন্ধু, উঠেছিল গীত কত ব্যথা ভেদ করি?
রাঙা ফুল হয়ে উঠিছে ফুটিয়া হৃদয়শোণিতপাত,
অশ্রু ঝলিছে শিশিরের মতো পোহাইয়ে দুখরাত।

কাব্যে ইঙ্গিতমাত্রে আর নিজস্ব ডায়ারিতে স্পষ্টবাক্যেই এই-যে জানতে দিয়েছেন কোন্ 'দুঃখের যজ্ঞঅনলজ্বলনে' কী সুখদুঃখাতীত আনন্দের ও সৌন্দর্যের অনিন্দিত মুখখানি দেখার দুশ্চর সাধনা তাঁর, এ-সবই ১৮৮৮ থেকে ১৮৯০ সনের মধ্যে, বঙ্গাব্দের হিসাবে ১২৯৫-৯৭ সনের অন্তর্বর্তী কালে। ১২৯১ সনের বৈশাখে, যেমন আকস্মিক তেমনি মর্মান্তিক এক শোকদুঃখেই এর সূচনা এরূপ মনে করলে অযৌক্তিক বা অবাস্তব হবে না। কিন্তু, অন্যত্র যেমন বলেছি, প্রাণের পরাভব, বিষাদ-অন্ধকারের অধিরাজত্ব, মৃত্যু-কামনা —এর কোনোটিকে মেনে নেওয়াই অমৃতের পুত্র, জ্যোতির সন্তান, মানবসত্তার মূলগত অপরাজেয় আনন্দের অধিকারী রবীন্দ্র-নাথের পক্ষে স্বাভাবিক বা সম্ভবপর নয়। তাঁকে নিশিদিন, নিদ্রায়

ও জাগরণে, এই বিষাদ, এই তমো, এই মৃত্যুর আকর্ষণ, এগুলির সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত তিনি জয়শীলও হয়েছেন, স্ব-ভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছেন। এখানে একটা কথা 'গোপনে' বলে নিই— বিশ্বসৃষ্টির বা জীবজীবনের আসলে কোনো যুক্তি-যুক্ততা নেই, বুদ্ধিবিচারে কিছুই স্থির হয় না। তাই, সমস্ত বিশ্বজীবন বেঁচে বর্তে থাকে নিগূঢ় অথচ সর্বব্যাপী যে 'অস্তি'র আনন্দে সেও যেমন অহেতুক, তাকে পরাভূত করতে চায়, প্রলয়ান্ধকারে বিলুপ্ত করতে চায় যে তমোময় বিষাদ, মৃত্যু ও জড়ত্বের যে সর্বজাগতিক আকর্ষণ, বস্তুতঃ সেও তেমনি অহেতু। আনন্দের বা বিষাদের দৃশ্যতঃ অনেক হেতুপরম্পরা থাকতে পারে, কিন্তু সে কেবল লোক-দেখানো আর মন-ভোলানো মাত্র— সেগুলি কার্য না কারণ সে বিষয়ে আমাদের ঘোর সন্দেহ আছে। আমরা দার্শনিক নই, যুক্তি-তর্কে কিছু প্রমাণ বা অপ্রমাণ করতে পারব না— তবু এই আমাদের, অর্থাৎ বর্তমান লেখকের, বদ্ধমূল ধারণা বা সংস্কার।

এখন পূর্বপ্রসঙ্গের অনুসরণ করা যাক। আমরা দেখতে পাই ১৮৯০ খৃস্টাব্দে দ্বিতীয়বার বিলাত-প্রবাসের সময় পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ নিদারুণ মানসিক তথা আধ্যাত্মিক সংকটের ভিতরে কালযাপন করে-ছিলেন। এই সময়ের কতকগুলি চিঠিও ছিন্নপত্রাবলীতে নেই যে তা নয়। সে-সব পত্রে, বালিকা ইন্দিরার বড়ো 'মজা' লাগবে জেনে, সদলবলে দার্জিলিং-যাত্রা, কোমরে বাতব্যাধির আক্রমণ, কোনো-এক ঠিকানা থেকে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে স-কন্যা স-আয়া প্রত্যাবর্তন[২] ও রেলস্টেশনে 'এক-জোড়া মেম-সাহেব' বা 'নাক-তোলা রূপসী ইংরেজ মেয়ে'র সঙ্গে 'সংঘর্ষ', সাজাদপুর স্কুলের সুনীতিসঞ্চারিণী সভার সভাপতিত্ব, আর সাজাদপুরেই কোনো 'সাহেব' বা 'ম্যাজিস্ট্রেট'কে দুর্যোগের সন্ধ্যায় আতিথ্যদান, এ-সবের কটাক্ষে-বঙ্কিম কৌতুকে-রঞ্জিত যে ভাবের বর্ণনা করেছেন— তাতে লেখকের তৎকালীন মর্মবিদ্ধ

পীড়া বা মানসিক সংকটের বিষয় কিছুই জানা যায় না। ঠিক যে-ভাবে ‘সরোজিনীপ্রয়াণ’, হেঁয়ালিনাট্যগুলি, ‘কড়ি ও কোমল’ কাব্যের বিভিন্ন ‘পত্র’[৩] ও ‘চিঠি’[৪], এ-সব প্রবন্ধ নাটিকা এবং কবিতাবলীও অকৃপণ কৌতুকে বিদ্রূপে আমাদের এক-প্রকার প্রবঞ্চিত করে— লেখকের বিক্ষত হৃদয়কে আশ্চর্য নৈপুণ্যে লোকলোচনের আড়ালে রাখে। আব, এটাই রবীন্দ্র-চরিত্রের বিশেষ শালীনতার বা আভিজাত্যের লক্ষণ, তাঁর মৌলিক একাকিত্বের নিদর্শন— তিনি-যে চিরএকাকী, যেমন একাকী সৃষ্টিকার্যে আর সৃষ্টির অন্তরে থেকেও স্রষ্টা— এ কথা তিনি এই গ্রন্থেব নানা স্থানে, তেমনি ‘পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি’তে, নানা সময়ের নানা কবিতায়, এক-প্রকার স্বীকাবই করেছেন, আমার পাঠকদের সেটি অবশ্যই মনে পড়বে।

যা হোক, অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির লালনে, প্রাণসঞ্চাবী অলক্ষ্য করস্পর্শে, রবীন্দ্রনাথ ক্রমশ সুস্থ হয়েছেন— স্বস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠেছেন— সে আমাদেব না-জানা নয়। সচেতন কবিমানসে বাহিব ও অন্তরের মধ্যে একটা কোনো অচল সীমারেখা কোথাও আছে তাও বলা যায় না— বাহিরে অন্তবে কেবলই মেশামিশি হয়। প্রাণে আনন্দে আলোকে ও চেতনায় একটি আর-একটিকে কেবলই ব্যাপ্ত করে, অধিকার করে, এ কথাও যেন আমবা মনে রাখি। অনাদি অনন্ত প্রকৃতিকে রবীন্দ্রনাথ জীবনে ও সাহিত্যে কী-ভাবে প্রত্যক্ষ ও প্রকাশ করেছেন সেটিব ধ্যানধারণা থেকে এ-সবই স্পষ্ট হবে এই আমাদের বিশ্বাস।

রহস্যময়ী প্রকৃতির এই সঞ্জীবনী শুশ্রূষা, রুগ্ন অন্তঃকরণে সৌন্দর্য-সুষমার প্রলেপ— অলক্ষ্য এবং নিরন্তর। লক্ষগোচর হয় যে দিব্যমুহূর্তে তখনই বুঝি মনে পড়ে ‘জননান্তরসৌহৃদানি’, একই কালে মানবমনকে শান্ত এবং উদাস করে তোলে। এমন একটি দুর্লভ মুহূর্তের স্মৃতি কবি সারা জীবনে ভুলতে পারেন নি; তারই একটু বর্ণনা এখানে সংকলন

করি। জাহাজ চলেছিল লোহিতসমুদ্রের শান্ত জলরাশি মথিত ক'রে। ৩০ অগস্ট্ ১৮৯০ সনের সন্ধ্যা—

সমুদ্রের জলে একটি রেখামাত্র নেই। দিগন্তবিস্তৃত অটুট জলরাশি নিটোল সুডোল কোমল পরিপূর্ণ যৌবনের মতো স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। · সন্ধের সময় চিল আকাশের যে-একটা সর্বোচ্চ নীলিমার সীমার কাছে গিয়ে সমস্ত পাখা সমতল রেখায় বিস্তার করে দিয়ে হঠাৎ গতি বন্ধ করে দেয়— চিরচঞ্চল সমুদ্র ঠিক যেন সহসা সেই রকম একটা চরম প্রশান্তির শেষ সীমায় এসে ক্ষণেকের জন্যে পশ্চিম অস্তাচলের দিকে মুখ করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে। · সন্ধ্যাকাশের স্পর্শলাভ করে হঠাৎ সমুদ্রের অতলস্পর্শ অন্ধকার গভীরতার মধ্যে থেকে একটা আকস্মিক প্রতিভার দীপ্তি স্ফূর্তি পেয়েছে— সে কতটা তার কতটা আকাশের বলা যায় না। **আমাদের কত কবিতা কত গান আর-একজনের দুখানি নেত্রের ছায়া— এও সেই রকম।** সমুদ্রের এবং আকাশের সেই আশ্চর্য রঙ দেখে কেবল মনে হচ্ছিল ঠিক এইটেকে ব্যক্ত করতে পারি এমন ভাষা কোথায়? আবার তখনি মনে হল দরকার কী। আমার মধ্যে এ চঞ্চলতা কেন? · হৃদয়ের সমুদয় তরঙ্গকে একেবারে থামিয়ে দিয়ে কেন কেবল চেয়ে থাকি নে? সবই ধরতে হবে, রাখতে হবে —এই কেবল চেষ্টা! · কিন্তু মনে হয় সমুদ্র এবং আকাশের মধ্যেকার এই দুর্লভ সন্ধ্যাটুকু যদি পারিজাতপুষ্পের মতো তুলে নিয়ে কারও হাতে না দিতে পারি তবে কিছুই হল না। এই আলো এই শান্তি কেবল চেয়ে দেখবার এবং মুগ্ধ হবার জন্যে নয়, কিন্তু মানুষের ভালোবাসার উপরে এই আলো ফেলবার জন্যে। ঠিক এই উজ্জ্বল ম্লান নিভৃত উদার সন্ধ্যার ঠিক মর্মস্থলে যদি আমরা দুজনে দাঁড়াতে পারি তা হলে আমরা যেন আপনাদের আরও বেশি বুঝতে পারি, আরও বেশি ভালোবাসি। কারণ, **ভালোবাসা বোঝাতে গেলে সৌন্দর্যের ভাষা চাই এবং চারি দিকের নিস্তব্ধতা চাই।** এমন

আলোক, এমন বর্ণ, এমন ভাষা আমার নিজের মধ্যে কোথায় পাব ! ·· এ কথা নিশ্চয় সত্যি যে, **ঐ আকাশ আমারই অসীম দৃষ্টির মতো এবং এই সমুদ্র আমারই ভালোবাসা-মুগ্ধ হৃদয়ের মতো।**[৫]

অবর্ণনীয়ের বর্ণনা করা হয় নি, আভাসে ইশারাতেই যা-কিছু বলা হয়েছে। অন্তর-বাহিরের মিলনব্যাকুলতায় উভয়ের ভেদ প্রায় ঘুচে গেছে— প্রকৃতির অপরূপ রূপের আভায় কী-জানি কোন্ অভূত অভাবী প্রেমের প্রতিমা জেগে উঠেছে প্রশান্ত চিত্তে। রবীন্দ্রনাথের মতোই স্বভাবতঃ সৌন্দর্যবিভোর যে চিরস্মরণীয় কবি তাঁর অপূর্ব উক্তি স্মরণ করে একেই আমরা বলেছি— জননান্তরসৌহৃদানি।

অনন্তপ্রকৃতির বিকশিত সৌন্দর্যের শতদলে অবচন অবিচলপ্রায় এই প্রেমের প্রতিমা, এরই আরাধনায় চিরনিবেদিত ছিল কবিচেতনা, কবিসত্তা। এরই বিশেষ উপলব্ধি, বিশেষ প্রাপ্তি, সেটি বাস্তবকে স্পর্শ ক'রেও বাস্তবের অতীত। তার প্রকাশ ছন্দে সুরে, রূপে রেখায় রঙে। ভাষায় বলতে গেলে 'প্রেম' ও সৌন্দর্য' এই দুটি শব্দই মুখে আসে, অথচ চরম উপলব্ধির ক্ষণে ও-দুটি এক ও অভিন্ন।—

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে, তুমি বিচিত্ররূপিণী !
অযুত আলোকে ঝলসিছ নীল গগনে,
আকুল পুলকে উলসিছ ফুলকাননে,
দ্যুলোকে ভূলোকে বিলসিছ চলচরণে তুমি চঞ্চলগামিনী।

···

অন্তরমাঝে শুধু তুমি একা একাকী তুমি অন্তরব্যাপিনী !
একটি স্বপ্ন মুগ্ধ সজল নয়নে,
একটি পদ্ম হৃদয়বৃন্তশয়নে,
একটি চন্দ্র অসীম চিত্তগগনে— চারি দিকে চিরযামিনী।
অকূল শান্তি সেথায় বিপুল বিরতি,
একটি ভক্ত করিছে নিত্য আরতি—

নাহি কাল দেশ— তুমি অনিমেষ মুরতি,
তুমি অচপল দামিনী।…
‥ তুমি অন্তরবাসিনী।

অন্তরে ও বাহিরে— বিশ্বে ও আপনাতে— এই-যে আলোক ও চেতনার একাকারতা, এই-যে প্রেম ও সৌন্দর্যের অভিন্নতা, আমাদের আলোচ্য জীবনপর্বে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিশেষভাবে তারই কবি, তারই অনুভবী। এই সময়েই 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা'র অবিস্মরণীয় কবিতাগুলি লেখা হয়, বিদায়-অভিশাপে চিত্রাঙ্গদায় কামনা ও প্রেমের ঘাতপ্রতিঘাতময় সংবেগ সাকার সচল হয়ে ওঠে, এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ জমিদারি-পরিদর্শনের উপলক্ষ নিয়ে আত্রাই ইছামতী পদ্মায় বোটে ক'রে নিরন্তর ভ্রমণ করেছেন সজল শ্যামল বাংলাদেশের এক জেলা থেকে অন্য জেলায়, গ্রামবাসী জনসাধারণের জীবন চোখে দেখেছেন আর তার মর্মেও প্রবেশ করেছেন অপূর্ব অন্তর্যামিত্বের গুণে— প্রথমে সাপ্তাহিক 'হিতবাদী'তে, পরে প্রতি মাসে 'সাধনা'য় পকাশিত ছোটোগল্পগুলিতে তারই সজীব সাক্ষ্য বর্তমান— আর, ডায়ারি রাখার ইচ্ছা বা অভিরুচি ছিল না, প্রায় প্রত্যেক দিন 'প্রাণাধিকা' ইন্দিরাকে যে চিঠিগুলি লিখেছেন— দিনে দুবারও লেখেন নি তা নয়— তাতেই একাধারে ব্যক্তি ও কবি রবীন্দ্রনাথের জীবনযাত্রার, বিশেষতঃ অন্তর্জীবনের, আনুপূর্বিক দিনলিপি ভাষা নিবদ্ধ হয়েছিল। রবীন্দ্রজীবনের এই অংশটি আমরা ১৮৯১-৯৫ খৃস্টাব্দ অথবা বঙ্গীয় ১২৯৮-১৩০২ সন এই অঙ্কচিহ্নে অঙ্কিত করতে পারি।

আমরা পূর্বেই বলেছি এটি রবীন্দ্রনাথের জীবনে সুখশান্তি ও পারিবারিক স্বস্তির সময়, সৌন্দর্য ও সামঞ্জস্যের কাল। তাঁর পরিপূর্ণ প্রতিভাবিকাশের একটি যেন স্নিগ্ধোজ্জ্বল দিব্যমুহূর্ত। জীবনবীণায় এর সুর বেঁধে দিয়েছে যে প্রকৃতি, কখনো সে আশ্বিনের সোনার

প্রতিমা, কখনো ফাল্গুনের লাবণ্যময়ী।

বিশুদ্ধ কবিপ্রতিভা কিম্বা বিশুদ্ধ কবিতা, দেশী বিদেশী কাব্য-আলোচনার কালে এরূপ শব্দসংজ্ঞা আমাদের অশ্রুত অপরিচিত নয়। অবশ্য, এ-সব উক্তি নিখুঁত সংজ্ঞার্থ দিয়ে কতটা ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করা যায় সে আমরা বলতে পারি নে। তবে একান্ত সৌন্দর্যোপাসনাই যে এর বিশেষ লক্ষণ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আর, 'সৌন্দর্য আমার পক্ষে সত্যিকার নেশা! আমাকে সত্যি-সত্যি ক্ষেপিয়ে তোলে' এ কথা রবীন্দ্রনাথ মিথ্যা বলেন নি; হয়তো মহাকবি গেটে বা কীট্‌সের সঙ্গেও এ দিক দিয়ে তাঁর সম্পূর্ণ মিল আছে। বিশেষ ক'রে অনন্তপ্রকৃতির স্থলজল আকাশ থেকে এই লৌকিকরূপিণী অলৌকিকের সৌন্দর্যচ্ছটা তাঁর হৃদয়ে মনে তাঁর জীবনে প'ড়ে তাঁকে কবি ক'রে তুলেছে পদনখ থেকে কেশাগ্র পর্যন্ত। এই অপূর্ব স্পর্শমণির প্রভাবে সত্তার সবই তাঁর সোনা হয়ে গিয়েছে। তরুণ বয়সে একদিন সকালবেলায় সদরস্ট্রীটের বাড়ির বারান্দা থেকে নবোদিত সূর্যকিরণে সমুদয় বিশ্ব 'আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত' দেখেছিলেন যে দৃষ্টিতে, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তা অনাবিল স্বচ্ছ ছিল। চিঠির পর চিঠিতে এই বিশুদ্ধসৌন্দর্যসম্ভোগের কথা, সহজ সত্য কথা, অতিশয় সহজ সুন্দর ভাবেই ব্যক্ত হয়েছে—

'আমি যদি সাধুপ্রকৃতির লোক হতুম তা হলে হয়তো মনে করতুম জীবন নশ্বর · সৎকার্যে এবং হরিনামে যাপন করি। আমার সে প্রকৃতি নয়।— তাই আমার মাঝে মাঝে মনে হয় এমন সুন্দর দিনরাত্রিগুলি আমার জীবন থেকে প্রতিদিন চলে যাচ্ছে, তার সমস্তটা গ্রহণ করতে পারছি নে! এই-সমস্ত রঙ, আলো এবং ছায়া, আকাশ-ব্যাপী নিঃশব্দ সমারোহ, এই দ্যুলোক ভূলোকের মাঝখানে সমস্ত-শূন্য-পূর্ণ-করা শান্তি এবং সৌন্দর্য, এর জন্যে কি কম আয়োজনটা

চলছে!··· রঙিন সকাল এবং রঙিন সন্ধ্যাগুলি দিগ্‌বধূদের ছিন্ন কণ্ঠহার থেকে এক-একটি মানিকের মতো সমুদ্রের জলে খসে খসে পড়ে যাচ্ছে। আমাদের মনের মধ্যে একটাও এসে পড়ে না!··· লোহিতসমুদ্রের স্থির জলের উপরে যে-একটি অলৌকিক সূর্যাস্ত দেখেছিলুম, সে কোথায় গেছে!··· আমার জীবনে তার রঙ রয়ে গেছে। অমন এক-একটি দিন এক-একটি সম্পত্তির মতো। আমার সেই পেনেটির বাগানের গুটিকতক দিন, তেতালার ছাদের গুটিকতক রাত্রি, পশ্চিম ও দক্ষিণের বারান্দার গুটিকতক বর্ষা, চন্দননগরের গঙ্গার গুটিকতক সন্ধ্যা, দার্জিলিঙে সিঞ্চলশিখরের একটি সূর্যাস্ত ও চন্দ্রোদয় —এই-রকম কতকগুলি উজ্জ্বল সুন্দর ক্ষণখণ্ড আমার যেন ফাইল করা রয়েছে। সৌন্দর্য আমার পক্ষে সত্যিকার নেশা। আমাকে সত্যি-সত্যি ক্ষেপিয়ে তোলে। ছেলেবেলায় বসন্তের জ্যোৎস্নারাত্রে যখন ছাদে পড়ে থাকতুম তখন জ্যোৎস্না যেন মদের শুভ্র ফেনার মতো একেবারে উপচে প'ড়ে নেশায় আমাকে ডুবিয়ে দিত।·· যদি বাসনা এবং সাধনা-অনুরূপ পরকাল থাকে তা হলে এবার আমি এই ওয়াড়-পরানো পৃথিবী থেকে বেরিয়ে গিয়ে যেন এক উদার উন্মুক্ত সৌন্দর্যের আনন্দলোকে জন্মগ্রহণ করতে পারি। যারা সৌন্দর্যের মধ্যে সত্যি-সত্যি নিমগ্ন হতে অক্ষম তারাই সৌন্দর্যকে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের ধন ব'লে অবজ্ঞা করে— কিন্তু এর মধ্যে যে অনির্বচনীয় গভীরতা আছে, তার আস্বাদ যারা পেয়েছে তারা জানে— সৌন্দর্য ইন্দ্রিয়ের চূড়ান্ত শক্তিরও অতীত; কেবল চক্ষু কর্ণ দূরে থাক্, সমস্ত হৃদয় নিয়ে প্রবেশ করলেও ব্যাকুলতার শেষ পাওয়া যায় না॥ ৫৫

দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের মতো ভাবমগ্নচিত্ত কবির ক্ষেত্রে এই-যে সৌন্দর্যসম্ভোগ, আত্মবিলোপকারী উপাসনার থেকে তার কোনো প্রভেদ নেই। সচেতন ইন্দ্রিয় মন মেলে দিয়ে অতীন্দ্রিয় এই অনুভূতি যথার্থই আধ্যাত্মিক।—

০সৌন্দর্য আমার কাছে প্রত্যক্ষ দেবতা— যখন মনটা বিক্ষিপ্ত না থাকে এবং যখন ভালো করে চেয়ে দেখি তখন এক-প্লেট গোলাপ-ফুল আমার কাছে সেই ভূমানন্দের মাত্রা যার সম্বন্ধে উপনিষদে আছে : এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি। সৌন্দর্যের ভিতরকার এই অনন্ত গভীর আধ্যাত্মিকতা এটা কেবল পুরুষরা উপলব্ধি করতে পেরেছে। এই জন্যে পুরুষের কাছে মেয়ের সৌন্দর্যের একটা বিশ্বব্যাপকতা আছে। সেদিন শঙ্করাচার্যের আনন্দলহরী ব'লে একটা কাব্যগ্রন্থ পড়ছিলুম, তাতে সে সমস্ত জগৎসংসারকে স্ত্রীমূর্তিতে দেখছে – চন্দ্র সূর্য আকাশ পৃথিবী সমস্তই স্ত্রীসৌন্দর্যে পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছে— অবশেষে সমস্ত বর্ণনা সমস্ত কবিতাকে একটা স্তবে একটা ধর্মোচ্ছ্বাসে পরিণত করে তুলেছে। কেবল চক্ষুকে কিম্বা কল্পনাকে নয়— সৌন্দর্য যখন একেবারে সাক্ষাৎভাবে আত্মাকে স্পর্শ করতে থাকে তখনই তার ঠিক মানেটি বোঝা যায়। আমি যখন একলা থাকি তখন প্রতিদিনই তার সুস্পষ্ট স্পর্শ অনুভব করি, সে যে অনন্ত দেশকালে কতখানি জাগ্রত সত্য তা বেশ বুঝতে পারি— এবং যা বুঝতে পারি তার অর্ধেকের অর্ধেকও বোঝাতে পারি নে॥ ১৯৭

বলাই বাহুল্য, প্রকৃতির মধ্যে যে সৌন্দর্য দেখেছেন কবি নিমগ্ন হয়ে, তন্ময় হয়ে, দুর্লভ ক্ষণে ক্ষণে (রবীন্দ্রনাথের জীবনে সত্যই তেমন দুর্লভ নয়) অনন্ত প্রকৃতিতে আপন সত্তা ব্যাপ্ত ও বিলীন করে দিয়ে, নিখিল সংসার তারই আভায় আভাসিত হয়েছে— শুধু আকাশ-জল-মাটি বন-উপবন পশু-পক্ষী নয়, ঘরে বাহিরে আবালবৃদ্ধ নরনারীও সুন্দর হয়ে উঠেছে। তবে, মানুষ তো শুধু প্রকৃতির রচনা নয় ; সমাজ অথবা ব্যক্তি নিজের হাতের কাজে, নিজস্ব মানসের গুণে বা দোষে, নিজেকে যেমন প্রকাশ করতে পারে তেমনি আবরণও করতে পারে— আর দুঃখের বিষয় প্রায়শঃ তাই করে থাকে— মানুষের সেই দুঃখ-দৈন্য-হীনতার মলিন ছদ্মবেশ কবিকে সর্বদাই পীড়া দিয়েছে— যেখানে

মানুষ নিজেকে প্রকাশ করেছে, সহজ স্বাভাবিক বেশেই হোক কিম্বা সৌজন্যে সামাজিকতায়, কারুকলার অনুশীলনে, সৃজনপ্রতিভায়, সেখানেই কবি অলৌকিক চিত্তপ্রসাদ-লাভে আনন্দিত হয়েছেন। নিষ্কলুষ সচেতন সত্তার এই সম্ভোগ লৌকিককে আশ্রয় ক'রেও অলৌকিক এবং নিয়তই অম্লান, পবিত্র। শাস্ত্র বা লোকাচার -মানা সংস্কারের আবরণে কখনোই তার শুচিতারক্ষার প্রয়োজন হয় নি সে আমরা বেশ জানি। নূতন-প্রচারিত 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি' থেকে তারই যৎকিঞ্চিৎ সাক্ষ্য এ স্থলে সংকলন করা যেতে পারে।—

একজন বিখ্যাত artist -রচিত একটি উলঙ্গ সুন্দরীর ছবি দেখলুম। কী আশ্চর্য সুন্দর! দেখে কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। সুন্দর শরীরের চেয়ে সৌন্দর্য পৃথিবীতে কিছু নেই— কিন্তু আমরা ফুল দেখি, লতা দেখি, পাখি দেখি, আর পৃথিবীর সর্বপ্রধান সৌন্দর্য থেকে একেবারে বঞ্চিত। মর্তের চরম সৌন্দর্যের উপর মানুষ স্বহস্তে একটা চির অন্তরাল টেনে দিয়েছে। কিন্তু সেই উলঙ্গ ছবি দেখে যার তিলমাত্র লজ্জা বোধ হয় আমি তাকে সহস্র ধিক্কার দিই। আমি তো সুতীব্র সৌন্দর্য-আনন্দে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলুম, আর ইচ্ছে করছিল আমার সকলকে নিয়ে দাঁড়িয়ে এই ছবি উপভোগ করি। বেলি [বড়োমেয়ে] যদি বড়ো হ'ত তাকে পাশে নিয়ে দাঁড়িয়ে আমি এ ছবি দেখতে পারতুম। এরকম উলঙ্গতা কী সুন্দর! দেখলে সহসা চৈতন্য হয়— ঈশ্বরের নিজহস্ত-রচিত এক অপূর্ব সৌন্দর্য পশু-মানুষ একেবারে আচ্ছন্ন করে রেখেছে এবং এই চিত্রকর মনুষ্যাকৃত সেই অপবিত্র আবরণ উদ্‌ঘাটন করে সেই দিব্য সৌন্দর্যের একটা আভাস দিয়ে দিলে। এই দেহখানির শুভ্র কোমলতা এবং প্রত্যেক সুঠাম ভঙ্গিমার উপর বিশ্বকর্মার, সেই অসীমসুন্দরের, অঙ্গুলির স্পর্শ দেখা যায় যেন। এ কেবলমাত্র দেহের সৌন্দর্য নয়— একটি প্রেমপূর্ণ সুকোমল নারীহৃদয়, একটি অমর সুন্দর মানবাত্মা এরই মধ্যে বাস

করে। তারই ভালোবাসা, তারই লাবণ্য এর সর্বত্র উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।··· আত্মার শুভ্র জ্যোতি ব্যক্ত করছে, মানব-অন্তঃকরণের চিরপ্রচ্ছন্ন রহস্য কতকটা প্রকাশ করে দিচ্ছে।[৬]

দ্বিতীয় য়ুরোপ প্রবাসের সময় নিজের ডায়ারিতে কবি এই যা লিখেছিলেন তা কেন যে ইতিপূর্বে ছাপা হয় নি অনুমান করা কঠিন নয়। যে সত্যকথন বা বস্তুকথন এ দেশের শিক্ষিত সুরুচি লোকেরও সহ্য হওয়ার আশা ছিল না নিরাভরণ ভ্রমণবিবরণে, সেটি কয়েক বৎসরের মধ্যেই কবি রূপান্তরিত করেছেন তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা 'বিজয়িনী'তে, যার শেষাংশটুকু স্মরণ করা যেতে পারে—

অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের তরঙ্গ উচ্ছল
লাবণ্যের মায়ামন্ত্রে স্থির অচঞ্চল
বন্দী হয়ে আছে ; তারই শিখরে শিখরে
পড়িল মধ্যাহ্নরৌদ্র— ললাটে, অধরে,
ঊরু-'পরে, কটিতটে, স্তনাগ্রচূড়ায়,
বাহুযুগে, সিক্তদেহে রেখায় রেখায়
ঝলকে ঝলকে।
ত্যজিয়া বকুলমূল মৃদুমন্দ হাসি
উঠিল অনঙ্গদেব। সম্মুখেতে আসি
থমকিয়া দাঁড়ালো সহসা। মুখপানে
চাহিল নিমেষহীন নিশ্চল নয়ানে
ক্ষণকাল-তরে। পরক্ষণে ভূমি-'পরে
জানু পাতি বসি', নির্বাক্-বিস্ময়-ভরে,
নতশিরে, পুষ্পধনু পুষ্পশরভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা-উপচার
তূণ শূন্য করি। নিরস্ত্র মদন-পানে
চাহিলা সুন্দরী শান্ত প্রসন্ন বয়ানে।

পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের নিষ্কল নির্মল প্রতিমার সম্মুখে এসে কামদেব পরাভূত আর কামনা লজ্জিত। রূপসৌন্দর্যের অনুরূপ সত্যোপলব্ধি থেকেই কিছুকাল পূর্বে রবীন্দ্রনাথ লেখেন উর্বশী; তার তাৎপর্য-ব্যাখ্যায় একখানি চিঠিতে লেখেন— 'দেবতার ভোগ নারীর মাংস নিয়ে নয়, নারীর সৌন্দর্য নিয়ে। হোক্-না সে দেহের সৌন্দর্য, কিন্তু সেই তো সৌন্দর্যের পরিপূর্ণতা। সৃষ্টিতে এই রূপসৌন্দর্যের চরমতা মানবেরই রূপে। সেই মানবরূপের চরমতাই স্বর্গীয়। উর্বশীতে এই দেহসৌন্দর্য ঐকান্তিক হয়েছে ·· সে যেন চিরযৌবনের পাত্রে রূপের অমৃত · সে অবিমিশ্র মাধুর্য।'—

দিবসরাতি সুরসভার মাঝে যে সুধা করে পান
পরশ তার মেলে না, মেলে না যে, নাহি রে পরিমাণ।

বিশ্বান্তর্যামী কিম্বা ব্যক্তিচৈতন্যে-অধিষ্ঠিত ভগবান সবই ভোগ করেন দৃষ্টি দিয়ে, এটি যে জানে, বিশ্বের সব-কিছুই সে— সমুদয় রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শ— ভগবৎপ্রসাদরূপে গ্রহণ করতে পারে; তার পক্ষেই ঈশোপদিষ্ট ত্যাগ ও ভোগের একীকরণ সহজ সম্ভবপর হয়।

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন ও সাধনার আলোকে, আলোচনে, আমরা এই ধারণায় উপনীত হই। না হলে সৌন্দর্যের উপাসনা, স্বচ্ছদৃষ্টির উজ্জ্বলতায় তারই আরতি, এটুকুর ভাবগ্রহে বা বিচার-বিবেচনায় আমাদের কবিকে শুধুই ক্লাসিক বা গ্রীক বললেও ভুল হ'ত না, গেটে বা কীট্সের সঙ্গে উপমিত ক'রে ক্ষান্ত হওয়া যেত। কিন্তু বিশেষ পার্থক্য কিছু নেই কি? রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-রতি বা আরতি পরিণামে ব্যাপ্ততর, গভীরতর, অধিকতর আধ্যাত্মিক —সে যদি বা 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা'র 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' 'মানসসুন্দরী' 'জ্যোৎস্নারাত্রে' 'প্রেমের অভিষেক' 'বিজয়িনী' বা 'উর্বশী'তে স্বতঃ প্রকটিত না হয়ে থাকে, হয়তো 'যেতে নাহি দিব' 'এবার ফিরাও মোরে' 'চিত্রা' 'অন্তর্যামী' 'জীবনদেবতা' 'রাত্রে ও প্রভাতে' এমন

কতকগুলি কবিতায় পুনঃপুনঃ আভাসিত হয়েছে। ফলতঃ, ভারত-ভূমিতে জন্মলাভ ক'রে, স্মরণাতীত অতীতের দিব্যদ্রষ্টা ঋষিদের অক্ষয় উত্তরাধিকার অন্তরে পেয়ে, এমন না হয়ে উপায় ছিল না। তাঁরাও তো কোনোরূপ মনঃকল্পিত রীতিনীতির সংস্কারে বদ্ধ ছিলেন না, জীবন উৎসর্গ ক'রে সত্যেরই সাধনা করেছিলেন, সত্যের (তেমনি সৌন্দর্যের) প্রাণস্বরূপ বিশুদ্ধ আনন্দকেই বিশ্বজীবনের আদি অন্ত মধ্য ব'লে জেনেছিলেন, পেয়েছিলেন— তাঁদেরই শিক্ষাদীক্ষায়, প্রতীচ্যে ও প্রাচ্যে, গ্রীকে ও ভারতীয়ে, কীট্‌সে ও রবীন্দ্রনাথে এষণা ও প্রাপ্তিতে কিছু প্রভেদ দেখা যায়। 'আনন্দলহরী'র সঙ্গে 'এপিসিকিডিয়ন' হুবহু কেনই বা মিলবে? হয়তো একই বস্তুর অভিমুখে পৃথক্ পৃথক অভিসারে, পরিণামে যাই হোক, পথে পথে বিচিত্র এবং বিশেষ ফললাভ না হয়েই পারে না। আর, সেই পথের কথায় ও কাহিনীতে গ্রথিত মানুষের সমস্ত জীবন, সমস্ত কাব্য কলা। প্রাপ্তি অবাঙ্‌মনোগোচর, তার কোনো ভাষাই থাকে না।

'বিশুদ্ধ' কাব্যে কলায় যাঁদের অভিরুচি, অন্য কথায় বলতে গেলে যাঁরা কলাকৈবল্যবাদী, তাঁরা সম্ভবতঃ কীট্‌সেরই একটি মহাবাক্যকে বীজমন্ত্রস্বরূপ গ্রহণ করেন ; সেটি হল—

Beauty is truth, truth beauty.

বাক্যটির অর্থের ব্যাপ্তি বা গভীরতা, প্রেরণার মাধুরী বা মাদকতা অল্প নয় এবং এই ভাবনারই প্রবল আকর্ষণে বা একনিষ্ঠ অনুসরণে কীট্‌সের প্রতিভা বিকশিত হয়েছে, তাঁর অচিরজীবনের সাধনা আশ্চর্য-সুন্দর রূপ পেয়েছে। রবীন্দ্রকাব্যে ওআর্ড্‌স্বার্থ্ শেলি কীট্‌স্ প্রভৃতি সাগরপারের রোমান্টিক কবিকুলের প্রভাব অল্প বা অনুপস্থিত নয়— এবং আমরা তাঁর প্রতিভা-বিকাশের যে পর্বের আলোচনায় নিযুক্ত সে সময়ে বা তারই চরমে, রূপনিষ্ঠায় কীট্‌সের সঙ্গে তাঁর সজাতীয়তা ছিল সমধিক। ওআর্ড্‌স্বার্থের সঙ্গে মিল ততটা আকার-প্রকার-

গত নয় যেমন মূলগত— বিশ্বপ্রকৃতিকে নিবিড়-গভীর-ভাবে অনুভব করবার প্রবণতায়, ব্যক্তিসত্তাকে বিশ্বসত্তায় লীন করে দেবার স্বাভাবিক শক্তিতে, এক কথায় ধ্যানতন্ময়তাতেই উভয়ের তুলনা হতে পারে। তবে, যার-পর-নেই বরণীয় এবং স্মরণীয় ইংরাজ কবির মহৎপ্রতিভা কী জানি কী-একটা ট্র্যাজেডির বশে যেন রূপকথার সেই রাজপুত্রের মতোই কতকটা শিলীভূত আর বাকিটা সজীব, সচেতন, আনন্দবেদনাহত। রবীন্দ্রপ্রতিভার তনুর প্রত্যেক অণু পরমাণুই সজীব সচেতন এবং অনাহত অশ্রুত সুরে সুরে অবিরাম ঝঙ্কৃত। সে কথা যাক্— বিশেষতঃ 'চিত্রা'র কতকগুলি কবিতায় ভাব ও রসের আশ্চর্য মূর্ততার কারণে রূপরসিক কীট্‌সের কথা স্বতঃই মনে পড়ে। কীট্‌সের যে মহাবাক্যটি আমরা এইমাত্র সংকলন করেছি এটি যে রবীন্দ্রনাথকে চিরদিন উদ্‌বুদ্ধ করে নি তাও নয়। অথচ তাঁর ভারতবর্ষীয় বিশেষ প্রকৃতিতে বাক্যটি কী অপ্রত্যাশিত রূপান্তর লাভ করেছে কবি তা লক্ষ্য না করে থাকতে পারেন, আমরা দেখেছি। তিনি বলছেন—

এই রকম সংশয়ের সময়ে কবির বাণী মনে পড়ে: Truth is beauty অর্থাৎ, সত্যই সৌন্দর্য।'

অন্যত্র আরও স্পষ্ট করে লিখেছেন—

কীট্‌সের বাণী মনে পড়ল: Truth is beauty, beauty truth। অর্থাৎ, যে সত্যকে আমরা হৃদা-মনীষা-মনসা উপলব্ধি করি তাই সুন্দর। তাতেই আমরা আপনাকে পাই। এই কথাই যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন যে, যে-কোনো জিনিষ আমার প্রিয় তার মধ্যে আমি আপনাকেই সত্য ক'রে পাই ব'লেই তা প্রিয়, তাই সুন্দর।'

কীট্‌সের কাছে **সুন্দরই** ছিল সত্য, আর রবীন্দ্রনাথে **সত্যই** হয়েছে সুন্দর।

বিশেষ ক'রে কল্পলোকে কাব্যলোকে সীমাবদ্ধ কীট্‌সের ভাবনা

ও উপলব্ধি রবীন্দ্র- প্রতিভায় ও জীবনে কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে সেটি যেমন দেখা গেল, সেই সঙ্গেই লক্ষ্য করবার বিষয়— এই ভাবান্তর বা রূপান্তরের হেতু ও প্রয়োজন কোন্‌খানে। কাব্যসাধনা আর জীবনসাধনা রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে যেমন একীভূত হয়ে উঠেছিল, তার ব্যাপ্তি ও গভীরতা যতদূর গিয়েছিল, কিংবদন্তীশ্রুত ও অলৌকিক-আখ্যানে-ধৃত ব্যাস-বাল্মীকির কথা বাদ দিলে, জানি নে এমনটা হয়ে উঠেছিল আর কোন্ কবি কোন্ ভাবুক কোন্ শিল্পীর জীবনে। মানব-ইতিহাসের ধারায় তার কোনো উল্লেখ দেখি নে।

সত্যকাম, সত্যতপা, সত্যসংকল্প, সত্যদ্রষ্টা হওয়াই ছিল প্রাচীন ঋষিগণের জীবনব্রত। কেননা সত্যেই নিখিলজীবন আশ্রিত, বিশ্বের একটি অণু পরমাণু তার বাইরে নেই, আর সে সত্য দার্শনিক মনের শুষ্ক চিন্তাসূত্র যেমন নয়, জড়বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত কতকগুলি মূল 'পদার্থ' কিম্বা তৎসম্পর্কিত কয়েকটি আঙ্কিক সংকেতও নয়— পরন্তু চৈতন্যময়, আনন্দময়। পরম সত্যকে তাই তাঁরা সচ্চিদানন্দ ব'লে নির্দেশ করেছেন। অবাঙ্‌মনোগোচর যে বস্তুকে বলা হয় 'সত্য' বা 'অস্তীতি', তাই চেতনা, তাই আনন্দ; অনাদি অনন্ত বিশ্বভুবন, চিরকালীন জীবজীবন তারই আশ্রিত— তারই ইন্দ্রিয়মনোগোচর (?) একদেশ মাত্র। আমাদের কবি শেষ পর্যন্ত এই 'সত্য'কেই যেমন জীবনে তেমনি কাব্যেও পরমদৈবত ব'লে, একমাত্র আবাধ্য-রূপে স্বভাবতই চিনে নিয়েছেন। তাই কবি কীট্‌সের সঙ্গে কবি রবীন্দ্রনাথের সজাতীয়তা বহুদূরগামী হতে পারে নি, একের স্বধর্ম অন্যের নয়। সত্য ও সুন্দরের সম্পর্কটি দুর্লভ হীরকের মতো দ্যুতিক্ষর একটি বাক্যে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্ত করেছেন প্রৌঢ় পরিণত বয়সে এই ভাবে—

Truth smiles in beauty when she beholds
her face in a perfect mirror.

সঙ্গীতে যখন সত্য শোনে নিজবাণী
সৌন্দর্যে তখন ফোটে তার হাসিখানি।[২]

উদ্ধৃত রচনার ইংরেজিটুকু অর্থব্যঞ্জনায় অতিঅপূর্ব এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রের বিশেষ প্রণিধানের বিষয় ব'লে আমরা মনে করি। মন্ত্রবৎ সংহত এবং স্বপ্রকাশ এই উক্তিতে তাবৎ রূপকলার শেষ সীমা পর্যন্ত উদ্ভাসিত মনে হয়। আর, বিশ্বজীবনও কি আদিকবির অজর অমর চিত্র মূর্তি কবিতার চলপ্রবাহ নয়? তা হলে তারও গূঢ়তম মর্ম উদ্‌ঘাটিত। ইংরেজির বাংলা ভাষান্তরে ঐ মহাবাক্যের ঈষৎ ভাবান্তর হয়ে গেছে— কবি নিজেও নিজের অপূর্ব উপলব্ধিটুকু এক ভাষা থেকে আর-এক ভাষার আধারে, হোক তাঁর স্বভাষা, ধ'রে দিতে হার মেনেছেন— এই পরিবর্তন যে একেবারে অহেতুক তাও নয়, তারও গূঢ়ার্থ অবশ্যই আছে। রবীন্দ্র-কবিপ্রতিভার বৈশিষ্ট্যেই সেই বিশেষ হেতু নিহিত আছে, ছিন্নপত্রাবলীর যত্রতত্র তার যথেষ্ট ইঙ্গিত ইশারা, হয়তো বা বিশদ লক্ষণ ও পরিচিতি লিপিবদ্ধ আছে।

সচেতন রূপকার মাত্রেই সংগীতকে সকল চারুকলার মূলীভূত কারণরূপে বোধ করেন। নিখিল সৃষ্টির পরার্ধ আর অপরার্ধ, যেটি ইন্দ্রিয়মনের অগোচর আর যেটিকে ইন্দ্রিয়মন-যোগে সারা জীবন আবিষ্কার ক'রে ক'রে জীবযাত্রা নিষ্পন্ন করে জীব মাত্রেই— বিশেষতঃ প্রাণবান্ ধীমান মানুষ— উভয়ের মধ্যে ঋষিগণ শাস্ত্রকারগণ একটি 'বিজ্ঞান'লোক বা কারণলোক স্বীকার করেন। তেমনি কে না জানে —তুরীয় লোক, আনন্দ ও চেতনার সীমাহীন অরূপলোক, আর নৃত্য গীত কাব্য কলা স্থাপত্য মূর্তি যা-কিছু নিয়ে মানবমানসের নিরন্তর 'সৃজ্যমান' অভিনব মায়িক ভুবন— উভয়ের মধ্যে আছে একটি নিরাকার সুরলোক, যা অনাহত এবং অশ্রুতপ্রায় হয়েও কবি ও শিল্পীকে নিয়ত প্রেরণ করে ব'লেই যে-কোনো রূপসৃষ্টি সম্ভবপর হয়।

ভাষাপরিপূর্ণ নীরবতা— অনেক ক্ষণ চুপ করে অনিমেষনেত্রে চেয়ে দেখতে দেখতে মনে হয় যদি এই চরাচরব্যাপ্ত পূর্ণনীরবতা আপনাকে আর ধারণ করতে না পারে, সহসা তার অনাদি ভাষা যদি বিদীর্ণ হয়ে প্রকাশ পায়, তা হলে কী-একটা গভীর গম্ভীর শান্ত সুন্দর সকরুণ সংগীত পৃথিবী থেকে নক্ষত্রলোক পর্যন্ত বেজে ওঠে! আসলে তাই হচ্ছে। কেননা, জগতের যে কম্পন আমাদের চক্ষে এসে আঘাত করছে তাই আলোক, আর যে কম্পন কানে এসে আঘাত করছে তাই শব্দ। আমরা একটু নিবিষ্টচিত্তে স্থির হয়ে চেষ্টা করলে জগতেব সমস্ত সম্মিলিত আলোক এবং বর্ণের বৃহৎ হার্মনিকে মনে মনে একটি বিপুল সংগীতে খানিকটা তর্জমা করে নিতে পারি। এই জগৎব্যাপী দৃশ্যপ্রবাহের অবিশ্রাম কম্পনধ্বনিকে কেবল একবার চোখ বুজে মনের কান দিয়ে শুনতে হয়॥ ৭৩

আশা করি, স্বভাববধির প্রায়ান্ধ আমরা সাধারণ মানুষ এ-সবই কবিজনোচিত অত্যুক্তিমাত্র মনে করব না এবং নিবিষ্টমনে ভেবে দেখব, অনুভব কবে দেখব এ কথাব তাৎপর্যই বা কী।—

০এখানে প্রকৃতি এত নিকটবর্তিনী, তাব হৃৎকম্প এবং তাব নিশ্বাসহিল্লোল এত কাছে অনুভব করা যায় যে, সংগীত ছাড়া আব কোনোবকম চেষ্টাসাধ্য উপায়ে ভাবপ্রকাশ করতে ইচ্ছা হয় না। প্রকৃতির সঙ্গে গানের যত নিকট সম্পর্ক এমন আর কিছু না— আমি নিশ্চয় জানি এখনি যদি আমি জানলার বাইরে দৃষ্টি রেখে রামকেলি ভাঁজতে আবম্ভ করি তা হলে এই বৌদ্ররঞ্জিত সুদূরবিস্তৃত শ্যামলনীল প্রকৃতি মন্ত্রমুগ্ধ হরিণীর মতো আমার মর্মের কাছে এসে আমাকে অবলেহন করতে থাকবে॥ ২৩২

কবির দিবারাত্রির সকল স্বপ্নে ও ভাবনায় রহস্যময়ী বিশ্বপ্রকৃতি ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত, মিলিত; তিনি শুধু রূপ অথবা রূপস্মৃতি -ময়ী নন, সুর ও সংগীত -ময়ী— রবীন্দ্র- সাহিত্য ও জীবনের গহন-গভীর-

ব্যাপিনী সর্বময়ী সেই সত্তা প্রায় সকলপ্রকার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের অতীত। সত্তার সঙ্গে যা একীভূত তাকে সত্য করে জানা যায় শুধু প্রজ্ঞায় অথবা অনুভবে, কিছু হয়তো বলা যায় ইঙ্গিতে ইশারায়, 'ধ্বনি'-সংযোগে, অর্থাৎ পুনশ্চ আর্ট্ বা রসরূপের আকারে।

রবীন্দ্রপ্রতিভার একান্ত সৌন্দর্যতন্ময়তা, রবীন্দ্রকাব্যের অন্তর্নিহিত নন্দনরুচি, এরই আলোচনার সূত্রে আমরা— রবীন্দ্রনাথ ও প্রকৃতির গভীরগহন প্রণয় ও আত্মীয়তার মুখোমুখি উপস্থিত হয়েছি। এই প্রকৃতি কতখানি সত্তার বাহিরে আর কতখানি ভিতরে তা বলা যায় না ; অন্তর ও বাহিরের ভেদরেখা কেবলই লুপ্ত হয়ে যায়, অন্তর ও বাহির পরস্পরকে ব্যাপ্ত ক'রে পৃথক্ অস্তিত্বই হারিয়ে ফেলে যেন, এবং দৃশ্যই অদৃশ্য হয়ে ওঠে শ্রুত অশ্রুত কিম্বা প্রাণে-প্রাণে-মৃদুগুঞ্জিত গানে গানে। সৌন্দর্যের স্বরূপ এখানে নির্বিচল রূপসুষমার সীমায় সীমায় সংহত হতেই পারে না। বিজ্ঞানী যেমন বলেন, অনড় বা 'জড়' ব'লে কোনো পদার্থই হয় না ; সমস্তই অদৃশ্য অধৃষ্য তেজঃপুঞ্জ— অথবা আমাদের ভাষাতেই বলি, প্রাণপুঞ্জ মাত্র। সৌন্দর্য আকারগত নয়— রূপসুষমার আধারে ক্ষণে ক্ষণে ধরা দিলেও, রূপে রূপে তার চকিত পদপাত হতে থাকলেও, আসলে সে ভাবগত, আত্মিক। তাই যদি হয়, নিছক সৌন্দর্যতন্ময়তার সংজ্ঞার্থে রবীন্দ্রপ্রতিভার সবটুকু ধারণা করা যায় না। 'উর্বশী' বা 'বিজয়িনী'র মর্মবোধ সম্ভব হলেও, 'চিত্রা', যিনি জগতের মাঝে চিরবিচিত্ররূপিণী অথচ অন্তরে একা-একাকী ও অন্তরব্যাপিনী, তাঁকে যেন দেখেও দেখা হয় না ; আর, রবীন্দ্রপ্রতিভারই অন্য এক শিখর থেকে আকারে-আকারে-নিরাকারা যে 'চঞ্চলা'র চকিত রূপ দেখি— না, দেখি আর কৈ— 'স্পন্দনে শিহরে শূন্য তব রুদ্র কায়াহীন বেগে', তারই দুরন্ত অভিঘাতে নিশীথরাত্রের নিদ্রা-তন্দ্রা ছুটে যায়— তাঁকে ঐ কীট্সীয় রূপসত্যের কৈবল্যবাদের

গণ্ডীতে ধরে রাখা একেবারেই অসম্ভব। প্রাণের কিম্বা গানের নিরন্তর কম্পন-রূপে, গতি-রূপে, তাঁর নিঃসীম ধারণা। বহিরন্তর-ব্যাপিনী অদ্বিতীয়া প্রকৃতি বলেও তাঁর উল্লেখ চলতে পারে।

কবিপ্রাণ ও প্রকৃতি তত্ত্বতঃ অবিচ্ছিন্ন হলেও, দৃশ্যতঃ গান ও কবিতার যুগ্ম-ইন্দ্রধনুতে উভয়ের মধ্যে অতিলৌকিক অপূর্ব এক সেতুর রচনা, সেই সেতুর দূরবিসর্পিত অবকাশেই নিখিল সংসারস্রোত প্রবাহিত— এটি কি কথার কথা ও কল্পনা মাত্র, অথবা সত্যই? রবীন্দ্রনাথ আত্মনিমগ্ন কবি, প্রকৃতির কবি, অথচ মানবজীবনের বিচিত্র স্তরকেও একান্ত তন্ময়তার গুণে জেনেছেন এবং কল্পনাবলে প্রতিভাবলে আশ্চর্য রূপ দিয়েছেন— অনাদ্যন্ত প্রকৃতির সুবিশাল ভূমিকায় রেখে সে রূপ দেখা যাবে, তার বিশেষ তাৎপর্যের উপলব্ধি হবে। রবীন্দ্রকবিপ্রতিভার ও কবিধর্মের সেই মনে হয় বিশিষ্টতা। এমন না হয়ে উপায় ছিল না। কবির কাছে প্রকৃতি যে চৈতন্যময়ী সত্তা— একান্তভাবে সজীব, সক্রিয়, সত্য— কথার কথা বা কল্পনা মাত্র নয়। কল্পনার বর্ণে বর্ণেও যখন যা বর্ণিত হয়েছে, তার বিশেষ মাধুরীতেই ধরা পড়ে সেই কবিকল্পনার অন্তর্লীন সত্যতা, হোক সে প্রবাসসঙ্গিনী সন্ধ্যার তারাটি, হোক-না বহুরূপিণী প্রবাহিণী পদ্মা— কখনো সাগরাভিসারিণী নাগিনী-হেন, কখনো ফেনিলমুখ দুরন্ত উচ্চৈঃশ্রবা, আব কখনো রণরঙ্গিণী কালিকাই যেন ছারখার ক'রে ছুটেছে কূল উপকূল। 'ছিন্নপত্রাবলী'র থেকে নানা অংশ সংকলন করে আমাদের সকল বক্তব্য পরিস্ফুট ক'রে তুলি এ আশা দুরাশা মাত্র। কেননা, গ্রন্থের আধখানা বা সবটাই প্রবন্ধভুক্ত করা সংগত হবে না। প্রকৃতি যে কবিচক্ষে কতখানি বাস্তব, জীবজননী বসুন্ধরা কতই সত্য, তারই ছিন্নবিচ্ছিন্ন নিদর্শন আরও কিছু উদ্‌ধৃত না করে তবু উপায় নেই।—

॰ঐখেনে যেন সন্ধ্যার বাড়ি, ঐখেনে গিয়ে সে আপনার রাঙা

আচলটি শিথিলভাবে এলিয়ে দেয়, আপনার সন্ধ্যাতারাটি যত্ন করে জ্বালিয়ে তোলে, আপন নিভৃত নির্জনতার মধ্যে সিঁদুর প'রে বধূর মতো কার প্রতীক্ষায় বসে থাকে, এবং বসে বসে পা দুটি মেলে তারার মালা গাঁথে এবং গুন্ গুন্ স্বরে স্বপ্ন রচনা করে। সমস্ত অপার মাঠের উপর একটি ছায়া পড়েছে— একটি কোমল বিষাদ— ঠিক অশ্রুজল নয়— একটি নির্নিমেষ চোখের বড়ো বড়ো পল্লবের নীচে গভীর ছল্‌ছলে ভাবের মতো ॥ ১০

০ঐ-যে মস্ত পৃথিবীটা চুপ করে পড়ে রয়েছে ওটাকে এমন ভালোবাসি— ওর এই গাছপালা নদী মাঠ কোলাহল নিস্তব্ধতা প্রভাত সন্ধ্যা সমস্তটা -সুদ্ধ দু হাতে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করে। মনে হয় পৃথিবীর কাছ থেকে আমরা যে-সব পৃথিবীর ধন পেয়েছি এমন কি কোনো স্বর্গ থেকে পেতুম? আমি এই পৃথিবীকে ভারী ভালোবাসি। এর মুখে ভারী একটি সুদূরব্যাপী বিষাদ লেগে আছে; যেন এর মনে আছে— 'আমি দেবতার মেয়ে, কিন্তু দেবতার ক্ষমতা আমার নেই। আমি ভালোবাসি, কিন্তু রক্ষা করতে পারি নে। · জন্ম দিই, মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারি নে।' এই জন্যে স্বর্গের উপর আড়ি করে আমি আমার দরিদ্র মায়ের ঘর আরো বেশি ভালোবাসি— এত অসহায়, অসমর্থ, অসম্পূর্ণ, ভালোবাসার সহস্র আশঙ্কায় সর্বদা চিন্তাকাতর ব'লেই ॥ ১৩

০একলা বসে বসে আমি যে এর ভিতরে কী অনন্ত শান্তি এবং সৌন্দর্য দেখতে পাই সে আর ব্যক্ত করতে পারি নে।··· মাথাটা জানলার উপর রেখে দিই— বাতাস প্রকৃতির স্নেহহস্তের মতো আস্তে আস্তে আমার চুলের মধ্যে আঙুল বুলিয়ে দেয়, জল ছল্ ছল্ শব্দ ক'রে ব'য়ে যায়, জ্যোৎস্না ঝিক্ ঝিক্ করতে থাকে এবং অনেক সময়

‘জলে নয়ন আপনি ভেসে যায়’। · এই অপরিতৃপ্ত জীবনের জন্যে প্রকৃতির উপর আমাদের যে আজন্মকালের অভিমান আছে, যখনি প্রকৃতি স্নেহমধুর হয়ে ওঠে তখনি সেই অভিমান অশ্রুজল হয়ে নিঃশব্দে ঝরে পড়তে থাকে। তখন প্রকৃতি আরও বেশি করে আদর করে এবং তার বুকের মধ্যে অধিকতর আবেগের সহিত মুখ লুকোই, এক প্রকার ‘বিরাগ-ভরা বিবেকে’র বিষণ্ণ শান্তি লাভ করা যায়॥ ২২

০দূরে আমবাগানে সন্ধের ছায়া পড়ে আসছে · নারকোল গাছগুলির পিছনে আকাশ সোনায় সোনালি হয়ে উঠেছে। পৃথিবী যে কী আশ্চর্য সুন্দরী এবং কী প্রশান্ত প্রাণ এবং গভীর ভাবে পরিপূর্ণ তা এইখানে না এলে মনে পড়ে না। যখন সন্ধেবেলা বোটের উপর চুপ করে বসে থাকি, জল স্তব্ধ থাকে, তীর আবছায়া হয়ে আসে, এবং আকাশের প্রান্তে সূর্যাস্তের দীপ্তি ক্রমে ক্রমে ম্লান হয়ে যায়, তখন আমার সর্বাঙ্গে এবং সমস্ত মনেব উপর নিস্তব্ধ নতনেত্র প্রকৃতির কী একটা বৃহৎ উদার বাক্যহীন স্পর্শ অনুভব করি! কী শান্তি, কী স্নেহ, কী মহত্ত্ব, কী অসীম করুণাপূর্ণ বিষাদ! এই লোকনিলয় শস্যক্ষেত্র থেকে ঐ নির্জন নক্ষত্রলোক পর্যন্ত একটা স্তম্ভিত হৃদয়রাশিতে আকাশ কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, আমি তার মধ্যে অবগাহন করে অসীম মানসলোকে একলা বসে থাকি॥ ৩১

০আমাদের এই নবযৌবনা ধবণীসুন্দরীর সঙ্গে কোন্-এক জ্যোতির্ময় দেবতার ভালোবাসা-বাসি চলছে— তাই এই আলো এবং এই বাতাস, এই অর্ধ-উদাস অর্ধ-সুখের ভাব, গাছের পাতা এবং ধানের ক্ষেতের মধ্যে এই অবিশ্রাম স্পন্দন— জলের মধ্যে এমন অগাধ পরিপূর্ণতা, স্থলের মধ্যে এমন শ্যামশ্রী, আকাশে এমন নির্মল নীলিমা। স্বর্গে মর্তে একটা বৃহৎ গভীর অসীম প্রেমাভিনয়। · চার

দিক থেকে আকাশ আলো বাতাস এবং গান এক রকম মিলিতভাবে এসে আমাকে অত্যন্ত লঘু করে আপনাদের সঙ্গে যেন মিশিয়ে ফেলছে— আমার সমস্ত মনটাকে কে যেন তূলিতে করে তুলে নিয়ে এই রঙিন শরৎপ্রকৃতির উপব আর-এক পোঁচ রঙের মতো মাখিয়ে দিচ্ছে, তাতে ক'রে এই-সমস্ত নীল সবুজ এবং সোনার উপরে আর-একটা যেন নেশার রঙ লেগে গেছে ॥ ৬৯

০এই পৃথিবীটি আমার অনেক দিনকার এবং অনেক জন্মকার ভালোবাসার লোকের মতো আমার কাছে চিরকাল নতুন আমি বেশ মনে করতে পারি বহুযুগ পূর্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করছেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম। তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সমস্ত সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্যালোক পান করেছিলুম, নবশিশুর মতো একটা অন্ধজীবনের পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলুম, এই আমার মাটির মাতাকে আমার সমস্ত শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্যরস পান করেছিলুম। তার পরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীব মাটিতে আমি জন্মেছি। আমরা দুজনে একলা মুখোমুখি করে বসলেই আমাদের সেই বহুকালের পরিচয় যেন অল্পে অল্পে মনে পড়ে ॥ ৭৪

০সন্ধেবেলাটি আমার মাথার উপর, আমার চোখের সামনে, আমার পায়ের তলায়, আমার চতুর্দিকে এমন সুন্দর, এমন শান্তিময়, এমন নির্জন নিস্তব্ধ, অথচ এমন পরিপূর্ণ হয়ে উদয় হয়, মানুষের মতো এমন নিবিড়ভাবে আমার নিকটবর্তী হয়ে আসে যে, আকাশের নক্ষত্রলোক থেকে আব পদ্মার সুদূব ছায়াময় তীররেখা পর্যন্ত সমস্ত

বৃহৎ দৃশ্যটি আমার চতুর্দিকে একটি নিভৃত আরামের গোপন গৃহের মতো ছোটো হয়ে ঘিরে দাঁড়ায়— আমার মধ্যে যে-দুটি প্রাণী আছে, আমি এবং আমাব সেই অন্তঃপুরবাসী আত্মা, এই দুটিতে মিলে সমস্ত ঘরটি দখল করে বসে থাকি— এই দৃশ্যের মধ্যগত সমস্ত পশু পক্ষী প্রাণী আমাদের দুজনের অন্তর্গত হয়ে যায়— কানে জলের কলশব্দ আসতে থাকে, মুখের উপর মাথার উপর জ্যোৎস্নার শুভ্রহস্ত আদরের স্পর্শ করতে থাকে, আকাশে চকোর পাখি ডেকে চলে যায়, জেলের নৌকো পদ্মার মাঝখানে খরস্রোতের উপর দিয়ে বিনা চেষ্টায় অনায়াসে পিছ্‌লে বহে যেতে থাকে, আকাশব্যাপী স্নিগ্ধরাত্রি আমার রোমে রোমে প্রবেশ করে ধীরে ধীরে শরীরের উত্তাপ জুড়িয়ে দেয়— চোখ বুজে, কান পেতে, দেহ প্রসারিত করে প্রকৃতির একমাত্র যত্নেব জিনিষের মতো পড়ে থাকি : তার সহস্র সহচরী আমার সেবা করে॥ ১৪৫

রবীন্দ্রসাহিত্যের মনোযোগী কোনো পাঠকের কাছেই এই উদ্‌ধৃতিগুলি বড়ো বেশি নূতন মনে হবে না। কেননা, 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা'র অনেকগুলি কবিতায় এ-সবই কাব্যরূপ রসরূপ পেয়েছে— আর, নিখিল রবীন্দ্রসাহিত্যের কোথায় বা এই লৌকিকে-অলৌকিকে-মেশা অনুরাগের বিচিত্র রাগিণী নানা ছন্দে ধ্বনিত হয় নি বা অনুরণন জাগিয়ে তোলে নি ?—

আনমনে বসিয়া একাকী
পদ্মাতীরে, সম্মুখে মেলিয়া মুগ্ধ আঁখি
সর্ব অঙ্গে সর্ব মনে অনুভব করি
তোমার মৃত্তিকামাঝে কেমনে শিহরি
উঠিতেছে তৃণাঙ্কুর, তোমার অন্তরে
কী জীবনরসধারা অহর্নিশি ধরে
করিতেছে সঞ্চরণ, কুসুমমুকুল

কী অন্ধ আনন্দভরে ফুটিয়া আকুল
সুন্দর বৃন্তের মুখে, নব রৌদ্রালোকে
তরুলতাতৃণগুল্ম কী গূঢ় পুলকে
কী মূঢ় প্রমোদরসে উঠে হরষিয়া
··· শরৎকিরণ
পড়ে যবে পক্কশীর্ষ স্বর্ণক্ষেত্র-'পরে,
নারিকেলদলগুলি কাঁপে বায়ুভরে
আলোকে ঝিকিয়া ··
মনে পড়ে বুঝি সেই দিবসের কথা
মন যবে ছিল মোর সর্বব্যাপী হয়ে
জলে স্থলে, অরণ্যের পল্লবনিলয়ে,
আকাশের নীলিমায়।

এ তো পূর্বসংকলিত অন্যতম পত্রের ছন্দ-অনুবাদ বৈ নয়। অর্থাৎ, আসলে এ-সব কিছুই কবিকল্পনার কথা নয়, কবিসত্তার নিবিড়গভীর অনুভূতির বাঙ্ময় প্রকাশ মাত্র। ছিন্নপত্রে ৯ ডিসেম্বর ১৮৯২ তারিখের ঐ চিঠিখানি সংকলন-কালে নেপথ্য-সম্পাদক সুহৃৎ রামেন্দ্রসুন্দর কা জানি হয়তো মৃদু আপত্তি জানিয়ে থাকবেন, তারই খণ্ডনে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টবাক্যে না লিখে পারেন নি—

এ আমার প্রাণের কথা। আমার প্রাণের মধ্যে গাছের প্রাণের গূঢ় স্মৃতি আছে, আজ মানুষ হইয়াছি বলিয়াই এ কথা কবুল করিতে পারিতেছি। শুধু গাছ কেন, সমস্ত জড়জগতের স্মৃতি আমার মধ্যে নিহিত আছে। বিশ্বের সমস্ত স্পন্দন আমার সর্বাঙ্গে আত্মীয়তার পুলক সঞ্চার করিতেছে— আমার প্রাণের মধ্যে তরুলতার বহুযুগের মূক আনন্দ আজ ভাষা পাইয়াছে— নহিলে আজ গাছে গাছে যখন আমের মুকুলের উচ্ছ্বাস একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে তখন আমি কোন্ নিমন্ত্রণে বসন্ত-উৎসবের আয়োজন করিতে যাই! ·· আমি

আমার বোটের খোলা জানলায় বসিয়া এই পুরাতন পৃথিবীটার গৈরিক রঙের মাটির উপরে যখন সূর্যের আলো পড়িতে দেখিয়াছি তখন আমার সমস্ত দেহটা যেন বিস্তীর্ণ হইয়া ঐ ধুলা এবং ঘাসের মধ্যে দিক্‌প্রান্ত পর্যন্ত অবাধে আতত হইয়া গিয়াছে। আমি সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র এবং মাটি পাথর জল সমস্তের সঙ্গে একসঙ্গে আছি এই কথাটা এক-এক শুভ মুহূর্তে যখন আমার মনের মধ্যে স্পষ্ট সুরে বাজে তখন একটা বিপুল অস্তিত্বের নিবিড় হর্ষে আমার দেহ মন পুলকিত হইয়া উঠে। ইহা আমার কবিত্ব নহে, ইহা আমার স্বভাব। এই স্বভাব হইতেই আমি কবিতা লিখিয়াছি, গান লিখিয়াছি, গল্প লিখিয়াছি আমি মানুষ, এই জন্যই আমি ধুলা মাটি জল গাছপালা পশুপক্ষী সমস্তই আমার সত্তায় জড় ও জীবের সমস্ত সত্তা সম্পূর্ণ হইয়াছে। এইজন্যই আমার রক্তরঙ্গ সমুদ্রতরঙ্গের তালটাকে চিনিতে পারিয়া নৃত্য করে, কিন্তু সমুদ্রতরঙ্গ আমাকে চেনে না— এই জন্য আমার প্রাণের সুখ গাছপালার প্রাণের সুখের সঙ্গে যুক্ত হইয়া এমন প্রফুল্ল হইয়া ওঠে, কিন্তু গাছপালা আমাকে চেনে না।[১১]

চেতনসত্তার এই-যে সর্বব্যাপী প্রসার এ থেকে গান কবিতা গল্প সবই লেখা হয়েছে এ কথা কবি সহজ মনেই কবুল করেছেন, আর রবীন্দ্রসাহিত্যরসিক কে না জানেন— এ কোনো অত্যুক্তি নয়। একটি বিশেষ কথাও এখানে বলা হয়েছে— জড় জীব বোবা গাছ-পালা সকলকেই কবি অতিশয় অন্তরঙ্গ, হয়তো বা অন্তর্যামী -রূপেই জানেন, তারা কিন্তু কবিকে জানে না। তাদের চেতনা বা বোধ-শক্তির পূর্ণ বিকাশ হয় নি, তাই নিজের নিজের সীমান্তেই আবদ্ধ, আব দুর্লভক্ষণে সেই চেতনারই উপ্‌চে-পড়া পরিপূর্ণতায় রবীন্দ্রনাথ সর্বভূতে প্রবেশ ক'রে সব হতে পেরেছেন। মনে পড়ে কোনো জাপানি কবির মনের আশা— তিনি চেরী-চন্দ্রমল্লিকা-বনের প্রজাপতিটি হতে চান। এ বড়ো আশ্চর্য কামনা। মানুষ কি ক্ষুদ্র পতঙ্গের থেকে

কোনো দিক দিয়ে কম? না, তা নয়। কবির কামনা বা কল্পনা যদি সত্য হয়ে ওঠে তবে তিনি মানুষই রইবেন অথচ তাঁর চিত্রপতঙ্গম হয়ে ওঠারও বাধা থাকবে না, আর চন্দ্রমল্লিকা বা চামেলী ফুলে ফুটে না ওঠার কারণ বা কী? সীমাবদ্ধ অহংবদ্ধ ব্যক্তিত্ব অতিক্রম ক'রে অন্য-কেউ বা অন্য-কিছু হয়ে ওঠবার এই ক্ষমতা সকল কবি ও শিল্পীর পূর্ণমাত্রায় থাকে না। যার থাকে তাকেই আমরা ষোলো-আনা কবি বা মহাকবি বলতে পারি। সর্বত্র প্রবেশের এই ক্ষমতা নিয়েই শেক্স্পীয়র গিয়েছিলেন দেশকালব্যাপ্ত সুবিশাল মানবলোকে; আর-কোনো কবি আর-কোনো দিকে। আর, রবীন্দ্রনাথ মুখোমুখি বসেছিলেন সুবিশাল প্রকৃতির; তারই অঙ্গীভূত অনন্ত প্রাণলোক, জীবলোক— চিৎলোকের আভায় ও আভাসে সবই অপূর্বলাবণ্যময়, মনোহারী। ফলে কবিচিত্তবৃত্তির এমন-কিছু রূপান্তর হয়েছিল যাতে পদে পদে পথে পথে ধুলামুঠিও 'সোনামুঠি' হয়ে উঠেছিল, তাই বলতে পেরেছেন—

আছে আছে প্রেম ধুলায় ধুলায়,
আনন্দ আছে নিখিলে।

সন্তানবাৎসল্য অতীব ব্যক্তিগত অনুভূতি, রবীন্দ্রনাথেও প্রচুর পরিমাণেই ছিল— 'ছিন্নপত্রাবলী'র থেকে তারই কিছু কিছু সাক্ষ্য ইতিপূর্বে আমরা 'শিশু' প্রবন্ধে সংকলন করেছি— সেই বাৎসল্যের মধ্যে বাৎসল্যের বেশি কিছু ছিল না বলা চলে কি?—

'একটা জগৎব্যাপ্ত শক্তি আমার ভিতর দিয়ে কাজ করছে।'[২]

··সেই শক্তির হাতে মুগ্ধভাবে আত্মসমর্পণ করাই আমার জীবনের প্রধান আনন্দ। সে আমাকে কেবল যে প্রকাশ করায় তা নয়, অনুভব করায়, ভালোবাসায়। সেই জন্যে আমার অনুভূত আমার নিজের কাছেই প্রত্যেকবার নূতন এবং বিস্ময়জনক। প্রকৃতির মধ্যে

এসে আমার নিজের মনে যে ভাবোদয় হয় সেটা মনে হয় যেন আমার স্বভাবের, আমার শক্তির অতিরিক্ত একটা ব্যাপার।··· আমার সব অনুভূতির মধ্যে ওই রকম আমার অতিরিক্ত একটা উপাদান আছে। ['ক্ষুদ্রতম'] মীরাটাকে যখন আমার ভালো লাগে তখন তার মধ্যে আমি এমন একটা অসীম রহস্য অনুভব করি যে, সে কেবল আমার কন্যা মীরা থাকে না— সে বিশ্বের সমস্ত মূলরহস্য মূলসৌন্দর্যের অঙ্গ হয়ে পড়ে, আমার স্নেহ-উচ্ছ্বাস একটা উপাসনার মতো হয়ে আসে। আমার বিশ্বাস আমাদের সব স্নেহ ভালোবাসাই রহস্যময়ের পূজা— কেবল সেটা আমরা অচেতনভাবে কবি। ভালোবাসা মাত্রই আমাদের ভিতর দিয়ে বিশ্বজগতেব অন্তরস্থিত শক্তির সজাগ আবির্ভাব— যে নিত্য-আনন্দ নিখিল জগতের মূলে সেই আনন্দের ক্ষণিক উপলব্ধি॥ ১৪৪

বিষয়ানুষঙ্গে মনে পড়ল পত্রান্তবে রবীন্দ্রনাথ কৌতুক করে বলেছেন—

০বাহ্যপ্রকৃতির একটা মস্ত গুণ এই, সে অগ্রসর হয়ে মনেব সঙ্গে কোনো বিবোধ করে না ; তাব নিজেব মন ব'লে কোনো বালাই না থাকাতে আমার মনটিকে তাব সমস্ত স্থান ছেড়ে দিতে বাজী আছে— সঙ্গীর মতো নিয়ত সঙ্গ দান কবে, অনন্ত স্থান অধিকার করে থাকে, অথচ আমাব এক তিল জায়গা জোড়ে না— নির্বোধের মতো বকে না, সুবুদ্ধির মতো তর্ক করে না, আমার মীরাব মতো আকাশের কোলে শুয়ে থাকে, যখন শান্তভাবে থাকে সেও মিষ্টি লাগে, যখন গর্জন ক'রে হাত পা ছুঁড়তে থাকে সেও মিষ্টি লাগে— বিশেষত যখন তার স্নান পান বেশপরিবর্তনের আশ্চর্য সুবন্দোবস্ত আছে, আমার উপরে তার কোনো ভার নেই, তখন সেই ভাষাহীন মনোহীন প্রকাণ্ড পরিপুষ্ট শিশুটি আমার নির্জনের পক্ষে বেশ। ভাষাপরিপূর্ণ বুদ্ধিমান বয়ঃপ্রাপ্ত মনুষ্য লোকালয়েই অত্যন্ত উপাদেয়॥ ১২৫

বাহ্যপ্রকৃতি মনোহীন এটা সত্য, তাই ব'লে অচেতন প্রাণহীন বা প্রেরণাহীন ব'লে রবীন্দ্রনাথ বোধ করেন নি বা বিশ্বাস করেন নি কোনোকালে সে বোধ হয় বলাই বাহুল্য। বিষয়লুব্ধ বহির্মুখ বিতর্ক-ক্লিষ্ট মানুষের অপরিণত মন পদে পদে জীবনের ছন্দোভঙ্গ করে, সামঞ্জস্য নষ্ট করে, সব-কিছু মুঠোয় ধরতে গিয়ে বহু বিড়ম্বনার সৃষ্টি করে— এজন্য বাস্তব জীবনে 'মন'কে বাদ দিয়ে চলবার উপায় নেই যদিও, তবু তার বিরুদ্ধে ঋষি মনীষী ভাবুক জনের কিছু নালিশ চিরকালই আছে আর রবীন্দ্রনাথেরও ছিল। এ বিষয়ে সাধ্যমত অন্যত্র আলোচনা করা হয় নি যে তা নয়, তবু এখানেও পুনরালোচনার অবকাশ আছে। 'ছিন্নপত্রাবলী'র একখানি চিঠিতে শেলির প্রসঙ্গ তুলে কবি লিখছেন—

৹শেলিকে অন্যান্য অনেক বড়োলোকের চেয়ে বিশেষরূপে কেন ভালো লাগে জানিস? ওর চরিত্রে কোনো রকম দ্বিধা ছিল না, ও কখনো আপনাকে কিম্বা আর-কাউকে বিশ্লেষণ করে দেখে নি— ওর এক রকম অখণ্ড প্রকৃতি। শিশুদের, এবং অনেক স্থলে মেয়েদের, এই জন্যে বিশেষরূপে ভালো লাগে— তারা সহজ স্বাভাবিক, তারা নিজের মনের বিতর্ক কিম্বা থিয়োরি -দ্বারা নিজেকে ভেঙেচুরে গড়ে নি। শেলির স্বভাবের যে সৌন্দর্য তার মধ্যে তর্ক বিতর্ক আলোচনার লেশ নেই। সে যা হয়েছে, সে কেবল নিজের ভিতরকার এক অনিবার্য সৃজনশক্তির প্রভাবেই হয়েছে। সে নিজের জন্যে নিজে কিছুমাত্র দায়ী নয়— সে জানেও না সে কাকে কখন্ আঘাত দিচ্ছে, কাকে কখন্ সুখী করছে— তাকেও কোনো বিষয়ে নিশ্চয়রূপে কারও জানবার যো নেই। কেবল এইটুকু স্থির যে, ও যা ও তাই, তা ছাড়া ওর আর-কিছু হবার যো ছিল না। ও বাইরের প্রকৃতির মতো স্বভাবতই উদার এবং সুন্দর এবং স্বভাবতই নিজের এবং পরের সম্বন্ধে চিন্তা ও দ্বিধা -মাত্র-হীন। এই রকম অখণ্ডপ্রকৃতির

লোকের ভারী একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে।··· কোনো দোষ এদের স্বভাবে যেন স্থায়ীভাবে লিপ্ত হতে পারে না। এদের স্বভাব প্রথম যুগের আদম ইভের মতো আবরণহীন এবং সেই জন্যেই এক হিসাবে পরম রহস্যময়। এরা এখনো জ্ঞানবৃক্ষের ফল খায় নি ব'লে একটি নিত্য সত্যযুগে বাস করছে।·· মন-নামক পদার্থটি শ্রদ্ধার যোগ্য, কিন্তু ভালোবাসার পাত্র নয়— আসল খাঁটি বড়োলোকেরা মনোবিহীন, তারা স্বতঃস্ফূর্তিবিশিষ্ট, তারা বিনা চেষ্টায় বিনা যুক্তিতে অনিবার্যবলে লোককে আকর্ষণ করে নেয়॥ ২০৪

'অখণ্ডপ্রকৃতি' কথাটি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য এবং মন্তব্য ব'লে মনে করি। 'খাঁটি বড়োলোকেরা মনোবিহীন' কথাটায় একটু অত্যুক্তি আছে বৈকি। আমরা অনেকে মিলে ওই দুর্লভ পদবীর লোভে ওই গুণের বা নির্গুণের সাধন বা অসাধন শুরু করলে সমাজ ও সভ্যতার সংকট বাড়বে বৈ কমবে না সেও নিশ্চিত। তবু, ইচ্ছা করলে, রবীন্দ্রনাথের আসল বক্তব্যটি বুঝে নিতে কোনো অসুবিধা নেই। প্রাকৃতিক যা কিছু কার্য ও ঘটনা অনিবার্য বেগে চলে আশ্চর্য ছন্দে। প্রকৃতিকে যন্ত্র যদি বলি সে যন্ত্রে নিত্য নিয়মিত দম দেয় কে জানা নেই, কে বা চালনা করে! অতএব নিজেকেই নিজে চালনা করে, তার নিজের ভিতরেই সর্বব্যাপী একটি নিয়ন্তৃত্ব আছে যা 'বহুধা শক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থোদধাতি', যা মানুষের মনঃকল্পিত পাপপুণ্য ভালোমন্দের সকল বিধিবিধানের ঊর্ধ্বে, যা একলক্ষ এবং অস্খলিতগতি, যা প্রতিনিয়তই জড়ের ভিতর থেকে চেতনা আর মৃত্যু মথন ক'রে জীবন জাগিয়ে তুলছে —এমনটা মনে করাই সংগত। স্বনিয়ন্ত্রিত স্বচ্ছন্দ শক্তিকে ইংরেজিতে এলিমেণ্টাল বলা কিছু আশ্চর্য নয়— অনুরূপ শক্তির ক্রিয়া, স্বভাবের অনুরূপ প্রবর্তনা মানুষের মধ্যেও বড়ো আকারে যখন দেখা দেয়, সে মহম্মদ বা বুদ্ধ হোক, চেঙ্গিস বা নেপোলিয়ন, হেলেন দ্রৌপদী বা জোয়ান অব আর্ক্, তাকেও

ওই একই বিশেষণে বিশেষিত না ক'রে উপায় কী? যুগে যুগে সব রকম ভাবের পাগল, প্রেমের পাগল, রূপস্রষ্টা কবি শিল্পী সুরকার, কম-বেশি ওই এক স্বভাব নিয়েই পৃথিবীতে এসেছে — ওই স্বভাব ও স্বধর্মের অনুবর্তন যতটা করেছে, করতে পেরেছে, সেই অনুপাতেই তাদের সাধনার সিদ্ধি বা সার্থকতা। সুনীতি দুর্নীতির বিচার যেমন অনাহূত এবং অহেতুক, সুখদুঃখের হিসাবও এ ক্ষেত্রে তেমনি অবান্তর। অনিবার্য প্রগতি ও ছন্দ, সর্বব্যাপী এক সামাঞ্জস্য, স্ব-ভাব, স্বাতন্ত্র্য, নিখিল অস্তিত্বের হেতুভূত আনন্দ বা প্রাণশক্তি —এইমাত্র কাম্য এবং অভিনন্দনীয়। ছোটো বড়ো যে যেমন হোক, এই-সব খাঁটি মানুষেরা মনোহীন এমন নয়; কিন্তু অন্যে না জানুক, নিজে নিজে তারা জানে মনই তাদের জীবনের নিয়ন্তৃশক্তি নয়, কোনোরূপ মননই তাদের উপায় বা উদ্দেশ্য নয়। সংসারে এমন খাঁটি মানুষের সংখ্যা কম, সঙ্গ দুর্লভ বলা যেতে পারে, আর কেউ যদি আমাদের সামনে এসে পড়ে তার আকর্ষণও অতিপ্রবল। শিশু বা নারীর প্রতি স্নেহে ও প্রণয়ে প্রাণের প্রতি প্রাণের এই আকর্ষণই লক্ষ্য করেছেন কবি, সে তো অকারণে নয়। প্রকৃতির বিধানে, এ সংসারে তাদের চরিত্রেই সহজ স্বাভাবিকতার একটি 'মাত্রা' অবশ্যই মিলিত মিশ্রিত থাকে। গ্রামে বা মফস্বলে থেকে রবীন্দ্রনাথ সুস্থ স্বচ্ছন্দ বোধ করেছেন, নিজের ভাবের ভুবনে নিজের ধ্যানধারণায় ও রূপকল্পনায় সম্পূর্ণ নিমগ্ন হতে পেরেছেন, তারও বিশেষ কারণ এই যে, এক দিকে যেমন প্রকৃতিকে পেয়েছেন অতি অন্তরঙ্গ ভাবে— উষার আলো তাঁকে কোলে তুলে নিয়েছে, সন্ধ্যাকাশ দিগন্তে স্নিগ্ধদ্যুতি একটি দেউটি জ্বেলে নিয়ে প্রতিদিন তাঁর বোটে ফেরার প্রতীক্ষা করেছে, রাত্রি তার নক্ষত্রখচিত কেশপাশ ছড়িয়ে দিয়ে তাঁর বুকে মুখ রেখে সুগভীর স্তব্ধ ভালোবাসায় স্থির হয়ে থেকেছে, পদ্মাচরের জ্যোৎস্নায় মনে হয়েছে নিজেকে তেপান্তরের পথিক কোন্ রাজপুৎতুর ব'লে, মাটিকে মা এবং

পদ্মা-ইছামতীকে মনে হয়েছে সখী বা সঙ্গিনী— ঠিক তেমনি তো এখানকার পল্লীতে পল্লীতে জনসাধারণের অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা, তারও দুঃখসুখ-আশাশঙ্কা-বিচিত্র স্বাভাবিক ছন্দ তাঁর বড়ো ভালো লেগেছে, স্বভাবশিশু বুড়ো বুড়ো প্রজাদের ভক্তি ভালোবাসা তাঁর প্রাণস্পর্শ করেছে। নদীর ঘাটে ক্বচিৎ জনপদবধূর অর্ধাবগুণ্ঠিত কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাঁর গল্পরচনার, এমন-কি কাব্যসাধনার ব্যাঘাত হয় নি এবং লন্‌ডন-পারীর জ্ঞানবিজ্ঞান সুখৈশ্বর্যের সঙ্গে তুলনা ক'রে সেই সভ্যতার উদ্দেশে না ব'লে পারেন নি, 'তোমার শতবিধ বাদ্যযন্ত্রের কোলাহল আজও সুরে বাঁধা হয় নি; গোপীযন্ত্রে একক তারের ঝঙ্কারেই আমার মনোহরণ করেছে আকাশ-আলো— প্রভাতে সন্ধ্যায় সমতানে বেজে উঠেছে অখণ্ড মানবহৃদয়।'

ছিন্নপত্রাবলীর পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে ভুলে যাই— রবীন্দ্রনাথ এ সময় ঠাকুর-পরিবারের বিপুল জমিদারির পরিচালনা করছেন আশ্চর্য দক্ষতায়। কিম্বা, বিশেষ কারণে লাভ লোকশান যাই হয়ে থাক্ পরিণামে, পাটের ব্যাবসাতেও লিপ্ত হয়েছেন। বরং মনে হয় দিনের অষ্টপ্রহর তাঁর অখণ্ড অবসর; আত্রাই থেকে ইছামতী, ইছামতী থেকে পদ্মায়, কোনো কারণে নয়, অকারণেই তিনি যেন তার 'সাধের তরণী' তরঙ্গে সঁপে দিয়ে পাড়ি জমিয়েছেন, অথবা স্থির বোটের জানলা থেকে দেখছেন—

০গ্রাম নেই, বসতি নেই, চষামাঠ ধূ ধূ করছে, নদীর ধারে ধারে খানিকটা করে শুকনো ঘাসের মতো আছে, সেই ঘাসগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে গোটাকতক মোষ চরে বেড়াচ্ছে। আর, আমাদের দুটো হাতি আছে তারাও এ পারে চরতে আসে। তাদের দেখতে বেশ মজা লাগে॥ ১১৩

হয়তো পথ চলতে দেখলেন—

০রাস্তার ধারে একটা ছাগ-মাতা গম্ভীর অলস স্নিগ্ধ ভাবে

ঘাসের উপরে বসে ছিল এবং তার ছানাটা তার গায়ের উপরে ঘেঁষে পরম নির্ভরে গভীর আরামে প'ড়ে ছিল— সেটা দেখে আমার মনে যে-একটা সুগভীর রসপরিপূর্ণ প্রীতি এবং বিস্ময়ের সঞ্চার হল আমি সেইটেকেই আমার ধর্মালোচনা বলি। এই-সমস্ত ছবিতে চোখ পড়বা মাত্রই সমস্ত জগতের ভিতরকার আনন্দ এবং প্রেমকে আমি অত্যন্ত প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎভাবে আমার অন্তরে অনুভব করি ॥ ১৮৭

এই সহজ স্নেহের চোখে দেখা ব'লেই ভোলা যায় না আর-এক জায়গার আর-এক দিনের একটি ছবি—

০আমার ঘরের ভিতরে সমস্ত দুপুর বেলাটা কেবল কাঠ-বিড়ালির ছুটোছুটি চলে।·· ফুলো ন্যাজ, কালো এবং ধূসর রেখায় অঙ্কিত রোমশ নরম গা, ছোট্ট দুটি কালো ফোঁটার মতো দুটি চঞ্চল চোখ, নিতান্ত নিরীহ অথচ অত্যন্ত ব্যস্ত ভাব— দেখে মনের মধ্যে ভারী একটা স্নেহের উদয় হয়। এই ঘরের কোণে লোহার-জাল-দেওয়া আল্‌মারির মধ্যে ডাল চাল পাঁউরুটি রাখা হয়— কৌতূহল-পূর্ণ নাসিকাটি নিয়ে তারা সমস্ত দিন এই আল্‌মারিটার চতুর্দিকে ছিদ্র অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে। যে-সব ডাল এবং চালের কণা আল্‌মারির বাইরে ছড়ানো থাকে সেইগুলি সন্ধান ক'রে বের ক'রে সামনের গুটিচারেক ছোটো তীক্ষ্ণ দন্ত দিয়ে কুট্ কুট্ করে পরম তৃপ্তি-সহকারে আহার করা হয়— মাঝে মাঝে লাঙুলের উপর ভর দিয়ে সোজা হয়ে বসে সামনের দুটি ক্ষুদ্র হাত যোড় ক'রে সেই ক্ষুদ্র শস্যকণা-গুলিকে মুখের মধ্যে গুছিয়ে-গাছিয়ে জুত করে নেওয়া হয়— এমন সময় আমি একটু নড়েছি কি অমনি চকিতের মধ্যে ন্যাজটি পিঠের উপর তুলে দিয়ে দে-দৌড়— যেতে যেতে হঠাৎ একবার অর্ধপথে পাপোষটার উপর থেমে একটা পা তুলে ফস্ করে একটা কান চুলকে নিয়ে আবার এসে উপস্থিত— এমনি সমস্ত বেলাই কুট্‌কাট্ দুড়্ দুড়্ এবং প্লেট কাঁটা চামচের মধ্যে টুংটাং ঝুন্ ঝুন্ চলছেই ॥ ১৭৪

কিন্তু, কবি শুধু-যে ভাবে-ভোলা মন আর ছবি-দেখা দৃষ্টি নিয়ে এক-প্রকার অখণ্ড অবকাশে জীবন কাটিয়েছেন বস্তুতঃ তা নয়, কাজ করেছেন, অনেক চিন্তা ক'রে অনেক দায়িত্ব নিয়ে বহু নূতন কাজেরও সূত্রপাত করেছেন। গ্রামের মানুষের দুঃখে সুখে তাদের সহায় ও সুহৃৎ ছিলেন, বর্ষাপ্লাবিত পল্লীঅঞ্চলের দুঃখদৈন্য অস্বাস্থ্য দেখে তাঁর দরদী হৃদয় ব্যথাতুর ক্লিষ্ট হয়ে উঠেছে। সে-সব বিবরণ সংকলন করে দীর্ঘ প্রবন্ধটি দীর্ঘতর করতে চাই নে। তবু, তাঁর প্রেমানুরক্ত ভক্ত প্রজাদের প্রসঙ্গ একেবারে এড়িয়ে গেলেও বিশেষ অপরাধ হবে। কবির মুখ থেকেই তাদের পবিচয় নেওয়া সংগত।—

০এইমাত্র কালীগ্রাম থেকে একটি বুড়ো প্রজা তার ছেলেকে সঙ্গে করে আমার কাছে এসেছিল— সে যেন তাব সমস্ত সরল আর্দ্র হৃদয়খানি দিয়ে আমাব পা-দুটো মুছিয়ে দিয়ে গেল। ভাগবতে কৃষ্ণ বলেছেন 'আমার চেয়ে আমাব ভক্ত বড়ো', সে কথার মানে খানিকটা বোঝা যায়। বাস্তবিক এর সুন্দর সরলতা এবং আন্তরিক ভক্তিতে এ লোকটি আমার চেয়ে কত বড়ো! আমিই যেন এ ভক্তিব অযোগ্য, কিন্তু এ ভক্তিটি তো বড় সামান্য জিনিষ নয়। এদের চাষাব ভাষা, এদেব স্নেহের সম্বোধন এমন মিষ্টি লাগে! ছোটো ছেলেদের উপর যে রকম ভালোবাসা এই বৃদ্ধ ছেলেদের উপর অনেকটা সেই রকম এরা তাদের চেয়েও ছোটো! কেননা, তারা বড়ো হবে, এরা আর কোনো কালেও বড়ো হবে না— এদের এই জীর্ণ শীর্ণ কুঞ্চিত বলিত বৃদ্ধ দেহখানির মধ্যে কী-একটি শুভ্র সরল কোমল মন রয়েছে! শিশুদের মনে কেবল সরলতা আছে মাত্র, কিন্তু এমন স্থিরবিশ্বাসপূর্ণ একাগ্র নিষ্ঠা নেই। আমি কি এই বৃদ্ধটির রাজা হবার যোগ্য! ৯৬

০এরা যেন আমার একটি দেশজোড়া বৃহৎ পরিবারের লোক।…

এদের ভাষা শুনতে এমন মিষ্টি লাগে— তার ভিতর এমন স্নেহমিশ্রিত করুণা আছে! এরা যখন কোনো-একটা অবিচারের কথা বলে আমার চোখ ঝাপ্‌সা হয়ে আসে, অন্য নানা ছলে আমাকে সামলে নিতে হয়। সরলতাই মানুষের স্বাস্থ্যের একমাত্র উপায়— সে যেন গঙ্গার মতো, তার মধ্যে স্নান ক'রে সংসারের অনেক তাপ দূর হয়ে যায়॥ ১১১

'খুব ভোরে বিছানায় শুয়ে' শিলাইদ'র ঘাটে মেয়েদের উলুধ্বনিতে মনে পড়ে— 'কী বৃহৎ পৃথিবী! কী বিপুল মানবসংসার!' সেই বিপুল সংসারের যে অংশটা 'গাছপালা শস্য গোরুবাছুর এবং একতলা মেটে ঘরের সঙ্গে সংলগ্ন এবং ধান কাটা, নৌকোর খেয়া দেওয়া, জল তোলা, কাপড় কাচার সঙ্গে জড়িত— সেইটে নিকট থেকে দেখলে বেশ একটি মাধুর্য অনুভব করা যায়।' কেননা 'আমাদের সুখ বড়ো জটিল এবং দুর্লভ এবং বহুল পরিমাণে কৃত্রিম হয়ে পড়েছে।'

এখানে অকৃত্রিম গাঁয়ের মানুষেরা তাদের তরুণ রাজাবাবুকে এসে ঘিরে ফেলে জমিদারি-পুণ্যাহের দিনে—

◦ঘর বারান্দা সমস্ত পূর্ণ হয়ে গেল। আমার একটি বুড়ো ভক্ত আছে তার নাম রূপচাঁদ মেধা— সে একটি ডাকাত-বিশেষ, লম্বা জোয়ান সত্যবাদী অত্যাচারী রাজভক্ত প্রজা। আমাকে যেন সে পরমাত্মীয়ের মতো ভালোবাসে— সে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে বললে, 'তোমার চাঁদমুখ দেখতে এসেছি।' চাঁদ-মুখ এ কথায় বোধ করি কিঞ্চিৎ রক্তিমবর্ণ হবার উপক্রম করলে। রূপচাঁদ বললে, 'কতদিন পরে দেখা— এক বৎসর তোমায় দেখি নি!' মেয়েদের ভালোবাসা অবশ্য খুব মধুর লাগতে পারে, কিন্তু এই রকম সরল সবল পুরুষমানুষের অকৃত্রিম অটল নিষ্ঠা এরও একটি অপূর্ব সৌন্দর্য আছে— এর মধ্যে মানবপ্রকৃতির একেবারে অমিশ্রিত আদিম সহৃদয়তাটুকু প্রকাশ পায়— এর সঙ্গে সঙ্গে যে-একটা বল এবং

কাঠিন্য আছে, যে-একটা ঋজুতা এবং directness প্রকাশ পায়, সেইটের জন্যেই এই সরস সুন্দর অনুরক্তি আরও এমন বহুমূল্য বোধ হয়। শিশুর মতো সরল এবং মনের-ভাব-প্রকাশে-অক্ষম সব দাড়িওয়ালা পুরুষমানুষ একে একে এসে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে চুমো খেতে লাগল— কখনো কখনো এরা কেউ কেউ একেবারে পায়ে চুমো খায়।·· আমি যদি আমার প্রজাদের একমাত্র জমিদার হতুম তা হলে আমি এদের বড়ো সুখে রাখতুম— এবং এদের ভালোবাসায় আমিও সুখে থাকতুম॥ ২১৯

প্রসঙ্গক্রমে এই কালের আর-একজনকে আমরা স্মরণ করতে চাই যাঁর দীপ্তিময় চাবিত্ররূপ ববীন্দ্রনাথেব অন্যতম ছোটো গল্পে অঙ্কিত আছে আব 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারিতে'ও যিনি একাধিকবার উল্লিখিত। ইনি হলেন এই পদ্মাপাবের এক 'বোষ্টমী'। রবীন্দ্রনাথ এঁব এমন কিছু পবিচয় পেয়েছিলেন যে, এঁর কাছে রবীন্দ্রনাথের স্বভাবসিদ্ধ দূরত্ব দূর হয়ে গিয়েছিল আর দরোজাও সর্বদাই অবারিত ছিল, সময় অসময়েব প্রশ্নই ছিল না, এ আমরা শুনেছি আচার্য নন্দলালের মুখে। ১৩৩৭ চৈত্রে শ্রীমতী হেমন্তবালাকে কবি লিখেছেন—

'শিলাইদহেব বোষ্টমী আমার হাতে আম দিয়ে বললে, তাঁকে [ঠাকুরকে] দিলুম।'

'যাত্রী' বা 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি' গ্রন্থে—

'একদিন আমার মালী ফুলদানি থেকে বাসিফুল ফেলে দেবার জন্যে যখন হাত বাড়ালো বৈষ্ণবী তখন ব্যথিত হয়ে বলে উঠল, 'লিখতে পড়তেই তোমার সমস্ত মন লেগে আছে, তুমি তো দেখতে পাও না।' তখনি চমকে উঠে আমার মনে পড়ে গেল, হাঁ, তাই তো বটে! ঐ 'বাসি' ব'লে একটা অভ্যস্ত কথার আড়ালে ফুলের সত্যকে আর আমি সম্পূর্ণ দেখতে পাই নে।·· বৈষ্ণবী সেই বাসি ফুলগুলিকে

অঞ্চলের মধ্যে সংগ্রহ করে তাদের চুম্বন করে নিয়ে চলে গেল।'

৭ আশ্বিন ১৩৩৮ তারিখে শ্রীমতী হেমন্তবালাকে লেখা আর একখানি চিঠি থেকে পুনশ্চ সংকলন করি; ১৩২১ সনে সবুজপত্রে প্রকাশিত 'বোষ্টমী' গল্প নিয়েই প্রসঙ্গসূচনা—

'বোষ্টমী অনেকখানিই সত্যি। এই বোষ্টমী স্বয়ং আমার কাছে এসে গল্প বলত। · বোষ্টমী-যে গুরুকে ত্যাগ করেছিল সেটা সত্য নয়, সংসার ত্যাগ করেছিল বটে। একদিন আমাকে এসে বললে, 'কাল রাত্রে স্বপ্নে তোমার পা-দুখানি বুকের উপর পেয়েছিলুম— মোজা ছিল না— ঠাণ্ডা। এই তো দূরের থেকেও তোমাকে পেয়েছি। কাছে আসবার এই আকাঙ্ক্ষা এ তো মোহ।' এই ব'লে সে চলে গেল, আর তাকে দেখি নি।'

এই বৈষ্ণবী-যে আপন সংস্কারমুক্ত শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে রবীন্দ্রনাথকে গুরুরূপে বরণ করেছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। শিষ্যও-যে সময়-সময় গুরু হয়ে ওঠে— কেননা, মানুষের মধ্যে যে ইষ্ট, যে ঠাকুর, তাকে ঐ মানুষের মধ্যে উদ্‌ঘাটিত করে দেওয়ার কারণ বা উপলক্ষ্য -স্বরূপ হয় —সেও আমরা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি। রবীন্দ্রনাথ এঁকে চিরদিন সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেছেন।

গগন হরকরার কাছে তিনি বাউল গানের কথা ও সুর সংগ্রহ করেছেন—

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে!

এইভাবে গ্রামের কত মানুষের সঙ্গে ভক্তি ও প্রীতির ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে আবদ্ধ হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, মনুষ্যজীবনের স্বরূপ আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের বৃহৎ-ক্ষুদ্র সুখদুঃখ আশাআকাঙ্ক্ষার অন্তরঙ্গ গভীর আবেদনে, সকল কাহিনী তার আজও জানা যায় নি— হয়তো কোনোদিনই জানা যাবে না। শুধু ইশারায় ইঙ্গিতে জানিয়ে দিয়েছেন

কাব্যে—

সেদিন ভাবনা ছিল মেঘের মতন
কিছু নাহি ছিল ধরে রাখিবার,
সেদিন আকাশে ছিল রূপের স্বপন,
রঙ ছিল উড়ো ছবি আঁকিবার। ··
সেইখানে মাঝে মাঝে এল যারা পাশে
কথা তারা ফেলে গেছে কোন্ ঠাঁই—
সংসার তাহাদের ভোলে অনায়াসে,
সভাঘরে তাহাদের স্থান নাই।

রবীন্দ্রনাথের যে অন্তরঙ্গ পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয় ছিন্নপত্রে, বিশেষতঃ সদ্যপ্রকাশিত ছিন্নপত্রাবলী গ্রন্থে, তেমনটি আর কোথাও দেখা যায় না। সত্য বটে এটি তাঁর দীর্ঘজীবনের অল্প কয়েক বৎসরের কথা, কিন্তু এই কয় বৎসরেই অলৌকিক 'সোনার তরী'তে বহু সোনার ফসল ভরে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির কবি, প্রকৃতির অঙ্কে থেকে তারই স্নেহে প্রেমে সোহাগে তাঁর চিত্তশতদল পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে আলোকে; দিবা তারই মধুব হাসিটির প্রতিফলনে নতুন লাবণ্য ও মাধুরী পেয়েছে, আর রাত্রিব অনিমেষ নক্ষত্রলোকের উদ্দেশেও উঠেছে তার প্রাণের সৌরভ। প্রকৃতি হাতে ধ'রে কবিকে মানব লোকে পৌঁছে দিয়েছে, যে মানুষেরা শহুরে সভ্য সজ্জনদের মতো নিশিদিনই নানা আবরণে আবৃত নয়, যারা সহজ স্বাভাবিক ব'লেই সুন্দর, একান্ত আত্মীয় সমাজের বাইরে এই যাদের জীবনমুকুরে কবি নিখিল মানুষ বা চিরমানুষকে দেখেছেন, আপন অন্তরে পেয়েছেন 'মানুষের ধর্ম'টি আর শনৈঃ শনৈঃ কর্মে ও ভাবনায় তাকে রূপ দিতে প্রস্তুত হয়েছেন।

শহুরে সভাসমাজে খ্যাতি ও নিন্দা সেদিন সমভাবে জুটেছে

তাঁর। যদিও পূর্বোক্ত বস্তুটি এত বিপুলপুঞ্জিত হয় নি যে, কবির স্বাধীন স্বচ্ছন্দ চলা-ফেরা ব্যাহত হতে পারে— অন্তত সে খ্যাতি মফস্বল পর্যন্ত লুব্ধ শিকারীর মতো তাঁকে তাড়া করে নি। সেখানে প্রজাদের কাছে তিনি পরম শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের রাজাবাবু বটে, তবু দরদী আপনার জন। ফলতঃ, অন্তরে বাহিরে সহজ স্বভাবে সহজ সুন্দর ছিল রবীন্দ্রনাথের জীবন; একান্ত স্নেহের ইন্দিরাকে লেখা এই চিঠিগুলি যেন সেই জীবনেরই ধারাবাহিক দিনলিপি, আর প্রায়শই স্বগতউক্তি বললেও অত্যুক্তি হয় না। এমন তাই সহজ, সুন্দর, স্বাভাবিক ও গভীর। ধীমান বা নির্বোধ, সহৃদয় অথবা অরসিক, তৃতীয় কোনো ব্যক্তির মুখ চেয়ে কিছুই লেখা হয় নি। যদিও তাঁরই অলক্ষ্য ওষ্ঠাধরে, ভ্রূযুগে, কুঞ্চনের কোনো সম্ভাবনায় অনুলিখনকালে ইন্দিরাদেবী অনেক-কিছুই বর্জন করেছেন সন্দেহ নেই, লেখার পরেও বহুলাংশ কেটেছেন বা অন্যভাবে অবলুপ্ত করে দিয়েছেন— আর, কবির নিজস্ব সম্পাদনা, সে তো আরও নির্মম, নিষ্ঠুর এবং আজ বলতে ইচ্ছা হয় অহেতু। তবু 'ছিন্নপত্র'-প্রকাশে রবীন্দ্রসাহিত্যরসিক মাত্রেই চমৎকৃত পুলকিত হয়ে উঠেছিলেন এটুকু অনুমান করতে বাধা নেই, আর 'ছিন্নপত্রাবলী'-প্রকাশের ফলে তাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতায় কোনো সীমা পরিসীমা থাকবে না। কবি হুইট্‌ম্যানের ভাষা প্রয়োগ ক'রে রবীন্দ্রনাথের এই লেখা সম্পর্কেই শুধু বলা যায়—

> …this is no book ;
> who touches this, touches a man.

বই নয়— শরীরী সজীব মানুষের স্পর্শ, সঙ্গ।

এখানেই আমাদের এই আলোচনা শেষ করা যাবে কি?

পাঠক, মনে মনে যদিও বলেছি 'ভালো হয়েছে আমার রচনা', অন্তত সেই অর্ধেক যা লিখেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বাগ্‌দেবীর মরাল-বাহনের পাখার পালখ স্বহস্তে ধ'রে— তবু, কত কথাই বলবার ছিল, সব গুছিয়ে বলা সম্ভবপর হয় নি। সব 'সৌন্দর্য' খুঁটে খুঁটে দেখাবে কে!'[৩] রূপ সীমাবদ্ধতা হারিয়েছে বর্ণের দ্যুতিতে বা লাবণ্যে! জানি, গ্রন্থের পাতা খুলতেই মুদ্রিত রেখা বা লেখা অপরূপ ভাবনা বেদনা স্বপ্ন সাধনার মর্মরে মর্মরে মুখর হয়ে উঠবে আর রসিকচিত্তে চিরদিন তার সঙ্গীতের রেশ অবশ্যই বাজতে থাকবে। সুতরাং আমাদের আলোচনার কোনো অসম্পূর্ণতাই তেমন অমার্জনীয় ত্রুটি ব'লে গণ্য হবে না। অতএব এখানেই গ্রন্থখানি রসিক পাঠকের হাতে তুলে দিয়ে আমরা বিদায় নিতে পারি; তবে স্বর্ণাক্ষরে-লেখা কোনো-এক প্রভাত কোনো-একটি সন্ধ্যার দিকে শেষবার ফিরে চেয়ে দেখতেও ইচ্ছা হয়— এমন সৌন্দর্য মহাকাল মর্তভুবনের পথে পথে ঋতুতে ঋতুতে দিনে রাতে অজস্র ছড়িয়ে চলেছেন, অন্ধের নয়ন সে-সব কখনোই দেখে না, দেখে এবং দেখায় কদাচিৎ সেই শিল্পী বা কবি, যার আগমন-প্রতীক্ষায় থাকে যুগ-যুগান্তর।—

০দিনগুলি আজকাল অত্যন্ত সুমধুর হয়ে এসেছে— বাতাস সুশীতল, আকাশ সমুজ্জ্বল, তটরেখা শ্যামল, নদী সুপ্রশান্ত, মন স্বপ্নাতুর, কাজকর্ম স্বল্প, লেখাটেখা বন্ধ, চারি দিকে ছুটি, এবং অন্তরে বাহিরে সৌন্দর্যপ্রবাহ। জলের কলস্বরে যেন কার অত্যন্ত সুকোমল আদরের কণ্ঠ মাখা রয়েছে; স্বচ্ছ নীলাকাশও স্নেহভারে আবিষ্ট এবং স্নিগ্ধ সমীরণও প্রীতিসুধায় পরিপূর্ণ; এই-সব রঙগুলি— এই জলের গেরুয়া, এ পারের সাদা, ও পারের সবুজ, আকাশের নীল, রৌদ্রের সোনা, এ-সমস্ত কতই বেশভূষা দৃষ্টিহাসির অজস্রতারূপে আমার চতুর্দিকে শরৎকিরণে ঝলকিত হচ্ছে! সমস্ত আকাশ যেন হৃদয়পুঞ্জের মতো আমাকে বেষ্টন করে ধরেছে॥ ২৩৫

॰স্টীমার যখন ইছামতী থেকে বেরিয়ে সন্ধ্যাবেলায় পদ্মার মধ্যে এসে পড়ল তখন যে কী সুন্দর শোভা দেখেছিলুম সে আর কী বলব! কোথাও কোনো কূলকিনারা দেখা যাচ্ছে না— ঢেউ নেই, সমস্ত প্রশান্ত গম্ভীর পরিপূর্ণ। ইচ্ছা করলে যে এখনই প্রলয় করে দিতে পারে সে যখন সুন্দর প্রসন্ন মূর্তি ধারণ করে, সে যখন তার প্রকাণ্ড প্রবল ক্ষমতাকে সৌম্য মাধুর্যে প্রচ্ছন্ন করে রেখে দেয়, তখন তার সৌন্দর্য এবং মহিমা একত্র মিশে একটি চমৎকার উদার সম্পূর্ণতা ধারণ করে। ক্রমে যখন গোধূলি ঘনীভূত হয়ে চন্দ্র উঠল তখন আমার মুগ্ধ হৃদয়ের মধ্যে সমস্ত তারগুলো যেন বেজে উঠতে লাগল॥ ১৩২

॰কিন্তু এই বসন্তপ্রভাতের বাতাসে আমাকে বড়ো মাটি করে দেয়। কেবল এই উদার উত্তপ্ত বাতাসটিকে সর্বশরীরে লাগানোই একটা যথেষ্ট কর্তব্য কাজ বলে মনে হয়— মনে হয়, এই মিষ্টি বাতাসের প্রবাহটি যেন আমার প্রতি বাইরের প্রকৃতির একটা প্রত্যক্ষ আলাপচারি। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলুম, বসন্তের বাতাসটি গায়ে লেগেছিল, কনকচাঁপার গন্ধে মস্তিষ্ক ভরে গিয়েছিল, মাঝে মাঝে এক-একটা সকালবেলা এক-একটা দৈববাণীর মতো আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়েছিল— একজন স্বল্পজীবী মানুষের পক্ষে এই বা কম কথা কী! ২০১

-

জোড়াসাঁকো

১৫ নভেম্বর ১৯৬০

রবীন্দ্রপ্রতিভার নেপথ্যভূমি। তেমনি কারুক্ষেত্রও বলা চলে, কারু শব্দটি যদি সুপ্রচলিত অর্থে ব্যবহার করি। কেননা কবি স্বয়ং বলেছেন—

আপনমনে গোপন কোণে লেখাজোখার কারখানাতে
দুয়ার রুধে বচন কুঁদে খেলনা আমায় হয় বানাতে।
এই জগতেব সকাল সাঁজে ছুটি আমার সকল কাজে,
মিলে মিলে মিলিয়ে কথা বঙে রঙে হয় মানাতে।

সবলহৃদয় পাঠককে অবশ্য বলা দবকার, কবি-অত্যুক্তির প্রচুব পবিচয় যদিবা যত্র তত্র পেয়ে থাকেন, এখানে যাব-পর-নেই উনোক্তি হয়েছে সে যেন খেয়াল বাখেন।

কে গো আছে ভুবন-মাঝে নিত্যশিশু আনন্দেতে,
ডাকে আমায় বিশ্বখেলায় খেলাঘরের জোগান দিতে

এ কথা সত্য। তবু এটাই সব সত্য নয় যে কথার সঙ্গে কথা মিলিয়ে, তূলি ধরে বিচিত্র লেখাজোখা এঁকে আর রঙ চড়িয়ে, কবিপ্রতিভা নিষ্কৃতি পেয়েছে। কবিব সাধনা আরও ব্যাপক, বিশাল, নিগূঢ়, সিদ্ধি আবও শত দিকে শত ভাবেই চমৎকারজনক; আর, কবি রবীন্দ্রনাথ জীবনেব সকাল-সাঁঝে কবিতা লেখা ও গান রচনা ছাড়া অন্য সকল কাজেই ছুটি চেয়েছিলেন অথবা পেয়েছিলেন এটাও নিতান্তই অবিশ্বাস্য কাহিনী। কোনো মহর্ষি সহস্রজনের অন্নপান আত্মসাৎ করে বলেছিলেন শুনতে পাই— 'আজ তো আমার নিরম্বু উপবাস'; এ দেখি সেই প্রকার। হাজারো কাজের সঙ্গে সঙ্গেই অবাধ ছুটি থেকে থাকে তো আলাদা কথা; নইলে সারা জীবনে সহস্র মানুষের কাজই করে গেছেন তিনি আর ঘটিয়ে তুলেছেন আরও লক্ষ লোকের করণীয়। সে-সবের বহু শ্রমসাধ্য:খতিয়ানে

আমরা প্রবৃত্ত হই নি এখানে। আমরা স্রষ্টাকে দেখব তাঁর সৃজন-ক্ষেত্রে; রবীন্দ্রকল্পলোকের কুশীলবরূপী কত কথা, কত কল্পনা, কত ভাব, কত চিত্র ও চরিত্র— সাজঘরের পর্দাটি ঈষৎ সরিয়ে চকিতে একবার দেখে নেব তাদেরই কয়েক জনকে কিছুবা অপ্রস্তুত অসজ্জিত বেশে, সহজ অথচ শোভন স্বরূপে। তবু সত্যকার চেনা-পরিচয় হবে কি না নিশ্চিত বলা যায় না; কেননা চুরি ক'রে বা সুপারিশ সংগ্রহ ক'রে সজন নেপথ্যে ঢুকে পড়া এক কথা, আর সঙ্গে সঙ্গেই একক স্রষ্টার অন্তর্লোকেও পৌঁছে যাওয়া আব-এক কথা। যথার্থ কবি-প্রতিভা এক প্রকার open secret বলা চলে— খুলে-বলা হেঁয়ালি। 'যত জানি তত জানি নে'। শেষ পর্যন্তই রহস্যময়তা তার দূর হবার নয়।

২

কবির স্বহস্তে লেখা যে কবিতার খাতা প্রথম হাতে তুলে দেখি সে হল— 'মানসী'। তার মলাটের ভিতর পিঠে লেখা ছিল: *Think not bitterly of me*। কবির পূর্ণপরিণত ইংরেজি হাতের লেখার সঙ্গে মেলে না ব'লেই তাঁব কিম্বা অপরের লেখা, এ সংশয়েব অবকাশ আছে, আর এটি কোনো উদ্ধৃতি কি না তাও নিশ্চিতভাবে বলতে পারি নে— তবে, তরুণ কবির ভাবোচ্ছলিত স্নেহ-প্রেম-আনন্দ-বেদনা-বিদ্ধ হৃদয়েরই নিখুঁত প্রতিচ্ছবি নয় যে তাই বা কেমন করে বলি। বস্তুতঃ মানসবাসিনী বীণাপাণিব সুরে ছন্দে সেদিন যিনি লিখেছিলেন—

কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া, এসেছি ভুলে

অথবা—

তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি যুগে যুগে অনিবার

তাঁরই কবিমানসের চকিত একটি ছবি দেখি যেন, ঐ ক'টি সহজ

সরল কথায়। প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ে আমার পিতৃপ্রতিম এক বন্ধুর কাছে শুনেছি, তরুণ কবির প্রথমোক্ত ঐ কবিতা যখন প্রথম প্রকাশিত হয় আর তাঁরও তরুণতর বয়সে ওর প্রথম রসাস্বাদন করেন, মনে এমন একটি ভাবের ঘোর লেগেছিল, সুখ-না-দুঃখের অনির্বচনীয় একটি আমেজ, যে, সে নেশা সপ্তাহে বা পক্ষকালেও এতটুকু ফিকে হয়ে যায় নি। হায়, রসজ্ঞতাঅভিমানী আমাদের কাব্যসম্ভোগও এমন নিবিড় গভীর অথবা সুস্থির এ কথা হলপ করে বলা যায় না। আমরা অক্ষর দেখি তো কথা দেখি নে, কথা দেখি তো কথার অন্তর্লীন ছন্দস্পন্দে হৃদয় দুলে ওঠে না, আর ভাব ভাষা তত্ত্ব তথ্য সব-কিছুই যদি বা অনুধাবন করি— সমুদয় কবিতাটির যুগপৎ আধার ও আধেয় -স্বরূপ যে রসাত্মা তার কি কোনো উপলব্ধি ঘটে? ঘটলেও, সে বোধ কতই আবৃত, অগভীব ও ক্ষণস্থায়ী!

'মানসী'ব খাতাটি হাতে তুলে নিয়ে মনে হল, এ মুহূর্তে আমার মনের ভাবটি কথঞ্চিৎ ব্যক্ত করতে হলে চন্দনপিঁড়ির উপব এই পুঁথি-খানি বেখে, শতদলসম্ভাবে বা গোলাপ চাঁপা চন্দ্রমল্লিকায় সাজিয়ে, ধূপ গুগ্‌গুল জ্বেলে, সামনে ভূলুণ্ঠিত হয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত ভিন্ন কী আর করতে পারি! কিন্তু, শিক্ষিত সজ্জন মাত্রেই সেটা অতিভক্তির বাড়াবাড়ি ব'লেই গণ্য করবেন আর আমারও স্বভাবে সৎসাহস পদার্থটি অল্প; তাই শুধু পাতার পর পাতা উল্‌টিয়ে বহুক্ষণ ঐ খাতা-খানি দেখেছি, পরে বহুবার দেখেছি, এবং হয়তো কখনো নিজেবই অজ্ঞাতসারে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনে মনে বলে থাকব— হায় বে সেদিন হায় রে! যে কবিযুবার ঘনিষ্ঠ করস্পর্শ রয়েছে এই পাণ্ডুলিপির প্রত্যেক পৃষ্ঠায়, ভাববৈদ্যুতীময় সমুদয় সত্তারই স্পর্শ, কোথা সেই কবি, যৌবনবেদনারসে-উচ্ছল কোথা সেই দিনগুলি— কালের অধীশ্বর অন্য মনে ভুলে না গেলেও, আপনাতে তবু সংহরণ করে নিয়েছেন। সেই তাঁর লীলা, সেই হল পার্থিব জীবনের

অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।

হাতের লেখাতেই ব্যক্তির সত্যপরিচয়— অশরীরী হলেও, কোনো একটি স্থগিত মুহূর্তের সম্পূর্ণ পরিচয়। ব্যবহৃত তৈজসপত্রে পোশাকে, চিত্রে বা মূর্তিতে, চিরচলিষ্ণু চিরপরিণামী ব্যক্তিসত্তার এতখানি পরিচয় ধরা থাকে না। ফোটোগ্রাফে একটি নিমেষের নির্ভুল সাক্ষ্য বর্তমান সন্দেহ নেই, কিন্তু সে তো শুধু মায়াময় কায়ারই ছবি, উজ্জ্বলস্মিত চক্ষু- তারায় তারায় অজ্ঞাত অপঠিত স্বাক্ষর— অন্তঃপুরুষের সেই ইঙ্গিতময় মূক ভাষা কে বা বুঝতে পারে! অথচ, হাতের লেখার প্রত্যেক বেখায় রেখায়, সাবলীল ভঙ্গীতে, দৃঢ়তায় বা আকম্পনে, এমন-কি চ্যুতি-বিচ্যুতিতেও মানুষের মন কথা কয়; জীবজীবনের নিগূঢ় কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়; তৎকালীন সুখদুঃখের আর চিরকালীন আশাস্বপ্নের নিশ্চিত ব্যঞ্জনা ফোটে; মরতায় নিহিত যা-কিছু অমরতার বীজ সেও অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে— তেমন তেমন ক্ষেত্রে তার কোনো ক্ষয় নেই, লয় হতে পারে না। এই খাতার পাতায় পাতায় এই মুক্তাপংক্তিসদৃশ অক্ষরগুলি লেখার আবেশে শুধু কি কলম ছুঁয়েছে কাগজ? কালো কালীর ধারা বয়ে গেছে বেখার প্রবাহে? না, মানুষের মনই ছুঁয়েছে কাগজ, সাকার সচেতন হয়ে উঠেছে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায়। কাগজ কালী কলম উপলক্ষ্য মাত্র; তেমন ভাবের আবেশে, একান্ত তন্ময়তায়, তাদের সকল অস্তিত্ব লীন হয়ে গেছে অন্য এক 'অস্তি'তে, সেটি হল ব্যক্তির আসল সত্তা, চেতনসত্তা। কাগজ কালী কলম কিছু নয়, এমন-কি ভাব ভাষাও গৌণ। এগুলি সেই অপরূপ বস্তুরই আধার যাকে ধরে রাখার কোনো সম্ভাবনা ছিল আদিম মানুষের স্বপ্নঅগোচর। বিজ্ঞানের প্রসাদে আজ মানুষের কণ্ঠস্বর ধরে রাখা যায় নিখুঁত-ভাবে। সে বড়ো আশ্চর্য সন্দেহ নেই; কিন্তু একটি যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার লক্ষগোচর বাধা থাকেই বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে। হাতের

লেখার মতো এমন সহজ সাবলীল নয়; আত্মবিস্মৃত আত্মসৃষ্টির এবং সেটি গ্রহণের এমন অবাধ সুযোগ সেখানে নেই।

হাতের লেখা নিয়ে বর্তমান লেখকের অসীম বিস্ময় বা শ্রদ্ধা জানি না কতখানি ব্যক্ত হল। এটুকু ভাবলেই চলবে— আজ যদি কোনো অভূতপূর্ব উপায়ে বুদ্ধ বা খৃস্টের, ব্যাসবাল্মীকি অথবা কৃষ্ণার্জুনেব হস্তলিপি কেউ আবিষ্কার করে, কী পর্যন্ত পুলক ও বিস্ময়ের সৃষ্টি হবে! কতখানি সম্ভ্রমে ও সমাদরে মানুষ তা রক্ষা করবে! হয়তো নূতন মঠ ও মন্দির উঠবে তাকে ঘিরে! যদিও বুদ্ধ খৃস্ট ব্যাস ও বাল্মীকির জীবনবেদ ও বাণী অন্য আকারে আজও ভাগ্যবান জনের ভোগ্য হয়ে নেই এমন নয়।

বহু দেশে বহু যুগ ধরে গুণীর হাতেব লেখার বা লেখাঙ্কনের মান ও মর্যাদা তাই শ্রেষ্ঠ শিল্পীব হাতে আকা উৎকৃষ্ট চিত্রকৃতির সমানই মনে কবা হয়। লেখশিল্পীগণ নৈষ্ঠিক পূজার্চনাব মতোই সংযত পবিত্র চিত্তে এর চর্চা করেন— বীর না হলে অভয় বাক্ ফুটে ওঠে না বেখায় রেখায়, মহাপুরুষ হলেই মহত্ত্বের ব্যঞ্জনা ফোটে শব্দের অর্থে শুধু নয়, লিপিবদ্ধ আকারে, এ তাঁরা নিশ্চিত জানেন। প্রসঙ্গক্রমে বলি, এক বিদুষী পাশ্চাত্য মহিলা সাবাজীবন কাটিয়েছিলেন দেশ-বিদেশেব উৎকৃষ্ট 'লেখা'ব সংগ্রহে ও গুণগ্রাহিতায়; রবীন্দ্রনাথের সুশ্রী সুগঠিত সচ্ছন্দপ্রবাহিত হস্তলিপি তিনি যেদিন প্রথম চোখে দেখলেন, বিস্তারিত বিচাব বিশ্লেষণের পূর্বেই একেবারে অ-বাক্ অভিভূত হয়ে পড়লেন, অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠল তাঁর মুগ্ধ দুটি চক্ষু। সেটি বাংলা অথবা ইংরেজি লেখা ছিল জানি না; তেমনি আমাদের জানা নেই ঐ ভাষায় তাঁব অক্ষরপবিচয় ছিল কতদূর।

লেখা সম্পর্কে আমবা বিশেষবিৎ নই, সুতরাং এ প্রসঙ্গে আব অধিক আলোচনা না'ই করা গেল। তবু আরও একটি কথা মনে উদয় হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখার শোভন সচ্ছন্দ অনুকরণ

হয়েছে প্রচুর। তাঁরই নিকটে থেকে সময়ে সময়ে তাঁর লেখার 'কপি' প্রস্তুত করেছেন অন্যে, বিশেষতঃ কবির প্রাচীন বয়সে— অসতর্ক পাঠক সেই হস্তলিপি রবীন্দ্রনাথের ভেবেই ভ্রান্ত হবেন। অথচ সূক্ষ্ম তফাত অবশ্যই আছে। যে ক্ষেত্রে নকলকারীর অক্ষর-গুলি নিটোল, নিখুঁত, কবির হয়তো তেমন নয়, যেন রসে-পরিপূর্ণ এক-একটি ফলের মতো, কোথাও কোথাও বরং টোল খেয়েছে— অলক্ষ্য বোঁটায় লেগে আছে আল্‌তো ভাবে।

৩

'আমার বয়স তখন সাত-আট বছরের বেশি হইবে না। আমার এক ভাগিনেয় ·· আমার চেয়ে বয়সে একটু বড়ো একদিন দুপুর-বেলা তাঁর ঘরে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন, তোমাকে পদ্য লিখিতে হইবে।··· কোনো একটি কর্মচারীর কৃপায় একখানি নীল কাগজের খাতা জোগাড় করিলাম। তাহাতে স্বহস্তে পেন্সিল দিয়া কতকগুলা অসমান লাইন কাটিয়া বড়ো বড়ো কাঁচা অক্ষরে পদ্য লিখিতে শুরু করিয়া দিলাম।' এই হল কবির অন্যূন সপ্ততিবর্ষব্যাপী গান ও কবিতা -রচনার প্রথম সূত্রপাত, অবিচ্ছিন্ন অক্লান্ত সাহিত্যসাধনার প্রথম সোপান। 'ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশপাথর' —তেমনি-ভাবে পাঁতি পাঁতি করে খুঁজেও বন্ধুবর পুলিন সেন বা ক্ষিতীশ রায় এ খাতাখানি আজও আবিষ্কার করতে পারেন নি। অজস্র সোনার ফসল সঞ্চিত হয়েছে স্বদেশের গোলায়, কিন্তু সোনার তরীর প্রথম খেয়ায় প্রথম ক্ষেপণীপাতে মানসসরসে লহরী উঠেছিল কোন্ মাসের কোন্ তারিখে কোন্ লগ্নে সেটি জানা যায় নি। আরও কিছু পরের ঘটনা নিয়ে জীবনস্মৃতি গ্রন্থে কবি বলেন, 'ইতিমধ্যে সেই ছিন্নবিচ্ছিন্ন নীল খাতাটি বিদায় করিয়া একখানা বাঁধানো লেট্‌স্ ডায়ারি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। · শুধু কবিতা লেখা নহে, নিজের কল্পনার সম্মুখে

নিজেকে কবি বলিয়া খাড়া করিবার জন্য একটা চেষ্টা জন্মিয়াছে।··· বোলপুরে · বাগানের প্রান্তে একটি শিশু নারিকেল গাছের তলায় মাটিতে পা ছড়াইয়া বসিয়া খাতা ভরাইতে ভালোবাসিতাম। এটাকে বেশ কবিজনোচিত বলিয়া বোধ হইত। তৃণহীন কঙ্করশয্যায় বসিয়া রৌদ্রের উত্তাপে 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' বলিয়া একটা বীররসাত্মক কাব্য লিখিয়াছিলাম। · প্রচুর বীররসেও উক্ত কাব্যটাকে বিনাশের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই।·· লেট্‌স্ ডায়ারিটিও জ্যেষ্ঠা সহোদরা নীল খাতাটির অনুসরণ করিয়া কোথায় গিয়াছে তাহার ঠিকানা কাহারও কাছে রাখিয়া যায় নাই।'

ডায়ারিটি পাওয়া না গেলেও সুধীজন মনে করেন, 'পৃথ্বীরাজ-পরাজয়' কাব্যই ভাবান্তরে ও রূপান্তরে 'রুদ্রচণ্ড' নাটিকা-আকারে বর্তমান। বালক কবির প্রথম কাব্যকৃতির এই পুনর্জন্মলাভের পূর্বেই আরও বহু কাব্য রচিত ও মুদ্রিত হয়েছে সত্য— বনফুল, কবিকাহিনী, বাল্মীকিপ্রতিভা ও ভগ্নহৃদয়। এগুলির রসাস্বাদন আজও সম্ভবপব ; কোনো কোনো পাণ্ডুলিপি হয়তো রবীন্দ্রসদনে সংগৃহীত হয়ে থাকতে পারে। ঠিক জানি না। এটুকু জানি— একটি পুঁথি দিয়েছেন শ্রীমতী মালতী সেন, 'মালতীপুঁথি' বলেই এটি সহজ পরিচিতি অর্জন করেছে, এটির থেকে আরও পুরাতন কবির কোনো পাণ্ডুলিপি আজও আমাদের চোখে পড়ে নি। খাতাটি কত পুরাতন তারই প্রমাণস্বরূপে উল্লেখ করা যায়— ১২৮৪ অগ্রহায়ণের 'ভারতী'তে মুদ্রিত 'ঝান্সীর রাণী' বীজাকারে এই পুঁথিতে নিবদ্ধ। হাতের লেখা, অবশ্য, রবীন্দ্রনাথের কিনা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না। এটির 'প্রেরণা'য় ভারতীর প্রবন্ধটি যে অনধিক ষোলো বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ লেখেন তার প্রমাণ আছে সেই রচনার ভাবে ভাষায় ও প্রবন্ধশেষে মুদ্রিত 'ভ' অক্ষরে, যেটি ভানুসিংহ ঠাকুরের জ্ঞাপক মনে করা যেতে পারে। মালতীপুঁথিতে

মেঘনাদবধ কাব্যের প্রসঙ্গ আছে, তেমনি আছে ইউনাইটেড স্টেট্‌স্'এ নিগ্রোদের শিক্ষাধিকারের আলোচনা। জীবনস্মৃতির 'ঘরের পড়া' অধ্যায়ে কবি যে সময়ের উল্লেখ করেছেন তারই কিছু কিছু লুপ্তাবশিষ্ট চিহ্ন এগুলিকে সহজেই মনে করা যেতে পারে। এ বিশ্বাস আরও দৃঢ়ীকৃত হয় যখন দেখি কবির সুন্দর সচ্ছন্দ হাতের লেখায় কুমারসম্ভব কাব্যের অংশবিশেষের অনুবাদ। পিতৃদেবের সঙ্গে কিছুকাল হিমালয়-বাসের পর, গৃহপ্রত্যাগত বালককে স্কুলের আটঘাট-বাঁধা পড়াশুনার মধ্যে ধরে রাখা যখন উত্তরোত্তর কঠিন হয়ে উঠল, জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য ছিলেন কবির গৃহশিক্ষক। নিরুপায়ের উপায় হিসাবে তিনি এক দিকে কুমারসম্ভব আর অন্য দিকে ম্যাক্‌বেথ নাটক রবীন্দ্রনাথকে বাংলায় অর্থ করে পড়াতে লাগলেন। আর, কুমারসম্ভবের অনেকটা না হলেও, ম্যাক্‌বেথের সবটাই রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে কবিতায় অনুবাদ করিয়ে নিলেন —এ কথা আজ আমাদের অবিদিত নেই। 'রবীন্দ্রজীবনী'কার বলেন খৃস্টীয় ১৮৭৩ সনে জ্ঞানচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের গৃহশিক্ষক ছিলেন, আর বেশিদিন তিনি এই কাজে থাকেন নি। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন মনে করেন ১৮৭৪ সনের শেষার্ধেই রবীন্দ্রনাথ পূরো ম্যাক্‌বেথ এবং কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গ থেকে মদনভস্মের কিছুটা প্রসঙ্গ কবিতায় অনুবাদ করেন। শেষোক্ত অনুবাদ মিলহীন চতুর্দশ মাত্রার পয়ারে করা হয়েছিল। এই অনুবাদের থেকেই রূপান্তরিত একটি পাঠ পরে ভারতী পত্রিকার ১২৮৪ মাঘ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। মালতীপুঁথিতে রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখায় যেমন রবীন্দ্রনাথের অনুবাদটি প্রথমেই আছে (পৃ. ৫-৬) তেমনি পরে আছে পরিবর্তিত একটি পাঠ অন্যের হস্তাক্ষরে (পৃ. ৪৩-৯৮) —ভালো করে মিলিয়ে দেখি ভারতী'র পাঠের থেকে এই পরবর্তী পাঠের পার্থক্য অল্প— হস্তাক্ষরের বিচারে ও ভাষার বিচারে, বাহ্য এবং আভ্যন্তরীণ প্রমাণে, আমরা মনে করি যে, সম্ভবতঃ এটির

রচয়িতা দ্বিজেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের অনুবাদটি সচ্ছন্দ, কিন্তু মূলানুগ নয়। এজন্য দ্বিজেন্দ্রনাথ (?) যে রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখার উপরেই সংশোধন করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন মালতীপুঁথির উল্লিখিত ৫-৬ পৃষ্ঠায় কিছু কিছু তার চিহ্ন নেই এমন নয়। অবশেষে সবটাই তিনি পুনর্লিখন করেন—এটিকে রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ মনে করবার কারণ নেই।

রবীন্দ্রনাথের নিজের অনুবাদটি এপর্যন্ত জনসাধারণের কাছে অজ্ঞাত অপরিচিত আছে ; এজন্য, পাণ্ডুলিপি স্থানে স্থানে ছিন্ন হলেও, যতটা পাঠ উদ্ধার করা যায় তাই আমরা এ স্থলে সংকলন করে দিচ্ছি।[১] মালতীপুঁথি চোখে দেখলে তো বটেই, তা ছাড়া এটিকে নিয়ে মদনভস্মের মোট তিনটি পাঠ মিলিয়ে দেখলেই যে-কোনো সুধীব্যক্তি বুঝতে পারবেন, উপস্থিত আমরা কেন বা একটিকে রবীন্দ্রনাথ-রচিত বলছি আব অন্য দুটিকে বলছি না।—

সময় লঙ্ঘন করি নায়ক তপন
উত্তর অয়ন যবে করিল আশ্রয়
দক্ষিণের দিকবালা হেরিয়া তাহাই
ধীরে ধীবে ফেলিলেন বিষণ্ণ নিশ্বাস। ২৫
অমনি উঠিল ফুটি অশোকের ফুল,
অমনি পল্লবজালে ছাইল পাদপ। ২৬
নবীন পল্লব দিয়া রচি পক্ষগুলি
ভ্রমর-অক্ষরে লিখি মদনের নাম
নবচূতবাণচয় নির্মিল বসন্ত। ২৭
মনোহরবর্ণময় কর্ণিকার ফুল
ফুটিল, নাইক তাহে সুবাসের লেশ।
বিধাতা সকল গুণ দেন কি সবারে? ২৮

মর্মর শবদ করি জীর্ণ পত্রগুলি
ফেলে ধীরে বনস্থলী বায়ুর পরশে,
মদোদ্ধত হরিণেরা করে বিচরণ
পিয়ালমঞ্জরী হতে রেণু ঝরি ঝরি
যাদের বিশাল আঁখি হয়েছে আকুল। ৩১
যখন মদন বসি বনশ্রীর কোলে
পুষ্পশরে গুণ তার করিল বন্ধন
স্নেহরসে মগ্ন হল যত ছিল প্রাণী। ৩৫
একই কুসুমপাত্রে ভ্রমর প্রিয়ার
পীত-অবশেষ মধু করিল গো পান।
স্পর্শনিমীলিতচক্ষু মৃগীর শরীরে
কৃষ্ণসার শৃঙ্গ দিয়া করিল আদর। ৩৬
আধেক মৃণাল খেয়ে সুখে চক্রবাক
আধেক তুলিয়া দিল প্রিয়ার মুখেতে। ৩৭ শেষার্ধ
পুষ্পমদ পান করি ঢলঢল আখি—
কিম্পুরুষললনারা গাইতেছে গান,
প্রিয়তম তাহাদের হইয়া বিহ্বল
থেকে থেকে প্রিয়ামুখ করিছে চুম্বন। ৩৮
কুসুমস্তবকগুলি স্তন যাহাদের
নবকিশলয়গুলি ওষ্ঠ মনোহর
বাঁধিল সে লতিকারা বাহুপাশ দিয়া
নম্রশাখা তরুদের গাঢ় আলিঙ্গনে। ৩৯
লতাগৃহদ্বারে নন্দী করি আগমন
বাম করতলে এক হেমবেত্র ধরি
অধরে অঙ্গুলি দিয়া করিল সঙ্কেত। ৪১
[অমনি] নিষ্কম্প বৃক্ষ, নিভৃত ভ্রমর,

·· হইল মূক, শান্ত হল মৃগ
·· · কাঁপিল সঙ্কেতে। ৪২
নন্দীর সতর্ক আঁখি এড়ায়ে মদন
নমেরু গাছের তলে লুকায়ে লুকায়ে
শিবের সমাধিস্থান করিল দর্শন। ৪৩
দেখিল সে— মহাদেব শার্দূল-আসনে
দেবদারু-বেদী'পরে আছেন বসিয়া। ৪৪
উন্নত প্রশস্ত অতি স্থির বক্ষ তাঁর,
শোভিতেছে সন্নমিত দৃঢ় স্কন্ধদেশ,
কোলে তাঁর হাত দুটি রয়েছে অর্পিত
প্রফুল্ল পদ্মের মতো শোভিছে কেমন। ৪৫
বদ্ধ তাঁর জটাজাল ভুজঙ্গবন্ধনে।
কর্ণে তাঁর অক্ষসূত্র রয়েছে জড়িত—
গ্রন্থিবদ্ধ কৃষ্ণসারহরিণ-অজিন
ধরিয়াছে নীলবর্ণ কণ্ঠের প্রভায়। ৪৬
ঈষৎ প্রকাশে যার স্তিমিত তারকা,
শান্ত যার ভ্রূযুগল অচল নিস্পন্দ,
অকম্পিত পক্ষ্মমালা ভেদ করি যার
বিকীরিত হইতেছে শান্ত জ্যোতিরাশি
সে নেত্র নাসাগ্রভাগ করিছে বীক্ষণ। ৪৭
অবৃষ্টিসংরম্ভস্তব্ধ মেঘের মতন
তরঙ্গবিহীন শান্ত সমুদ্রের মত
নির্বাতনিষ্কম্প অগ্নিশিখার সমান
মহাদেব শান্তভাবে ধ্যেয়ানে নিমগ্ন। ৪৮
মস্তক করিয়া ভেদ উঠিয়াছে জ্যোতি
কপালের শশধরে করিয়া মলিন। ৪৯

মনের অগম্য সেই মহাদেবে হেরি
মদনের সকম্পিত হস্তদ্বয় হতে
থর থর কাঁপি খসি পড়িল ধনুক। ৫১
হেনকালে বনদেবীদের সাথে সাথে
উমা পশিলেন সেই বনস্থলীমাঝে—
হেরি সে অতুলরূপ পাইয়া আশ্বাস
মদন তুলিয়া নিল ধনুর্বাণ তার। ৫২
পদ্মরাগ মণি জিনি অশোককুসুম
কনকবরণ জিনি কর্ণিকার ফুল
মুকুতাকলাপসম সিন্ধুবারমালা
আরণ্য বসন্তফুলে ·· ··
·· · ··· । ৫৩
স্তনভারে নতকায়া ঈষৎ অমনি
অবনত কুসুমের মঞ্জরীর ভারে
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতাটির মতো। ৫৪
থেকে থেকে খুলে পড়ে বকুলমেখলা,
বার বার হাতে করে রাখেন আটকি। ৫৫
ভ্রমর তৃষিত হয়ে নিশ্বাসসৌরভে
বিম্ব-অধরের কাছে করে বিচরণ,
সম্ভ্রমে বিলোলদৃষ্টি উমা প্রতিক্ষণ
লীলাশতদল নাড়ি দিতেছেন বাধা। ৫৬
যাঁর রূপরাশি হেরি রতি লজ্জা পায়
অকলঙ্ক সে উমারে করি নিরীক্ষণ
জিতেন্দ্রিয় শূলীরেও বাণ সন্ধানিতে
মদন হৃদয়ে নিজ বাঁধিল সাহস। ৫৭
শৈলসুতা ভবিষ্যৎপতি শঙ্করের

লতাগৃহদ্বার-মাঝে করিলা প্রবেশ।
পরমাত্মাসন্দর্শনে পরিতৃপ্ত হয়ে
যোগ ভাঙি উঠিলেন মহেশ তখন। ৫৮
নন্দী তাঁর পদতলে প্রণিপাত করি
উমা-আগমনবার্তা করিল জ্ঞাপন।
ঈষৎ ভ্রূক্ষেপমাত্রে মহেশ অমনি
পার্বতীরে প্রবেশিতে দিলা অনুমতি। ৬০
উমার স্বহস্তে তুলা পল্লবে-জড়িত
হিমসিক্ত ফুলগুলি অর্পি পদতলে
সখীগণ মহাদেবে করিল প্রণাম। ৬১
উমাও সে পদতলে হইলেন নত—
চঞ্চল অলক হতে পড়িল খসিয়া
নবকর্ণিকার ফুল মহেশচরণে। ৬২
[অন্য] নারী-অনুরক্ত নহে যেই জন
[হেন] পতি লাভ করো আশীষিলা দেব
[ক] থার কভু হয় না অন্যথা। ৬৩
[অ] বসর প্রতীক্ষা করিয়া
পতঙ্গের মতো
করি। ৬৪
পদ্মবীজমালা লয়ে আরক্তিম করে
মহেশের হস্তে উমা করিলা অর্পণ। ৬৫
সম্মোহন পুষ্পধনু করিয়া যোজনা
অমনি শিবের প্রতি হানিলা মদন। ৬৬
অমনি হইলা হর ঈষৎ অধীর
সবেমাত্র চন্দ্রোদয়ে অম্বুরাশি-সম,
উমার মুখের 'পরে মহেশ তখন

একেবারে ত্রিনয়ন করিলা নিবেশ। ৬৭
অমনি উমার দেহ উঠিল শিহরি,
সরমবিভ্রান্ত নেত্রে লাজনম্র মুখে
পার্বতী মাটির পানে রহিলা চাহিয়া। ৬৮
মুহূর্তে ইন্দ্রিয়ক্ষোভ করিয়া দমন
বিকৃতির হেতু কোথা দেখিবার তরে
দিশে দিশে করিলেন ত্রিনয়নপাত। ৬৯
দেখিলা জ্যাবদ্ধমুষ্টি সশর মদন
তাঁর [প্রতি] লক্ষ নিজ করেছে নিবেশ। ৭০
তপস্যার বিঘ্ন হেরি ক্রুদ্ধ অতিশয়
ভ্রূভঙ্গদুষ্প্রেক্ষ্যমুখ মহাতপস্বীর
তৃতীয় নয়ন হতে ছুটিল অনল। ৭১
ক্রোধ সম্বরহ প্রভু ক্রোধ সম্বরহ
স্বর্গ হতে দেবতারা কহিতে কহিতে
হইল মদনতনু ভস্ম-অবশেষ। ৭২

মালতীপুঁথিতে যেমন আছে প্ল্যাঞ্চেটযোগে (?) ইহপরলৌকিক আলাপের কিঞ্চিৎ বিবরণ, তেমনি রবীন্দ্রনাথের পাকা হাতের লেখায় বহুপরবর্তী সারস্বতসমাজের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন— ভিন্‌দেশী কবিতাব অনুবাদ, ভানুসিংহঠাকুরের অন্যতম 'পদ', রবীন্দ্রনাথের আনুমানিক তেবো থেকে আঠাবো বৎসর বয়সে রচিত কোনো কোনো গান, তা ছাড়া ১৮৭৮ খৃস্টাব্দের ৬ই জুলাই (২৩ আষাঢ় শনিবার ১২৮৫) তারিখে আমেদাবাদের শাহীবাগে বসে লেখা এই কবিতা[২]—

হে কবিতা, হে কল্পনা,
জাগাও জাগাও, দেবি, উঠাও আমারে দীনহীন।

ঢালো এ হৃদয়মাঝে জ্বলন্ত অনলময় বল—
দিনে দিনে অবসাদে হইতেছি অবশ মলিন
নির্জীব এ হৃদয়ের দাঁড়াবার নাই যেন বল।
নিদাঘতপনশুষ্ক ম্রিয়মাণ লতার মতন
অবসন্ন হয়ে যেন ভূমি'পরে পড়িছি লুটায়ে—
চারি দিকে চেয়ে দেখি ক্লান্ত আখি করি উন্মীলন
বন্ধুহীন প্রাণহীন জনহীন মরু মরু মরু
ইত্যাদি।

প্রথম বিলাত-যাত্রার প্রাক্কালে রবীন্দ্রনাথ তখন আঠারো বৎসর বয়সে প্রবেশ করেছেন মাত্র। 'আঠারো বৎসর' বয়সের আকার প্রকার ও স্থায়িত্ব কেমন তার ভালো বর্ণন ও বিশ্লেষণ আছে জীবনস্মৃতির ভগ্নহৃদয় অধ্যায়ে। (ভগ্নহৃদয়ের অন্তর্গত একাধিক রচনা রয়েছে মালতীপুঁথিতে।) এই বয়সের এই ভাবাকুলতারই অন্য একটি নিদর্শন (পৃ ৫৭) এখানে উদ্ধৃত করি। এটির উদ্দিষ্টা কোনো মনোময়ী কল্পনা অথবা যুগপৎ ভক্তি-প্রীতি আদর-আবদার ও সখ্যের পাত্রী কোনো পার্থিবা নিশ্চিত করে কে বলবে?—

ছেলেবেলা হতে বালা যত গাঁথিয়াছি মালা
যত বনফুল আমি তুলেছি যতনে
ছুটিয়া তোমারি কোলে ধরিয়া তোমারি গলে
পরায়ে দিয়েছি, সখি, তোমারি চরণে।
আজও গাঁথিয়াছি মালা তুলিয়া বনের ফুল,
তোমারি চরণে, সখি, দিব গো পরায়ে—
নাহয় ঘৃণার ভরে দলিয়ো চরণতলে
হৃদয় যেমন করে দলেছ দু পায়ে ·

এটি কি কোনো পরিকল্পিত গ্রন্থের উৎসর্গপত্রের প্রাথমিক খসড়া? না জানি কার উদ্দেশে কবি লিখেছেন (পৃ ২০)—

কাছে থাকি, দূরে থাকি, দেখো আর নাই দেখো,
শুধু স্নেহ দাও।
স্নেহ করে ভালো থাকো, স্নেহ দিতে ভালোবাসো,
কিছু নাহি চাও।
দূরে থেকে কাছে থাকো আপনি হৃদয় তাহা
জানিবারে পায়।
সুদূর প্রবাস হতে স্নেহের বাতাস এসে
লাগে যেন গায়।
এত আছে, এত দাও, কথাটি নাহিক কও
—স্নেহপারাবার—
প্রভাতশিশিরসম নীরবে ঝরিছে সুধা
প্রাণের মাঝার।
তব স্নেহ প্রাণে মম নীরবে ভাসিয়া আসে
সৌরভের প্রায়,
উষার কিরণ-সম নীরবে বিমল হাসি
প্রাণেরে জাগায়।

না, 'না জানি কার উদ্দেশে' বলা ভুলই হয়েছে— ছাপার মুখে জানা গেল, উৎকলিত এই কবিতা 'বৌঠাকুরানীর হাট' গ্রন্থের (ভারতী পত্রে প্রকাশ ১২৮৮ কার্তিক - ১২৮৯ আশ্বিন) উৎসর্গপত্রের খসড়া মাত্র। পূর্ববর্তী কবিতাটি (পৃ ২৫৬, ছত্র ১৭-২৪) কার উদ্দেশে জানা না গেলেও, 'বৌঠাকুরানীর হাট' উৎসর্গ করা হয় পরমস্নেহময়ী জননীসমা বড়দিদি সৌদামিনীদেবীকে।

৪

মালতীপুঁথির মতো অতিপ্রাচীন নয় অথচ দীর্ঘকাল ধরে রবীন্দ্র-মানসের একখানি অপরূপ মায়ামুকুর হয়ে রয়েছে আর-একখানি

বাঁধানো খাতা, শ্রীসমীরচন্দ্র মজুমদারের সংগ্রহ-ভুক্ত, তাঁরই সৌজন্যে এটি দেখা বা এটির আদ্যন্ত আলোকচিত্র-গ্রহণ সম্ভবপর হয়েছে— তাই এটিকে মজুমদার-পুঁথিও বলা যেতে পারে। এর সম্যক্ পরিচয় দিতে গেলে হয় সমস্তটি যথাযথ ছেপে, আকিবুঁকি কাটাকুটি -সমেত, রবীন্দ্রজিজ্ঞাসুদের হাতে হাতে দিতে হয়, নয়তো বাধ্য হয়ে একখানা ভারী গ্রন্থই লেখা দরকার। উপস্থিত তদুপযোগী সময় ও সুযোগের অসদ্ভাবে সংক্ষেপে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বিবরণমাত্র আহরণ করতে চেষ্টা কবব। এখানে বলে নিই, মালতীপুঁথি হোক আর মজুমদার-পাণ্ডুলিপি হোক, কোনোটি নিয়েই নিখুঁত এবং সর্বাঙ্গীণ, বিজ্ঞানসম্মত অথবা একেবারে বস্তুতন্ত্র গবেষণা করবার শক্তি আমাদের নেই — আব, হয়তো বা প্রবৃত্তিও নেই। সহৃদয় সুধীজন বতমান লেখকেব এই অসামান্য ত্রুটি নিজগুণে মার্জনা করবেন।

আলোচ্য পুঁথিখানিব মলাটে দপ্তরীব নৈপুণ্যগুণে গোটা গোটা অক্ষরে মুদ্রিত আছে: R. N. TAGORE / POCKET BOOK / 1889। অর্থাৎ, আশ্চর্য হব না যদি বা ১২৯৫ বঙ্গাব্দের শেষের দিক থেকে সর্বদা এই খাতাখানি সঙ্গে নিয়ে ফিরে থাকেন কবি কলিকাতায়, শান্তিনিকেতনে, পদ্মাতটে, হাজারিবাগে আর গিরিরাজ হিমালয়ের স্নিগ্ধশীতল স্নেহচ্ছায়ে। খাতা খুললেই দেখা যায় যুগলপক্ষী পেন্সিলের যদৃচ্ছ লেখাজোখার রেখাজাল ভেদ ক'রে সূচ্যগ্র দীর্ঘ চঞ্চু বাড়িয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। পক্ষীতত্ত্বে অনভিজ্ঞ হওয়ায় বলতে পাবি নে একদা এরা দুটিতে পদ্মার তীরে তীরে বালি-কাদায় খোঁচা দিয়ে দিয়ে ফিরেছিল কি না, উপস্থিত পদ্মাপ্রেমিক কবির খাতায় এসে বাসা বেঁধেছে। যে দিকে দপ্তরী নাম ছেপেছে সে দিক থেকেই যে অবিচ্ছেদে লেখা চলেছে এমন নয়, খাতাটি উল্টে নিয়ে অন্য দিক থেকেও অনেক কিছু লেখা

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা—
কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা।
রাশি রাশি ভারা ভারা
ধান কাটা হল সারা,
ভরা নদী ক্ষুরধারা [redacted] খর-পরশা—
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা।

একখানি ছোট খেত, আমি একেলা,
চারি দিকে বাঁকা জল করিছে খেলা।
পরপারে দেখি আঁকা
তরুছায়ামসীমাখা
গ্রামখানি, মেঘে ঢাকা প্রভাতবেলা,
এ পারেতে ছোট খেত আমি একেলা!

গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে।
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।
ভরা পালে চলে যায়
কোন দিকে নাহি চায়,
ঢেউগুলি নিরুপায়
ভাঙে দুধারে।

হয়েছিল। সামনের দিকে প্রথমে পাই—

শুধু যাওয়া আসা
শুধু স্রোতে ভাসা।

সমস্ত গানটি লিখে কেটে দেওয়া হয়েছে। রচনাকাল ১২৯৮ সনের শেষ হওয়াই সম্ভব, কেননা ১২৯৯ বৈশাখের 'সাধনা'য় 'নূতন গান' এই পরিচয়ে স্বরলিপি-সহ ছাপা হয়েছিল। এ দিকে খাতা উল্টে নিয়ে প্রথমে পাই—

গগনে গরজে মেঘ
ঘন বরষা।

এ কবিতা, আমরা সকলেই জানি, শিলাইদহের বোটে লেখা ১২৯৮ সনের ফাল্গুন মাসে। অর্থাৎ, মলাটে ১৮৮৯ খৃস্টাব্দের নিশানা থাকলেও, ঐ সময়ের কোনো জানা-চেনা সাহিত্য-রচনা এই পাণ্ডুলিপিতে আমাদের চোখে পড়ছে এমন বলতে পারি নে। অবশ্য, এই পকেট-খাতার প্রথম দিকে অন্যের পাকা হাতে যে-সব কাঁচা হিসাব আছে জমিদারি সেরেস্তার, তা ১৮৮৯ খৃস্টাব্দের হলেও হতে পারে; সেই হিসাবে সমস্ত খাতা ভরে নি, অতঃপর কালাতিক্রমণগুণে হঠাৎ কবিতাদেবীর ব্যবহারে লেগে গেছে, স্বকীয় স্নেহবশে আর তাকে ত্যাগ করেন নি— বাণীর অলংকারে, কনকে রতনে, তার শিখনখ, কিনা প্রতি পৃষ্ঠা, ভরে দেওয়ার আগে। সে হিসাবে বা আনন্দ-বেদনার বেহিসাবে দেখতে পাই— 'সোনার তরী' পর্বের সোনার ফসলে বোঝাই হয়ে এই নূতন খাতার সূচনা পদ্মাতীরে ১২৯৮ ফাল্গুনে আর শেষ, যতদূর দেখছি, ২৩শে আষাঢ় ১৩১১, শুক্রবার, মজঃফরপুরে। মধ্যে কর্মময় ভাবসমৃদ্ধ জীবনের একটি যুগের বিস্তার। কত ভাব ও কল্পনা, সুর ও ছন্দ, নিত্য এবং নৈমিত্তিক ঘটনা, দিনজীবী মানুষ আর চিরজীবী কবির মিলিতমিশ্রিত পরিচয়লিপি— কত বেদনা, কতই-না বিস্ময় এই সময়ের মধ্যে আর এই খাতার পৃষ্ঠায়

পৃষ্ঠায় স্তরে স্তরে পুঞ্জিত হয়ে রয়েছে। অনাগত অভাবিত আশাতীত ভাবী কাল বর্তমানের বেশে ক্ষণমাত্র দেখা দিয়ে কেবলই দূর অতীতে, ক্রমশ দূরতর বিস্মৃতিতে বিলীন হয়ে গিয়েছে।

সামনের প্রথম পৃষ্ঠায় 'শুধু যাওয়া আসা' গানটির উল্লেখ পূর্বেই করেছি। পরপৃষ্ঠায় শুধু দেনা-পাওনার হিসাব ছিল মনে হয়— ক্ষেত্রবসু যজ্ঞেশ্বর হরিবোলা দ্বারিকসা শুকচাঁদ নায়েব অথবা বিহারী ডাক্তারের নামোল্লেখ ক'রে। পেন্সিলে হিজিবিজি কেটে সে-সবই বাতিল করে দেওয়ার পর বিচিত্র কতকগুলি মুখাকৃতি ফুটে উঠেছে— সে যে ওঁদেরই প্রতিকৃতি অসংশয়ে তা বলা যায় না। (সাচীকৃত নারী-পুরুষের মুখাকৃতি আছে মালতীপুঁথিতে নানা লেখার আশে-পাশে।) পরবর্তী একটি পৃষ্ঠায় দেখি শব্দতত্ত্ব-আলোচনার সূত্রপাতে বহু শব্দবিকৃতির উদাহরণ। আরও পরপৃষ্ঠায় কাঁচা হাতের লেখায় টাকা আনা পাই -ঘটিত কিছু যোগ-ভাগের নমুনা এবং ঐ হাতেই অথবা অন্য কোনো কাঁচা হাতে সহসা—

তোমার কি
হি হি হি !

আমাদের আধুনিক বানানে অনুলিখিত হতে পারবে: তোমার কী! হি হি হী! সন্দেহ হয় এটি পঞ্চমবর্ষীয়া (?) কন্যা বেলার বিদ্যাভ্যাসের নমুনা নয়, পরন্তু কবিজায়ার রহস্যপ্রিয়তার নিদর্শন— তা ছাড়া বিশুদ্ধ অত্যুক্তি মাত্র। যেমন অত্যুক্তিতে কবি নিজেও জানিয়েছিলেন যে, তাঁর—

আকাশ ঘিরে জাল ফেলে তারা ধরাই ব্যবসা।
থাক্‌গে তোমার পাটের হাটে মথুরকুণ্ডু শিবুসা।

আসলে কিন্তু পূরো আশমানদারি বজায় রেখেও আদর্শ জমিদার হতে তাঁর কোথাও কিছু বাধে নি। তার কিছু প্রমাণ পূর্বেই পাওয়া গেছে আর পরেও 'যেতে নাহি দিব' কবিতা শেষ না হতেই পাতা

উল্টে পাওয়া যায় (অন্যের হাতে)—

১২ জানুয়ারির দেয় সদর খাজনাদি

বিরাহিমপুর, সদকি, মকলুতচর ধোকড়া কোন্ সংক্রান্ত টাকা কলিকাতায় আইসে ইত্যাদি ইত্যাদি।

এবং কবিতাটি এই হিসাব ডিঙিয়ে ঐ ভাবের স্রোতে অভীষ্ট রসের মোহানায় পৌঁছুতেই আবার নূতন চর জেগে ওঠে— কালীগ্রামের সদর খাজনার হিসাব। অতঃপর কবির নিজেরই হস্তাক্ষরে বলুর জুতো ৬।০, আমার জুতো ৫৸০, চৌকি মেরামত ১৲, পুরীতে স্নানের ধুতি এক জোড়া ২৲, খণ্ডগিরি গাড়িটানা কুলি ॥০, বলু (গয়না) ১০৲, পাল্কি ২২৲ টাকা ইত্যাদি।

সুতরাং, কবি ব'লেই রবীন্দ্রনাথ যে সাংসারিক কোনো দায়-দায়িত্বের ধার ধারেন না, কবিজায়ার এ প্রচ্ছন্ন (খুব কি প্রচ্ছন্ন ?) নিন্দার ইশারা একেবারেই অমূলক। কবির ঘরণী -বিধায় কবিতা-বচনায় হাত দিলে তিনিও যশস্বিনী হতে পারেন এটি প্রমাণ করবার ইচ্ছা থাকলে অনেকটা সফল হয়েছেন বলতেই হবে। যে ধ্বনি বা ব্যঙ্গ্য হল কবিতার প্রাণ, এই দু ছত্রে সে তো বেশি বৈ কম নেই। · অথবা সবই কি আমাদের 'রীতিমত গবেষণা' অথবা অলীক কল্পনা মাত্র, আসলে লক্ষ্য করা হয় নি যে এই দু ছত্রের আগে এই পৃষ্ঠারই শীর্ষদেশে ছিল—

থাকো তুমি ওইখানে থাকো—
অন্তরের চোখে চোখে   আমার আনন্দলোকে,
সেথা হতে কাছে এসো নাকো।
থাকো তুমি ওইখানে থাকো—
ওই পারে ওই দূরে   বিরহ-অলকাপুরে
আমার হিয়ার মাঝখানে।

কবিজায়ার মনে রোষ বা সন্তোষ কী ভাব জেগেছিল কে জানে;

যুগপৎ মিলন ও বিরহের আকূতি -মিশ্রিত, নিষেধ ও মিনতি -ভরা, এই পদাবলীর গূঢ় তাৎপর্য তিনি কেমন বুঝেছিলেন— যেমনই বুঝুন, হাসতে হাসতে কবির কলম কেড়ে নিয়ে এই পরমকৌতুকী মন্তব্যটুকু না লিখে পারেন নি।

কিন্তু, এভাবে মজুমদার-পাণ্ডুলিপির ধারাবিবরণী কতই বা দেওয়া যাবে? 'সোনার তরী' থেকে 'উৎসর্গ' পর্যন্ত এর ব্যাপ্তিকাল। বঙ্গ বিহার উড়িষ্যায় আর হিমাচলপ্রদেশে, গৃহে পথে ও নদীবক্ষে, বসবাস ও চলাচলের সাক্ষ্য এর পত্রে পত্রে। বেলা রথী ও অন্যান্য সন্তানের কলকাকলি-মুখর শৈশবে পরিবৃত সুখের ও স্নেহের গার্হস্থ্য-জীবনের আদিপর্ব থেকে শুরু ক'রে ক্রমশ মৃণালিনীদেবীর অকাল মৃত্যু, রেণুকার ক্ষয়রোগ, কবির জীবনে নানা বৈষয়িক দুর্ভাবনা, সমস্যা ও সমাধানের ইঙ্গিত —এ-সমস্তই মিলিয়ে মিশিয়ে নিয়ে এর অগ্রগতি। বোধ করি নবরসের স্মিত করুণ মধুর শান্ত অদ্ভুত সব ক'টি এর বিভিন্ন পত্রপুটে বার বার পূরে উঠেছে— রুদ্র বীর বীভৎস ভয়ানক না'ই থাক্ —এ-সবের ফাঁকে ফাঁকে আছে শব্দতত্ত্বের অনুশীলন, হবু-চিত্রকরের খেয়াল-খুশি-প্রেরিত আঁকিবুঁকি, রেখা-জালের আবরণ ছিন্ন ক'রে স্থানে অস্থানে বিচিত্র রূপের চকিত আভাস— তা ছাড়া নিজের বা অন্যের হাতে বিবিধ আয়ব্যয়ের হিসাব, যজ্ঞে আমন্ত্রণযোগ্য বিভিন্ন লোকের নামের তালিকা, এমন-কি অজ্ঞাত পাকপ্রণালীর বা রসায়নপ্রস্তুতির বিচ্ছিন্ন সূত্র। কোনো-একটি গান বা কবিতার জন্মলগ্নে আকাশে বাতাসে কেমন হুলুরব উঠেছিল, জলস্থলের পরিবেশটি কেমন ছিল, সে-সবও জানা যায় না বা অনুমান করা চলে না এমনও নয়। কখনো ইছামতী কখনো আত্রাই, কখনো বড়ল কখনো নাগর নদী, আর কখনো পদ্মা। সকাল সন্ধ্যা অথবা ভোর-রাত্রি। ঝড়বৃষ্টিতে বোট টলোমলো অথবা প্রসন্ন জলস্থল আকাশে আলোকের ব্যাপ্তি। এই খাতার কল্যাণে আমরা

জানতে পারি— ফাল্গুনের দিনে কবি ধ্যান করেছেন ঘনবরষার; অসুস্থ অবস্থায় রামপুর-বোয়ালিয়ায় লিখছেন 'ওরে মৃত্যু জানি তুই আমার বক্ষের মাঝে বেঁধেছিস বাসা' আর নাটোর হয়ে শিলাইদহে পৌঁছে, ১২৯৯ অগ্রহায়ণের ১৬, ২০, ২৭ তারিখে, ক্রমে এ কবিতা শেষ করেছেন। জানতে পারি কোন্ কবিতা কিরূপে প্রথম আবির্ভূত হয়ে কোন্ রূপে বা রূপান্তরে অবশেষে সার্থক হয়েছে। কে বা অকালে এসে দ্বিধাভরে ফিরে গেছে, বহুকাল পরে 'যৌবনে গঠিতা পূর্ণপ্রস্ফুটিতা' তার অলৌকিক প্রকাশ দেখে কেউ বোঝে নি কোন্ প্রচ্ছন্ন বৃন্তে বিধৃত এই অপরূপ। পূর্বে 'সোনার তরী' থেকে 'স্মরণ'-'উৎসর্গ' পর্যন্ত এই পুঁথির সীমানা নির্দেশ করে থাকলেও এখন বলি— 'খেয়া'র কোনো কোনো কবিতার পূর্বাভাসও এ ক্ষেত্রে আবিষ্কার করা যায় আর বহুপরবর্তী শিশুশিক্ষার 'সহজপাঠ' (১৩৩৬) সেও বীজাকারে বর্তমান। অল্প পরিসরে ও অল্প সময়ে সব বিবরণ কখনোই দেওয়া যাবে না, প্রধান প্রধান তথ্য যতটা দেওয়া যায় অতঃপর সে বিষয়ে আমরা যত্ন করব।

এক স্থলে আপন কবিকর্ম সম্পর্কে কৌতুক করে লিখছিলেন রবীন্দ্রনাথ— পরে কেটেও দিয়েছেন—

নাহি অবসর।

আখি ভরা ঘুমঘোরে, উঠিয়াছি কোন্ ভোরে,
বসিয়াছি ঘড়ি ধ'রে, রুধিয়াছি ঘর।
কলমের খোঁচা লেগে ভাবগুলো রেগে-মেগে
কাঁচা ঘুমে উঠে জেগে নাহি পায় পথ।

১৩০২, ৫ আশ্বিনের এই লেখা। অন্যত্র এমন আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন স্পষ্টভাষী গদ্যে, পূর্বাপর রবীন্দ্রসাহিত্যে হঠাৎ যার জুড়ি মেলানো যায় না।—

'পূর্বজন্মে অবশ্য একটা মহাপাপ করিয়াছিলাম, নতুবা লেখক

হইয়া জন্মিলাম কেন? মনের ভাবগুলো যখন বাহিরে আনিয়া ফেলিয়াছি তখন বাহিরের লোক উচিত অনুচিত যে কথাই বলে, না শুনিয়া উপায় নাই। সুধাকর চন্দ্র, তুমি যদি ক্ষীরোদসমুদ্রের মধ্যেই আরামে শয়ান থাকিতে তাহা হইলে কবিদের কবিত্ব করিবার কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত হইত বটে, কিন্তু নিশীথের শৃগাল তোমার দিকে মুখ তুলিয়া অকস্মাৎ তারস্বরে অসম্মান জানাইয়া যাইত না।

'মনের ভাব যখন মনে ছিল সে যেন গৃহদেবতা ইষ্টদেবতা ছিল; এখন কী মনে করিয়া তাহাকে চতুষ্পথে বটবৃক্ষের তলায় স্থাপন করিলাম? সকল জীবজন্তুই কি তাহার সম্মান বোঝে? যদি বা না বোঝে তবুও কি তাহাকে বিশ্বের চোখের সামনে পাথর হইয়া বসিয়া থাকিতে হয় না?

'তাহার পর আবার আত্মীয়বন্ধুদের কাছেও জবাবদিহি আছে। এটা কেন লিখিলে? ওটা কিভাবে বলিলে? সেটার অর্থ কী? এও তো বিষম দায়! যেন আমি কোদাল দিয়া পথ কাটিতেছি বলিয়া গাড়ি করিয়া মানুষকে পার করিয়া দেওয়াও আমার কর্তব্য!

'যাহা হউক, ঝগড়া কাহার সহিত করিব? জন্মকালে অদৃষ্টপুরুষ ললাটে এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সেই প্রবীণ ভাগ্যলিপি-লেখক মহাশয়কে তাঁহার কোনো লিখনের জন্য সহস্র লাঞ্ছনা করিলেও তিনি দিব্য গা-ঢাকা দিয়া বসিয়া থাকেন। আর তাঁহারই বশবর্তী হইয়া আমরা যদি দুটো কথা লিখি তাহা হইলে কথার আর শেষ থাকে না।'

এই আক্ষেপের শিরোদেশে—

হে সিন্ধু, ধরিত্রী তব গর্ভের সন্তান
অনিন্দ্যসুন্দরী। কত দীর্ঘ যুগ ধরে
আঁধার জঠরে

এই কয় ছত্র লিখে কেটে দেওয়া হয়েছে। তারও পূর্বে— কাটজুড়ি,

বালুহন্তা, ভার্গবী, সর্দাইপুর, ভুবনেশ্বর, ধৌলি, খণ্ডগিরি, দূরে জগন্নাথের মন্দির, সমুদ্রতীর, এ-সব ভ্রমণের বা দর্শনের বে-তারিখ সূত্রাকার বিবরণ আর তৎপূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে জোড়াসাঁকোর গৃহে লেখা 'যেতে নাহি দিব' কবিতা।

৫

পূর্বেই বলা হয়েছে, মজুমদার-পুঁথির যত্র তত্র শব্দতত্ত্ব-সন্ধানের নানা নিদর্শন বিকীর্ণ আছে। 'শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থের প্রকাশ বাংলা ১৩১৫ সালে হলেও, গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধগুলি তৎপূর্বে ১২৯২ থেকে ১৩১১ বঙ্গাব্দের মধ্যে 'বালক' 'সাধনা' 'ভারতী' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রচারিত হয়। আলোচ্য পুঁথিও প্রায় সমকালীন। শব্দতত্ত্বের অনুধাবনে কবি মন দেন আরও বহু বৎসর পূর্বে প্রথম ইংলন্‌ড্‌-প্রবাসের সময়, স্কট-পরিবারের প্রিয়সখীসমা কন্যা দুটিকে বাংলাভাষা শেখানোর উৎসাহে। চারুহাসিনী চারুভাষিণী কোন্ কন্যা বাংলাভাষা কতদূর শিখেছিলেন আমরা জানি নে, ইংলন্‌ডে কবির স্থিতিকালও সুদীর্ঘ হয় নি। ভাষা শেখানোর সঙ্গে ভাষাতত্ত্বের আলোচনা এক সূত্রে গাঁথা এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিশেষতঃ বিদেশের মানুষকে শেখাতে হলে। অতএব আলোচ্য পুঁথিতে আমরা যে-সব শব্দতত্ত্ব-সন্ধানের নমুনা দেখি তারও বহু পূর্বেই কবির এ বিষয়ে চিন্তা ও চেষ্টা আরব্ধ হয়েছিল, তেমনি বাঙালির ঘরে প্রথমশিক্ষার্থীর উপযোগী 'সহজপাঠ'-মালা-প্রণয়নের অল্প যে নিদর্শন আলোচ্য পাণ্ডুলিপিতে আবিষ্কৃত হয়েছে সেও পূর্বের এই-জাতীয় অন্য কোনো উদ্যমের ধারাবাহী নয়-যে তাই বা কেমন করে বলব? যা হোক, প্রথমভাগ সহজপাঠ প্রকাশিত হয় ১৩৩৬ সালে; তারই বীজাকার বা ভ্রূণরূপ এখানে দেখা দিয়েছে ১৩০২-১৩০৩ বঙ্গাব্দের কোনো সময়ে। ১৩১১।১২ সালের পরেও দীর্ঘকাল এ খাতা কবির নিকটে ছিল এমন আমরা

অনুমান করি নে। অথবা, খাতায় সাদা পাতা আর যখন রইল না, মুখ্য লেখাগুলি বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে ছাপা হয়ে গেল, তখনও এ খাতা কোনো দিন খুলে দেখেছিলেন এমন মনে হয় না। তা হলে অন্তর্বর্তী প্রায় বত্রিশ-চৌত্রিশ বৎসরেও কবির সংকল্পে বা চিন্তা-প্রণালীতে কোনো দিগ্‌ভ্রংশ হয় নি এটি স্পষ্টই দেখা যায়; বিষয়টির আসল কাঠামো সহজেই তাঁর স্মৃতিবিধৃত হয়ে ছিল, যথাকালে পূর্ণ আকার অবয়ব নিয়ে লোকসমাজে প্রকাশ পেয়েছে। ঘটনাটি যেমন কৌতূহলোদ্দীপক তেমনি বিস্ময়কর। 'সহজপাঠ' আজ প্রায় ঘরে ঘরে আছে; নিম্নের উদ্‌ধৃতিটুকু যে-কোনো অনুসন্ধিৎসু পাঠক তারই সঙ্গে তুলনা করতে পারবেন। পদ্ধতির মিল তো আছেই, ভাষা ও ভঙ্গী -গত সাদৃশ্যও অল্প নয়।—

ক কাটে কাঠ। খ খায় খই।
গ গায় গান। ঘ ঘুমোয় ঘরে।
ঙ করে উ আঁ। তার চোখে লাগে ধুঁয়া।
চ চড়ে চালে। ছ ছেঁড়ে ছাতা।
জ জড়ায় জাল। ঝ ঝাড়ে ঝুলি।
কুকুরছানা ঞ কাঁদে ই য়ঁ ইয়।
ট টানে টিকি। ঠ ঠেলে ঠিলি।
ড ডোবে ডোবায়। ঢ ঢোকে ঢাকে।
ণ বলে শোনো
আমি মূর্দ্ধণ্য ণ।
ত তোলে তেঁতুল। থ থাকে থামে।
দ দোলে দোলায়। ধ ধোয় ধুতি।
ন বলে শোন্ ত
আমার নাম দন্ত্য।
প পড়ে পাঁকে। ফ ফেলে ফল।

[illegible]

ক কয় কথা। খ খায় খই।
গ গায় গান। ঘ ঘুমোয় ঘরে
ঙ কহে উঁ ওঁ। [illegible]
চ চড় চালে। ছ ছুঁচো [illegible]।
জ জড়ায় [illegible]। ঝ ঝাড়ে ঝুলি।
[illegible] ঞ কাঁদে ইঁ ইঁ ইঁয়।
ট টানে টিকি। ঠ [illegible]।
ড ডাকে ডাকায়। ঢ [illegible] ঢাকে [illegible]
ণ বলে শোনো
আমি মূর্দ্ধন্য ণ।
ত তোলে তেঁতুল, থ থাকে থমে
দ দোলে দোলনায়, ধ ধোঁয় ধুতি –
ন বলে শোন তো
আমার নাম দন্ত্য ন।
প পাড়ে পাকা, ফ ফেলে ফল
ব বোঝে বক ভ ভাঙে ভাঁড়
ম বলে মামী মামা
আমার নাম [illegible]।
য যায় যশোর, র রাঁধে রান্না
ল লাগায় লাঠি [illegible]

ব বেড়ায় বনে। ভ ভাঙে ভাঁড়।
ম বলে মামা
আমায় মাচা থেকে নামা।
য যায় যশোরে। র রাঁধে রাস্তায়।
ল লাগায় লাঠি। ব বাজায় বীণা।
শ ষ স তিন ভাই শোনায় শানাই।
হ হাঁচে হক্ষ
ক্ষ কাশে খক্ষ।
দুই বাবু অ আ বসে খায় হাওয়া।
দুই মেয়ে ই ঈ শীতে কাঁপে হী হী।
দুই বুড়ি উ ঊ কাঁদে বসে হু হূ।
দুই বুড়ো ঋ ৠ চলে ধীরি ধীরি।
দুই বোন ঌ ৡ হাসে খিলি খীলি।
দুই ভাই এ ঐ হেঁকে বলে দে দই।
গুটিসুটি ও ঔ বসে আছে দুই বৌ।

সংকলিত পাঠগুলিতে গূঢ়ভাবে বা স্পষ্টতই ছন্দস্পন্দ বর্তমান এ কথা না বললেও চলে। অক্ষরগুলির প্রত্যেকটি যেন মনের পটে এঁকে নিয়ে প্রত্যক্ষ করেছেন কবি— বিশেষতঃ স্বরবর্ণগুলির কৌতুককর ও মনোহর রূপ ফুটিয়ে তোলা দক্ষ শিল্পীর তূলিতে সহজেই সিদ্ধ হবে। স্বরবর্ণ এ ঐ অঙ্গুলি-নির্দেশে দেখাতে গিয়ে 'দে দৈ' এমন লিখতে পারতেন কবি এই আমাদের ধারণা। অপর পক্ষে, 'খিলি খীলি' ধ্বনিতে কতকটা স্বরবৈচিত্র্যের ইঙ্গিত করলেও, 'হী হী'তে করেন নি আর 'হু হূ' লিখেও পরিবর্তন করেছেন মনে হয়, তার কারণ এই যে, শেষোক্ত দুটি ক্ষেত্রে ছন্দোমাধুর্যের অনুরোধে জোড়া জোড়া দীর্ঘ-স্বরের উচ্চারণই প্রশস্ত এবং কর্ণে মধুবর্ষণও করবে যদি হয় 'বালভাষিতম্'।

৬

অতঃপর বিভিন্ন হিন্দিগানের সুর ভেঙে বিচিত্র নূতন গান রচনার বহুতর নিদর্শন দেখি। আরও পরে ২৯ ভাদ্র ১৩০৩ তারিখের রচনা: কে যায় অমৃতধামযাত্রী। এক-এক সময় ঝাঁকে ঝাঁকে নূতন গান এসে জুটেছে কবিমানসের বিজন কূলে, শীতান্তে মানস-প্রতিবর্তী হংস-পংক্তির মতো। মজুমদার-পুঁথির সমুদয় গানের একটি তালিকা[৩] দিলে ক্ষতি আছে কি? প্রথম গানটির রচনার বিষয়ে কিছুই জানা যায় নি, না হলে সত্যই বলা যায় যে, ১৩০২ আশ্বিনে, শিলাইদহের পদ্মাতটে, অশ্রুত বিভাস-ভূপালি সুরের গুঞ্জরণে রবিকরোজ্জ্বল অপরূপ এক দৃশ্যপট উদ্‌ঘাটিত হল।—

আমার মন মানে না দিনরজনী[৪]
তুমি নূতন কি তুমি চিরন্তন[৫]
ঝর ঝর বরষে[৫]
ফিরে এস ফিরে এস[৫]

১ ওলো সই, ওলো সই। ৫ আশ্বিন ১৩০২। বোট। শিলাইদহ
২ মধুর মধুর ধ্বনি বাজে। ৬ আশ্বিন ১৩০২। বোট। শিলাইদহ
৩ বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে। ৮ আশ্বিন ১৩০২। বোট। শিলাইদহ

বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে। ৪-৯ আশ্বিন
আহা, আজি মোর দ্বারে কাহার মুখ হেরেছি

৪ কে দিল আবার আঘাত আমার। ১২ আশ্বিন ১৩০২ বিজয়াদশমী। শিলাইদহ
৫ এসো গো নূতন জীবন। ১৩ আশ্বিন ১৩০২
৬ পুষ্পবনে পুষ্প নাহি। ১৪ আশ্বিন
৭ আহা জাগি পোহালো বিভাবরী। ১৫ আশ্বিন
৮ হে অনাদি অসীম সুনীল অকূল সিন্ধু। ১৬ আশ্বিন[৬]

৯ উঠ রে মলিনমুখ। ২৬ ভাদ্র ১৩০২। জোড়াসাঁকো[৭]

১০ তোমার গোপন কথাটি সখি। ১৮ আশ্বিন

১১ চিত্ত পিপাসিত রে। ২৩ আশ্বিন

১২ আমি চিনি গো তোমারে। ২৫ আশ্বিন

১৩ আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল। ২৯ আশ্বিন

১৪ ওগো ভাগ্যদেবী পিতামহী। ১ কার্তিক

১৫ একি আকুলতা ভুবনে। ১৬ কার্তিক ১৩০২। জোড়াসাঁকো

১৬ তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম। ১৮ কার্তিক। জোড়াসাঁকো

১৭ সে আসে ধীরে। ২১ কার্তিক

১৮ কে উঠে ডাকি। ২২ কার্তিক। জোড়াসাঁকো

১৯ ওহে সুন্দর, মম গৃহে আজি। ২৩ কার্তিক

২০ তুমি যেয়ো না এখনি। ২৪ কার্তিক

২১ আকুল কেশে আসে, চায় ম্লান নয়নে। ২৫ কার্তিক

২২ হৃদয়চন্দ্র হৃদিগগনে। ২৯ কার্তিক

২৩ কী রাগিণী বাজালে হৃদয়ে। ২৯ [কার্তিক][৮]

অতঃপর মাত্র দু পৃষ্ঠায় সহজ পাঠের খসড়া। পরবর্তী তারাচিহ্নিত গানগুলি 'হিন্দিভাঙা' মনে হয়।[৯]—

*শীতল তব পদছায়া

*আজি রাজ-আসনে তোমারে

আজি কোন্ ধন হতে বিশ্বে আমারে [১৪ শ্রাবণ ১৩০৩]

*তোমা-হীন কাটে দিবস

*হৃদয়-আবরণ খুলে গেল

আমার সত্য মিথ্যা সকলই ভুলায়ে দাও

মধুর রূপে বিরাজ

আর কত দূরে আছে

কে যায় অমৃতধামযাত্রী। ২৯ ভাদ্র ১৩০৩

*আজি মম মন চাহে জীবনবন্ধুরে
*হরষে জাগো আজি
শান্ত হ রে মম চিত্ত নিরাকুল
*শান্তি করো বরিষণ
*সুন্দর বহে আনন্দমন্দানিল
*ভক্ত হৃদয়- [হৃদ্]- বিকাশ
*পান্থ, এখনো কেন অলসিত অঙ্গ
*আনন্দ-উষাকালে মঙ্গলরবি। কেবল এক ছত্র—
পরে হয় : আনন্দ তুমি স্বামী
*বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা
কেন ধরে রাখা, ও যে যাবে চলে
বৃথা গেয়েছি বহু গান। ২৮ ভাদ্র ১৩০৪
কেন বাজাও কাঁকন কন কন [১৩০৪]
হেরি নবীন শ্যামল ঘন। ৬ আশ্বিন। ইছামতী। ঝড়-বাদলা
এবার চলিনু তবে। ৭ আশ্বিন ১৩০৪। ইছামতী
যামিনী না যেতে জাগালে না। ৭ আশ্বিন ১৩০৪। যমুনা নদী
বন্ধু, কিসের তরে অশ্রু ঝরে। খসড়া। ৭ আশ্বিন ১৩০৪। বড়ল
আমি কেবলই স্বপন করেছি বপন। ৮ আশ্বিন ১৩০৪। বলেশ্বরী
ভালোবেসে, সখী, নিভৃতে যতনে। ৮ আশ্বিন ১৩০৪। সাজাদপুর
তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর। ৯ আশ্বিন ১৩০৪। চলন বিল।
ঝড়বৃষ্টি
যদি বারণ করো তবে। ৯ আশ্বিন ১৩০৪। চলন বিল।
দিনে দু-তিন বার করে ঝড় হচ্ছে। বোট টলমল
আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি। ১০ আশ্বিন। নাগর নদী
সখি, প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে। ১০ আশ্বিন ১৩০৪।
নাগর নদী। মেঘবৃষ্টি। শনিবার অমাবস্যা

বিধি ডাগর আঁখি যদি দিয়েছিল। ১০ আশ্বিন। নাগর নদী। ধান ক্ষেতের ভিতর

বঁধু, মিছে রাগ কোরো না। ১০ আশ্বিন। পতিসর

এ কি সত্য, সকলই সত্য। ১৩ আশ্বিন। রেলপথে

*নিত্য সত্যে চিন্তন করো রে

*কে বসিলে আজি হৃদাসনে

*উঠি চলো সুদিন আইল

লহ লহ তুলি লহ হে[১০]

কে এসে চলে যায় ফিরে আকুল নয়নের নীরে[১১]

তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়

দুইটি হৃদয়ে একটি আসন

*স্বপন যদি ভাঙিলে

*দুঃখরাতে, হে নাথ, কে আসিলে

*আনন্দ তুমি, স্বামী, মঙ্গল তুমি

*মন্দিরে মম কে আসিলে

দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া

নিবিড় আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা

আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু

গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে

প্রভু, দাঁড়াও আমার আঁখির আগে। ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩১১। শান্তিনিকেতন

আজি যত তারা তব আকাশে। ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩১১। শান্তিনিকেতন

মন তুমি, নাথ, লবে হ'রে। ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩১১। শান্তিনিকেতন

গরব মম হরেছ প্রভু। ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩১১

সবার মাঝারে তোমারে স্বীকার করিব হে। ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩১১

যে কেহ মোরে দিয়েছে সুখ। ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩১১

কী সুর বাজে আমার প্রাণে। ২৩ আষাঢ় ১৩১১। মজঃফরপুর

তুমি যে আমারে চাও আমি সে জানি। ২৩ আষাঢ় ১৩১১। শুক্রবার

মজুমদার-পুঁথি উল্টে নিলে অন্য দিকেও কতকগুলি গান পাওয়া যায়—

উজ্জ্বল করো হে আজি। ৯ বৈশাখ ১৩০৩

অয়ি ভুবনমনোমোহিনী। পৌষ ১৩০৩

১৩০৯, ১০ মাঘের পরবর্তী—

যে তরণীখানি ভাসালে দুজনে

দুজনে যেথায় মিলিছে সেথায়

কবির লুপ্তাবশিষ্ট কয়েকটি পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে, শূন্যে-বিলীন ভূতকালের দীর্ঘ পথ বেয়ে, উজ্জ্বলমধুর শারদদিবসের মাধুরী থেকে কখন এসে পড়েছি শোক ও সান্ত্বনার গভীর গম্ভীর রহস্যচ্ছায়ায়। মৃণালিনীদেবী ১৩০৯ সালের ভাদ্রে শান্তিনিকেতনে অসুস্থ হয়ে প'ড়ে অগ্রহায়ণের ৭ তারিখে কলিকাতায় দেহত্যাগ করলেন। কবি শীঘ্রই ফিরে এলেন বোলপুরের নিঃশব্দশান্তিমন্ত্রধ্বনিত আকাশের তলে প্রান্তরের কোলটিতে। অন্তর্হিতা যে গৃহলক্ষ্মী কবিজীবনের অন্তর্যামিনী জীবনলক্ষ্মীতে লীন হতে চললেন তাঁরই উদ্দেশে উদ্‌গত অশ্রুর প্রেমপূত তর্পণবারি ধরে রাখলেন কবিতার পর কবিতায়। উচ্ছ্বাসে আবেগে ও উচ্চস্বর হাহাকারে পূর্ণ নয় ব'লেই সেই কবিতাবলির অকৃত্রিম আন্তরিকতা ও গভীরতা সমধিক। কালে ব্যক্তিগত শোক পরিণত হল জগতের সর্বজনীন সর্বকালীন প্রিয়বিচ্ছেদের করুণ বেদনায়— তার রূপ ক্রমেই অন্তরিত হল স্ফটিকোপম স্বচ্ছ রূপকের অন্তরালে। ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ ও কবি রবীন্দ্রনাথের মানসের এই-যে গতি ও পরিণতি, তার সকল কথাই মেলে ধরেছে এই পাণ্ডুলিপি এবং



মেজবোঠান সত্যেন্দ্রনাথ

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নতুন বোঠান



মৃণালিনী দেবী

পরে সমগ্র 'স্মরণ' কাব্যে ও 'উৎসর্গে'র অনেকগুলি কবিতায় সহৃদয়-জনের চিরস্মরণীয় হয়েছে। স্মরণের কবিতাগুলি সকলেই চেনেন, উৎসর্গের যে অপূর্ব রূপকগুলির কথা বলেছি, গুণ্ঠন মোচন ক'রে একবার দেখি তাদের সিক্তপক্ষ্ম করুণ মাধুরী। সেই কবিতাগুলি হল—

আমাদের এই পল্লীখানি পাহাড় দিয়ে ঘেরা।

১৩০৯, ১০ মাঘ তারিখে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এর রচনা; অনেক সংস্কার করে গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে। (স্মরণের পঁচিশটি কবিতার মধ্যে উনিশটি এই খাতায় আছে এবং সম্ভবতঃ সেগুলি সবই বোলপুর-শান্তিনিকেতনে লেখা।) কয়েক মাস পরে, ১৩০৯, ১০ চৈত্র তারিখে হাজারিবাগে লিখলেন—

মন্ত্রে সে যে পূত
রাখীর রাঙা সুতো
বাঁধন দিয়েছিনু হাতে।

প্রিয়বিয়োগব্যথা মধুর ভাবনায় পরিণত হয়েছে আরও পরে, ১৩১০, ২৯ বৈশাখের এই কবিতায়—

আমি যারে ভালোবাসি সে ছিল এই গাঁয়ে।

বৎসর ঘুরে গেছে। অসুস্থ কন্যা রেণুকার পরিচর্যায় নিযুক্ত আছেন কবি আলমোড়ায়। কার মর্মব্যথা ফুটে উঠেছে কার ভাষা-ভরা চাহনি চলা হাস্য কটাক্ষের অতর্কিত বিলয়ে, উভয়েরই নাম একেবারে মুছে গেছে এই রচনা থেকে। 'বিশ্বের বিরহী যত', যে দেশে যে কালের হোক তারা, প্রত্যেকেরই বিষন্ন দীর্ঘশ্বাস এর ছত্রে ছত্রে সমীরিত। তেমনি আরও অনেকগুলি কবিতায়, যেমন—

'আজিকে গহন কালিমা লেগেছে গগনে'
'পথের পথিক করেছ আমায় সেই ভালো ওগো সেই ভালো'
'সেদিন তুমি কি এসেছিলে ওগো সেকি তুমি মোর সভাতে'
'আলো নাই, দিন শেষ হল ওরে পান্থ বিদেশী পান্থ'

ব্যক্তির একই বিষাদ ও বেদনা, পরিণামে আত্মনিবেদনপর শান্তি ও প্রণতি, নানা রূপে ও রূপান্তরে ফুটে উঠেছে। উল্লিখিত কবিতা-চতুষ্টয় বা সগোত্র আর-কয়েকটি, বর্তমান পাণ্ডুলিপিতে না পেলেও প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ করতে হল।

অন্ধকার ফিকে হয়ে কখন ভোরের আলো ফুটে উঠতে চাইছে, 'ভোরের পাখি'র কাছে সে বার্তা পেয়েছেন কবি। নব-প্রভাতের আলোকে জেগে উঠে মনে হল—

না জানি কারে দেখিয়াছি, দেখেছি কার মুখ—
প্রভাতে আজ পেয়েছি তার চিঠি।

কবিচিত্তের কুঞ্জবনে আবার নানা দিকে গেয়ে উঠল নানা বন-বৈতালিক ; গাছের চিকন-কচি পাতায় পাতায় ঠিকরে পড়ল আলো, যেন ইন্দ্রাণীর আলোককঙ্কণের চকিত দ্যুতি ; আপন চিরকিশোর সত্তাকেই আহ্বান করে আবার গেয়ে উঠলেন—

ওরে আমার কর্মহারা, ওরে আমার সৃষ্টিছাড়া,
ওরে আমার মন রে আমার মন !

আশ্চর্য কবিচিত্তবৃত্তি, আশ্চর্য প্রতিভার ধর্ম ! কত অল্পকালে কী পরিণতি ! (পূর্বোক্ত 'ভোরের পাখি' বা অন্য দুটি কবিতা-রচনার স্থানকাল হল— হাজারিবাগ, ১১-১২ চৈত্র ১৩০৯ বঙ্গাব্দ।) কিন্তু এখানেই সকল রহস্যের শেষ নয়, আর শেষ যদি হত তা হলে 'পুষ্পাঞ্জলি' ধরত না 'লিপিকা'র রূপ। তেইশ বছরের শোক ষাট বছরের কাছাকাছি এসে যে গদ্যকবিতাবলিতে আকার পেয়েছে সে তো কোনো-একজন মানুষের ক্ষণকালীন অশ্রুআসার নয়, পরন্তু এক-একটি নিটোল মুক্তা বললেই চলে। 'পুষ্পাঞ্জলি'র চিহ্ন না থাকলে 'লিপিকা'র 'সন্ধ্যা ও প্রভাত' 'একটি দিন' 'একটি চাউনি' বা 'প্রথম শোক'কে যেমন "সনাক্ত" করা যেত না— সেজন্য কাব্য-রসাস্বাদে ব্যাঘাত বা অসুবিধা কিছু হত এমন আমরা মনে করি নে—

মজুমদার-পুঁথির নেপথ্যভূমিতে তেমনি চুরি ক'রে প্রবেশ ক'রে জেনেছি এক দিকে 'চিত্রা'র অন্য দিকে 'খেয়া'র দু-একটি কবিতার 'জননান্তরসৌহৃদানি' ; না হলে জানবার কোনো উপায়ই ছিল না। চিত্রার সম্পর্কে কৌতূহল চরিতার্থ হয় এই পর্যন্ত। দেখি সিন্ধুপারে কবিতাব সূচনা হয়েছিল এই ভাবে—

ঘুমাতেছিলাম গভীর নিশীথে
পৌষরজনী আড়ষ্ট শীতে
খণ্ডচন্দ্র পাণ্ডুবরণ
হিমবিজড়িত জ্যোৎস্নাকিরণ।

মনেব মতো না হওয়ায় কেটে দিয়ে আবার লিখেছিলেন—

পৌষরজনী শীতজর্জর
নির্বাণদীপ নির্জন ঘর
তপ্তশয়ন প্রিয়াব মতন
রেখেছিল মোবে সোহাগ বেড়িয়া ইত্যাদি।

সেও বর্জন করে এই প্রথম ছত্রটি যেই পাওয়া গেল—

পৌষপ্রখর শীতে জর্জব ঝিল্লিমুখব রাতি

আপন বেগে আপনি পথ কেটে প্রবাহিত হল ছন্দ এবং ভাব, কল্পনা সচ্ছন্দে উপনীত হল অভীষ্ট লক্ষ্যে। খাতার উল্টো দিকের মুখপাতে 'কপাল-টুক্‌নি' একটি ছত্র পাই—

যাছিলদিনুআজকিদিবকাল।

চিনতে দেরি হয় না এটি 'চিত্রা'র কোন্ কবিতার পূর্বাভাস। আর পূর্বোক্ত পৃষ্ঠাতেই দেখি—

আমার বক্ষপবে
মৃত্যু এসে নৃত্য করে গো
তাব কেশ আলুলিত।

এটি কোনোদিন পরিপূর্ণ রূপে রাগে ছন্দে সুরে গান বা কবিতা হয়ে

উঠেছে কি না সে তো আজ বলা যায় না। এহ বাহ্য। কৌতুক বা কৌতূহলের নিবৃত্তি শুধু। কিন্তু, নানা বর্জিত অসম্পূর্ণ লেখার মধ্যে হঠাৎ যখন আবিষ্কৃত হয় (পাঠক, 'খেয়া'র ১৩৬১ বা তৎপরবর্তী মুদ্রণের পাণ্ডুলিপিচিত্রখানি দেখে নেবেন)—

এক বরষার রাত্রে এ আমার অশ্রুসরোবর
কূল ছাপাইয়া কোথা গেছে চলি দিক্ দিগন্তর।
প্রভাতে উঠিয়া দেখি
মাঝে ফুটিয়াছে একি
শূন্যবনে একমাত্র শতদল সম্পূর্ণ সুন্দর !
সমস্ত আকাশ আজি অনিমেষ তাঁরি মুখ'পরে
নিস্তব্ধ চাহিয়া আছে সুগভীর প্রশান্ত আদরে।
বাতাস থামিয়া আছে
সুদূর তীরের কাছে—
বিহঙ্গ গাহে না গান জানি না কী বিস্ময়ের ভরে।

আমাদেরও বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। বিস্ময় এজন্য নয় যে মৃণালিনী-দেবীর বিয়োগব্যথাহত কবি ঠিক মনের মতো শব্দ ও ছন্দ খুঁজে পান নি ভাবকে ভাষা দিতে গিয়ে, অর্ধপথে অচল হয়েছে লেখনী, তাই স্মরণের কবিতাবলিতে এটির স্থান হয় নি। বিস্ময় এজন্যই যে—

এক রজনীর বরষনে শুধু কেমন করে
আমার ঘরের সরোবর আজি উঠেছে ভরে !
নয়ন মেলিয়া দেখিলাম ওই
ঘন নীল জল করে থই থই—
কূল কোথা এর তল মেলে কৈ কহ গো মোরে।
এক বরষায় সরোবর দেখো উঠেছে ভরে।

এই [illegible]
[illegible]
[illegible]

প্রভাতে উঠিয়া দেখি
মনে হোলো এ কী
শ্যামল [illegible] সম্পূর্ণ সুন্দর!

অসীমের
সমস্ত আকাশ আছে তারি ভুবন ভরে
সূর্যের প্রশান্ত
নিস্তব্ধ চাহিয়া আছি, পরম আদরে।
বাতাস থামিয়া আছে
সুদূর তীরের কাছে, —
বিহঙ্গ গাহে না গান জানিনা কিসের ডরে

ওরে প্রাণ তোর ওই গানে
আমি একাকী অবসানে।
জাগরে জাগরে [illegible] জাগরে —
তোমার এসেছে অশ্রু সাগরে।
কেহ তারে নাহি জানে
কেহ তার নাহি মানে
তবু গর্জমানে জাগরে —
তরী তোর নাচে অশ্রু সাগরে।

হেরো হেরো মোর অকূলঅশ্রুসলিলমাঝে
আজি এ অমলকমলকান্তি কেমনে রাজে।
একটি মাত্র শ্বেতশতদল
আলোকপুলকে করে ঢলোঢল—
কখন্ ফুটিল বল্ মোরে বল্ এমন সাজে
আমার অতলঅশ্রুসাগরসলিলমাঝে।

'খেয়া'র এই অপরূপ কবিতাটি যে বৃন্তহীন পুষ্প নয়, অবস্তু নয় বা কল্পনামাধুরী মাত্র নয়, জীবনের একান্ত বাস্তব অভিজ্ঞতারই পরম-ব্যঞ্জনা বা পারগামী তাৎপর্য —এ কথাটি তো জানা গেল। অন্ধকার হয়ে গিয়েছে আলো; ধুলোমাটি হয়েছে পেলবস্নিগ্ধ শুভ্র কুসুম। কল্পনা নয়, রূপক নয়— নিজের জীবনেই নিখিলজীবনের প্রত্যক্ষতা ও প্রতিভাস। কবি সুখদুঃখে অবিচল থাকতেন, শোকতাপের ঊর্ধ্বে উঠে যেতেন, ব্যক্তিগত রাগবিরাগের তুলনায় ভাবনাকল্পনা ও আত্মগত ধ্যানধারণা ছিল তাঁর কাছে সত্যতর, এ-সব বলতে কোনো বাধা না থাকলেও, সবই অর্ধসত্য মাত্র। 'কাব্য প'ড়ে যেমন ভাবো কবি তেমন নয় গো'। দ্বন্দ্বময় দুঃখময় মানবজীবনেরই অপূর্ব রূপান্তর হল কবিতা। পূর্বেই বলেছি ধুলো হয়েছে ফুল। ফুল গন্ধ হয়ে আকাশে বাতাসে নিঃশব্দে ছেয়ে গেছে, তারই 'অপরশ' আলিঙ্গনে চকিত হয়ে নির্জনপথচারী হয়তো জানতে পারে না অথবা জানতে চায় না কোথাকার কোন্ ফুলে এই সৌরভ জেগেছে। অথচ, জানলে কি বিস্মিত হবে না? ভালো লাগবে না? 'ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা' অথবা 'কখনো বা ভাবময় কখনো মুরতি' —এ কথার নিগূঢ় তাৎপর্য তখনই বোঝা যাবে।

যা হোক, রবীন্দ্রকাব্যগ্রন্থ খুলে 'বিশ্বের কবিতা'য় আমরা যখন খুশি মগ্ন হতে পারি, 'গৃহের বনিতা' সম্পর্কেই আরও একটু বলবার কথা ছিল— যথাস্থানে বলা হয় নি। পাণ্ডুলিপির যে পৃষ্ঠায় স্মরণের

প্রথম কবিতাটি দেখি, 'তুমি মোর জীবনের মাঝে মিশায়েছ মৃত্যুর মাধুরী', তার পূর্ববর্তী পৃষ্ঠায় পাই—

কুঞ্জকুটিরের স্নিগ্ধ অলিন্দের 'পর
কালিন্দীকমলগন্ধ বহিবে সুন্দর,
মুদিতনয়না লীনা তব অঙ্কতলে,
বাসন্তী সুবাস উঠে এলানো কুন্তলে—
তাঁহার করিব সেবা সেদিন কি হবে
কিসলয়-পাখাখানি দোলাইব যবে ?

এই অনূদিত কবিতাটি যে ঈষৎ-পরিবর্তন-সহ 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' বা 'চিরকুমারসভা'য় ব্যবহৃত হয়েছে সে তো অনেকেরই মনে পড়বে। বৈষ্ণবকবির উজ্জ্বল রসের শ্লোক বড়ো ভালো লেগেছে বলেই রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন সন্দেহ নেই। এই কবিতার অব্যবহিত পূর্বেই কবি তাঁর খাতার পাতায় সংকলন করেছেন শ্রীমদ্‌শঙ্করাচার্যের বহুখ্যাত 'আনন্দলহরী' বা 'সৌন্দর্যলহরী' কবিতার শ্লোক—

বহন্তী সিন্দূরং প্রবলকবরীভারতিমির-
দ্বিষাং বৃন্দৈর্বন্দীকৃতমিব নবীনার্ককিরণম্।
তনোতু ক্ষেমং নস্তব বদনসৌন্দর্যলহরী-
পরীবাহস্রোতঃসরণিরিব সীমন্তসরণিঃ ॥

উত্তর কালে কবি এর এই ভাষান্তর করেন— 'ঐ সিঁথির রেখা আমাদের কল্যাণ দিক, যে রেখাটি তোমার মুখসৌন্দর্যধারার স্রোতঃপথের মতো। আর, যে সিঁদুর আকা রয়েছে তোমার ঐ সিঁথিতে সে যেন নবীনসূর্যের আলো, তাকে ঘনকবরীভারের অন্ধকার শত্রু হয়ে বন্দী করে রেখেছে।'

কবি মন্তব্য করেছেন— সাধারণ নারী এ নয়, 'বিশ্বসৌন্দর্যের প্রতিমা ·· অল্প কথায় ভাবের যে স্তবকগুলি সংবদ্ধ তাতে কবিহৃদয়ের আনন্দ দিয়ে আঁকা একটি ছবি দেখতে পাচ্ছি, সেই ছবিটি বিশ্ব-

প্রকৃতির নারীরূপ।'

আমরা বলব— গৃহলক্ষ্মীরূপ। গৃহে যখন থাকেন বিশ্বসৌন্দর্যের প্রতিমা ব'লে সব সময় তাঁকে জানি নে, আর না জানাতে ক্ষতিও হয় না। তিনি নিজেও যে আত্মবিস্মৃতা। চকিতে তাঁকে চিনিয়ে দিয়ে যায় অদ্ভুত কবিদৃষ্টি, অথবা অকরুণ মৃত্যু।

পাঠকের ধৈর্যের পরীক্ষা হল কতদূর সে আমবা অনুমান করতেও চাই নে। উপস্থিত প্রসঙ্গটির সম্পর্কে বিশেষ সুবিচার করা হয়তো আমাদের সাধ্যের অতীত। প্রতিভার মায়াদণ্ডস্পর্শে কী থেকে কী হয় তারই আর-একটি দৃষ্টান্ত সংকলন করে ক্ষান্ত হব। 'হিন্দিভাঙা' গানের বিষয় পূর্বে বলা হয়েছে। সর্বদাই হিন্দি গীতপংক্তির ফাঁকে ফাঁকে বাংলাকথার সংযোজনা হয়েছে যে এমন নয়। কদাচিৎ হিন্দিগানের কথাই শুধু পাওয়া গিয়েছে; এই যেমন—

রাজা ছুলারকা বনারা আইল মা রাতচো
লেরা সুধবীনি মেরোয়ি আঙ্গন বা।
ধনরী তেরো ভাগ যো এশো বর
পায়া, নিবখি রহী কহুঁ কোন
সাজন বা। মেরোবি আঙ্গন বা।[১২]

সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে না কি?—

ওগো মা, রাজার দুলাল যাবে আজি মোর
ঘরের সমুখপথে।
বলে দে আমায় কী করিব সাজ,
কী ছাঁদে কবরী বেঁধে লব আজ,
পরিব অঙ্গে কেমন ভঙ্গে
কোন বরনের বাস!

ওগো মা, রাজার দুলাল গেল চলি মোর
ঘরের সমুখপথে।··
ছিঁড়ি মণিহার ফেলেছি তাহার
পথের ধুলার পরে।···
মা গো, কী হল তোমার অবাক্ নয়নে
চাহিস্ কিসের তরে!

ভাষাবিৎ মনে-মনে হাসুন। একটির সঙ্গে অন্যটির নাহয় 'না-বোঝার প্রদোষ-আলোকে'ই দৃষ্টিবিনিময় হয়েছে। পুরাতন ঠাটের এই হিন্দি আমরা অনেকেই বুঝি না, আর হয়তো বা রবীন্দ্রনাথও বোঝেন নি। অপূর্ব সুরের আনন্দবেদনাময় লোকে কল্পনা করেছেন—

কোন্ রাজার দুলাল এল আমার আঙিনায় মা!
তার ভাগ্য ভালো এমন বর যে পেয়েছে!
চেয়ে আছিস মুখের দিকে। ব'লে দে আমায় কোন্ সাজে
সাজব। আমার আঙিনা বেয়ে এসেছে।

কী জানি বসন্তে বাহারে পরজে বা সাহানাতে, কেমন মীড়ে মূর্ছনায়, প্রবাহিত স্বরলহরীতে, অন্তরে বাহিরে আনন্দ-ঔদাস্যের ঢেউ তুলে দিয়েছিল মূল গান। সে তো থাকবে না কবিতায়। কবিতায় সুরের লীলা ও নৃত্য লীন হয়ে যায় ছন্দোবদ্ধ বাগর্থে। প্রহত কাংস্যঘণ্টা-ধ্বনি দিশে-দিশান্তে দূরে-দূরান্তরে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে শেষে নীরব হল যখন, হয়তো কান পেতে শোনা যাবে সূক্ষ্ম রেশ বাজছে তখনো, কাঁপছে তখনো, সুস্বর ঘণ্টার ঝঙ্কৃত 'অণ্‌পরমাণু'তে। তেমনি অন্তর্লীন ধ্বনিকেই আনন্দবর্ধন বা অভিনবগুপ্ত কবিতার 'ধ্বনি' বা 'রসধ্বনি' বলেছেন এই আমাদের 'নিশ্চিত অনুমান'। সেই 'ধ্বনি'রই চমৎকারিত্বে সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যেও ঐ 'শুভক্ষণ' কবিতাটি অতুলনীয়। নাহয় রবীন্দ্রনাথ শব্দ ভুল শুনেছেন, স্বেচ্ছায় বা অনবধানে শব্দার্থ ভুলই বুঝেছেন, তাতে কিছু ক্ষতি হয় নি। সহজেই হিন্দিগানের সুরটি

আত্মসাৎ করেছেন গূঢ় অন্তরে। এবার আর নূতন গান রচনা করেন নি তারই প্রেরণে ; নূতন কবিতারূপে তা আমাদের গোচর হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঋণ নিয়েছেন অথবা ঋণী করেছেন সকল কালের সকল রসিকজন'কে কে তা বলবে ? আনন্দবেদনার আবেদনে মূল গানটি হয়তো অপূর্বই। তারই চকিত স্ফুলিঙ্গ-পাতে কাব্যলোকে এই-যে রসের দীপটি জ্বলে উঠেছে, আপনার সঞ্চিত স্নেহে, আপনারই অলৌকিক দীপ্তিতে, জানি তার কোনো তুলনা হয় না।'[৩]

জোড়াসাঁকো

৫ আষাঢ়

১৯ জুন ১৯৬০

রূপসৃষ্টি : মায়ার খেলার রূপান্তর

প্রথম বয়সে হৃদয়ভাব প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি গানে, আশা করি সেটা কাটিয়ে উঠেছি পরে। **পরিণত বয়সের গান ভাব বাৎলাবার জন্মে নয়, রূপ দেবার জন্য।** তৎসংশ্লিষ্ট কাব্যগুলিও অধিকাংশই রূপের বাহন।

—সুর ও সঙ্গতি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তাঁহার প্রথম বয়সের গান আবেগপ্রধান; শেষ বয়সের গান সৌন্দর্যপ্রধান।

—রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন। প্রমথনাথ বিশী

নারায়ণ নরোত্তম ও দেবী সরস্বতীকে প্রণাম করি। দুরূহ এবং দুরবগাহ বিষয়টি নিজের কাছেই স্পষ্ট করতে পারি এমন বিদ্যা বুদ্ধি নেই। তবে, অনির্বচনীয়ের বাচন হয় না, তার ইঙ্গিতমাত্র যদি সম্ভব হয় সেও তো যে কলম লেখে কিম্বা যে তা ধারণ করে থাকে উভয়ের কারোই গুণপনায় নয়— নেহাৎই দৈবের নির্দেশে— মনোনেপথ্য-বাসিনী অজানা-অচেনা-প্রভাব-রূপিণীদের স্মিত প্রসাদে।

বিদ্যা বা বুদ্ধির অভাব, কথাটায় কপট বিনয়ের কোনো ভঙ্গী নেই। শুনেছি বিষধর সর্প বিবর থেকে বেরিয়ে আসে, উদ্যত ফণা আন্দোলন করে সুস্বরলহরী শোনে, স্বভাবভীরু হরিণ সেও দুর্গমে পালাবার সহজ প্রবৃত্তি ভুলে গিয়ে উৎকর্ণ হয়ে চিত্রার্পিতবৎ দাঁড়ায়; আর বন্য বর্বরেরাও গান শুনে বিমুগ্ধ বিহ্বল হয়। কাজেই, রবীন্দ্র-সংগীত আমারও যে ভালো লাগবে— সেই গানে, যে মুখ কখনো দেখব না তারই লাবণ্যচ্ছটা, যে ঘটনা কখনো ঘটে নি তারই বেদনামধুর 'স্মৃতি' অন্তরতল হতে জেগে উঠবে যে, তাতে আর আশ্চর্য কী! অথচ, স্বীকার করাই ভালো, রে থেকে সা'র তফাৎ বুঝি নে—

অভাবিত মীড়ে বা মূর্ছনায় চেতনা অলৌকিকতর চেতনায় মূর্ছিতপ্রায় হয়ে আসে যখন, তখনই তার পিঠে চাপড় মেরে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে 'গান চলছে ইমন-আড়াঠেকায় কিংবা বেহাগ-সুর-ঝাঁপতালে', বেকুবের মতো চেয়েই থাকতে হবে, কোনো উত্তর জোগাবে না মুখে। এ-সবই জানি। তবু এও দেখলেম এই লেখকের মতোই সংগীতের ব্যাকরণ বা অলংকার এক অক্ষর না জেনেও অগ্রজ শ্রীপ্রমথনাথ বিশী রবীন্দ্রসংগীতের মর্মেই তো প্রবেশ করেছেন ; অন্তত স্রষ্টার উক্তির সঙ্গে বিমুগ্ধ অথচ 'অজ্ঞান' শ্রোতার সহজ উপলব্ধি একেবারেই মিলে যাচ্ছে। তাই মনে হয়, ব্যাকরণে ও অলংকার-শাস্ত্রে সজ্ঞান অধিকার না থাকলেও যেমন কবিতা লেখা যায়, উপভোগ করা যায়, নিবিড় উপলব্ধিতে আত্মসাৎ করা যায়, আর্টের অন্য ক্ষেত্রেও অনুরূপ কোনো ঘটনা ঘটে নি বা ঘটতে পারে না এমনও জোর করে বলা যাবে না।

বিশেষতঃ, রবীন্দ্রনাথের গান যে কেবল অপূর্ব সুরলহরী তা নয়, সঙ্গে সঙ্গেই অপরূপ বাণীর ব্যঞ্জনাও বটে। অভেদাঙ্গ হরগৌরীর মতো, বাগর্থের মতো, দেহ ও আত্মার মতো, একই দুই হয়েছে আর দুটিতে মিলে পুনরায় এক হয়ে উঠছে সচকিত রসিকচিত্তের চোখের সামনে। রবীন্দ্রসংগীতে সুরের আকর্ষণেও স্তব্ধ হতে হয় আর ভাব-ভাষার ব্যঞ্জনায়, কথার কারুকার্যেও, অভিভূত হওয়া অনিবার্য। কবিতা ও রাগ উভয়ের অর্ধনারীশ্বর সত্তা ও শ্রী যার চিত্তপটে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে সে যে মহাভাগ্যবান্ সন্দেহ নেই, কেবল একদেশে পুলকঅপলক দৃষ্টি পড়ে যার সেও ধন্য হয়।

কবি প্রমথনাথ ঠিকই বলেছেন, 'গীতিকবিতা শব্দটা আজকাল ব্যর্থপ্রয়োগ, কারণ বহুকাল হইল গীতি ও কবিতায় বিচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গানগুলিকে সত্য-সত্যই গীতিকবিতা বলা চলে। তাঁহার গীতিকবিতায় ঝর্ণার টানে নুড়ির মতো সুরের

টানে কথা আপনি চলিয়া আসে। এই গানগুলিকে সব সময়ে সচেতন ভাবে গাহিবার আবশ্যক করে না, নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে পড়িতে বসিলেও এগুলি আপনি গুন্ গুন্ করিয়া ওঠে। যথার্থ গীতিকবিতা ভ্রমরজাতীয়, উড়িবামাত্র তাহার পাখা গুঞ্জরণ করিতে থাকে ; তাহার পক্ষে ওড়া ও গান করা একার্থক।'

আর উদ্‌ধৃতির প্রয়োজন নেই। ভাব ও রূপ— বাষ্পোচ্ছ্বসিত আবেগ আর পটে-আঁকা পাথরে-খোদাই-করা মূর্তি-- কবিতার ক্ষেত্রে উভয়ের মিল কোথায় এবং কী সূত্রেই বা সম্বন্ধবন্ধন, প্রথমেই সে বিষয়ে মনোনিবেশ করা যাক্।

প্রসঙ্গান্তরে আলোচনা করা গেছে, প্রতিভার বাল্য ও কৈশোর কালটাই হল বাষ্পগদ্‌গদ আবেগ ও ভাবুকতার কাল। বৎসর গণনা ক'রে নয় অবশ্য, তবু তা প্রতিভাবান কবি বা ভাবুকের 'আঠারো বছর' বয়স-কাল। আকাশে আকাশে নিরাকার শক্তির আবর্তনে, প্রথমা প্রৈতির প্রেরণায় একেবারেই দীপ্ত হয়ে ওঠে না নক্ষত্রপুঞ্জ ; জ্যোতির্বাষ্পে প্রথমে রচিত হয় ছায়াপথ— দেবতাদের অলক্ষ্য-চরণ-চারণের অপরূপ সেতু, নিরবয়ব নীহারিকা। মানবমনোলোকেও একই ব্যাপার।

বর্তমানের ঘটনাঘাতে অন্তরে বাহিরে পাক খেয়ে ওঠে দুঃখসুখ, রাগদ্বেষ, কামনাভাবনা, এক কথায়— উচ্ছলিত উচ্ছ্বসিত আবেগ। কিন্তু এই সম্বলেই স্থায়ী রূপসৃষ্টি করা সম্ভব হয় না। কারণ, ধাবমান বর্তমান কালকে ধরতে পারি নে, বাঁধতে পারি নে, তার কাছ থেকে এতটা উপাদান ছিনিয়ে নিতে পারি নে যাতে একটি কোনো ছায়াশরীরীর আভাস দেওয়া শুধু নয়, তার নিগূঢ় প্রাণের ছন্দ অনুসরণ করে অঙ্গে অঙ্গে তাকে লাভ করা, প্রত্যক্ষ করা সম্ভবপর হবে, তার প্রতিটি অঙ্গ গড়ে তোলা সম্ভব হবে। সেজন্য চাই প্রতিভার সেই পরিণতি, দর্শন স্পর্শন অনুভূতির সেই নিতলে তলিয়ে

যাওয়া আর 'আত্মবিস্মৃতি', যার ফলে একদা এ জন্মের, এমন-কি জন্মজন্মান্তরেরও, স্মৃতি বা সংস্কার জেগে উঠে কারিগরের আসনে ব'সে যায় রূপকারের রঙের তূলি হাতে নিয়ে, শাণিত ছেদনী দৃঢ় মুষ্টিতে তুলে ধ'রে।

নিরাকার তাইতেই আকার পায়, বর্তমানের ব্যগ্র ডাকে, নিঃশব্দ ডাকে, আর অতীতের প্রত্যুত্তরে। রস তবু রূপ পায় বলা যায় কি? কারণ, আসলে অনির্বচনীয় রসের রূপ কিছু হয় না; পদ্মপত্রে শিশিরের মতো' তার স্থিতি রূপে রূপে, কিন্তু আলো ঝিকিয়ে হেসে না ওঠা পর্যন্ত তাকে 'দেখা'ই যায় না। রূপের এই-যে লাবণ্য, রসের যাতে ব্যঞ্জনা, অনির্বচনীয় ব্যক্তি আর অরূপ আবির্ভাব, এর জন্যে মনে হয় কবিপ্রতিভার উপায় বা উপাদান হিসাবে আবেগ যথেষ্ট নয়, স্মৃতি বা সংস্কার যথেষ্ট নয়— চাই কল্পনা, চাই দিব্যদৃষ্টি। মনোরথ-গতি এই কবিশক্তি, এই আর্ষসিদ্ধি দূর অথবা অতিদূর ভবিষ্যতে অভিসার করে ফিরে আসে অপ্রকাশিত অভাবিত ছন্দ নিয়ে, সুর নিয়ে, সৌন্দর্য নিয়ে, সত্যতা নিয়ে। তাই সম্ভব হয় অরূপ ও কালাতীত রসের রূপ; রূপের লাবণ্যোদ্ভাসিত মুখচ্ছবিতে আব প্রাণবেগবান অঙ্গে অঙ্গে অধরাকে ধরার সুখ, অদেখাকে দেখার আনন্দ।

কাজেই, সার্থক রূপসৃষ্টির তিনটি স্তর, তিনটি ভূমি আছে, আর শেষ ভূমিতে উত্তীর্ণ হলে তবেই তাকে রসরূপ বলা চলে। তখন সেই রূপের মুকুরে তুরীয় লোকেরও প্রতিফলন সম্ভবপর হয়। অর্থাৎ, নিত্যের প্রতিফলন প্রত্যেক নিমেষে; অসীমের স্পন্দন সীমায় সীমায়; আনন্দ এবং চেতনার বিচ্ছুরণ হর্ষে শোকে সান্ত্বনায়, সুখে দুঃখে আর বিচিত্র আকৃতিতে। উপনিষদ্ বলেন নি কি?—

> ন তত্র সূর্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং
> নেমা বিদ্যুতোভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
> তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥

রসের আপন লোকে নেই সূর্য চন্দ্র তারার ভাতি, বিদ্যুৎ চকিত হয়ে ওঠে না, অগ্নি বা কোথায়? তারই ভাতির অনুভাতি সব— ভবেরই অনুভব—তারই প্রতিভাতে এ-সব প্রতিভাত হয়।

২

আলোচ্য বিষয়টি এতক্ষণে আশানুরূপ দুর্বোধ, রহস্যময় হয়ে এসেছে কি? আর না। বিশেষ বিশেষ উদাহরণের প্রয়োগ ও পরীক্ষায় দেখা যাক বক্তব্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে কিনা।

ভগ্নহৃদয় কাব্যে গুঞ্জরিত হয়ে উঠেছে তরুণহৃদয় কবির অরুণ-স্বপ্ন-বিভোর এই গানখানি—

বিপাশার তীরে ভ্রমিবারে যাই,
প্রতিদিন প্রাতে দেখিবারে পাই
লতা-পাতা-ঘেরা জানালা-মাঝারে
একটি মধুর মুখ।
চারি দিকে তার ফুটে আছে ফুল—
কেহ বা হেলিয়া পরশিছে চুল,
দুয়েকটি শাখা কপাল ছুঁইয়া,
দুয়েকটি আছে কপোলে নুইয়া,
কেহ বা এলায়ে চেতনা হারায়ে
চুমিয়া আছে চিবুক।
বসন্তপ্রভাতে লতার মাঝারে
মুখানি মধুর অতি—
অধর-দুটির শাসন টুটিয়া
রাশি রাশি হাসি পড়িছে ফুটিয়া,
দুটি আঁখি-'পরে মেলিছে মিশিছে
তরল চপল জ্যোতি।[১]

গানটি কানে শোনা হয় নি, চোখে দেখতে পাচ্ছি লতা-পাতা-পুষ্প-পল্লবের ফ্রেমে বাঁধানো, অকারণ-হাসিরাশি-ভরা মধুর একখানি মুখ। স্বপ্নেরই মতো শোভা তার, সত্য মনে হয় না। রেখা ও রঙের সীমানাগুলি শিশিরে মুছে মুছে গেছে, কিম্বা হয়তো ভালো করে আঁকাই হয় নি। বহু যত্নে ও বিশেষ আগ্রহে, হয়তো তারই আতিশয্যে, এ ছবিতে প্রাণ দিতে পারেন নি কবি ; বোবা মুখে বাণী ফোটে নি। তরুণ কবিব আঙ্গিকের উপর দখল না থাকাতেই এমন ঘটেছে তা নয়— কারণ, ছায়া যে ভাবে কায়ার অনুসরণ করে আঙ্গিক পোক্ত পরিণত হয়ে ওঠে অভিজ্ঞতা অনুভূতি ও প্রতিভার পবিণতির সঙ্গে সঙ্গে ; আঙ্গিক বা কর্মকৌশল রসবস্তুকে সৃজন করে না, রসবস্তুই আঙ্গিক সৃষ্টি করে, গ্রহণ করে।

যা হোক, স্ফুটতর ছবিও বটে, গানও বটে, ছবি ও গান[৩] কাব্যের নিম্নসংকলিত রচনাটি—

ওই জানালার কাছে বসে আছে
করতলে রাখি মাথা—
তার কোলে ফুল পড়ে রয়েছে,
সে যে ভুলে গেছে মালা গাঁথা।
শুধু ঝুরু ঝুরু বায়ু বহে যায়,
তার কানে কানে কী যে কহে যায়—
তাই আধো শুয়ে আধো বসিয়ে
ভাবিতেছে কত কথা।
চোখের উপরে মেঘ ভেসে যায়,
উড়ে উড়ে যায় পাখি—
সারাদিন ধরে বকুলের ফুল
ঝ'রে পড়ে থাকি থাকি।

মধুর আলস, মধুর আবেশ,
মধুব মুখের হাসিটি—
মধুর স্বপনে প্রাণের মাঝারে
বাজিছে মধুর বাঁশিটি।

স্বরলিপি-গীতিমালায় থাকলেও, এ গানও তবু কানে শোনা হয় নি; প্রাণে দেখতে পাচ্ছি ভোরের আলোয় আব্‌ছা ছবিখানি। এ গানে মধুর আলস, মধুর আবেশ, মধুর বাঁশরিস্বরে মধুব দিবাস্বপ্ন ঘনিয়ে আসছে সুমধুর মূর্ছায়— নিষ্পলক দর্শনেব দুর্লভ চিত্তপ্রসাদে নয়। তৃপ্ত হতে পারলেম কৈ? কিন্তু, বহু বৎসব পরে কবি যখন গেয়ে উঠলেন—

আছ আকাশপানে তুলে মাথা,
কোলে আধেকখানি মালা গাঁথা।
ফাগুন বেলায় বহে আনে
আলোব কথা ছায়াব কানে,
তোমার মনে তারি সনে
ভাবনা যত ফেরে যা-তা।
কাছে থেকে রইলে দূবে,
কায়া মিলায় গানের সুরে।
হারিয়ে-যাওয়া হৃদয় তব
মূর্তি ধবে নব নব—
পিয়ালবনে উড়ালো চুল,
বকুলবনে আচল পাতা।[৫]

একই বিষয় একই ভাব সংহত আবেগে, জন্মান্তরসঞ্চিত স্মরণের বর্ণে বর্ণে, রসের নির্ব্যক্তিতায়, কী অপরূপ ছবি হয়ে উঠল! কবির মতোই ধন্য হল রসিক। এ গান আমরা শুনেছি, তাই জানি, সুরের উজানগতিতে নিকট দূর হলেও, কায়া সুর হলেও, পিয়ালবনে তার তরঙ্গিত চিকুর আর বকুলবনে তার স্রস্ত অঞ্চল চকিতে চকিতে

মিলিয়ে এলেও, সেই সুরই আকাশের দূরে দূরে সঞ্চরণ-শেষে হৃদয়ে ফিরে আসে যখন, দূর নিকট হয়, সুর কায়া ধরে, রসাল-পিয়াল-বকুল-বনের ছায়ালোক, আর রূপ, আর রঙ, আর সুগন্ধ, হৃদয়গহনে ঘনীভূত হয়ে রচনা করে একটি শান্ত বিজন নীড়। একি কথা? একি সুর? এ-যে রূপও, যার পরিস্ফুট সীমায় সীমায় অসীমের ব্যঞ্জনা। অসীমকে প্রকাশ করতে হলে অস্পষ্টতার প্রয়োজন হয় না, বরং তার বিপরীত। স্ফুটতম রূপেরই মৌক্তিক লাবণ্যে দেখা যায় অসীমকে, অরূপকে। আর-কিছু দেখবার আকাঙ্ক্ষা থাকে কি? না থাক্, চিরপুরাতনকে বারে বারে নূতন ক'রে দেখতে কবির কিন্তু ক্লান্তি নেই। তাই বসন্তে বাহারে বা পরজে কোন্ সুরে জানি নে বীণা বেঁধে নিয়ে গুন্‌গুনিয়ে গেয়ে উঠলেন আপন-মনে—

একলা ব'সে, হেরো, তোমার ছবি
এঁকেছি আজ বসন্তী রঙ দিয়া।
খোঁপার ফুলে একটি মধুলোভী
মৌমাছি ওই গুঞ্জরে বন্দিয়া।
ঘাটের ধারে কম্পিত ঝাউশাখে
দোয়েল দোলে সংগীতে চঞ্চলি,
আকাশ ঢালে পাতার ফাঁকে ফাঁকে
তোমার কোলে সুবর্ণঅঞ্জলি।
বনের পথে কে যায় চলি দূরে—
বাঁশির ব্যথা পিছন-ফেরা সুরে
তোমায় ঘিরে হাওয়ায় ঘুরে ঘুরে
ফিরিছে ক্রন্দিয়া।[৫]

অশরীরী সুর কী নিটোল সংহত শরীর পেয়েছে এইবার! তার পরে ঐ নদী, বন, শিথিলবৃন্ত গোলকচাঁপা, গীতচঞ্চল দোয়েল আর ঐ চিত্রার্পিতা সুন্দরী পুনরায় মিলিয়ে যাচ্ছে কোন্ রসোজ্জ্বল

চেতনার সীমাশূন্যতায়! আবার দেখা দিচ্ছে আবার মিলিয়ে যাবে ব'লেই। ধাঁধা লাগাচ্ছে, পুলকিত চিত্তকে বুঝতে দিতে চায় না যেন— একি সুর না কায়া! রস না রূপই! দেখা যাক্ কবি কী বলেন গানে গানে—

ওগো সাঁওতালি ছেলে,
শ্যামল সঘন নববরষার কিশোর দূত কি এলে?
ধানের ক্ষেতের পারে শালের ছায়ার ধারে
বাঁশির সুরেতে সুদূর দূরেতে চলেছ হৃদয় মেলে।··
ঝড়ে চঞ্চল তমালবনের প্রাণে
তোমাতে আমাতে মিলিয়াছি একখানে,
মেঘের ছায়ায় চলিয়াছি ছায়া ফেলে।[৬]

ঘনশ্যাম নববর্ষার মূর্ত আবির্ভাব এই সুগঠিত সাঁওতাল ছেলেটি। রবীন্দ্রনাথের মতো কবি সুরের আলোক না ফেললে কোনোদিনই একে দেখা যেত না। কেবল কি একেই দেখা গেল? অপূর্বসৃষ্ট এই রূপের আকর্ষণে এই রূপের চারি ধারে এসে ঘিরে দাঁড়ালো, এই নবীন পথিকের সঙ্গে সঙ্গে চলল, সমস্ত আকাশ আর পৃথিবী। পূর্ববনান্তের নীলিমা, ক্ষণোদ্ভাসিত অরুণরাগ, ধানক্ষেতের কচি সবুজ, শাল-তালের প্রগাঢ় শ্যামিমা, হংসপংক্তির ওড়া আর প্রচ্ছন্নকেতকীগন্ধ —কিছুই বাদ গেল না! ঝড়ে-চঞ্চল তমালবনের লুটোপুটিতে কবি রসিক আর এই সাঁওতাল ছেলেটি মিলে মিশে এক হয়ে গেল। নিটোল রূপের পাত্রে কানায় কানায় পরিপূর্ণ অথচ অনুচ্ছল সুরের সুধা, অপরূপ রস, এমন আর কী হতে পারে? ঐ-যে আরেকটি গানে কবি গেয়েছেন—

তখন পাতায় পাতায় বিন্দু বিন্দু ঝরে জল,
শ্যামল বনান্তভূমি করে ছলোছল্'

সে তো শুধু শব্দার্থে নয়, বর্ণনার নির্দিষ্ট কোনো কৌশলে নয়, কেমন

করে জানি নে, সদ্যোবর্ষণক্ষান্ত একটি বিকাল বেলার সিক্তনীপসুগন্ধি একটি ক্ষণকে অব্যবহিতভাবে আমাদের গোচর ক'রে তোলে। সুরে সুরে বারিবিন্দুপতনধ্বনি শোনা যায়। শ্যামবনান্তের ছলোছলো ভাব বলতে কী বোঝায় নিঃশেষে ব্যাখ্যা করা না গেলেও— অশ্রু না হাসি, আলো না ছায়া, বায়ু বৃষ্টি কার কতটুকু কাঁপন, কী-পর্যন্ত মাধুরী— সম্পূর্ণ ধরা-ছোঁওয়া না গেলেও, সে আমাদের অন্তরে চিরন্তন হয়ে যায়।

কবির পরিণত প্রতিভাব গান থেকে, কবিতা থেকেও, এমন অজস্র উদাহরণ দেওয়া যায়। কথা ও সুরের সম্মিলিত ইন্দ্রজালে অপরূপ রূপসৃষ্টি। কেবল বর্তমানের দেখাশোনা থেকে নয়, অতীতের স্মৃতি-বিস্মৃতি থেকে আর অনাগত ভবিষ্যতের ভাবনা-কল্পনা থেকেও। অর্থাৎ, সমুদয় কালসাগর মন্থন ক'রে এক-একটি রূপ উঠে এসেছে ভুবনমোহিনী উর্বশীর সৌন্দর্য নিয়ে, চোখে মুখে নিখিলকল্যাণরূপিণী লক্ষ্মীর প্রসন্ন হাসি নিয়ে। অরূপ, অপরিসীম, অনির্বচনীয় সেই মায়ামুকুরেই হেসে চেয়েছেন। এরূপ রূপসৃষ্টির পরাকাষ্ঠা দেখি কবির প্রায়-পঞ্চাশ বা পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সেই বেশি। সাল-তারিখে চিহ্নিত ক'রে কিছু বলতে গেলে বিপদ পদে পদে। কোনো মহতী প্রতিভারই বিকাশ হয় না ছক কেটে, রুটিন বা ফর্‌মুলা -মাফিক। সমস্ত হিসাব-কিতাব বিধি-বিধান বিপর্যস্ত করতে প্রতিভার মতো দুটি জিনিষ আর নেই। অথবা প্রাণরূপিণী নারীকেও যদি স্মরণ করি, করাই কর্তব্য, তা হলে বলতে হয়— এমন তৃতীয় কোনো জিনিষ হয় নি আর হবেও না। এই গেল প্রথম কথা। আর দ্বিতীয় কথা এই যে, কাল নির্ণয় ক'রে অথচ অনেক-কিছুই অনির্ণীত রেখে, বিভিন্ন প্রবণতা সম্পর্কেও যা বলা সম্ভবপর তার জন্য চাই অশেষ অনুসন্ধান ও সযত্ন প্রস্তুতি। এ ক্ষেত্রে তা নেই। তবু অনেকে বলেছেন আর আমরাও অস্থিরভাবে স্থির করে নিয়েছি যে, শারদোৎসবে বা

গীতাঞ্জলিতে কবির সংগীতপ্রতিভা পা বাড়িয়েছে নূতন সীমান্তে। এই সহজসিদ্ধি ও রূপৈশ্বর্যের বহুবৎসরবিস্তৃত ভূমি থেকেই লোকান্তরে প্রয়াণ করেছে। রবীন্দ্রনাথের জীবন-কালে উক্ত সংগীতসিদ্ধির বিরাম বিচ্ছেদ বা অবসাদ ছিল না কোনোদিন। শ্রাবণ ঐ ফিরে এল না?—

এ গান আমার শ্রাবণে শ্রাবণে তব বিস্মৃতিস্রোতের প্লাবনে
ফিরিয়া ফিরিয়া আসিবে তরণী বহি তব সম্মান[৮]

সার্থক এই অভিমান। চৈত্রের রোমাঞ্চিত বনভূমি আর তারই রাগে ও অনুরাগে রঞ্জিত উজ্জ্বল আকাশ নাম ধ'রে ডাকবে যখন কবিকে, দূর থেকে ভেসে আসবে সুর—

রইল তাহার বাণী রইল ভরা সুরে, রইবে না সে দূরে,
হৃদয় তাহার কুঞ্জে তোমার রইবে না নির্বাক্।
ছন্দ তাহার রইবে বেঁচে
কিশলয়ের নবীন নাচে নেচে নেচে।...
তোমার ফুলে ফুলে মধুকরের গুঞ্জরণে বেদনা তার থাক্।[৯]

হায় হায়! অর্ধেক গীতবিতান পুনর্মুদ্রিত করে তো ফল নেই। আত্মসংবরণ করা যাক। মোট কথা এই যে, রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশমুখী আর পঞ্চাশোর্ধ্ব জীবনে, কেবল ভাব নয়, আবেগ নয়, রূপের অস্পষ্ট আভাস অথবা প্রাথমিক বর্ণবিলেপনও নয়, বর্ণে ও রেখায় পরিস্ফুট প্রত্যক্ষতা দেখা দিয়েছে গানে গানে। রূপ বলতে, কবিতা যা আমাদের প্রতীতিগোচর করে ছন্দোবদ্ধ বাক্যে বা বর্ণনায় কেবলমাত্র সেটি বুঝলে ভুল বোঝা হবে। সুরে তালে ঠিক সেই জিনিষটি ফুটে ওঠা চাই; সেই সুরের গতিতে চাই অপ্রমত্ততা, অনিবার্যতা: মানস-আকাশ আর পৃথিবী ছুঁয়ে ছুঁয়ে অদৃশ্য ধ্বনির প্রবাহিত রেখায় রেখায় এমন স্বয়ংসম্পূর্ণ ছবি, এমন অপরূপ আল্পনা এঁকে যাবে অবলীলায় যে, কোনো জাদুমন্ত্র -প্রভাবে সেটি নেত্রগোচর হলেই

তূলি ফেলে দেবে চিত্রকর বিস্ময়ে পুলকে। কারণ,—

[12]স্বরতরঙ্গ যত গ্রহ তারা

ছুটিছে শূন্যে উদ্দেশহারা… ..

সতত বিশ্বনির্ঝর ঝরে ঝর্ঝর সংগীতে

আদিকবির গাওয়া অপরূপ সেই গানই বিশ্বের এই যা-কিছু অপূর্ব-সুন্দর রূপ হয়েছে। মানুষ কবির গাওয়া গানে গানেও জমাট রাগ-রাগিণীতে যে রূপ আমাদের নিষ্পলক দৃষ্টির সামনে আসা উচিত ছিল, অন্তত আমাদের রসোদ্‌বোধিত প্রতীতির মধ্যে ফুটে ওঠা চাই। ভারতীয় সংগীতশাস্ত্রে বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর রূপকল্পনার অর্থও কতকটা তাই।

রূপেরও সুর আছে, আর সুরেরও রূপ আছে।

তা ছাড়া পূর্বেই বলা হয়েছে— সুর আর কবিতা, রবীন্দ্রসংগীতে কে কার অগ্রজ কিছুই বলা যাবে না। দেহ আর আত্মার মতো উভয়ের এক সঙ্গেই আবির্ভাব। উভয়ে এক ছন্দে বা প্রাণস্রোতেই ভাসমান। প্রায়শঃ, এই রূপ ফুটে উঠেছে গানের প্রথম পদ-ক্ষেপেই।—

যখন মল্লিকাবনে প্রথম ধরেছে কলি

তখনি, বন্ধু, তোমার লাগিয়া বেঁধেছিনু অঞ্জলি।[৯]

অথবা—

আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় বাঁশি।[১০]

অথবা—

রোদনভরা এ বসন্ত কখনো আসে নি বুঝি আগে।[১০]

তেমনি আবার—

যে ছিল আমার স্বপনচারিণী তারে বুঝিতে পারি নি।[১১]

এমন সার্থক নিদর্শনের কোনো শেষ নেই। এই-সব রচনা রসিকের অন্তঃকরণে কবিতা হিসাবেই গাঁথা থাকুক অথবা গান হিসাবেই

অন্তঃকর্ণে অনুরণিত হোক, এ আক্ষেপ কখনো জাগাবে না—

তয়া কবিতয়া কিংবা তয়া বনিতয়াপিবা।
পাদবিন্যাসমাত্রেণ মনোনাপহৃতং যয়া॥

এ যে পাদবিন্যাসমাত্রেই আমাদের সমস্ত চেতনাকে শ্রুতিপথে আকর্ষণ করে ও চমৎকৃত করে। উল্লিখিত শেষ গানটি পুনর্লিখিত মায়ার খেলা নাট্যের অন্তর্গত। সমগ্রভাবে মায়ার খেলা গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হবার আগে, রসরূপসৃষ্টির রহস্যে আরেকটু অভিনিবিষ্ট হওয়ার প্রয়োজন আছে।

৩

পূর্বেই ইঙ্গিত করা হয়েছে, অপরিণতির 'আঠারো বছর বয়স' পার হয়ে, প্রতিভার পরিণতিতে, কবি বা রূপকার ত্রিকালদর্শী হয়ে থাকেন। অর্থাৎ, ক্ষণে ক্ষণেই অতীতের স্মৃতি-বিস্মৃতি, বর্তমানের ঘাতপ্রতিঘাত, ভবিষ্যতেব ভাবনা-কল্পনা-দিব্যদর্শন, এ-সব মন্থন ক'রে কালসাগরের অন্তস্তল থেকে উর্বশীপ্রতিম রূপকে, কল্যাণী শ্রীকে উদ্ধার করে আনেন মর্তমানবের প্রতীতিতে, তাদের মানসনয়নের অগ্রে। কিন্তু, অনিত্যেরই আশ্রয়ে নিত্যকালের উপর এই দখলিসত্ত্ব সর্বদাই যে অক্ষুণ্ণ থাকে তা নয়; এমন-কি বড়ো বড়ো প্রতিভাধর যাঁরা, তাঁদের পূর্ণশক্তির সময়েও সাময়িক বিভ্রান্তি বা অবসাদ দেখা যায়। তার কারণ আর কিছুই নয়— সামাজিক বা পারিবারিক যে মানুষ তারই মোহ অবসাদ বা অন্যমনস্কতা হয়তো সাময়িক ভাবে কবিচেতনাকে আচ্ছন্ন করেছে; এমনও হতে পারে— বর্তমানের ঘটনাঘাত এতদূর অতিশয়িত সুখে বা দুঃখে ব্যক্তিটিকে উল্লসিত বা আর্ত করেছে যে, ব্যক্তির অন্তর্নিহিত কবিসত্তা সম্পূর্ণ জেগে ওঠবার, সমুদয় ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ জঞ্জালবোধে সরিয়ে ফেলে নৈর্ব্যক্তিক রূপরসের ধ্যানে রূপায়ণে রসায়নে নিযুক্ত হবার, সময় বা সুযোগ

পায় নি। 'অকৃত কার্য' ও 'অকথিত বাণী'র বেদনা, 'অগীত সংগীতগুলি'র অশ্রুত রেশ সহজে কিন্তু সঙ্গ ছাড়ে না। তাই দেখি, যে সুর সাধা হয় নি তাই আবার সাধতে হয়, যে রূপ চিত্তপটে বিদ্যুচ্চমকে মিলিয়ে গেছে চিত্রপটে তাই আবার তুলি ধবে আকতে হয়, বহু দিন, মাস, বৎসর, এমন-কি যুগ পার হয়ে এসে। এবং হয়তো সিদ্ধিও মেলে। রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনে এরকম ঘটনা একেবারে বিরল নয়; কয়েকটি তো মনের সামনে দেখতে পাচ্ছি। রবীন্দ্রনাথের জীবনে 'চব্বিশ বছর বয়সের সময় মৃত্যুর সঙ্গে যে পরিচয়' বড়ো আকস্মিক ও নিষ্ঠুর ছিল তারই স্বাক্ষর রয়েছে সমসাময়িক ভারতীতে, 'পুষ্পাঞ্জলি'র বচনাগুচ্ছে।'[৩] আশ্চর্য এই যে, দুঃখের তীব্রতা, গভীবতা, সত্যতা, এ-সব সত্ত্বেও— হয়তো সেই কারণেই— অবিস্মবণীয় শিল্পমূর্তি পায় নি সেটি; উপস্থিত আঘাতের নিদাকুণতা আব তজ্জনিত ব্যক্তিগত আবেগ ও বেদনা এ-সব পার হয়ে রূপস্রষ্টার পক্ষে নৈর্ব্যক্তিক একটি শমে বা poiseএ উত্তীর্ণ হওয়া কিছুতেই সম্ভবপর হয় নি। কে চায় আর্ট্, কে চায় কবিতা, কে চায় রূপের অপরূপ সম্পূর্ণতা, যখন পায়ের নীচের মাটিই সবে সরে যাচ্ছে? যে চায় সে আর্টিস্ট্, সে কবি, রবীন্দ্রনাথের মতোই বড়ো কবি। কিন্তু সে কবিও মরতার সব দুঃখ আর সব দুর্বলতাব ঊর্ধ্বে নয়, সর্বক্ষণে। তাই পুষ্পাঞ্জলিতে যা ব্যক্ত করা হয় নি অবিস্মরণীয় শিল্পমূর্তিতে, সার্থক ভাবে ফুটে উঠতে পেরেছে তাই, প্রায় চৌত্রিশ বৎসব পরে ১৩২৬ সালের কতকগুলি রচনায়; লিপিকা কাব্যের প্রথম অধ্যায়ে সংকলিত। ব্যক্তির বেদনা বাণীর ভাস্বর বর্ণে বর্ণে অঙ্কিত হয়ে এমন অপরূপতা, এমন ব্যঞ্জনা পেয়েছে যে মনে হচ্ছে সে আমাদের প্রত্যেকেরই আপন বেদনা, আন্তরিক বেদনা, আর বেদনা নয়ও বটে— কেননা, 'তার গলায় সোনার হার, তার পায়ে দুগাছি মল, সে যেন কান্নার সরোবরে আনন্দের পদ্মটির উপরে দাঁড়িয়ে। সুরের ভিতর দিয়ে

তাকে সংসারের' সাধারণ বেদনা ব'লে চেনাই গেল না। তার অশ্রু-ধৌত মুখ ফেরানো, শান্তস্মিত দৃষ্টি ফেরানো ব্যক্তির দিকে নয়, সীমার দিকে নয়— অন্য কোথা! অন্য কার দিকে! সে কি ব্যাখ্যা ক'রে বলা যাবে?

পুষ্পাঞ্জলির প্রথম লেখাটির প্রেরণায় রচিত হয়েছে লিপিকার 'সন্ধ্যা ও প্রভাত'। একই বিষয় অথচ ভাষা ভঙ্গী সূচনা ও শেষ সবই বদলে গেছে। নূতন ব্যঞ্জনা এসেছে। মৃত্যুবিচ্ছেদ আর তারই কারণে দিনের-আলো-অন্ধকার-করা শোক আশ্চর্য রূপান্তর লাভ করেছে, যেন—

Those are pearls that were his eyes :
nothing of him that doth fade
but doth suffer a sea-change
into something rich and strange.

সবশেষে 'এর ছায়া ওর আলোটিকে একবার কোলে তুলে নিয়ে চুম্বন করুক, এর পুরবী ওর বিভাসকে আশীর্বাদ করে চলে যাক' এ ছত্র যে লেখনী থেকে প্রসৃত হয় স্বর্গের দেবতারা তার উপরে পুষ্পবৃষ্টি করেন। 'বাঁশি' লেখা হয়েছে পুষ্পাঞ্জলির একটি রচনা ছুঁয়ে— কিন্তু 'বাঁশির বাণী চিরদিনের বাণী, শিবের জটা থেকে গঙ্গার ধারা, প্রতিদিনের মাটির বুক বেয়ে চলেছে— অমরাবতীর শিশু নেমে এল মর্তের ধূলি নিয়ে স্বর্গ-স্বর্গ খেলতে' এ রসধ্বনিত পদবিন্যাস সেখানে তো কল্পনাই করা যায় না। 'কান্নার সরোবরে আনন্দের পদ্মটির উপরে দাঁড়িয়ে' এই-যে রূপ, অমূর্তেরও মূর্তি, আপন কান্না কেঁদে কেঁদে শেষ না করা পর্যন্ত তাকে তো দেখা যায় না। এই পর্যায়ের সাময়িকে-প্রথম-প্রকাশিত যে রচনাটি অধ্যায়ের প্রায় শেষে দেওয়া হয়েছে তারও উল্লেখ করা প্রয়োজন— প্রথম শোক। এ রচনার আদিরূপ পুষ্পাঞ্জলিতে হয় তো নেই, থাকবার কথাও নয়, কিন্তু

আত্মন্ত পুষ্পাঞ্জলি যে বেদনার অর্ধোচ্চারিত ভাষা তার সামগ্রিক রূপান্তর-সাধনই এর সুপরিস্ফুট তাৎপর্য—

'বনের ছায়াতে যে পথটি ছিল সে আজ ঘাসে ঢাকা। সেই নির্জনে হঠাৎ পিছন থেকে কে বলে উঠল, আমাকে চিনতে পারো না? আমি ফিরে তার মুখের দিকে তাকালেম। বললেম, মনে পড়ছে, কিন্তু ঠিক নাম করতে পারছি নে। সে বললে, আমি তোমার সেই অনেক কালের, সেই পঁচিশ বছর বয়সের শোক।'

সমস্ত লেখাটি সংকলনের লোভ সংবরণ করছি। শেষে আছে—

'একি তোমার অপরূপ মূর্তি! সে বললে, যা ছিল শোক আজ তাই হয়েছে শান্তি।'

এর পর আর আমাদের কোনো মন্তব্যের প্রয়োজন আছে কি?

কবিজীবনের একটি-যে বেদনার ধারা শান্তির স্নিগ্ধোজ্জ্বল দিগন্তে এসে এইভাবে মিলিয়ে গেছে, তার অনুসরণ থেকে এখানেই নিবৃত্ত হব। রবীন্দ্রনাথের জীবনে বিরহ বিচ্ছেদ মৃত্যুশোক বহুবার এসেছে। ১৩০৯ অগ্রহায়ণে মৃণালিনীদেবীর মৃত্যু এমনি একটি মর্মঘাতী ঘটনা। উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছৃঙ্খল নয় ব'লেই, কী আন্তরিক বেদনায়, কী শান্ত সংযত ছন্দে, কী পবিত্র ঈশ্বরনির্ভরে— ঈশ্বরই যে 'সত্য মঙ্গল প্রেমময়', সুন্দর— এই শোকের রূপ ফুটে উঠেছে স্মরণ কাব্যে। কিন্তু, এ ক্ষেত্রেও ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের ক্ষয়ক্ষতি কবি রবীন্দ্রনাথকে কখনো কিছুমাত্র যে অভিভূত করে নি তা নয়। তবে পূর্বোক্ত মৃত্যুশোকের পর সার্ধ এক যুগ অতীত হয়েছে, ব্যক্তিত্বের প্রৌঢ় পরিণতিতে আর নিরলস নিরবচ্ছিন্ন সারস্বত সাধনায় যে চারিত্র, যে শক্তি অর্জিত হয়েছে তার কথাও তো ভুললে চলবে না। স্মরণের পাণ্ডুলিপি পর্যালোচনা ক'রে তবু দেখতে পাই প্রকাশমুখী রসব্যগ্রতা অপ্রকাশে ফিরেও গেছে। প্রচলিত খেয়ায় বা স্মরণে একখানি পাণ্ডুলিপিচিত্রে

দেখতে পাওয়া যাবে—

এক বরষার রাত্রে এ আমার অশ্রুসরোবর
কূল ছাপাইয়া গেছে দিক্ দিগন্তর
প্রভাতে উঠিয়া দেখি মাঝে ফুটিয়াছে এ কি
শূন্যবনে একমাত্র শতদল সম্পূর্ণ সুন্দর।

ইত্যাদি। অব্যর্থ ছন্দ যে পাওয়া যায় নি, ঠিক সুরটি লাগে নি, এই বোধ থাকাতে অতৃপ্ত কবি অনিশ্চিত অসম্পূর্ণ লেখাটি মমতাহীনচিত্তে বর্জন করেছেন। কিন্তু, প্রকাশ যে চায় তাকে বর্জন করা এত কি সোজা? ঐ অলৌকিক পদ্ম ফুটবেই আর ওর দিকে চেয়ে কবি নিজেই গেয়ে উঠবেন—

কমলমুকুলদল খুলিল রে খুলিল।
মানসসরসে রসপুলকে
পলকে পলকে ঢেউ তুলিল।[১৪]

কিন্তু, না, কালাতিক্রমণে নিন্দিত হতে চাই নে। অসম্পূর্ণ ঐ যে কবিতাটি[১৫] ওরই সার্থক রসরূপ পাওয়া গেছে খেয়ার একটি কবিতায় তাতে কোনো সন্দেহ নেই—

এক রজনীর বরষনে শুধু কেমন ক'রে
আমার ঘরের সরোবর আজি উঠেছে ভরে।…
হেরো হেরো মোর অকূলঅশ্রুসলিল-মাঝে
আজি এ অমলকমলকান্তি কেমনে রাজে!
একটি মাত্র শ্বেতশতদল
আলোকপুলকে করে ঢলোঢল,
কখন ফুটিল বল্ মোরে বল্ এমন সাজে
আমার অতলঅশ্রুসাগরসলিল-মাঝে।[১৬]

উপমা একই: কান্নার সরোবরে আনন্দের পদ্ম, রূপের পদ্ম। এই পদ্মেই বাণীর বসতি। রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপির সাক্ষ্য ব্যতীত কার সাধ্য

ছিল বলে 'ব্যক্তিগত শোক থেকেই এই অপরূপ শ্লোকগুলি লেখা হয়েছে'? চেতনায়, ব্যক্তির অশ্রু আর আবেগ ধুয়ে মুছে নিঃশেষ হওয়ার পরেই শাশ্বত ও বিশ্বজনীন সৌন্দর্যের উদয় হয়।

পাঠক, স্মরণ-পাণ্ডুলিপির যে পৃষ্ঠাখানি উন্মোচন করা গেছে ঐ পৃষ্ঠায় বর্জিত অসম্পূর্ণ কবিতার পরেই পাওয়া যায়—

জাগো রে, জাগো রে, চিত্ত, জাগো রে!
জোয়ার এসেছে অশ্রু- সাগরে।

কবিতাটি[১৭] অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। স্মরণের অন্যান্য কবিতার তুলনায় বলা চলে এর রূপনিরূপণে তেমন সংহতি নেই। আবেগ অনেকটা আবেগই থেকে গেছে। অর্থাৎ, নিজের বেদনা পুরোপুরি বিশ্বের হয় নি। কিন্তু,—

বলেছিনু 'ভুলিব না' যবে তব ছলছল আঁখি
নীরবে চাহিল মুখে

পুরবীর এই কবিতাটি[১৮] সংহত আবেগে, অন্তর্বহ্নিময় বেদনে, ভাব ভাষা ছন্দ অলংকার প্রভৃতির তুলনাতীত প্রয়োগে আর অব্যর্থ গতিতে রবীন্দ্রকাব্যেও অদ্বিতীয়। আর, সেই গুণেই এটি বিশেষ একজন মানুষেরই অত্যন্ত নিগূঢ় ও নিজস্ব অভিজ্ঞতার কাহিনী হলেও, নির্বিশেষে প্রত্যেক প্রিয়বিরহীজন বলতে পারবে: এ আমারই অভিজ্ঞতা। কোনো প্রাণপ্রিয়তমারই পদক্ষেপ হয় নি যার শূন্য জীবনে সেও কি বলতে পারবে না? কারণ, কল্পনার মায়াদর্পণখানি কবি যখনই রসিকের হাতে তুলে দিলেন আর তিনিও তা স্বীকার করে নিলেন, তখনই ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখা আর না-দেখা, মন দিয়ে ছোঁওয়া আর না-ছোঁওয়া, এ কালের আর অন্য কালের, আমার ও অপরের— এ সবই তো ঐ দর্পণে সমভাবে প্রতিবিম্বিত হয়ে উঠল, জাগ্রত সত্তার আলোকসম্পাতে সত্য হয়ে উঠল। মৃণালিনীদেবীর স্মরণে লেখা[১৯] পূরবীর ঐ কবিতাটিতে এমন একটি দৃঢ় ও নিটোল

সম্পূর্ণতা আছে যে ওর থেকে কোনো কোনো ছত্র ছিন্ন করে নিয়ে রসাস্বাদের কোনো পথ নেই। দুঃখবেদনার অপ্রত্যাশিত এক sea-changeএর ফলে, বরুণদেবতার মন্ত্রপূত বারিনিষেকে, স্মরণ কাব্যে আর পূরবীর একটি-দুটি[২০] এই রচনায় প্রকাশের তারতম্য সামান্য নয়।

'ভাব বাৎলাবার জন্যে নয়, রূপ দেবার জন্য।' রবীন্দ্রনাথের এই 'ভাব' আর 'রূপ' অভ্রান্তভাবে চিনে নেবার একটি নিরিখ তো এই— রচিত গান বা কবিতার আবেদন বিশেষ ব্যক্তির কাছে না বিশ্বের কাছে? কোনো এক কালে না অন্য কালেও? অবশ্য, ভাবের, তেমনি রূপের, অনেক ডিগ্রী, অনেক মাত্রা আছে। অর্থাৎ, যখনই কিছু রচিত হল তার মধ্যে ভাবও আছে, রূপও আছে। কোন্‌টি মুখ্য হয়ে উঠল, কোন্‌টি গৌণ, কোন্‌টি কতখানি আমাদের নয়ন মন আকর্ষণ করে নিল, সেই হচ্ছে প্রশ্ন। ভিন্নভাবে বলা যাক, 'ভাব'-উপাদানে গড়ন বা 'রূপ' তৈরি হয় রসের আধার হবে বলে। রস তদাকার প্রাপ্ত হয়; রূপের অনুরাগে তদ্‌রাগ হয় বললেও ঠিকই বলা হবে। কারণ, রস দেখা যায় না, রূপই দেখা যায়। অথচ রূপের পাত্রে ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিয়ে রসেরই আস্বাদন হয়। রূপকেই রস ব'লেও কখনো কখনো ভ্রান্তি হয়। অপটু অপরিণত গড়ন হলে উপাদানটাই চোখে পড়ে। রস হয়তো সে আধারে ধরাও যায় না। আর, অপরিসীম পরিশ্রমে ও যত্নে এমন গড়নও কোনো কোনো ভোলামন কারিগর তৈরি করে যাতে গড়নটাই লক্ষ্য, গড়নেরই সহস্র 'বাহবা'— দেবতাদের পানোৎসবসভায় (রসিকজনেরাই দেবতা) সে গড়ন স্থান পায় না; কুলুঙ্গিতে, কাচের আলমারিতে, ধুলো ঝেড়ে-মুছে রাখা হয়— নিরর্থক আদর আর অলস বিস্ময়ের ধন হয় বুঝি নববধূর।

উপমা অনেক দূর পর্যন্ত টেনে আনা গেছে। লাগসই ব'লেই

নিখুঁত-যে তা নয়। পাত্র তৈরি ক'রেই কারিগর খালাস। রসের ভাবনা তার নয়। রস যার জুটবে যে-কোনো পাত্রে ঢাললেই তার কাজ চলবে, ফুটো না হলেই হল। সে ক্ষেত্রে সুন্দর অসুন্দর, কিভাবের কতটা সুন্দর এ-সবই যেন রুচিবিলাস মাত্র। তা ছাড়া উপাদান থেকেই পাত্র হচ্ছে। (কারিগরের মধ্যবর্তিতাও অবশ্যই আছে।) আর্টের ভুবনে ব্যাপারটা একেবারেই উল্টো। বাজারে বিপণিতে ধাতু পাথর মাটি বা চীনামাটির তৈরী গড়ন যেমন পাওয়া যায় তেমন যে আর্টেও পাওয়া যায় না তা নয়। তবে সত্যকার সে সংগীত নয়, কবিতা নয়, চিত্র বা মূর্তি নয়। যথার্থ রসরূপের সৃষ্টি হয় না আরোহ গতিতে— যেমন, আগে উপাদান, পরে পাত্র, তারও পরে পেয় বস্তু। রসের প্রেরণা অবতরণ করে অন্তরে— কেন, কোথা থেকে, সে হয়তো বলা যায় না— সচেতন বা অন্তশ্চেতন রসেরই প্রেরণায়, রসেরই প্রভাবে, 'জড়' উপাদান হয় বশীভূত, একটি ছন্দে নিয়ন্ত্রিত, একরূপ সৌন্দর্যে প্রস্ফুটিত ; তখন সেই রূপ বা প্রতিমা রসেরই রূপ, রসেরই প্রতিমা ব'লে গণ্য হয় ; অলক্ষ্যে অদৃশ্য অস্পৃষ্ট রস সেই আধারে ভ'রে ওঠে। রসের জন্য রূপ। রূপের জন্যই সূক্ষ্ম, স্থূল, দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, নানা বিচিত্র উপাদান।

'জড়' শব্দের লক্ষ্য যা পরবশ, ইচ্ছাময় কবির ইচ্ছার বশ, রসের প্রেরণার বশ। এই জড় উপাদানকে স্থূল-সূক্ষ্ম-ভেদে দুইপ্রকার ধরা যেতে পারে। স্থূলের ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। সূক্ষ্ম হল আবেগ, অনুভূতি, চিন্তা— আর্টের ব্যাপারে উপায় বা উপকরণ মাত্র, উদ্দেশ্য নয়। সেগুলিকে যতটা উদ্দেশ্য ক'রে তুলি ততটাই ভাব বাৎলাবার দিকে ঝুঁকি ; যতটা ছন্দে বেঁধে দিই ও নিয়মিত করি ততটাই রূপ জেগে ওঠে। অর্থাৎ, রূপ বলতে আকার নয়, 'ছবি' নয়। আর, ছন্দও স্বরবিন্যাসের, স্বরক্ষেপণের ছন্দ নয়। ইংরেজিতে রীদ্‌ম্ শব্দেরও অতি ব্যাপক অর্থ রয়েছে। সোজাসুজি যাকে 'ছন্দ' বলি

তাতেও দেখতে পাই ছন্দোবদ্ধ বাক্যাবলি কী আশ্চর্যভাবে মনে গেঁথে যায় আর স্মরণে থাকে। হৃদয় মনকে আকর্ষণ করা, হৃদয় মনের কাছে তারই প্রত্যক্ষতা দেওয়া যা তার (ছন্দের) অদৃশ্য প্রবাহে পড়েছে, যেটি সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খেলতে খেলতে চলেছে —এই হল ছন্দের কাজ। আবেগ, অনুভূতি, চিন্তা প্রত্যেকটিই চরম প্রত্যক্ষতা পায় ছন্দের গুণে। আবেগের ছন্দ, অনুভূতিব ছন্দ, চিন্তার ছন্দ। প্রত্যক্ষতা বা প্রতীতিকেই রবীন্দ্রনাথ রূপ বলে থাকবেন, দৃশ্যকে কখনোই নয়। উপাদান যখন থেকেও নেই তখনই এই বোধ সম্ভব— ছন্দের বোধ, রূপের বোধ।

৪

অভিমন্যুর মতো সপ্তরথীব মার খেয়ে না মরতে চাই তো, রসের আলোচনায় প্রবৃত্ত হব না। রূপ যে কী, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় বলি, সেইটিই এতক্ষণে 'বোধে বোধ' করবার কিনারায় এসেছি।

মরণ রে,   তুঁহুঁ মম শ্যামসমান।
মেঘবরণ তুঝ, মেঘজটাজুট,
রক্ত কমলকর, রক্ত অধরপুট—
তাপবিমোচন করুণ কোর তব
মৃত্যু-অমৃত করে দান।'[১]

এ অপূর্ব রূপ মানসনয়ন মেলে দেখবারই, আর তার সঙ্গে সংগতি রেখে সুরেরও যে রূপ তার কোনো তুলনা নেই। কিন্তু 'আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় বাঁশি' বা 'রোদনভরা এ বসন্ত' সেরূপ নয়; যদিও রূপেরই শেষ সীমা, কারণ, অতিশয় প্রত্যক্ষ। বর্ণতূলি হাতে নিয়ে তারুণ্যসুন্দর অঙ্গের বা বসন্তবনভূমির কোনো আলেখ্যলিখন এখানে নেই। আলোকের ও ছায়ার, একটি পুলকের ও একটি বিষাদের, 'নিরাকার প্রতিমা' রচিত হয়েছে আয়াসহীন কৌশলে।

ছবি হয়তো পরের ছত্রগুলিতে আছে, না থাকলেই ক্ষতি হ'ত যে তা বলা যায় না। কবিতার বা গানের প্রথম পদক্ষেপেই রূপের সৃষ্টি হয়েছে, রসের সৃষ্টি হয়েছে।

Daffodils
that come before the swallow dares and take
the winds of March with beauty

সুন্দর ছবি হলেও—

To-morrow, and to-morrow, and to-morrow,
creeps in this petty pace from day to day
to the last syllable of recorded time ;
and all our yesterdays have lighted fools
the way to dusty death

অথবা—

If thou didst ever hold me in thy heart,
absent thee from felicity a while,
and in this harsh world draw thy breath in pain

মানুষেব নিঃসীম বিষাদ ও বেদনাকে যেন পাথরে ছেনি দিয়ে কেটে কেটে বার করেছে। এও রূপ ; কিন্তু দেখবার জন্যে নয়, বুকে চেপে এর রুক্ষ কঠিন মৃত্যুহিম স্পর্শ বক্ষে চিরস্থায়ী ক'রে রেখে দেবার জন্যই।

রসরূপ-সৃষ্টির 'উপাদান' না ব'লে 'বিষয়'ও বলা যেতে পারে। স্থূল বিষয়— বস্তু, ঘটনা, তথ্য। সূক্ষ্ম বিষয়— আবেগ, অনুভূতি, তত্ত্ব, অথবা এক কথায় ভাব। বিষয় বা বিষয়ীর মর্যাদা-ভেদে, মুখ্য-গৌণ-ভেদে রসরূপেও ভিন্নতা ঘটে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যেতে পারে, 'কাব্যে', বিশেষতঃ আমাদের জানা-চেনা ইংরেজি কাব্যে, 'বিষয়ীর আত্মতা ছিল উনিশ শতাব্দীতে' আর 'বিষয়ের আত্মতা'

দেখতে পাই পূর্ব বা পর -বর্তী বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশে। রবীন্দ্রনাথের মতে 'বিশুদ্ধ আধুনিকতা' হল 'বিশ্বকে ব্যক্তিগত আসক্তভাবে না দেখে বিশ্বকে নির্বিকার তদ্গত ভাবে দেখা। এই দেখাটাই উজ্জ্বল, বিশুদ্ধ; এই মোহমুক্ত দেখাতেই খাঁটি আনন্দ। আধুনিক বিজ্ঞান যে নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে বিশ্লেষণ করে আধুনিক কাব্য সেই নিরাসক্ত চিত্তে বিশ্বকে'— বহির্বিশ্বকে আর অন্তর্বিশ্বকেও— 'সমগ্রদৃষ্টিতে দেখবে, এইটেই শাশ্বতভাবে আধুনিক।' কিন্তু বিষয়ই আমাদের দরোজায় এসে সাড়া দিক 'অয়মহং ভোঃ', অথবা নানা সুরে নানা ভঙ্গীতে বিষয়ীর কণ্ঠস্বরই আমাদেব কানে এবং প্রাণে বাজুক 'এই-যে আমি'— এই বিষয়েব আত্মতা[২২] বা বিষয়ীব আত্মতা[২৩] কিছুই সর্বজনগ্রাহ্য হয় না ছন্দ এবং রূপ না পেলে। ছন্দ ও রূপ দিতে যে নিবাসক্তিব প্রয়োজন হয় তাতে বিষয় গৌণ হয়, বিষয়ীও সরে দাঁড়ায়। তখন যেখানে যে-কেউ সেই রসরূপে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে তারই মনে হয়, এ তো আমারই অভিজ্ঞতার বিষয়, এ'তো আমারই 'দেখা' রূপ, আমাবই আস্বাদ্য বস, এ বিষয়ী যে আমি!—

যে ইচ্ছা গোপনে মনে
উৎসসম উঠিতেছে অজ্ঞাতে আমার
বহুকাল ধরে, হৃদয়ের চারি ধাব
ক্রমে পরিপূর্ণ কবি বাহিরিতে চাহে
উদ্‌বেল উদ্দাম মুক্ত উদাব প্রবাহে
সিঞ্চিতে তোমায়—

সমুদ্রমেখলা বসুন্ধরার সঙ্গে আত্মীয়তাবন্ধনেব এই ইচ্ছা, এই আবেগ কেবলমাত্র কবির হলে, তাতে আমার বা তোমার কিছুই এসে যেত না এবং এই ছন্দোবদ্ধ মধুরগম্ভীব সম্ভাষণে আমরা কর্ণপাতও করতেম না; কিন্তু রূপায়িত এ ইচ্ছা, এ আবেগ— আমার, তোমার, সকলেরই। কবির যে মানসসুন্দরী আকারে ও নিরাকারে 'জ্বলিছে'

নিবিছে যেন খদ্যোতের জ্যোতি', তার সেই জ্বলা ও নেভা আমাদের প্রত্যেকেরই মানস আকাশে। আর,—

স্বর্গের উদয়াচলে মূর্তিমতী তুমি হে উষসী
হে ভুবনমোহিনী উর্বশী

এই সম্বোধনে, সৌন্দর্যসৃষ্টির পরাকাষ্ঠা -হেন সংযত সংহত কল্পনায়, বিষয়ী আত্মসংবরণ করেছেন অনেক দূর ; বিষয়ের আত্মতাই প্রত্যক্ষ হয়েছে অপূর্ব মহিমায় ; সে বিষয় স্থূল কিছু নয়, বহির্জগতে ও অন্তর্জগতে স্থূল সূক্ষ্ম যা-কিছু বিষয় আছে সবেরই যেন রূপ— তার প্রতিষ্ঠা, তার নৃত্যচ্ছন্দ রসিকমাত্রেরই মনোমন্দিরে।

পাঠক, ধান ভানতে এসে, শিবের গীত যতগুলি মনে এল সবই প্রায় গাওয়া হয়েছে। আরও একটি গাওনার সম্পর্কে আপনাদের আরেকটু ধৈর্যের প্রত্যাশা রাখি।

রূপসৃষ্টির প্রাথমিক স্তরে আবেগ-আলোড়ন, সংস্কার-স্মৃতি, এ-সবেব প্রয়োজন সম্পর্কে মোট কথা যা বুঝি পূর্বেই বলা হয়েছে। তা ছাড়া এ কথারও আভাস আছে, কল্পনা বা দিব্যদৃষ্টিতেই কবি-প্রতিভার সীমা, কবিত্বশক্তির দূরগামী আর উর্ধ্বগামী মনোরথগতির সার্থকতা। ভাবীকাল থেকে, কখনো বা কালাতীত উর্ধ্ব থেকে আনে সে অপূর্ব ছন্দ, অভাবিত সুব, অপ্রকটিত সৌন্দর্য ; তাই রূপই রসরূপ হয়ে, 'আনন্দ রূপমমৃতম' হয়ে উঠে নিঃশেষে সার্থক হয়। বড়ো অদ্ভুত কথা নয় কি ? তবু হয়তো সত্য হতে বাধা নেই। পুনরুক্তি ক'রেও বলি— মাত্রা, যতি, ঝোঁক, লয়, স্বর, ব্যঞ্জন, বিচিত্র অনুপ্রাসের ঝংকার ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রেশ, পংক্তিলঙ্ঘক প্রবাহ বা শ্লোকসম্পূর্ণতা, এ-সব খুঁটিয়ে জেনে নিয়ে অথবা মনোযোগসহকারে পিঙ্গলাদি ছন্দোগ্রন্থ অনুশীলন ক'রে ধীমান ব্যক্তির পক্ষে যে ছন্দের

জ্ঞানার্জন সম্ভবপর সে আমাদের লক্ষ্য নয়। সে তো পরম্পরাগত কবিকৃতির প্রমাণে সিদ্ধ, বিধিবদ্ধ, অতীত; ভবিষ্যতের কিছু নয়। তা ছাড়া, যত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণই হোক, ছন্দের সে তবু বহিরঙ্গ মাত্র। অতীত থেকে ছন্দের এই বহিরঙ্গটিই অল্পবিস্তর গ্রহণ করে থাকে নূতন কবিও। কিন্তু, হায়, ছন্দের যে-একটি নিগূঢ় মর্ম আছে— রসাত্মা আছে বললেও অত্যুক্তি হয় না হয়তো— সে আছে সকল শাস্ত্রীয় বিধিবিধানের সম্পূর্ণ বাইরে। সেটি প্রত্যেক কবিকে বারে বারে নূতন ক'রেই পেতে হয়, নূতন করে অন্তঃকর্ণে শুনতে হয়, চোখ বুজে নিগূঢ় সত্তায় ছুঁইয়ে বুঝতে হয়। পুরাতন কোনো কবিকৃতির মর্ম থেকে সেটি ছিঁড়ে নেওয়া যায় না; নিতে হয় অশ্রুত, অনাগত থেকে। (আসলে সে আমাদের সত্তার ভিতর বাহির ভরে আছে, অনাগত নয়।) শব্দগত ছন্দেব সম্পর্কে যে কথা, সুর বা স্বরগত ছন্দ নিয়ে, 'সৌন্দর্য' বা আকারগত ছন্দ নিয়ে, সেই একই কথা— সমানই তার সত্যতা।

সংগীতশাস্ত্র জানা নেই, স্বরগ্রাম সাধা হয় নি, গমকে মীড়ে তানে বাটে কী-যে কাণ্ড-কারখানা হয় আশ্চর্যবৎ শুনেছি আর শুনেও বুঝি নি কিছুই। তবু, 'এহ বাহ্য, আগে কহো আর।' নারদসংহিতা বা সংগীতরত্নাকর মিলিয়ে, মিঞা তানসেন বা নিধুবাবুর অনুসরণ ক'রে, চিরপুরাতন অথচ চিরনূতন সুরের সেই সুরলোকে কোনোদিন কেউ প্রবেশ করে নি, রবীন্দ্রনাথও না। ধ্রুপদ-খেয়াল টপ্পা-বাউল দেশী-বিদেশীর ছাঁচ নিয়ে, ছাঁদ নিয়ে, খেলা করেছেন একদিন— খেলতে খেলতে তা থেকে যা-কিছু কলাকৌশল নেবার নিয়ে, ফেলে দিয়েছেন অথবা ভুলে গেছেন— অবশেষে বাদী বিবাদীর বিরোধ ঘুচিয়ে, কোন্ রাগিণীর সঙ্গে কোন্ রাগিণী মিশিয়ে, তৃতীয় কোন্ রাগ চকিতে ছুঁয়ে নিয়ে কেমন করে কী সৃষ্টি করেছেন তার রহস্য স্বয়ং কবিও জানেন না। সে গানের আকার-প্রকারের আভাস ইশারা

থাক্ পরম্পরাগত বাউল কীর্তন বৈঠকী গানের দিগ্‌বিদিকে, রসঘন অন্তঃশিহর-ভরা এ গীতিকবিতা ছিল না। তবু কোনোদিনই রবীন্দ্রনাথের আগে, আর পরেও হতে পারবে না।

তেমনি, সৌন্দর্য নয় পক্কবিম্বাধর আর শুকনাসা আর হরিণেক্ষণের জোড়াতাড়ার ব্যাপার। ফিতেয় বা গজকাঠিতে মেপে, গ্রীক বা ভারতীয় ভাস্কর্যের সঙ্গে মিলিয়ে, সৌন্দর্যের পরিত্যক্ত শরীরটাই পেতে পারি, প্রাণ নয়। প্রাণ পাব না, লাবণ্য পাব না, অঙ্গে অঙ্গে মাখানো 'মনের মাধুরী' বা চেতনার দীপ্তি কোথায় পাওয়া যাবে ?

আরো এক কথা, যে ছন্দ সুর সুষমা আর্টের বা কবিতার, প্রকৃতির রাজ্যে সে মূলেই ছিল না। আদৌ সৃষ্টি হয় নি এর প্রাকৃতিক ব্যাপারের অনুকরণে। কেমন করে হল ? শিল্পকথা পুস্তিকা থেকে শিল্পাচার্য নন্দলালের কথা এইখানে তুলে দিই— 'কন্‌ভেন্‌শন জিনিষটা বিষয়কে সহজ করা নয়, সম্পূর্ণ করা। সর্বত্র যে নিখুঁত ভাব আব নিখুঁত রূপেব দিকে উন্মুখ হয়ে চলেছে প্রকৃতির সকল আবেগ ও ইচ্ছা, অথচ ঝড় রৌদ্র শিলাবৃষ্টি আছে, কীট পশু মানবের শত উপদ্রব আছে, জড় উপাদানেব জড়ত্বের বাধা আছে, তাই ঠিকমত পৌঁচচ্ছে না, দৃষ্টি দিয়ে, প্রীতি দিয়ে সেইটি দেখা ও দেখানোতেই তার সার্থকতা।'

এখানে শুধু মনে রাখতে হবে, আমরা যাকে বলেছি ছন্দ, সুর, সুষমা, আচার্য তাকেই বলেছেন 'কনভেন্‌শন'। ঐগুলি প্রকৃতি থেকে যথাযথ তুলে নিয়ে লাগানো হয় নি আর্টে, কাজেই কন্‌ভেন্‌শন বা মন-গড়া বস্তু তো বটেই। মন কেনই বা গড়তে গেল তারও ইঙ্গিত রয়েছে ঐ উক্তিতে।

দেহ যদি আপন জড়ত্বের ভারে দেহীকে সততই টানতে না থাকত ভূশয়নে, তা হলে-যে মানুষের গতিমাত্রই নাচ হয়ে উঠত। মানুষ নট-নটীকে এ নাচ বহু সাধ্যসাধনায় অর্জন করতে হয়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের

বহুভঙ্গিম গতি ও স্থিতি নির্দিষ্ট কতকগুলি লয়ে অদৃশ্য একটি নক্সা-কাটা পথে ফিরে ফিরে আসে যেভাবে রসের প্রেরণে— তারই ফলে অঙ্গে অঙ্গে প্রবাহিত তরঙ্গিত হয়ে যায় অঙ্গীর আপন প্রাণ মন হৃদয় নয় শুধু, সুখ দুঃখ আনন্দ চেতনার অদৃশ্যপ্রবাহ-রূপী অপ্সর কিন্নর ঋভু ও দেবতাগণ। চেতনার অন্য লোকের অধিবাসীরা অন্য দৃষ্টির গোচর; অনুমান করতে পারি, মর্তলোকে গোচর হন তাঁরা মর্তজনের নাচের ছন্দে ছন্দে। দেবতাদের গতিই নাচ, ভাষাই সংগীত, ইচ্ছাই বিচিত্রদ্যুতি —এমন কল্পনা করতেও দোষ দেখি নে। পার্থিব নট-নটী অপার্থিব গতিগানেরই রসাবিষ্ট বাহন, তার ভঙ্গীতে ভঙ্গীতে অঙ্গ জাগায় [১৭]অনঙ্গের দ্যোতনা আর দৃশ্যে অদৃশ্যে কেবলই লুকোচুরি খেলতে থাকে।

নৃত্য জিনিষটি কৃত্রিম নয়, সেই অকৃত্রিম, সেই স্বাভাবিক— তবে অনাগত কালের আর উর্ধ্বলোকের হিসাবে। আনন্দিত গতিচ্ছন্দের সেই সম্পূর্ণতা। বাধাহীন শূন্যটি পেয়ে চন্দ্র সূর্য তারায় যেমন ছন্দ রচনা করেছে প্রকৃতি জ্যোতির্ময় কক্ষপথে-পথে, তেমনটি পারে নি আজও মানুষের মধ্যে। কাজেই, প্রকৃতির অসমাপ্ত সাধনা মানুষকেই সেধে নিতে হয়েছে। কে জানে, ছলনাময়ী প্রকৃতিই হয়তো গোপনে উস্‌কিয়ে দিয়েছে মানবপ্রকৃতিকে ?

কবিতা ভাব-ভাষার নৃত্য, গান নৃত্য স্বরে ও সুরে, ছবি নৃত্য রঙে ও রেখায়, মূর্তি এমন-কি মন্দিরও নৃত্য মন্ত্রস্থগিত— প্রস্তরীভূত— গতির ইশারায়। যে-কোনো স্থূল সূক্ষ্ম উপাদানে, সুখ-দুঃখ-আলো-ছায়ার দ্বন্দ্বে, আর শাস্ত্রসংগত বা অভ্যাসগত নিয়মে রচিত হোক, আর্টের সমস্তটাই আহরণ করা চলে না অতীত বা বর্তমান থেকে, স্মৃতিবিস্মৃতি বা নিছক ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সীমানা থেকে— আর্টের জগতে সার্থক সৃষ্টিমাত্রের এই রহস্য। আর, রহস্যও প্রায়শঃই রহস্যে আবৃত, অর্থাৎ সে সম্পর্কে বড়ো কেউ সচেতন নয়। স্রষ্টাও হয়তো জানেন,

হয়তো জানেন না। কদাচিৎ বিশেষ ঘটনা-সমাবেশেই এ রহস্যের স্ফুট ইঙ্গিত যেন পাওয়া যায় এমন দেখতে পাচ্ছি। যেমন—

আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো, নমো হে নমো,
তোমায় স্মরি হে নিরুপম,
নৃত্যরসে চিত্ত মম উছল হয়ে বাজে।··
আমার তনু-তনুতে বাঁধনহারা,
হৃদয় ঢালে অধরা ধারা,
তোমার চরণে হোক তা সারা
পূজার পুণ্য বাজে।
তোমার বন্দনা মোর ভঙ্গীতে আজ সঙ্গীতে বিরাজে।

১৩৩৩ সালের বৈশাখে, নটীর পূজার এই পরম ক্ষণের রূপায়ণে প্রথম অবতীর্ণ হয়ে, কুমারী গৌরীবসু ধন্য করেছিলেন নিজেকে আর রসিকগণকেও, অথচ কোনো কলাবিদ নটের কাছে নাচের তিনি কিছুই শেখেন নি। গুণী ও গুণগ্রাহী দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে 'কেমন দেখছেন' প্রশ্ন করায় তিনি বলেন, 'আমি তো দেখতে পাচ্ছি নে, চোখের জলে সব ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে।'

৫

জীবনস্মৃতিতে সংকলিত এই পত্রাংশের সঙ্গে পরিচয় অনেকেরই আছে—

'ভগ্নহৃদয় যখন লিখতে আরম্ভ করেছিলেম তখন আমার বয়স আঠারো। বাল্যও নয়, যৌবনও নয়। বয়সটা এমন একটা সন্ধিস্থলে যেখান থেকে সত্যের আলোক স্পষ্ট পাবার সুবিধা নেই।· এই সময়ে সন্ধ্যাবেলাকার ছায়ার মতো কল্পনাটা অত্যন্ত দীর্ঘ এবং অপরিস্ফুট হয়ে থাকে। সত্যকার পৃথিবী একটা আজগবি পৃথিবী

হয়ে উঠে। সেই কল্পনালোকের খুব তীব্র সুখদুঃখও স্বপ্নের সুখ-দুঃখের মতো।'

'ভগ্নহৃদয়' অধ্যায়ে এর পর রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন—

'নিজের মনের এই-যে অপরিণতির কথা বলিলাম ইহার সঙ্গে তখনকার কালের শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত যোগ দিয়াছিল।·· ইংরেজি সাহিত্য হইতে আমরা যে পরিমাণে মাদক পাইয়াছি সে পরিমাণে খাদ্য পাই নাই। তখনকার দিনে আমাদের সাহিত্যদেবতা ছিলেন শেক্‌স্‌পীয়র মিল্টন ও বায়্‌রন। ইহাদের লেখার ভিতরকার যে জিনিষটা আমাদিগকে খুব করিয়া নাড়া দিয়াছে সেটা হৃদয়াবেগের প্রবলতা। ·· অথচ য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের অবস্থার খুব একটা প্রভেদ ছিল। য়ুরোপীয় চিত্তের এই চাঞ্চল্য, এই নিয়মবন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, সেখানকার ইতিহাস হইতেই সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়াছিল। · সেখানে সত্যই ঝড় উঠিয়াছিল বলিয়াই ঝড়ের গর্জন শুনা গিয়াছিল। আমাদের সমাজে যে অল্প একটু হাওয়া দিয়াছিল তাহার সত্যসুরটি মর্মরধ্বনির উপরে চড়িতে চায় না, কিন্তু সেটুকুতে তো আমাদের মন তৃপ্তি মানিতেছিল না— এইজন্য আমরা ঝড়ের ডাকের নকল করিতে গিয়া নিজের প্রতি জবরদস্তি করিয়া অতিশয়োক্তির দিকে যাইতেছিলাম। · হৃদয়াবেগ সাহিত্যের একটা উপকরণমাত্র, তাহা যে লক্ষ্য নহে— সাহিত্যের লক্ষ্যই পরিপূর্ণতার সৌন্দর্য, সুতরাং সংযম ও সরলতা · '

রবীন্দ্রপ্রতিভার বাল্য ও কৈশোর -লীলায় ভাবুকতার, এমন-কি ভাবালুতার, আতিশয্য দেখা দিয়েছিল স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক, আত্মগত ও পরিবেশপুষ্ট, কোন্ হেতুপরম্পরায়, জীবনস্মৃতির এই উদ্‌ধৃতিতে কিছু তা বিশদ হবে। রবীন্দ্রনাথের ষোলো থেকে বাইশ বৎসর বয়সের মধ্যে যে-সব কাব্য সাময়িকে বা গ্রন্থাকারে বেরিয়েছে সেগুলিই উদ্‌ধৃত মন্তব্যের বিশেষ লক্ষ্য বলা যেতে পারে। জীবন-

স্মৃতির 'সন্ধ্যাসংগীত' অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ পুনর্বার বলছেন, এ ছিল এমন একটা কাল যখন—

'হৃদয়-নামেতে এক বিশাল অরণ্য আছে,
দিশে দিশে নাহিক কিনারা,
তারি মাঝে হনু পথহারা।

বাহিরের সঙ্গে যখন জীবনটার যোগ ছিল না, যখন নিজের হৃদয়েরই মধ্যে আবিষ্ট অবস্থায় ছিলাম, যখন কারণহীন আবেগ ও লক্ষ্যহীন আকাঙ্ক্ষার মধ্যে আমার কল্পনা নানা ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতেছিল⋯ '

রবীন্দ্রনাথের ষোলো থেকে কুড়ি-একুশ বৎসর বয়সের ভিতরে লেখা বা ছাপা, কবিকাহিনী, বনফুল, ভগ্নহৃদয়, রুদ্রচণ্ড, চারখানি কাব্য গ্রন্থের প্রত্যেকটি একটা-না-একটা কাহিনী অবলম্বনে গড়ে উঠেছে এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নায়কের ভূমিকায় একজন কবি। জ্ঞানের গোচরে বা অগোচরে শেলির Alastor কাব্য কবিকাহিনীতে কোনো প্রভাব বিস্তার করেছে কি না কে জানে। কবিকাহিনী আর বনফুল দুখানি কাব্যই অল্প-বিস্তর ছায়া-ছায়া অবাস্তবতায় পূর্ণ, অপরিণত। ভগ্নহৃদয় যে নাটক নয় সে হুঁশিয়ারির কথা ভূমিকাতেই আছে। যারা বাস্তব সংসারে বাস করে না, নিছক হৃদয়াবেগ দিয়ে গড়া কোনো একটা ত্রিশঙ্কুভুবনে পরস্পরের 'মন কুড়াইতে' 'মন ছড়াইতে' 'মনোফুল দলি চলি বেড়াইতে' নিরবধি সময়ক্ষেপ করে, আবার অন্যের মন পাবার দুরাশায় চিরপ্রদোষ বেলায় হাহুতাশ করে পথে পথে, অবশেষে শুকিয়ে মারা যায়, তাদেরই আরছায়া আবেগগুলির উৎপত্তি ও বিলয়কে একটা নাটকীয়তা দিতে চেষ্টা করা হয়েছে —এ কথা বললে অসংগত হবে না। অথবা বলা যেতে পারে, রক্তমাংসের মানুষকে বাদ দিয়ে তাদের ছাঁকা আবেগগুলিকে নটনটীরূপে আহ্বান করা হয়েছে ছায়াবৃত হৃদয়নাট্যমঞ্চে। ভগ্নহৃদয় গীতিবহুল। সব গানগুলিতে সুর দেওয়া হয়েছিল কি না জানা যায় না; কিন্তু এক

কালে অনেকগুলি গাওয়া হ'ত-যে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, আর কবিকর্তৃক নির্মমভাবে বাছাই করা গীতবিতানের দ্বিতীয় সংস্করণেও আসন রেখেছে এই গানটি: কী হল আমার— বুঝিবা, সজনী, হৃদয় হারিয়েছি!

আমাদের আলোচ্য 'মায়ার খেলা'র বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল, 'আমার পূর্বরচিত একটি অকিঞ্চিৎকর গদ্যনাটিকার সহিত এ গ্রন্থের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে।' বাংলা ১২৮৮ সালে ভগ্নহৃদয় আর ১২৯৫ সালে মায়ার খেলা, উভয়ের অন্তর্বর্তী ১২৯১ সালে প্রকাশ পায় সেই নাটিকাখানি 'নলিনী' নাম নিয়ে। নলিনীর ঘটনাবিন্যাস বা চরিত্রবিকাশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু নয়; বিশেষতঃ শেষের দিকে 'পতন ও মূর্ছা' প্রভৃতি নাট্যকৌশলের আকস্মিক ও পুনঃ পুনঃ প্রয়োগে নাটক সমাপ্ত করবার ব্যস্ততাই পরিস্ফুট হয়েছে। নলিনীতে রবীন্দ্রনাথের সেকালের কয়েকটি ভালো গান আছে, না হলে ভগ্নহৃদয়ে যত ত্রুটিই থাক্, আগাগোড়া ছন্দোবদ্ধ কবিত্বের গুণে তার যে আকর্ষিণী শক্তি আছে নলিনীতে তা নেই। বাইরের প্লটের দিক থেকে, রচনাকালের দিক থেকে, নলিনীর সঙ্গে মায়ার খেলার যত নিকট সম্পর্কই থাকুক, অন্তরে অন্তরে অনেক বেশি মিল আছে তার ভগ্নহৃদয়েরই সঙ্গে। মায়ার খেলার অমর ও প্রমদার পূর্বাভাস আছে ঐখানে কবি ও নলিনীর চরিত্রে। মায়ার খেলার মতোই ভগ্নহৃদয়ের গল্পটিও গ্রথিত হয়েছিল পাত্রপাত্রীর আলাপচ্ছলে। কিন্তু মায়ার খেলার মতো যা-কিছু আলাপ সবই গানে গানে মুখর নয় সেখানে; অনেক তার আবৃত্তিযোগ্য কবিতা আর সুদীর্ঘ স্বগতোক্তি, গান বলে যেগুলি নির্দিষ্ট তারও অনেকগুলি বস্তুতঃ সুরহীন ব'লে বা অন্য কারণেও তেমন পরিমিতি রক্ষা করে নি। মায়ার খেলা ভগ্নহৃদয়েরই আত্মজা, কিন্তু নানা কারণে তার ঘটনাশৃঙ্খলা ও চরিত্রবিকাশ অপেক্ষাকৃত সংহতি পেয়েছে। বয়স এবং অভিজ্ঞতা -বৃদ্ধির সঙ্গে

সঙ্গে এ পরিণতি অনিবার্য; উপাখ্যানস্থাপনার ঐক্য ও সংহতির এ কারণটিও ছিল যে, মায়ার খেলা নিরুদ্দেশ সৃষ্টিসুখের রচনা নয়— এটি লেখা হয়েছিল বা গ্রন্থে মুদ্রিত আকৃতি পেয়েছিল 'সখিসমিতির মহিলা শিল্পমেলায় অভিনীত' হবে এই লক্ষ্য সামনে রেখে।

কিন্তু, মায়ার খেলা তবু তো তেমন সংহত হয় নি, তেমন প্রত্যয়-যোগ্য বাস্তবতা পায় নি। সমস্ত রচনাটি গান গেয়ে গেয়ে, এবং প্রযোজকের সে প্রয়োগনৈপুণ্য থাকলে আদ্যন্তই নেচে গেয়ে, অভিনয়যোগ্য হওয়াতে মনোহারিতা আছে প্রচুর সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, তবু রসরূপগত সম্পূর্ণতার গুণেই সেটি হয়েছে কি, যেমন হয়তো হয়েছে পূর্ববর্তী বাল্মীকিপ্রতিভায়? বাল্মীকিপ্রতিভা 'গানের সূত্রে নাট্যের মালা' আর মায়ার খেলা 'নাট্যের সূত্রে গানের মালা' রবীন্দ্রোক্ত এ ইঙ্গিত স্মরণ রেখেও বিচার্য, নাট্যই হোক আর গানই হোক, রূপের অপরূপতার দিকে কোন্‌টি বেশি এগিয়েছে? বাল্মীকি-প্রতিভাই। তার অন্যতম কারণ এই যে, এ রচনায় কবিত্বশক্তির আশ্রয় হিসাবে পাওয়া গেছে পরমাদৃত একটি পুরাকাহিনী, সেইসঙ্গে কবির মনে ও সমস্ত সমাজের মনে যাকিছু অনুষঙ্গ। যেমনই রূপান্তরিত হোক, বহু যুগের ও বহু মানবের অনুষঙ্গ-পুষ্ট এই কাহিনী কবিপ্রতিভার পাদপ্রতিষ্ঠার সুদৃঢ় ভূমি। মায়ার খেলার স্বকপোল-কল্পনায় সে দৃঢ় ভূমি কোথায়? বাল্মীকিপ্রতিভায় বা কালমৃগয়ায় শুধু নয়, ইতিমধ্যে অন্য অনেক রচনাতেই রবীন্দ্রকাব্যভূমণ্ডলের দীর্ঘ-প্রত্যাশিত ডাঙা দেখা দিয়েছে। ছবি ও গান, প্রকৃতির প্রতিশোধ— জলস্থলের সীমানায় আছে বলা চলে। প্রকৃতির প্রতিশোধেই জেগে উঠেছে সেই বাণী, জীবনদেবতার কাছে যার বায়না নিয়ে এসেছেন রবীন্দ্রনাথ অরূপলোক থেকে রূপলোকে। পথে ঘাটে, গ্রামে গঞ্জে ভিড় ক'রে আসছে যাচ্ছে যারা চিরটা কাল সেই সাধারণ মানুষ সশরীরে এই গ্রন্থে এসে হাসছে কাঁদছে, স্বভাষায় কথা বলছে—এও

বড়ো কম কথা নয়। প্রতিভার নিঃসংশয় বিশিষ্টতা ও শিল্পপরিণত বাস্তবতা কম-বেশি দেখা দিয়েছে— বৌঠাকুরানীর হাট,[২১] রাজর্ষি[২২] এবং কড়ি ও কোমল কাব্যগ্রন্থে। এগুলি সবই মায়ার খেলার পূর্বপ্রকাশিত।

ভগ্নহৃদয়ের সমকালীন[২৩] রুদ্রচণ্ড নাটিকা, তার আলোচনাও সেরে নেওয়াই ভালো। কবি এখানে 'ইতিহাসে' আশ্রয় খুঁজেছেন ; এই নাট্যের 'কবি'টি ঐতিহাসিক চাঁদকবি। কিন্তু ইতিহাস তেমন প্রত্যয়গ্রাহ্য হয় নি। কবি এই রচনায় ভাববিহ্বলতা ও গীতিসর্বস্বতার মায়াগণ্ডী পার হয়ে, দস্যুপরিণত রুদ্রচণ্ডের প্রচণ্ড রোষে ও গর্বে, চরিত্রে-চরিত্রে ঘটনায়-ঘটনায় সংঘাত ঘটানোর কৌশলে, প্রাণপূর্ণ নাট্যসম্ভাবনার রুদ্ধ দ্বারে গিয়ে ঘা দিলেও, দরোজা তবু খোলে নি।

মোট কথা, ভগ্নহৃদয় ও রুদ্রচণ্ড -রচনার পর. রবীন্দ্রপ্রতিভার ঋতুর বদল হয়েছে, শক্তি ও বিশিষ্টতা ফুটে উঠেছে নানা ক্ষেত্রে, কেবল মায়ার খেলা রয়ে গেছে পূর্বের মতোই মায়াময় স্বপ্নময় গণ্ডীর ভিতরে। মায়ার খেলার পর কোনো গীতিনাট্যে হাত দেন নি কবি দীর্ঘ কাল। দিলে কী হ'ত বলা যায় না। সংগীতে ও অভিনয়ে— নৃত্যও এসে জুটেছে— অবিচ্ছেদ্যভাবে মিলিয়ে মিশিয়ে, কিছু-কম পঞ্চাশ বৎসর পরে হাত দিয়েছেন যখন 'চিত্রাঙ্গদা'য়, তখন তিনি শান্তিনিকেতন আশ্রমের 'গুরুদেব', সুদীর্ঘকালের নিরলস সাহিত্য-সাধনায় ও জীবনসাধনায় সিদ্ধপুরুষ বললেও অত্যুক্তি হয় না— বহুমুখী প্রতিভার শিখরদেশে সমাসীন।

তাই 'নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা'র সঙ্গে 'গীতিনাট্য মায়ার খেলা'র তুলনা হয় না। তুলনা করা তবু দরকার। কারণ, অঘটনঘটন-পটীয়সী মায়া, যার অন্য নাম প্রতিভা, তারই প্রৌঢ় পরিণতি দূরবর্তী থাকায় মায়ার খেলায় যে সংকল্প সিদ্ধ হয় নি চিত্রাঙ্গদায় তাই রূপে রসে অনির্বচনীয়তা লাভ করেছে 'সত্তর বছরের প্রবীণ যুবা রবীন্দ্র-

নাথের' যত্নে। বস্তুতঃ আয়ু তখন পঞ্চসপ্ততিবর্ষপূর্তির কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, এবং কবিত্বসিদ্ধি এমনি আয়াসবর্জিত যে তাঁকে 'ইচ্ছাময় কবি' বললেও বিশেষ অত্যুক্তি হবে না। প্রতিভার পূর্ণ-পরিণতি ও পুরাণকাহিনীর অবলম্বন, চিত্রাঙ্গদা রচনাটি অপরূপ সৌন্দর্যে মণ্ডিত ও রসে চঞ্চল হয়ে ওঠবার পক্ষে ঐ দুটিই যথেষ্ট ছিল ; অধিকন্তু ঐ সঙ্গে মিলেছে নৃত্যকলা। কাজেই বলা চলে, বাল্মীকিপ্রতিভা বা মায়ার খেলাব তুলনায় নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদায় রসরূপসৃষ্টিব আয়তনমাত্রার সংখ্যাও (dimensions) বেশি— কাব্য, গীত, নৃত্য-অভিনয়, রূপসজ্জা। যেন মহেন্দ্রমুকুটের দিব্যহীরক, শত সূচীমুখে তার আলো ঠিকবে পড়ছে। যেন উন্মুক্ত একটি ঝরোকায় উৎসবমোদিত ইন্দ্রসভাই আমাদেব বিস্মিত নয়নমনের সম্মুখে এসে পড়েছে। অথবা বলা যায়, একদিন ফাল্গুন-সন্ধ্যায় ধুতির উপব জামা-চাদব চড়িয়ে বেরিয়েছি বাঙালি ভদ্রলোকটি গুরুপল্লী বা নিচুবাংলাব গৃহ থেকে, উত্তরায়ণ-প্রাঙ্গণে সমবেত হয়েছি, অকস্মাৎ কখন কে আমাদেব দেবলোকে দেবসদস্যদেরই এক সারিতে বসিয়ে দিয়েছে ! এই অপরূপ ববীন্দ্রকৃতি পথম নয়ন-মন-শ্রবণের গোচর হতেই যে চমৎকার জন্মেছিল তাব বর্ণনাব উপযুক্ত ভাষাও দুর্লভ।

চিত্রাঙ্গদার পরেও আমাদেব, রুদ্ধশ্বাস বিস্ময়েব সোপানে সোপানে উঠিয়ে নিয়েছেন কবি চণ্ডালিকায়, শ্যামায়। গীতিনাট্য মায়ার খেলাব রূপান্তরেও মন দিয়েছিলেন অবশেষে, তাকে নতুন করেই কল্পনা কবেছিলেন নৃত্যনাট্য হিসাবে। শান্তিনিকেতন আশ্রমের অল্পসংখ্যক দর্শকের সামনে তারই আংশিক অভিনয় হয়েছিল বাংলা তেরো-শো-পঁয়তাল্লিশেব ফাল্গুন-পূর্ণিমায় ; সমগ্র নৃত্যনাট্যটি'' মঞ্চস্থ করতে গিয়ে বর্তমান রচনাটির উপবে আরও কী পরিবর্তন হ'ত বলা যায় না। তা ছাড়া, গ্রন্থনিবদ্ধ রচনা ও নাট্য-নির্দেশ এক, মধুর কণ্ঠে যথাযথ গাওয়া গান এক, নিপুণ প্রযোজক-

কর্তৃক সমস্তটির ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পূর্ণ আর-এক জিনিষ। মুদ্রিত গ্রন্থের সাহায্যে রূপ দিয়ে, ভবিষ্যতে অল্প বা অধিক সিদ্ধি অর্জন করবেন হয়তো অনেকেই; কিন্তু এই নৃত্যনাট্যের রবীন্দ্রমনোভব কল্পরূপ একেবারেই হারিয়ে গেল—এ দুঃখ কখনো ঘুচবে কি? নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা বা শ্যামার রূপায়ণে যে বহুমুখী প্রতিভার অলৌকিক নৈপুণ্য দেখা গিয়েছিল— দুর্লভ সমাহার হয়েছিল অন্য সহকারী প্রতিভার— নিরবধি কালে তেমনটি কবে আর হতে পারবে কে জানে!

পঠিত কাব্য আর কথঞ্চিৎশ্রুত গীত— এই হিসাবেই আমরা মায়ার খেলার দুটি রূপের পরস্পর তুলনা করব। তার পূর্বে, যে কথা বহু-আলোচিত হয়েও সহজে বুদ্ধিগত হতে চায় না তারও উল্লেখ করা একবার সংগত নয় কি? রেনেসাঁ-পরবর্তী পাশ্চাত্য চিত্রকলায়, কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে সাংসারিক বাস্তবের অনুকৃতি চেষ্টাই ক্রমপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়েছে বহুকাল ধ'রে; আমাদের দেশেও তার আমদানি হয়েছে। আমাদেরও সাদরে তা বরণ করে নিতে হয়েছে। কারণ, এ হল যুগপ্রবৃত্তি, পুরোপুরি এর বিরোধিতা না বাঞ্ছনীয়, না সম্ভবপর। তা ব'লে শিল্পের শিল্পত্ব যে ঐ বাস্তবিকতাতেই নয়, এ কথাও সর্বদাই মনে রাখবার। যেমন, রবীন্দ্রনাথ বাঙালি ব'লেই বাংলায় লিখেছেন, দক্ষিণী হলে তামিল বা তেলেগু ভাষায় লিখতেন, ইংরেজ বা ফরাসী হলে ইংরেজি বা ফ্রেঞ্চে লিখতেন— কাজেই তাঁর কবিতার কবিত্ব তাঁর স্বীকৃত ভাষার সঙ্গে আসলে অভিন্ন নয়। অভিন্ন হয়ে উঠেছে ঘটনাক্রমে, বাঙালির বহুভাগ্যে, প্রতিভা বা রসপ্রেরণা তাকে স্বকীয় করে নিয়েছে ব'লে। আত্মবাদীদের কাছে আত্মা ও দেহের যে সম্পর্ক— দুটিতে তত্ত্বের দিক দিয়ে অভিন্ন না হয়েও ব্যবহারতঃ অনেকটাই অভিন্ন; ব্যবহার ফুরোলে বা অরুচিকর হলে জীর্ণ বসনের মতোই তাকে ত্যাগ ক'রে আত্মার পক্ষে অন্য দেহ-গ্রহণেও বাধা নেই।

সাংসারিক বাস্তবতাও তেমনি কবিপ্রতিভা স্বীকার করে নেয় তো ভালোই, আর পরিহার ক'রে অন্য স্তরের অন্য বাস্তবতা -সৃষ্টিতে মন দিলেও আমাদের কথাটি বলা চলবে না। সে তপস্যায় সিদ্ধ হোন কবি, আমরা বরং আরও তাঁর জয়ধ্বনি দেব, চিরস্মরণের দেউলে তাঁর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে পূজা করব। ভ্রান্তিবিলাস না ঘটে এজন্য আর্টের এই অতিবাস্তবতাকে, বাস্তব না ব'লে সত্য বলা যেতে পারে। শেক্‌স্‌পীয়রের সৃষ্ট জগৎ সম্পূর্ণ বাস্তব নয়, অতিবাস্তব এবং সত্য। রামায়ণ-মহাভারতের অদ্ভুতকর্মা নরবীরগণই নয়, তার দেব দৈত্য রাক্ষস, অপ্সর কিন্নর বানর, সবই সত্য, অতিশয় সত্য। রাবণের দশ মুণ্ড, কার্তবীর্যার্জুনের সহস্র বাহু, মহাবীরজির সূর্যতারা কুক্ষিগত করবার যোগ্য প্রতাপ আর ফাঁস আট্‌কিয়ে সমূলে মেরুপর্বত উৎপাটন করা যায় লাঙ্গুলের এমন দৈর্ঘ্য ও স্থিতিস্থাপকতা— কয়েক সহস্র বৎসর ধরে ভারতবর্ষীয় সমাজের সকল স্তরের অগণ্য নরনারী সাক্ষ্য দিয়েছে এ-সব সত্য, কারণ, প্রত্যক্ষবৎ, প্রতীতিগম্য। এই একই কারণে ঠাকুরমা ঠাকুরদা -কথিত রূপকথা-রসকথা গুলিও সবই সত্য। রণরঙ্গিনী দিগ্‌বসনা কালী বা তাণ্ডবমত্ত নটবাজ শিব, অথবা সিংহ-বাহিনী দশভূজা দুর্গা-- ঋষিকবিগণের ধ্যানপুণ্যে আর মূর্তিকার-চিত্রকারদের সাধনপ্রসাদে নিষ্পলক দৃষ্টিতে আমরাও দেখেছি, দেখে ধন্য হয়েছি, অস্বীকার করতে তো পারি নে। অর্থাৎ, লোকালয়ের ঘরে ও বাইরে— চৌরাস্তায় ও বাজারে— ইন্দ্রিয়গোচর হোক, না-ই হোক, মনের কাছে, হৃদয়ের কাছে, ধ্যানে, জ্ঞানে প্রত্যক্ষ হল কি না এইটেই আর্টের ক্ষেত্রে প্রথম ও শেষ প্রশ্ন।

ভাষান্তরে, আর্টে চাই রূপের সত্যতা বা সত্যেরই রূপ।

কোনো বিশেষ দেশকালের চিহ্ন কোথাও নেই সেজন্যই নয়, পূর্বোক্ত সত্যতার বিচারে বা প্রত্যক্ষতার পরখে ভগ্নহৃদয় বা নলিনী বা মায়ার খেলা সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হয় না। কতকগুলি বিশেষ হেতুর

যে যোগাযোগে বাল্মীকিপ্রতিভা সত্য হয়েছে, রসিক সামাজিকের মানসপ্রত্যক্ষতায় পৌঁছে তাকে পুলকিত করে তুলেছে, সে সুযোগ এ ক্ষেত্রে দেখা দেয় নি। মায়ার খেলার গল্পটি তরুণ প্রতিভার উদ্ভাবন; গতি পরিণতি ক্রিয়ামুখ্যা নয়, ভাবুকতাপূর্ণ একপ্রকার ভালোবাসা-বাসির সূত্রে। সে রাগ-বিরাগ স্বপ্নের রাগ-বিরাগের মতোই; চরিত্রগুলি কতকটা সুপ্তিচারী নয় তা বলা যায় না। এই সুপ্তিলোকে স্বপ্নগুলির চারণার ফাঁকে ফাঁকে অদৃশ্য মায়াকুমারীগণ মায়ামন্ত্র প'ড়ে, মায়াগান গেয়ে, তাঁদের উদ্দেশ্য বা খেয়ালই সিদ্ধ করছেন। এ ব্যাপারে শেলির Witch of Atlas-এর কল্পনা তরুণ কবি-কল্পনাকে যদি-বা একটু ছুঁয়ে গিয়ে থাকে, স্পষ্ট কোনো প্রভাব বিস্তার করেছে তা বলা যায় না। যা হোক, এই সুপ্তি-স্বপ্ন-লোকে মায়াকুমারীরাই হয়তো সজাগ, কিন্তু তাঁরা এ নাট্যের কতটুকু? তাঁদের কাছে যা খেলা মাত্র, অন্য পাঁচজনের তাই জীবন-মরণ-প্রশ্ন, তথা হৃদয়বিদারণ। সুখের বিষয় যে, অমর, অশোক, শান্তা, প্রমদা আসলেই—

> such stuff
> as dreams are made on ; and 'their' little life
> is rounded with a sleep.[২৮]

এ ক্ষেত্রে শেক্‌স্‌পীরীয় বাক্যের গভীরার্থ কেউ টেনে আনবেন না আশা করি। এই দৃশ্যকাব্যের আসল সার্থকতা হল স্বপ্নোচিত; বহু সুমধুর প্রেমসংগীতের আকর এটি; আর সেই গানগুলির রচনায় রবীন্দ্রনাথের সে সময়ের গীতিপ্রতিভার সকল জনমনোহারী জাদু সুপ্রচুরভাবেই আছে। আমার পরান যাহা চায়, সখী ব'হে গেল বেলা, ওলো রেখে দে সখী রেখে দে, ওগো দেখি আঁখি তুলে চাও, দিবস রজনী আমি যেন কার, অলি বার বার ফিরে যায়, বিদায় করেছ যারে নয়নজলে, না বুঝে কারে তুমি ভাসালে আঁখিজলে—

এই-সব গান এক কালের শিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত, রসিক-সমাজকে কিপর্যন্ত মাতিয়ে তুলেছিল অনুমান করা কঠিন নয়। কিন্তু, কবিতা বা সুরসৃষ্টি যেভাবেই দেখা যাক, প্রায়শঃ এগুলিতে রূপের প্রকাশ থেকে ভাবের বিলাস অধিক রয়েছে— রবীন্দ্রনাথের আত্মবীক্ষণের আলোকেই এরূপ ধারণা করার সুবিধা হল।

ঐ ভাবকুয়াশাকে অনেকটাই অপসাবিত ক'বে, রূপ'কে পরিচ্ছিন্ন-ভাবে ফুটিয়ে, কাহিনীকে ঋজুগতিতে এগিয়ে নিয়ে, অপ্রয়োজনীয় ভার-মোচনেব দ্বারা বচনাটিতে ঐক্য ও তনুতা দিয়ে, সাতাশ বৎসব বয়সের রচনাকে সাতাত্তব বৎসর বয়সে কি ভাবে কতটা রূপান্তরিত করলেন রবীন্দ্রনাথ, খুটিয়ে তা বলা যাবে না। আব, ব'লে লাভও নেই। কারণ, যত নিপুণ বাক্যবিন্যাসই কবা যাক, ছাপা কাগজ কিছু গান গেয়ে উঠবে না আর মুদ্রিত পদাবলীব পদে পদে তালে তালে মঞ্জীর বেজে উঠবে না নেপথ্যবর্তী এস্রাজ-সেতার মৃদঙ্গ-মন্দিবা বাঁশি-বেহালাব একতান বাদনেব সঙ্গে সঙ্গে। তবে? প্রচলিত গীতবিতানে পর পব দুটি পাঠ পড়ে নিতে হবে পাঠককে। আবৃত্তি কবা হলেই ভালো হয়। পুবাতনেব সঙ্গে মিলিয়ে নূতন গান শুনে নিতে হবে আর, গীতিনাটিকা অনেকের দেখা আছে, কোনো বহুগুণ-শালী কলাবিদ্ (দুঃসাহসই তাঁব প্রধান গুণ হলে চলবে না) নৃত্যনাট্য মায়ার খেলাটি মঞ্চস্থ করতে যদি যত্ন করেন, উপযুক্ত নটনটী যদি পান, তা হলেই আলোচ্য রূপান্তবেব সামগ্রিক একটি ধারণা সম্ভবপব হবে। নির্দোষ ধাবণা, অবশ্য, হবে না। কারণ, পূর্বেই বলেছি, রূপান্তরিত রচনা যা পাওয়া গেছে প্রয়োগকালে তাব উপরেও পরিবর্তন করতেন না কবি, নিশ্চিত বলা যায় না। পুরাতন গানগুলির সুরের ছাঁদ ঠিক রেখেও হয়তো এমন অনেক পরিবর্তন করতেন, এমন অনেক সূক্ষ্ম সুকুমার কারুকার্যের স্পর্শ লাগত এখানে সেখানে, যাতে পুরাতনকে চেনাই যেত না।

যা হোক, মূল রচনা ও রূপান্তর মোটের উপর তুলনা ক'রে দেখা যাক পাঠেরই বা পরিবর্তন কোন্ দিকে, কতখানি। একটি লেখায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'কাব্য হীরার টুকরার মতো কঠিন'। অর্থাৎ, নির্মম। যা রূপপ্রকাশের জন্য একান্ত আবশ্যক নয় তা ভাবুকতায়, ছন্দোবন্ধে, অলংকারে বা বিশেষ কোনো অনুষঙ্গ -বশতঃ, যত সুন্দর ও যত দরদের বস্তুই হোক, তার সম্পর্কে কলাকারের কোনো লোভ মোহ থাকে না। দিনজীবী[২৯] ব্যক্তির স্বাক্ষর, তার রাগ-বিরাগ, তারই অভিন্নদেহী চিরজীবী কবি নিষ্ঠুরভাবে বর্জন করেন। সার্থক কলাসৃষ্টি এত কঠিন, এমন কেটে কেটে তৈরি ব'লেই, তার শতসূচীমুখে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়।

৬

মায়ার খেলাকে রূপান্তরিত করতে ব'সে, প্রথমেই দেখতে পাই, কবি তার বহু অংশ বর্জন করেছেন। নাটিকায় সাতটি দৃশ্য আছে। মায়াকুমারীদের গান নিয়েই প্রথম দৃশ্য, গানটি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। পুরাতন রচনায় ধারাবাহিক মন্তব্য হিসাবে বা 'কোরাস' হিসাবে বাকি ছয়টি দৃশ্যেও ছিল মায়াকুমারীদের গান ; কায়াধারীদের আলাপ-বিলাপের ফাঁকে ফাঁকে তারা কোনো-একটি গান টুকরো টুকরো ক'রে গেয়ে দৃশ্যের শেষে পুনর্বার সব গানটি গেয়েছে। নূতন পাঠে প্রথম দৃশ্যের পর দ্বিতীয় দৃশ্যেও তাদের আবির্ভাব আছে; জীবনে 'প্রথমাগত' বসন্তের উন্মাদনায় অমর[৩০] পার্শ্ববর্তিনী শান্তাকে[৩০] লক্ষ্য না ক'রে অজানা-অচেনা 'চিরবিদেশিনী'র অভিসারে যাচ্ছে, তাই মায়াকুমারীরা বাস্তব নটনটীর অলক্ষ্যে থেকে 'অশ্রুত' সুরে[৩১] গেয়ে উঠেছে—

কাছে আছে দেখিতে না পাও !
তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও ?

গানটি একবারেই গাওয়া হয়েছে। নৃত্যনাট্যের পাঠে তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ও ষষ্ঠ দৃশ্যে মায়াকুমারীগণ অনুপস্থিত। সপ্তম দৃশ্যের শেষের দিকে তাদের শেষ আবির্ভাব একটি অচ্ছিন্ন গানে। মায়াকুমারীদের পুনঃ পুনঃ আবির্ভাবে এবং ছিন্ন ছিন্ন গানে নানা করুণ মধুর ভাবুকতাকে নানা করুণ মধুর ভাষায় ও সুরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করা ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'ত না। বাদ দিয়ে, নাটকে বেগ বা নাটকীয়তা বহুগুণে বেড়েছে।

তৃতীয় দৃশ্যে দেখি বয়ঃসন্ধিস্থিতা চঞ্চলা প্রমদা প্রেম বোঝে না; কখনো যৌবনলাবণ্যগর্বে কখনো কৈশোরশঙ্কায় রূপমুগ্ধ স্তাবকদের প্রণয়নিবেদন প্রত্যাখ্যানই করে। আপনাকে নিয়েই তার আপনার সুখ; বলে—

দে লো, সখী, দে পরাইয়ে গলে
সাধের বকুলফুলহার।

সে বোঝে না 'জীবনে পরম লগন কোরো না হেলা'[৩২] এ সতর্কতার বাণী কেন। কেননা—

মিছে কথা ভালোবাসা!
সুখের বেদনা সোহাগযাতনা
বুঝিতে পারি না ভাষা।···
তিলেক দরশ পরশ মাগিয়া
বরষ বরষ কাতরে জাগিয়া
পরের মুখের হাসির লাগিয়া
অশ্রুসাগরে ভাসা—
জীবনের সুখ খুঁজিবারে গিয়া
জীবনের সুখ নাশা!

এই যখন তার দুর্বিনীত গর্ব বা ভয়, যে অভাগা (অমর নয়) ছুটে এসে বলে 'ফুলদলে ঢাকি মন রেখে যাব চরণে পাছে কঠিন ধরণী

পায়ে বাজে', তাকে পরোক্ষে শুনতে হয়—

ওকে বলো, সখী, বলো
কেন মিছে করে ছল!
মিছে হাসি কেন সখী, মিছে আঁখিজল!

চঞ্চলা হলে কী হবে, সিকিখানি কটাক্ষে সবই বুঝতে পারে।

এ দৃশ্যে প্রমদা ও সখীগণ ছাড়া প্রণয়প্রার্থী অমর ও অশোক এসেছে; মায়াকুমারীদের আর কুমারকেও বাদ দিয়ে নাট্যরূপে প্রয়োজনীয় সংহতি আনা হয়েছে।

চতুর্থ দৃশ্যে ছিল অমর অশোক ও কুমার এই তিন প্রত্যাখ্যাত প্রেমিকের দীর্ঘ আলাপ ও বিলাপ। নূতনে বর্জিত হয়েছে। তার পরিবর্তে শান্তাকে একবার পাদপ্রদীপের সামনে এনে তার গূঢ় মর্মবেদনার আভাস দেওয়াতে—'তারে দেখাতে পারি নে কেন প্রাণ খুলে গো'— এই চরিত্র-বিকাশের পর পর সোপানগুলি পাওয়া গেছে। শান্তার সম্পর্কে তরুণ রবীন্দ্রনাথ এতটা সচেতন ছিলেন না; দ্বিতীয়ের পর একেবারে ষষ্ঠ ও সপ্তম দৃশ্যে তার দেখা পাওয়া যেত। যা হোক, চতুর্থ দৃশ্যেই দেখা গেল রূপজ মোহ তখনো চোখে লেগে রয়েছে অমরের, প্রমদার হৃদয়ও সলজ্জ মধুর অনুরাগে আকৃষ্ট, কিন্তু উভয়ের চাওয়া-পাওয়ার মাঝখানে সখীদের ছলনাজালে অনাবশ্যক ভ্রান্তির বাধা ও ব্যবধান।

পঞ্চম দৃশ্যে দেখা যায় প্রমদার অনুরাগ আবেগে পরিণত—

এ তো খেলা নয়, খেলা নয়,
এ যে হৃদয়দহনজ্বালা সখী!

কিন্তু, কার জন্য? সখীদেরই একজন ইঙ্গিতে দেখান—

ওই-যে তরুতলে
বিনোদমালা গলে
না জানি কোন্ ছলে বসে রয়েছে!

প্রমদা বলে, যে ওই প্রতিদিন এসে ফিরে যায়—

তারে আমার মাথার একটি কুসুম দে …
মোর শপথ আমার নামটি বলিস নে।[৩৩]

যে নিজেকে স্বভাবতই গোপন করতে পারবে না তার এ আত্ম-গোপনেচ্ছা বয়সোচিত লজ্জামাত্র। কিন্তু, বুদ্ধিমতী সখীদের পরামর্শ হল ব্যর্থ সাংসারিক জ্ঞানে—

যদি মন পেতে চাও মন রাখো গোপনে।
কে তারে বাঁধিবে তুমি আপনায় বাঁধিলে ?

কথাটা যেন এইমাত্র, প্রেমে কে কার উপর মালিকানা সাব্যস্ত করবে। তাই, প্রণয়ব্যাকুল হৃদয় নিয়ে যদি-বা ফিরে এল অমর, সখীরা এক-রকম মুখে হাত চাপা দিল তাদের প্রিয়সখীর। হতাশ প্রেমিক ফিরে যেতেই প্রমদা বলে—

সখী, ওরে ডাকো ফিরে !
মিছে খেলা মিছে হেলা কাজ নাই !

অপর পক্ষে সখীরা বলে—

অধীরা হোয়ো না সখী !
আশ মেটালে ফেরে না কেহ, আশ রাখিলে ফেরে।

লাবণ্যচঞ্চলা নবীনার পক্ষে সহজগ্রাহ্য উপদেশই বটে। কিন্তু, হায় রে, পার্বতী ঝর্না উপত্যকায় নেমে কার প্রেমে অশ্রুজলের সরোবর হয়েছে, নিরন্তর ফেনার ফুল ছড়িয়ে নৃত্যের আগ্রহ আর নেই তার, শান্ত ছলোছলো আত্মমুকুরে কার মুখচ্ছবি প্রতিবিম্বিত করতে চায় —সে কি কেউ বুঝলে না ?

দৃশ্যের পর দৃশ্যে হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের সংঘাতে ঘটনার লয় দ্রুত, দ্রুততর হয়ে আসছে। আর, অর্ধশত বৎসর পার হয়ে যে পূর্বসৃষ্টি স্রষ্টার কাছে ফিরে এসেছে তার সম্পর্কে তাঁর রসের আবেগ ও আগ্রহ ক্রমেই নিবিড়তর ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠছে সে বিষয়েও সন্দেহ নেই।

ফলে, পুরাতনের সংস্কার ও তাতে এখান সেখান থেকে টেনেটুনে দু-চারটি নূতন গান -যোজনা, এ চেষ্টা ছেড়ে, ষষ্ঠ ও সপ্তম দৃশ্যের জন্য অনেকগুলি আন্‌কোরা নূতন গান লিখে ফেললেন রবীন্দ্রনাথ। এত নূতন যে কবির অন্তর্ধানের এক যুগ পরে আজও সেগুলি অত্যন্ত বিরলপ্রচার, রসিকগণের অপরিচিত— আচার্যমুষ্টিগত দুর্লভ রত্নরাজি বলাই উচিত।[৩৪] পুরাতন গানে এবং নূতনে কী তফাত ভাবে, ভাষায়, সুরে (যদিও সব শ্রুতিগোচর হয় নি) ও সামগ্রিক রসের আবেদনে! পুরাতনে যে ঐতিহ্যানুস্মৃতির, যে সচেতন সাধনার, যে অর্জিত নৈপুণ্যের, যে মোহকর আবেগমাধুর্যের সাক্ষ্য প্রায় সর্বব্যাপী, বর্তমান গানগুলিতে তার কোনো চিহ্ন নেই বলা চলে। বক্তব্য, ভাষা, সুর, ব্যঞ্জনা— সব এক ডাকে একই কালে অবতীর্ণ হয়েছে বলে মনে হয়; প্রত্যেক গানে রসাত্মক বাক্যের প্রথম পদক্ষেপেই শ্রবণ মন চকিত হয়ে ওঠে আর প্রথম স্বরলহরীলীলায় দেহ মন এক-সঙ্গেই রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে।

যা হোক, কাহিনীর অনুসরণ করা যাক। ষষ্ঠ দৃশ্যের সূচনায় অমর শান্তার কাছে ফিরে এসেছে—

মরীচিকার পিছে পিছে
তৃষ্ণাতপ্ত প্রহর কেটেছে মিছে।
দিনঅবসানে তোমারই হৃদয়ে
শ্রান্ত পান্থ অমৃততীর্থগামী যে।

কিন্তু, বিচ্ছেদদুঃখ হেনে চলে যে গিয়েছিল তার সেই চলে-যাওয়াটাই ভুল, না এই ফিরে আসাই? অভাগিনীর প্রতি দয়া তো নয়? না না।

কিন্তু, উভয়ের প্রীতিপরিচয়ের এই ক্রান্তিক্ষণে, নিশ্চয়-অনিশ্চয়ের সন্ধিসময়ে, দূর বনের ছায়ায় প্রায়-ভুলে-যাওয়া স্বপ্নমায়ার মতো দেখা যায় প্রমদা-সঙ্গিনীদের। মোহময় সুর ভেসে আসে প্রেমিকের

কানে বা প্রাণে তা স্পষ্ট হয় না ; সে বলে—

ডেকো না আমারে ডেকো না—
ডেকো না। ..
আমার দুঃখ-জোয়ারের জলস্রোতে
নিয়ে যাবে মোরে সব লাঞ্ছনা হতে।
দূরে যাব যবে স'রে
তখন চিনিবে মোরে,
অবহেলা তব ছলনা দিয়ে ঢেকো না।

কোনোরূপ স্মৃতিসংকেতের অসদ্ভাবে ওই মায়াছায়ারূপিণীরা শান্তার ইন্দ্রিয়গোচর হোক বা না হোক তার মনে স্বতই সংশয় ওঠে—

না বুঝে কারে তুমি ভাসালে আঁখিজলে !

তখন বিক্ষিপ্তচিত্ত প্রেমিকের জীবনবেণুর কুহরে কুহরে আকুল সুরে বাজে—

যে ছিল আমার স্বপনচারিণী
তারে বুঝিতে পারি নি !

হাসিতে-অশ্রুতে হর্ষে-বেদনায় প্রত্যয়ে-সংশয়ে মিলিতমিশ্রিত, মানব-হৃদয়ের অন্তস্তল-উৎসারিত এ সুর মর্তমনেরই প্রতিমা— রচনা করেছেন রসাবিষ্ট 'প্রবীণ যুবা' আশির কাছাকাছি এসে।

ষষ্ঠ দৃশ্যে মায়াকুমারী আর প্রমদাসখীগণের গান ছিল পুনঃ পুনঃ। বর্তমানে মায়াকুমারীদের প্রসঙ্গই নেই, আর সখীরাও একবার মাত্র দেখা দিয়েছে দূর থেকে। ভারমুক্ত কাহিনী বিশেষ গতিবেগ সঞ্চয় করে গিয়ে পড়েছে সপ্তম দৃশ্যে। থাক্-না সংশয়কীট নায়ক-নায়িকার মনে, তাদের মিলনমহোৎসব মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে বাসন্তী প্রকৃতির পৃথিবীব্যাপী উৎসবের সঙ্গে—

থরোথরো-কম্পিত মর্মরমুখরিত

নবপল্লবপুলকিত
ফুলআকুলমালতিবল্লিবিতানে
সুখছায়ে মধুবায়ে ···

এমন সময়ে দূরে ওই কার আবির্ভাব! কোন্ যৌবনলাবণ্যরূপিণী কায়া, ছায়াটি শুধু ভাসিয়ে দিয়ে গেছে নিষ্করুণ নিরুদ্দেশ সংসার-স্রোতে! অমর বুঝতে চায়—

একি স্বপ্ন! একি মায়া!
একি প্রমদা! একি প্রমদার ছায়া!

বন্ধুজন ব'লে ওঠে—

ওকি এল ওকি এল না
বোঝা গেল না, গেল না![৩৫]

শান্তার মনে হয়—

ওর বাঁশিতে করুণ কী সুর লাগে
বিরহমিলনমিলিত রাগে!
হৃদয়বনে ও উদাসী হাওয়া,
বুঝি শুধু ও পরম কামনা!

সখীরা সায় দিয়ে আপন-মনেই যেন বলে, কোন্ ঝড়ের ভুল এ ফুল ঝরিয়ে দিল! হায়, কোন্—

নবপ্রভাতের তারা সন্ধ্যাবেলায় হয়েছে পথহারা···
কোন্‌খানে পাবে কূল!

তখন কী যেন লজ্জায় ধিক্কারে বধূ খুলে ফেলে আপন বধূবেশ। বলে—

আমি নাই, আমি নাই! আদরিনী লহো তব ঠাঁই,
যেথা তব আসন বিরাজে!

কিন্তু, প্রমদার বুক ফেটে বেরিয়ে আসে গান দীর্ঘনিশ্বাসের হাওয়ায় ঘুরে ঘুরে (স্বপ্নে যেমন হয়, সে গান শোনা যাচ্ছে অথচ গাওয়া

যাচ্ছে না, এমন কি মনে হয় না তার ? স্বর কোথায় ছায়াদেহিনীর কণ্ঠে ?)—

আর নহে আর নহে !
বসন্তবাতাস কেন আর শুষ্কফুলে বহে !
লগ্ন গেল বয়ে সকল আশা লয়ে,
এ কোন্ প্রদীপ জ্বালো ! এ-যে বক্ষ আমার দহে !

তাই অশ্রুধারাস্বচ্ছ দৃষ্টিতে চেয়ে, আবেগ-আকাঙ্ক্ষার পারে গিয়ে বলে পূর্বপ্রণয়ী—

ছিন্ন শিকল পায়ে নিয়ে, ওরে পাখি,
যা উড়ে— যা উড়ে— যা রে একাকী !

মিলনপিপাসিনী শান্তাও সকল আশাতৃষা ঘুচিয়ে নিজেকে ও অমরকে মুক্তি দেয়—

যাক্ ছিঁড়ে, যাক্ ছিঁড়ে যাক্ মিথ্যার জাল।
দুঃখের প্রসাদে এল আজি মুক্তির কাল।

সহসা মায়াকুমারীরা আবির্ভূত হন— নাটকের অন্য পাত্রপাত্রীদের এখন তাঁরা দৃষ্টি ও শ্রুতি -গোচর, কারণ এখন তো সকলেই প্রায় জেগে উঠেছে— মায়াকুমারীরা মায়ামন্ত্র সংহরণ করেন—

দুঃখের যজ্ঞঅনলজ্বলনে জন্মে যে প্রেম …
নিত্য সে নিঃসংশয়…
তৃষ্ণাদাহনমুক্ত অনুদিন অমলিন রয়।
গৌরব তার অক্ষয়—
অশ্রুউৎসজলস্নানে তাপস মৃত্যুঞ্জয়।

অকস্মাৎ কুমারসম্ভবের পুরাকথা ক্ষীণ আভাসে মনে পড়ে।[৩৬] বনে উপবনে উন্মদবসন্তশ্রী, লীলাপদ্ম হাতে লীলাময়ী প্রণয়প্রতিমা, বিলাস, বিভ্রম, মোহ, চতুর মধুপবৃত্তি বা দীপ্তবাসনাব্যথা —কোনো কিছুই স্থায়ী হল না। এবারে আপনার তাপেই মদন আপনি

ভস্মীভূত হলেন। মিলনের সার্থকতা বা প্রণয়ের পরিপূর্তি যে তপস্যালভ্য, যেমন তপ করেছিলেন 'নিনিন্দ রূপং হৃদয়েন পার্বতী', তারই ইঙ্গিতে এই নৃত্যনাট্যের উপরে যবনিকা প্রায় নেমে এল।

মায়াকুমারীগণ অন্তর্ধান করলেন। কিন্তু, চরম চমৎকারের কারণ ঘটল সর্বশেষ গানে।

পাঠকের স্মরণ আছে কি না জানি নে, পুরাতন মায়ার খেলার শেষ হয়েছিল দীর্ঘশ্বাসসমীরিত অশ্রুজলে-ভিজে-ভিজে হৃদয়বেদনার একটি বড়ো বাহুলে আবহাওয়ায়।

এ ভাঙা সুখের মাঝে নয়নজলে
এ মলিন মালা কে লইবে

অমরের এই কাতরতায় কোনো উজ্জ্বল করুণ রস উদ্দীপিত করে নি।

যদি কেহ নাহি চায় আমি লইব,
তোমার সকল দুখ আমি সহিব

শান্তার এ প্রেম না দাক্ষিণ্য না কাঙালপনা -মাত্র স্পষ্ট হয় নি।

দুখের মিলন টুটিবার নয়—
নাহি আর ভয়, নাহি সংশয়

অদৃশ্য মায়াকুমারীদের এ সান্ত্বনাবাক্যে কোনো আশ্বাস ছিল না, প্রত্যয় ছিল না বুঝি তাঁদের নিজেদেরই মনে।

হায় হায়, এ সংসারে যদি না পুরিল
আজন্মের প্রাণের বাসনা
চলে যাও ম্লানমুখে, ধীরে ধীরে ফিরে যাও—
থেকে যেতে কেহ বলিবে না

প্রমদার এ বিবর্ণ বিষাদে কোনো গভীর সার্থকতার ইঙ্গিত ছিল না। আর, সব-শেষে মায়াকুমারীদেরই সুর লোফালুফি[৩১] করে গাওয়া—

এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না!
শুধু সুখ চলে যায়! এমনি মায়ার ছলনা!

এরা ভুলে যায় কারে ছেড়ে কারে চায়!···
তাই এত হায়-হায়!

এই গানেও চোখে ঘুম যেন জড়িয়ে আসে[৩৮]— মায়াকুমারীগণ 'সখী চলো, গেল নিশি, স্বপন ফুরালো' ব'লে রজনীজাগররক্তিম অপাঙ্গে চেয়ে বিদায় নিতে উদ্যত হয়েছেন যদি, আমরাও তাঁদের ধরে রাখতে চাই নে।

কিন্তু, একি হল আজ!

'দুঃখের যজ্ঞ-অনল-জ্বলনে জন্মে যে প্রেম' এই সংগীতের উদাত্ত ভঙ্গীতে মিলিয়ে যথেষ্ট কঠিন ক'রে চিত্তবীণার তার বাঁধা হয়েছে জানি। তবু, নাটকের **সমুদয় পাত্রপাত্রীর সমবেত কণ্ঠে** এই গান, এ যে কল্পনারও অতীত—

আজ খেলা ভাঙার খেলা খেলবি আয়,
সুখের বাসা ভেঙে ফেলবি আয়।
মিলন-মালার আজ বাঁধন তো টুটবে,
ফাগুন-দিনের আজ স্বপন তো ছুটবে—
উধাও মনের পাখা মেলবি আয়।
অস্তগিরির ঐ শিখর-চূড়ে
ঝড়ের মেঘের আজ ধ্বজা উড়ে।
কালবৈশাখীর হবে-যে নাচন,
সাথে নাচুক তোর মরণ বাঁচন—
হাসি কাঁদন পায়ে ঠেলবি আয়।

চিরসন্ন্যাসী ও চিরগৃহী ত্রিনয়ন শিব, তাঁরই কর্ণবিভূষণ বিভূতিলিপ্ত ধুতুরার গান এটি[৩৯] পাঠকের জানা আছে। মহাদেবের কানে কানে এ গান সে গেয়েছে অশ্রুত স্বরেই, সুর ধরেছে তবু বিশ্বভুবন— কখন? সমাধিশান্ত যখন শিব তখন নয়; নটরাজরূপে নাচছেন তিনি যে মুহূর্তে— যে মুহূর্তেরও সত্যই কোনো আদি অন্ত নেই—

সমস্ত বিশ্বই তাঁর সঙ্গে নাচছে সুখে দুঃখে, মিলনে বিচ্ছেদে, জন্মে মৃত্যুতে।

নাট্যরঙ্গ শেষ হল **অবসাদে নয়, বিষাদে নয়, বৈরাগ্যেও নয়, চোখের জলে বা দীর্ঘশ্বাসে নয়, স্বপ্নলোকে বা বাস্তব সংসারেও নয়।** বেহাগ-বিভাসের করুণমন্থর আলাপ ত্যাগ ক'রে, উদ্দীপ্ত দীপকে না হলেও, উদার মধুর খাম্বাজের সুরে সকলকে চক্ষের পলকে পৌঁছে দিলেন কবি— আনন্দে উৎপত্তি, আনন্দে স্থিতি, আনন্দ থেকে আনন্দেই গতি যে বিশ্বসংসারের, তারই কেন্দ্রস্থলে নৃত্যনিমগ্ন নটরাজের পাদপীঠতলে— জন্মমৃত্যু দুঃখসুখ সবই নৃত্য যেখানে, সবই লীলা, সবই আনন্দ। খণ্ডিত কাল থেকে অসীম কালে, চেতনার এক স্তর থেকে অন্য উর্ধ্ব স্তরে, ক্ষণমাত্র সময়ে কী অবলীলায় চলে এলেম আমরা নটরাজের কবিশিষ্যের অনুসরণ ক'রে। তারই স্মরণে বলতে হয় মহান্ বিস্ময়ে— 'হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহু'— 'হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ'।

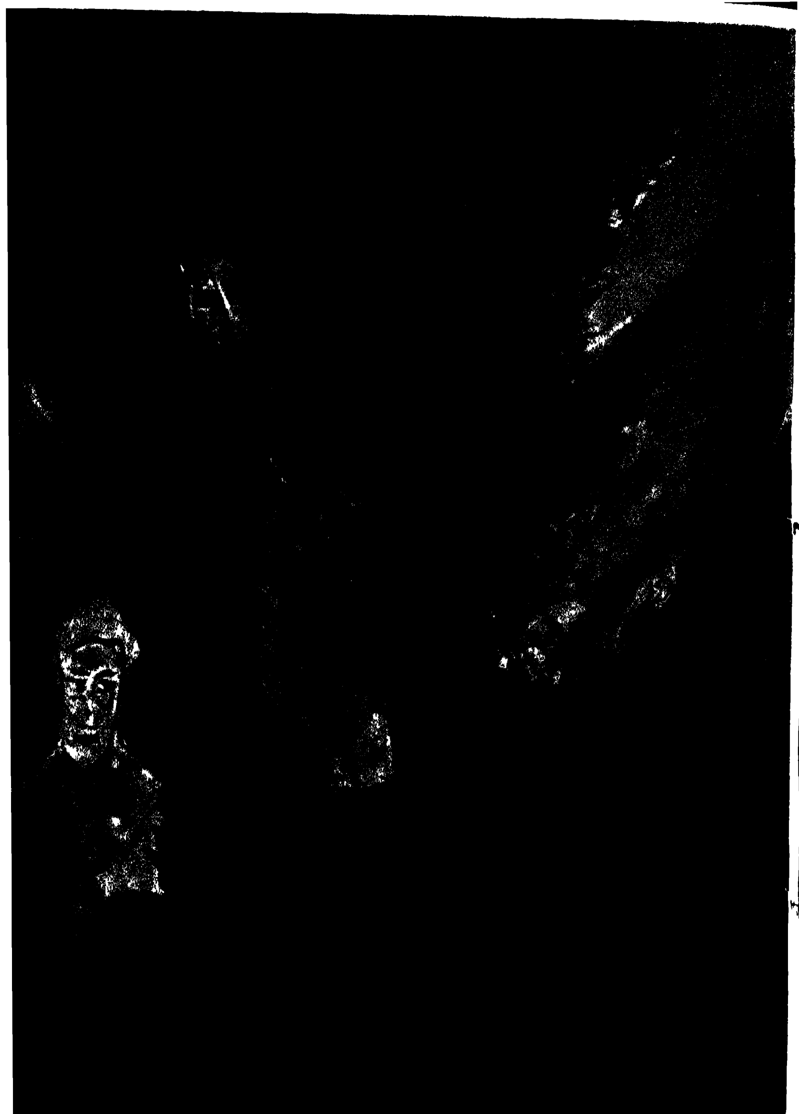
'মায়ার খেলা'র প্রাথমিক রূপ ও রূপান্তর (প্রায় অর্ধ শতাব্দ পরে) উভয়ই আমরা আলোচনা করে দেখলেম— একটি 'কবিত্ব-কল্পনা ও ভাবুকতা'র রঙিন-কুহকে-আচ্ছন্ন মায়াময় ভুবনে, অন্যটি উর্ধ্বলোকে আলোকে ও চেতনায় উদ্ভাসিত, অপূর্ব ছন্দে লয়ে বিধৃত, এবং সব-শেষে পরমানন্দের শমে পরিসমাপ্ত।

জোড়াসাঁকো
২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০



অসীম শূন্যে কে

অবাক চক্ষে দূর রহস্য দেখা   রবীন্দ্রনাথ



হল না সহজ পথ বাধা স্বপ্নের গহনে ॥ রবীন্দ্রনাথ

হে সমুদ্র, স্তব্ধচিত্তে শুনেছিনু গর্জন তোমার
রাত্রিবেলা ; মনে হল, গাঢ় নীল নিঃসীম নিদ্রার
স্বপ্ন ওঠে কেঁদে কেঁদে। নাই নাই তোমার সান্ত্বনা ;
যুগ যুগান্তর ধরি নিরন্তর সৃষ্টির যন্ত্রণা
তোমার রহস্যগর্ভে ছিন্ন করি কৃষ্ণ আবরণ
প্রকাশ সন্ধান করে। কত মহাদ্বীপ মহাবন
এ তরল রঙ্গশালে রূপে প্রাণে কত নৃত্যে গানে
দেখা দিয়ে কিছুকাল ডুবে গেছে নেপথ্যের পানে
নিঃশব্দ গভীরে। হারানো সে চিহ্নহারা যুগগুলি
মূর্তিহীন ব্যর্থতায় নিত্য অন্ধ আন্দোলন তুলি
হানিছে তরঙ্গ তব।

হে সমুদ্র, একা আমি মধ্যরাতে নিদ্রাহীন চোখে
কল্লোলমরুর মধ্যে দাঁড়াইয়া স্তব্ধ ঊর্ধ্বলোকে
চাহিলাম ; শুনিলাম নক্ষত্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাজে
আকাশের বিপুল ক্রন্দন ; দেখিলাম শূন্যমাঝে
আঁধারের আলোকব্যগ্রতা। রূপনিঃস্ব হাহাকার
অদৃশ্য বুভুক্ষু ভিক্ষু ফিরিছে বিশ্বের তীরে তীরে—
ধুলায় ধুলায় তার আঘাত লাগিছে ফিরে ফিরে।
ছিল যা প্রদীপ্তরূপে নানা ছন্দে বিচিত্র চঞ্চল
আজ অন্ধ তরঙ্গের কম্পনে হানিছে শূন্যতল।

হে সমুদ্র, চাহিলাম আপন গহন চিত্ত-পানে ;
কোথায় সঞ্চয় তার, অন্ত তার কোথায় কে জানে।

ওই শোনো সংখ্যাহীন সংজ্ঞাহীন অজানা ক্রন্দন
অমূর্ত আঁধারে ফিরে, অকারণে জাগায় স্পন্দন
বক্ষতলে। এক কালে ছিল রূপ ; ছিল বুঝি ভাষা ;
বিশ্বগীতিনির্ঝরের তীরে তীরে বুঝি কত বাসা
বেঁধেছিল কোন্ জন্মে ; দুঃখে সুখে নানা বর্ণে রাঙি
তাহাদের রঙ্গমঞ্চ হঠাৎ পড়িল কবে ভাঙি
অতৃপ্ত আশার ধূলিস্তূপে। আকার হারালো তারা,
আবাস তাদের নাহি। খ্যাতিহারা সেই স্মৃতিহারা
সৃষ্টিছাড়া ব্যর্থ ব্যথা প্রাণের নিভৃত লীলাঘরে
কোণে কোণে ঘোরে শুধু মূর্তি-তরে, আশ্রয়ের তরে।
রাগে অনুরাগে যারা বিচিত্র আছিল কত রূপে
আজ শূন্য দীর্ঘশ্বাস আঁধারে ফিরিছে চুপে চুপে।

এই একটি রচনায় রবীন্দ্র-চিত্রকৃতির নিগূঢ় তাৎপর্য-ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ। আন্‌ডেস জাহাজে লেখা ১১ অক্টোবর ১৯২৪ তারিখের এই কবিতায় একটি অনাবিষ্কৃতপূর্ব রহস্যলোকের দ্বার এক মুহূর্তে একটু যেই খুলে গেল, চকিতে দেখলাম আদিঅন্তহারা এক বিপুল বিশাল অপ্রকাশের রহস্য নিখিল বিশ্বসৃষ্টিতে আর মানবসত্তার নিঃসীম গহনে। আলো, অন্ধকার। যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ। সম্ভূতি এবং অসম্ভূতি নিয়ে এক অখণ্ড অপরূপ। আমরা প্রাণীমাত্রেই আলোকের দিকে উৎসুক, উন্মুখ। অমৃতেরই কাঙাল। নিখিলসৃষ্টির লীলাটি-যে কোন্ চির-প্রলয়ের তরল তরঙ্গিত রঙ্গমঞ্চের একদেশে অভিনীত সে আমরা জানতে চাই নে— না চাওয়াই স্বাভাবিক। অথচ, যথার্থ যিনি কবি ও মনীষী, ঋষি, তিনি হন সত্যকাম, সত্যদ্রষ্টা, সত্যেরই অনুভবী। আলো-অন্ধকার সুন্দর-অসুন্দর প্রসন্ন-ভয়াল প্রিয়-অপ্রিয়ের বিচার-বিবেকের বশে একটিকে ত্যাগ ক'রে অন্যটিকেই যে একান্তভাবে

বেছে নেবেন, শেষ পর্যন্ত, এ তিনি পারেন না। তাই রবীন্দ্রনাথ এই কবিতা লিখেছেন, অপ্রকাশ অব্যক্তের একটু যদি আভাস দেওয়া যায়। রঙ ও রেখার যোগে মোহাবিষ্টের মতো ছবির পর ছবি এঁকে গেছেন— যার নির্দিষ্ট কোনো নাম রূপ অথবা পরিচয় নেই অথচ যা বিশ্বপ্রকাশের তলে তলে নিয়তই সচল এবং সচেষ্ট, স্বপ্নের মতো অস্থির পরিবর্তমান এবং অলক্ষচারী, চকিতে তারই একটি যদি ছায়া এসে পড়ে— একটি কোনো অনুচ্চারিত কথা মূক ইঙ্গিতে-ইশারায় আমাদের প্রতিবোধে বিদিত হয়।

এই অপ্রকাশ রহস্যের বিস্তার অনন্ত দেশে, বিশেষতঃ কালে। আবার, দেশকাল-রচিত বিশ্বভুবনেও তেমন নয়, যেমন চেতনসত্তার অপরিসীম অন্তর্লোকে। কেননা, দেশকালের আনন্ত্যের ধারণা কিম্বা সত্যতা মানুষের প্রাণ এবং চেতনার ভিতরে বৈ বাইরে কোথাও নয়। সেই প্রাণ বা চেতনা সমুদয় দেশকালের আধার এবং আধেয় -স্বরূপ মনে হয়; একই কালে তাকে আলিঙ্গন ক'রে আর অতিক্রম করে আছে— আপনাকে আপনি সে জানে না, হয়তো কোনোদিনই জানতে পারবে না। অরূপ অব্যক্তের যেটুকু ব্যক্ত, নিরূপিত— যেটুকু স্মিত, উদ্ভাসিত— যেটুকু আপনার সীমায় সীমায় অসীমের একটু-না-একটু প্রতিবিম্ব ধরে আছে হৃদয়ে— 'সীমার মধ্যে, অসীম, তুমি বাজাও আপন সুর'— তারই প্রেরণায় রবীন্দ্রনাথ কবি, ব্যাস-বাল্মীকি-কালিদাস হোমার-দান্তে-সেক্স্পীয়র দেশ-বিদেশের খ্যাত-অখ্যাত অগণ্য কবিকুলের অন্যতম ধারাবাহী আমাদের এ দেশে আর এই যুগে। কিন্তু, যা ব্যক্ত হয় নি কোনো দিন, হবারও নয়— রূপনিঃস্ব যে বুভুক্ষু হাহাকারে অসীম শূন্য তারায় তারায় রোমাঞ্চিত, আসলে যা জাগ্রতচেতনার অন্তরালবর্তী আদিঅন্তহীন গহন গম্ভীর 'অচেতনা'রই একখানি প্রতিভাস মাত্র, অগণ্যআলোক-বর্ষপরিমিত দেশে দেশান্তরে প্রসারিত— সেই অজ্ঞাত অপরিজ্ঞেয়

রহস্যের আবেশে ইনি চিত্রকর। বিংশ শতাব্দের প্রিমিটিভ বা বর্বর আদিবাসী তাঁকে মনে হতে পারে, ষাট-সত্তর বৎসরের এক শিশু মনে করলেও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যার চূড়ান্ত হয়, অথচ সে-সমস্তই আমাদের অন্ধ অনুমান মাত্র— বাস্তব সত্য অবশ্যই নয়।

বাস্তব সত্য এই যে, প্রতিক্ষণে দিন এবং রাত্রির দ্বারা আলিঙ্গিত পৃথিবী, অথচ দিবাভাগের জাগ্রত আলোকিত কিম্বা আলোছায়াবৃত অর্ধেকের সঙ্গেই মানুষের বিশেষ পরিচয়— অপরার্ধ একেবারে অজ্ঞাত 'অশ্রুত' না হলেও আসলে তবু না-দেখা, না-জানা, শিহরণে শঙ্কায় মায়ামোহে ছলনায় আবৃত— মানুষের জীবনটি, তার আপন অস্তিত্বটি অবিকল তেমনি।

দিবাভাগের বর্ণনা এবং ব্যঞ্জনা নিয়েই সকল সাহিত্য আর রূপকলা চিরদিন ব্যাপৃত আছে। উষাসন্ধ্যার ধীর-উদাত্ত প্রসন্ন-করুণ জাগরণ এবং শান্তি, কৌমুদীবিভাসিত স্বপ্ন, তারও নিঃশব্দ সঞ্চার অবশ্যই মনোহারী হয়েছে। তিমিররূপিণী রাত্রির উল্লেখ ছাড়া আর কী আছে? নিখিল নাম রূপ পরিচয় -গ্রাসী, বর্ণহীন, বর্ণনাহীন, কে আঁকবে তার যথার্থ স্বরূপ? অথচ বলাই হয়েছে, মানবসত্তারও অর্ধেকটাই যেন সব সময় আবৃত করে আছে এই রাত্রি। তার রহস্যের নিরাকরণ কোনো কালে কিছুই হবে না? কেউ জানবে না? জানাতে পারবে না? আমরা অনুমান করতে পারি, কালে কালে লোকোত্তর কবি বা শিল্পী -মানসে জ্বালাময় যন্ত্রণাময় এ প্রশ্নের উদয় হয়ে থাকবে। যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ। অর্ধেকটাই জানলে প্রবঞ্চিত হতে হবে না কি? যে অর্ধেকটা জানা হয় নি তারই অতর্কিত আঘাতে পরাভূত হতে হবে না?

অথচ রাত্রিকে জানতে হলে রাত্রির অধিকারে যেতে হয়। রাত্রির মায়াছায়ায় আবিষ্ট হতে হয়। নিজের উপর নিজের অধিকার হারাতে হয়— স্বচ্ছন্দ চেষ্টা ও চেতনার অধিকার। গহন গম্ভীরের

সেই অভিজ্ঞতা তো জাগরণের উপরতলে তুলে আনা যাবে না। আর, যদি বা কোনো উপায়ে দিনের এলেকায় এনে তামসী রাত্রির অবগুণ্ঠন মোচন করি, সে আর রাত্রি থাকে না। এ এক নিদারুণ সমস্যাই বটে। আপাতত যেন তার একটি সমাধানই দেখা যায়, তারই সাধনে চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ আত্মনিয়োগ করেছিলেন মনে হয়— দিন এবং রাত্রি, চেতনা এবং আবেশ, জ্ঞান এবং অজ্ঞান, উভয়ের মিলন-মোহানায় আপনাকে যন্ত্রবৎ তুলে দেওয়া কী-এক অদৃশ্য শক্তির হাতে। আলো-আঁধারের বিচিত্র পর্যায় মেলে দিয়ে, এমন-কি একটির উপর আর-একটি চাপা দিয়ে, রূপ অর্থ ইশারার চির-বিচিত্র লুকোচুরি-খেলায় ও দ্বন্দ্বে, যা ধরা দেবার তাই সে ধ'রে দেবে ; যেটুকু ছিট্‌কে প'ড়ে প্রকাশিত হবার তাই সকলে সবিস্ময়ে দেখবে। 'কেন' 'কী' এ-সব প্রশ্নের সংগত কোনো জবাব নেই। অমেয় আঁধার রহস্যগর্ভ থেকে মন্ত্রমায়ামুগ্ধের জাল ফেলায় এই বিরূপ বা অপরূপ উঠে পড়েছে যদিও, সঙ্গে সঙ্গে তার সংজ্ঞা বা পরিচয় সেটিও উঠে আসে নি। তাই, নানা অনুমান হয়তো করা যায়, কিন্তু তাতে লাভ কী? 'চক্ষুহীন' দেখায় হঠাৎ যা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, অ-বাক্ বিস্ময়েই তার যথার্থ উপভোগ। প্রশ্ন ক'রে ফল নেই। এমনও বলা যায় যে, উন্মথিত প্রলয়ের থেকে শুধু 'অস্তি'টুকু যদি সৃষ্টির কূলে উৎক্ষিপ্ত হয়ে থাকে, প্রাণচাঞ্চল্য তার না থাকে বা অল্প হয় আর চেতনা ও আনন্দের উন্মেষও হয় দূরপরাহত, তাতেও বা ক্ষতি কী? এটিও দেখবার এবং জানবার জিনিষ (যতটা হয়) এরই স্ব-রূপে ও স্বভাবে।

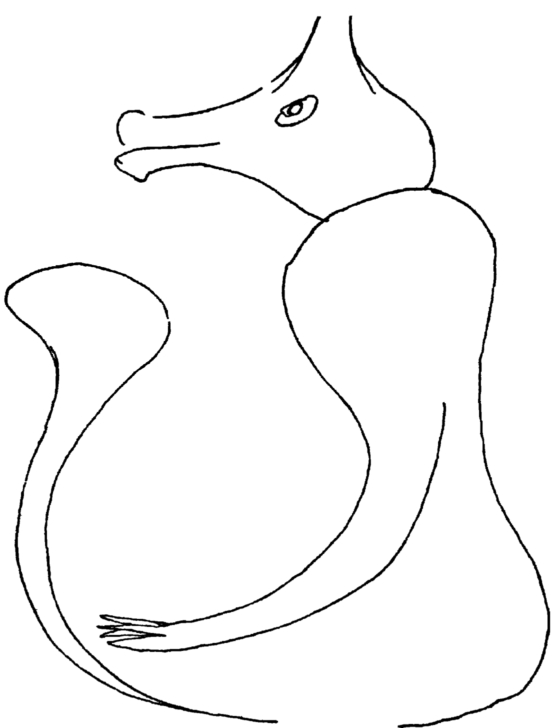
জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথের আয়ুষ্কালে বোধ করি এ সাধনারও একান্ত প্রয়োজন ছিল। অর্থাৎ, রবীন্দ্রচিত্রকলাকে আশ্চর্য এক প্রতিভার অসামান্য রূপসাধনা হিসাবে আদর বা উপেক্ষা না ক'রে

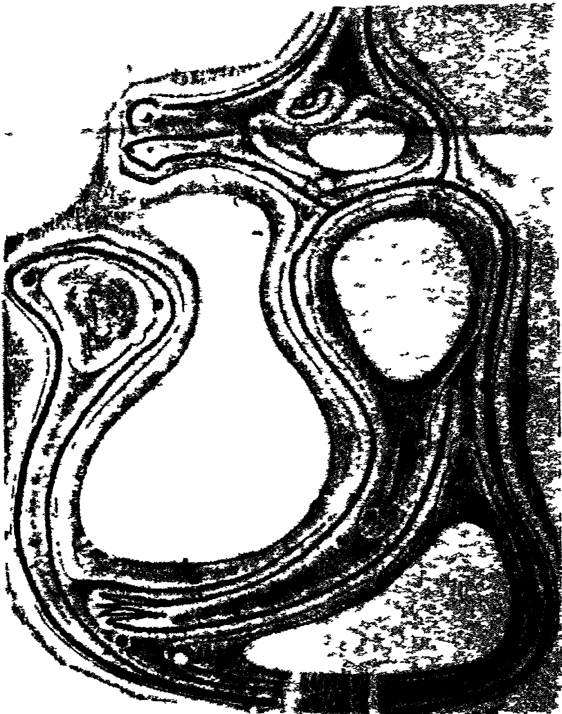
শুধু, তারই ব্যাপক জীবনসাধনার অঙ্গীভূত ক'রে দেখাও সম্ভব—হয়তো সেই দেখাই সত্য এবং সার্থক।

মর্তপৃথিবী দিবা-রাত্রি আলো-অন্ধকারের আবর্তিত পর্যায়ে নিত্য আলিঙ্গিত সে আমরা বলেছি। এখন অন্যভাবে বলা যায়—সচেতন মনুষ্যসত্তা একমাত্র পার্থিব ভুবনেই তো বাস করে না। ত্রিলোকী সে; স্বর্গ মর্ত পাতাল তিন ভুবন জুড়ে তার অস্তিত্ব। জাগ্রত সক্রিয় সবেদন জীবনটি পৃথিবীতে হলেও, স্বর্গ এবং রসাতল তার অস্তিত্বের বাইরে নয় এবং স্বর্গ মর্ত রসাতল এই তিনেরই 'মাত্রা' স্থূল সূক্ষ্ম নানা আকারে আছে তার সমস্ত ভাবনায় বেদনায়, কামনা ও কল্পনায়, জ্ঞানে, এমন-কি অজ্ঞানে— প্রত্যেক পদক্ষেপে ও চেষ্টায়। তিনের প্রকৃতি সম্পর্কে আবহমান কাল থেকে এই আমরা জেনেছি বা শুনে আসছি যে, স্বর্লোক বা দ্যুলোক স্বতই জ্যোতির্ময়, আনন্দময়, চৈতন্যময়। মর্ত বা পৃথিবী আলো এবং ছায়া, জ্ঞান ও অজ্ঞান, দিবা ও নিশা এবংবিধ দ্বৈতের ভোগভূমি, তথা দ্বন্দ্বময়। আর, পাতাল, নাগলোক, নির্‌জ্ঞান, অবচেতনা বা অচেতনা যে নামই দিই-না কেন অস্তিত্বের সব-শেষ আর সব-চেয়ে নীচের তলাটিকে, সে বুঝি চিরঅমানিশার দেশ, চিরঅন্ধকার। তারই সীমাশূন্য বিস্তারে, গুহায় গহ্বরে, তরল তরঙ্গিত একাকারে ব্যথাহত ব্যর্থ প্রাণের বেদনা, প্রেতের কামনা, জড়ীভূত জীবনাবেগ, ভাষাহারা আর্তনাদ ও হতাশা, এরাই লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে —ভেসে বেড়াচ্ছে— নির্দিষ্ট আকার হয়তো পাচ্ছে না। এই নিরন্তর বিক্ষোভ, এই নিঃশব্দ হাহাকার, এই 'আধারের আলোকব্যগ্রতা' এবং রূপনিঃস্বের অদৃশ্য বুভুক্ষা, সৃষ্টিউন্মুখ প্রলয়পয়োধির প্রসব-বেদনা ও ক্রন্দন— এরই আভাস পেয়েছেন কবি মধ্যরাত্রের বিনিদ্র প্রহরে কূলহীন কল্লোলমরুর মধ্যে একাকী দাঁড়িয়ে, সম্মুখে পশ্চাতে ঊর্ধ্বে অধে এবং আপনারই সত্তার ভিতরে নির্‌জ্ঞান অবচেতনার



হৈ রে হৈ মারহাট্টা ॥ রবীন্দ্রনাথ





হেঁহো খাসালেজুড়ি, পণ্ডিতে নাপিতে বানানো 'শিবুবাম । সে ছবি রবীন্দ্রনাথেব আঁকা।

ব্লক তুলতে ছাপাখানা যা বানিয়েছে সেটি দ্বিতীয় ছবি। মূল ছবির রেখাছন্দ [illegible] [illegible] [illegible] গিয়েছে [illegible]

অপরিসীম বিস্তারে এবং তারই ফলে বিস্মিত বেদনাহত চিত্তে যে জিজ্ঞাসা জেগেছে কোনোখানে তার কোনো জবাব পাওয়া যায় নি।

আর্টের বিশেষ সংজ্ঞা হল— রসরূপ। মর্তজীবনের যা-কিছু অভিজ্ঞতা, ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির যে-কিছু দেখাশোনা ও কল্পনা, তাকেই অমর্তচেতনার আলোকে উদ্ভাসিত ক'রে উপস্থিত করা— তারই আশ্চর্য এক রূপান্তর-সাধন। ফলে লৌকিক সুখ শান্তি তো অলৌকিক এক আনন্দে বা অমৃতে অপূর্ব পরিণতি লাভ করেই— এমন-কি কামনা লোভ, বিষাদ ব্যর্থতা, মর্মান্তিক যাতনা ও ক্ষোভ, রিপুর তাড়না, সে-সবও কী-এক ইন্দ্রজালে কোন্-এক প্রক্রিয়ার হস্তক্ষেপে ঠিক যে লোভ ক্ষোভ কিম্বা যন্ত্রণাই থাকে এমন নয়। না হলে কোনো যুগের কোনো বিয়োগান্ত কাহিনী, কোনো মর্মন্তুদ ট্র্যাজেডি, কাব্যে নাটকে নৃত্যে গীতে অভিনয়ে ও রূপকলায় মানব-সাধারণের সমাদর পেত না। আলোক ও চেতনার পরশমণি-ছোঁওয়ানো রূপের এই রূপান্তর-বশতই আর্টের চরম ফল হল গুণী এবং রসিক, ব্যক্তি ও সমাজ, উভয়েরই এক-প্রকার চিত্তশুদ্ধি— পরিণামে এক শান্তি ও সামঞ্জস্যে সচ্ছন্দ স্থিতি— এক নবীভূত চেতনা বা বোধ। বোধ করি গ্রীক মনীষী এই প্রক্রিয়া ও পরিণামকেই বলেছেন কাথার্‌সিস।

কিন্তু, এই-যে রূপান্তর-সাধন সে তো জাগরজীবনেরই সুখদুঃখময় আলোছায়াঙ্কিত যা-কিছু রূপ, যে-কিছু অভিজ্ঞতা, তার সম্পর্কেই প্রযোজ্য। জাগরণের আড়ালে ও অতলে সত্তার যে নিগূঢ় রহস্য, যে আবেগ আকূতি ভয়, সে শুধু সুপ্তজনের নিষ্ক্রিয় মানসে স্বপ্নের অনায়ত্ত ছায়াবাজি-রূপেই দেখা দেবে ও মিলিয়ে যাবে? নেপথ্য থেকে যদি বা জীবন নিয়ন্ত্রিত করে, সার্থক করে বা ব্যর্থতায় ভ'রে দেয়, মানসিক বিকার বিভ্রান্তি ও মূর্ছা -অভিমুখে প্রলোভিত করে 'নিশি'র ডাকে আর ছায়ারূপিণী মায়াবিনীর হাতছানিতে— তাকে

কি কোনোদিনই জানা যাবে না ? চেনা যাবে না ?

বুদ্ধি দিয়ে জানা যাবে না এ কথা সত্য। চিরনিশা অথবা চিরপ্রদোষের তমিস্রচর এই-সমস্ত বিরূপ বিকৃত বিস্মৃত ক্ষোভ ও বাসনা, যাদের এক কালে হয়তো ছিল সার্থক রূপ ও ব্যঞ্জনা, হয়তো ছিল না— যারা কোনো জন্মে বিশ্বগীতিনির্ঝরের তীরে তীরে, জীবজীবনের কূলে উপকূলে হয়তো বাসা বেঁধেছিল, হয়তো বাঁধে নি— নির্দিষ্ট আকার হারিয়ে ফেলেছে কিম্বা বেদনাময় চেতনাচঞ্চল জীবনলাভের সম্ভাবনা আজও আসে নি— দিনের সুস্পষ্ট আলোকে এদের মুখ দেখা যাবে না, চেনা হবে না। অস্থির রূপ ও পরিবর্তমান ভাবভঙ্গী নিয়ে স্বপ্নে অথবা জাগরস্বপ্নেই এরা দেখা দিতে পারে ; তার বেশি আশা করা বাতুলতা। আর, সেই চকিত মুহূর্তে যদি বন্দী করা হয় তাদের রঙে রেখায়, কোনোরূপ ভাবে ভাষায় ভঙ্গীতে, অস্থির অন্ধ প্রাণাবেগের অনেকটাই তো ধরা যাবে না। ধীবরের জালে যে-সব অদ্ভুত আশ্চর্য প্রাণী উঠে আসে সমুদ্র থেকে, নিষ্করুণ সৈকতে উপরি-তলের বাতাসে তারা কতক্ষণ নিশ্বাস নেবে ? কতক্ষণ জীবিত থাকবে ? এও তেমনি।

লোকোত্তর প্রতিভায় উদ্ভূত আর্টের যে প্রক্রিয়া চলে আসছে দেশে দেশে — যারই প্রভাবে প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য, প্রাচীন বা অর্বাচীন, তাবৎ রূপকলার স্বরূপ বা সংজ্ঞার্থ এক-প্রকার নির্দিষ্ট হয়ে গেছে রসিকসমাজে— এ ক্ষেত্রে তার কোনো অবকাশই ঘটে না। অর্থাৎ, এই অজ্ঞাত অপরিচিত অদ্‌ভুত ‘যদ্‌ভূত’ -সংঘের কতকটা নিরূপণ হলেও, রূপান্তর-সাধনের প্রশ্নই ওঠে না। কেননা, ভেবে দেখতে গেলে, রূপান্তরের ব্যাপারটি আসলে জন্মান্তর-জীবনান্তরেরই আরএক নাম। অথচ পূর্বেই দেখেছি, সুপ্তির জিনিষকে জাগরণে ধরে রাখলে, অতলের প্রাণীকে নিষ্করুণ রৌদ্রালোকে অনাবৃত করে দিলে, তার নিজস্ব জীবন ও ছন্দের অপঘাত সুনিশ্চিত।

মানুষী সত্তার অবচেতন স্তরের উদ্ঘাটনে সাম্প্রতিক কালে দেশে-বিদেশে যে বিপুল বিশাল বিচিত্র রূপকৃতির উদ্ভব হয়েছে, যে বিরূপ-লোকের বা জাতুময় জগতের কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া গেছে, সে-সবেরই সামান্যগুণ বা সাধারণ লক্ষণ কী হতে পারে, পূর্বের আলোচনা থেকেই ধারণা করা যাবে এরূপ আশা করি। অথচ, চিত্রকর রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ অসামান্যতা আছে সেটিও লক্ষ্য করা দরকার। দক্ষিণ আমেরিকার বিলুপ্ত বিধ্বস্ত সংস্কৃতির উৎখাত শিল্পসামগ্রী আর আফ্রিকার চিরতমসাচ্ছন্ন মহারণ্যে লালিত পালিত অত্যদ্ভুত রূপরীতি সুসভ্য য়ুরোপের উচ্ছৃঙ্খল ও অবসন্ন প্রতিভায় কতকটা প্রভাব বিস্তার ক'রে থাকলেও, অনেকটাই হয়তো পুঙ্খানুপুঙ্খ বাস্তব-অনুকৃতির স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া বা অবশ্যম্ভাবী পরিণামই ছিল —আমাদের দেশে যাঁদের কল্পনাকে বা প্রতিভাকে নূতনতার চমকে এ জিনিষ বিশেষভাবে উদ্দীপিত করেছে তাঁদের মধ্যে অগ্রণী ও উল্লেখযোগ্য হলেন গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রামকিঙ্কর বেইজ। একজনের রূপসাধনার আদ্যন্ত আমাদের গোচরে রয়েছে; অন্যজনের রূপরচনার ধারা নূতন নূতন তৈলচিত্রে ও মূর্তিতে অদ্যাবধি অনিঃশেষ হলেও, তার প্রকৃতি ও প্রকরণ সম্পর্কে প্রত্যাশার সীমায় আমরা উপনীত হয়েছি। রবীন্দ্রনাথের থেকে এঁদের বিশেষ পার্থক্য এই যে, এঁরা উভয়েই সাদৃশ্যনির্ভর রূপায়ণে নিপুণ হয়েও, শেষ পর্যন্ত রূপসাদৃশ্যকে উপেক্ষা ক'রে পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন বা আচ্ছন্ন করেছেন বিশেষ কোনো-একটি উদ্দেশ্যের সন্ধানে। ফলে, সাঁতার জানলে যেমন জলে ডুবে মরা কঠিন, এঁদেরও কতকটা তাই হয়েছে মনে হয়। অর্থাৎ, মানবচেতনার প্রচ্ছন্নগুহাগহ্বরাশ্রিত অতলতমিস্রচর উচ্ছৃঙ্খল আদিঅধিবাসীদের আবিষ্কার করেছেন এবং আমাদের লক্ষ্যগোচর করেছেন এঁরা বিশ্লেষণপটু বুদ্ধিবৃত্তির এক অভিনব শক্তি ও শৃঙ্খলার সহায়ে। বিরূপবিভীষার স্বচ্ছন্দ প্রবাহ এবং শক্তি,

অন্ধ আবেগের অবিচারিত গতি, কিছুটা নষ্ট হয়ে গেছে সন্দেহ নেই— স্বতঃস্ফূর্তি হারিয়েছে। তুলনায়, রবীন্দ্রনাথ কিছুই প্রায় শেখেন নি রূপরচনার দেশী-বিদেশী কোনো প্রকরণ; কোনো উদ্দেশ্য মনের সামনে রেখে কখনো কাগজ কালী রঙ ব্যবহার করেন নি মনে হয়; কদাচিৎ কোনো উদ্দেশ্য থেকে থাকলেও সূচনায়, সে তাঁর আয়ত্তে আসে নি— রবীন্দ্র- রূপকৃতি বা বিরূপসৃষ্টি নিজস্ব স্বভাবে স্বতই নিরূপিত হয়েছে। লোকোত্তর প্রতিভার বা অসামান্য ব্যক্তিসত্তার যে স্বাক্ষর পড়েছে সর্বত্রই, সে যে সজ্ঞান সচেতন ভাবে লিখেছেন কবি স্বহস্তে এমন বলা যায় কি? অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট চিত্র যেগুলি, যার মধ্যে তাঁর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের বিশেষ ছাপ প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে কিম্বা চাপা আগুনের মতো নানা রন্ধ্রপথে রক্তরাগের ঝলকে ঝলকে দেখা দিচ্ছে, সে-সবের কিছুই ভেবে-চিন্তে, সময় ও সুযোগ নিয়ে, উদ্দেশ্য এবং উপায়ে মিলিয়ে আঁকা হয় নি। যতটা হতবুদ্ধি করেছে দর্শকজনকে, ততটাই অ-বাক্ বিস্ময়ের বস্তু ছিল রবীন্দ্রনাথের নিজের কাছে। কবি মনীষী বাক্‌পতি হয়েও, কোনো সুসংগত ব্যাখ্যা তিনি কোনোদিন দেন নি বা দিতে পারেন নি। অপূর্ব এক চিত্রলোকের এই-সব অধিবাসীরা আছে বা হয়েছে, এ ছাড়া আর-কিছু বলা যায় না। আর-কোনো জবাবদিহির কথা ওঠে না। মনোবিজ্ঞানীরা সত্য কল্পিত অথবা সত্য ও কল্পনা -মিশ্রিত ব্যাখ্যা উপস্থিত করতে পারেন— চিত্রকারী প্রতিভার লাভ-লোকশান সামান্যই।

নিখিল রবীন্দ্রচিত্রকৃতি কোনো কোনো সাধারণ লক্ষণাক্রান্ত হলেও, সবই যে এক শ্রেণীতে পড়ে এমন নয়। রেখা রূপ ভাব ভঙ্গীর মন্ত্রস্তব্ধ বিশেষ ছন্দ প্রায় সর্বত্র দেখা যায়; তা ছাড়াও কোথাও কোথাও বিভিন্ন চারিত্ররূপ, কোথাও বা কম-বেশি বহিঃসাদৃশ্য ফুটে উঠেছে সন্দেহ নেই। অধিকাংশ দৃশ্যচিত্রে সৃষ্টির প্রদোষরহস্যের বিশাল এক বিষাদ ও শান্তি স্বতই উপচে উঠে অন্ধভাবাবেগের

ঊর্ধ্বে অরূপ রসলোককেও স্পর্শ করেছে এমন মনে হয়। প্রাচীন বা আধুনিক যে-কোনো আদর্শে বিচার করি, রসরূপ হিসাবে তাদের অপূর্বতা বা অনন্যতা অবশ্যই স্বীকৃত হবে।

রবীন্দ্রচিত্রকলার সকল বৈচিত্র্য ও বিশিষ্টতা নিয়ে বিশদ আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না। সে অধিকার অর্জন করতে হলে যে পরিমাণ যত্ন পরিশ্রম ভূয়োদর্শন ও মননের আবশ্যকতা তারও সুযোগ নেই। রবীন্দ্রচিত্রাবলির অনন্যতা সম্পর্কে দু-একটি কথা যা মনে জেগেছে, তাই আমরা সবিনয় সম্ভ্রমে উপস্থিত করেছি। পাশ্চাত্য কলারসিক যদি ব'লে থাকেন 'এ দেশে আমরা যার সন্ধানে হাৎড়ে বেড়াচ্ছি তোমার চিত্রকলায় তাই উজ্জ্বল পরিস্ফুট', পরিশীলিত সৌজন্যের বাগ্‌ভঙ্গিমা বাদ দিয়েও তার অর্থ হয়তো এই যে, যে দ্বিধাহীন বলিষ্ঠতা, ঐকান্তিক একমুখী সত্তার এষণা ও প্রাপ্তি, নিবিড় গভীর আবেশ -উদ্ভূত স্বতঃস্ফূর্তি বা অকৃত্রিমতা নব্যকালের অবাস্তব কিম্বা অতিবাস্তব রূপকলায় প্রায়শই অনুপস্থিত, রবীন্দ্র-রচনায় তারই প্রাচুর্য দেখা যায়। যাদুকরী বদ্ধির খেলা দেখানো, বিশেষ কোনো মতবাদের বা মনস্তত্ত্বের প্রমাণ সাজানো তার উদ্দেশ্য নয়। যেখানে তার সহজ সার্থকতা ও স্বাভাবিকতা সে স্থলে যেমন আছে লেখাঙ্কনের গুণোপেত অস্খলিত আশ্চর্য রেখাশৈলী, বিচিত্র বর্ণ-বিন্যাসের আলোআঁধারি[১] মায়াজাল ও ব্যঞ্জনা, স্থাপত্যোচিত নির্মাণ, সমুদয় চিত্রপটে পরিব্যাপ্ত রঙ ও রেখার স্পর্শযোগ্য নিপুণ বুনানি, ছন্দ, বিশেষ বিশেষ চারিত্ররূপ, তেমনি এমনও অনেক অদৃষ্টপূর্ব অপ্রত্যাশিত অদ্ভুত রূপ যা কেবল বলে 'এই-যে আমি', অর্থাৎ 'আমি যে হয়েছি বা রয়েছি তার প্রমাণ আমাতেই'— একটি সূক্ষ্ম স্বপ্নের পর্দার ওপার হতে সেই বাণী আমাদের কানে না এলেও প্রাণে ধ্বনিত হয়।

আমাদের আলোচনায় রবীন্দ্রচিত্রের অতিবাস্তবিকতায় বা স্বপ্ন-

সাদৃশ্যেই আমরা বিশেষ মনোযোগ দিয়েছি, কেননা সেখানেই তার অনন্যতা ও শ্রেষ্ঠতা। অথচ, বহুবিধ টাইপ-সৃজনে, মুখোষ বা মুখাকৃতি -অঙ্কনে ও ভূদৃশ্য-রচনায় শিল্পীর অবিসংবাদিত দক্ষতা, তারও উল্লেখ করতে ভুলি নি। শেষোক্ত রূপরাজিও যে মগ্নমানসের অতল গভীর থেকে স্বতই ভেসে ওঠে নি এমন নয়। বিশেষ এক ধরণের মুখাকৃতি ও চোখের দৃষ্টি ঐভাবেই পটের উপরে ফুটে উঠে আমাদের বিস্ময়বিমুগ্ধ করে; ভাবভঙ্গীর সেই ঐক্যের কারণ কী সে সম্পর্কে আচার্য নন্দলালের প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলেন, 'নতুন বৌঠানের চোখ দুটো এমন ভাবে আমার মনের মধ্যে গাঁথা আছে যে মানুষের ছবি আঁকতে বসলে অনেক সময়েই তাঁর চোখ দুটো আমার চোখের সামনে জ্বল্ জ্বল্ করতে থাকে— কিছুতেই ভুলতে পারি নে। তাই ছবিতেও বোধ হয় তাঁর চোখেরই আদল এসে যায়।'[২]

কবি ও শিল্পী রবীন্দ্রনাথ একই ব্যক্তি হলেও, বিশ্বসৃষ্টির ভিন্ন দুটি দিকে এই দুই প্রতিভার মুখ ফেরানো এবং তাৎপর্যের দিক দিয়েও এরা পৃথক্। পরস্পরের এরা পরিপূরক। একটিতে সমুদয় বিশ্বজীবনকে অ-লৌকিক অ-পূর্ব এক আলোকে উদ্ভাসিত ও রূপান্তরিত করা হয়েছে; তারই ফলে যেমন রূপস্রষ্টার তেমনি রসিকের মুগ্ধ পুলকিত চেতনার এক আশ্চর্য উদ্‌বোধন। অন্যটিতে বিশ্বসৃষ্টির গহন গভীর অন্তরালে অথবা প্রলয়লীন সত্তায় আকারের কাঙাল যে-সব স্মৃতি বিস্মৃতি ও কল্পনা, অন্ধ আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা, তাদেরও বুঝি রূপ দিতে বসেছেন চিত্রকর অপূর্ব এক নেশায় বা আবেশে; তারই ফলে 'কোন্ জন্মে কবে যেন ছিল' যে, 'কোন্ লোকে হয়তো হতে পারত' যা, তারই নানা আভাসে ইশারায় মুগ্ধ অভিভূত হতে হয়— অরূপের নিরূপণ কিছুটা হয়ে থাকলেও রূপান্তর প্রায়শঃ হয় নি— না হোক, যা

হয়েছে তারই প্রসাদে মানবসত্তার দূর দূরান্তর সম্পর্কে আমাদের বুদ্ধি উদ্দীপিত এবং ধারণা প্রসারিত হল।

বিশ্বজীবন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কৌতূহলের কোনো অন্ত ছিল না, চিত্ত এবং বুদ্ধি সর্বত্রই প্রবেশ করতে চেয়েছিল। সৃজনপ্রতিভার পরাকাষ্ঠায় পৌঁছুবেন ব'লে তাঁর পক্ষে চিত্রকলার কোনো প্রয়োজনই ছিল না, অথচ জীবনশিল্পীর সে প্রয়োজন ছিল বৈকি। সবই জানতে হবে, সর্বত্র প্রবেশ করতে হবে। সেই সন্ধানে ও সাধনায় মনস্তত্ত্ববিদ্ একভাবে সচেষ্ট, যোগী বা মহাযোগী আরএকভাবে তপোরত, কবি বা শিল্পীর কার্যকলাপ ও বিচরণ অভিনব তৃতীয় পন্থায়। পরিণাম এক না হলেও, হয়তো একমুখী বলা যায়। শেষ লক্ষ্য হল— চিত্তশুদ্ধি, জড়ে-জীবে-ও-চৈতন্যে-জট-পাকানো মানব-সত্তা ও স্বভাবের গ্রন্থিমোচন ও মুক্তি, সর্বাঙ্গীণ সাব্লিমেশন বা অতিক্রান্তি।

যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ।

নির্মোহ দৃষ্টিতে নির্মম সত্যকে সমগ্রভাবে দেখেছেন ঋষি। রুদ্রের দক্ষিণ এবং বাম কোনো মুখকেই প্রত্যাখ্যান করেন নি তিনি।[৩] তাই তাঁর কণ্ঠে এই মহামন্ত্র ধ্বনিত হয়েছে, যার তাৎপর্যের কোনো সীমা নেই।

সাধারণ মানুষের তো কথাই নেই, এমন-কি মহাজীবনের সাধক মহাপুরুষের পক্ষেও এ মন্ত্রউচ্চারণ সহজসাধ্য নয়। একনিষ্ঠ দীর্ঘ-জীবনের তপস্যার ফলেই শুধু, এ অধিকার অর্জিত হতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ সুন্দরের পূজারি, আনন্দের দূত, আলোকের অভিসারী, অমৃতের সন্তান— সূক্ষ্মাকার সর্বব্যাপী মৃত্যু, খুব সহজে তারই মুখোমুখি নিজেকে দাঁড় করাতে পেরেছেন কি? অথচ, সর্বাঙ্গীণ জীবনসাধনার মধ্যপথে, যত প্রসন্ন সুন্দর মধুর হোক, কোনো-একটি প্রশংসনীয় চিত্তস্থিতির পদবীতে উত্তীর্ণ হয়ে কালাতিবাহন, বিশ্রাম বা বিরতি —সেও কি তাঁর স্বভাবসংগত ছিল? তাই, যিনি বিচিত্ররূপিণী, যিনি অন্তরব্যাপিনী, অচপলদামিনী ও প্রশান্তহাসিনী —জীবনে বহু দুঃখ আঘাত বহু সংগ্রাম থাক্, সবেরই শেষে

'লুটাইয়া রক্তিম চরণতলে
ধৌত করি দিব পদ আজন্মের রুদ্ধ অশ্রুজলে
তৃপ্ত হবে এক প্রেমে জীবনের সর্ব প্রেমতৃষা'

একদা এ অভীপ্সা জেগেছিল যাঁর ধ্যানধারণা থেকে— তাঁকেই সম্বোধন ক'রে বলতে হল বুঝি আরএক দিন 'ক্ষতচিহ্নলাঞ্ছিত' জীবনের অন্তিম প্রহরে উপনীত হয়ে : হে ছলনাময়ী!

আশ্চর্যের উপর আশ্চর্য। সেই-যে শুনেছি—

মধুর, তোমার শেষ যে না পাই,
প্রহর হল শেষ!

না, এ তো সে কণ্ঠ নয়। সেই কবি না আরএক জন?

অবলীলাক্রমে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না। রবীন্দ্রচিত্রকৃতির অনুধাবনে আজ মনে হয়— পূর্ণজীবন-সত্যের, রবীন্দ্রজীবনেরও, সর্বাঙ্গীণ তাৎপর্যের একটা যেন আভাস ও ইশারা পাওয়া যায়।

অবিমিশ্র প্রেম ও কল্যাণ, শ্রী ও মাধুরী, জন্মাবধি যিনি ছিলেন তারই পূজারি, বিশেষ একটি পরিণতিতে পৌঁছে তাঁকে হতে হয়েছে আজ নির্‌মম সত্যেরই সাধক? সত্যের সাধনা আগেও করেছেন। কিন্তু, অতীব মধুর ও সূক্ষ্ম মায়ামমতা জড়ানো ছিল হৃদয়ে; নির্‌নিমেষ নির্‌মোহ দৃষ্টিতে দেখা হয় নি, অন্ধভাবে বুকে জড়িয়ে ধ'রে কিম্বা বুকের ভিতরে রেখেই অনুভব করতে চেয়েছেন— তাই ফুটে উঠেছে, উপচে পড়েছে গানে কবিতায় কাহিনীতে নৃত্যে ও অভিনয়ে ভাবনা ও কল্পনার নিঃসীম সুধা এবং মাধুবী, লালিত্য লাবণ্য এবং বর্ণচ্ছটা। অথচ সত্যের এ উপলব্ধি কি সর্বাঙ্গীণ? এই দেখাই কি প্রত্যক্ষ দেখা? মোহ নয়? অপরূপ স্বপ্ন নয়? কিন্তু—

আজ আমি কোনো মোহ নিয়ে আসি নি তোমাব সম্মুখে।
এতদিন যে দিনরাত্রির মালা গেঁথেছি বসে বসে
তার জন্যে অমবতার দাবি করব না·
অযুত নিযুত বৎসর সূর্যপ্রদক্ষিণের পথে
যে বিপুল নিমেষগুলি উন্মীলিত নিমীলিত হতে থাকে
তারই এক ক্ষুদ্র অংশে কোনো-একটি আসনের
সত্য মূল্য যদি দিয়ে থাকি,
জীবনের কোনো-একটি ফলবান্ খণ্ডকে
যদি জয় করে থাকি পরম দুঃখে,
তবে দিয়ো তোমাব মাটির ফোঁটার একটি তিলক
আমার কপালে!

জীবনশেষেব স্থিরতর প্রত্যয়ে, সমগ্র সত্যের নূতন আলোকে, এ কথা

বলা হয়েছে জীবধাত্রী পৃথিবীকে। বলতে বাধে নি যে,—

মহাবীর্যবতী তুমি বীরভোগ্যা
বিপরীত তুমি ললিতে কঠোরে···
ডান হাতে পূর্ণ করো সুধা,
বাম হাতে চূর্ণ করো পাত্র···

শুভে অশুভে স্থাপিত তোমার পাদপীঠ, প্রচণ্ড সুন্দর তোমার মহিমা, একাধারে অন্নপূর্ণা তুমি সুন্দরী এবং অন্নরিক্তা তুমি ভীষণা।

মনে পড়ে কি ?—

আমারে ফিরায়ে লহো অয়ি বসুন্ধরে,
কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে
বিপুল অঞ্চলতলে···

অথবা—

ইচ্ছা করিয়াছে
সবলে আঁকড়ি ধরি এ বক্ষের কাছে
সমুদ্রমেখলা-পরা তব কটিদেশ···

অথবা—

আমারে করিয়া লহো তোমার বুকের,
তোমার বিপুল প্রাণ বিচিত্র সুখের
উৎস উঠিতেছে যেথা ··

না— সে কণ্ঠস্বর নয় ; সেই কবি নয় ; আর, সেই স্বর্গহারা 'দেবতার মেয়ে' নয় যে 'এত অসহায়, অসমর্থ, অসম্পূর্ণ, ভালোবাসার সহস্র আশঙ্কায় সর্বদা চিন্তাকাতর'। জন্মান্তরে জীবনান্তরে আজ নূতনতর সত্যতর এক উপলব্ধি। বাহিরে যেমন অন্তরেও তেমনি সত্যের পূর্ণতর সাক্ষাৎকার।—

রূপনারানের কূলে জেগে উঠিলাম।
জানিলাম এ জগৎ স্বপ্ন নয়।···

সত্য যে কঠিন,
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম,
সে কখনো করে না বঞ্চনা।
আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ জীবন।

'আমৃত্যুর তপস্যা' কথাটির এ অর্থ নয় যে, মৃত্যুসঙ্গমে এসেই তপস্যার শেষ। মৃত্যুর তল স্পর্শ করা চাই, সীমান্ত পর্যন্তই যেতে হবে —এই নিয়তি। এই শরীরের 'মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ' করার অর্থ এ নয় যে, এ কারবার এখানেই গুটোনো হল— মৃত্যু এবং অমৃতকে একত্র জেনে সুখদুঃখাতীত পরম আনন্দের অধিকার চিরন্তন হবে না কি ?—

রাহুর মতন মৃত্যু শুধু ফেলে ছায়া,
পারে না করিতে গ্রাস জীবনের স্বর্গীয় অমৃত
জড়ের কবলে
এ কথা নিশ্চিত মনে জানি।··
বিশ্বেরে যে জেনেছিল আছে ব'লে
সেই তার আমি
অস্তিত্বের সাক্ষী সেই,
পরম-আমির সত্যে সত্য তার
এ কথা নিশ্চিত মনে জানি।

কবির লক্ষ কোন্ দিকে কোন্ পথে সে আমরা অবশ্যই অনুমান করতে পারি।—

দুঃখের আধার রাত্রি বারে বারে
এসেছে আমার দ্বারে ··
ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি,
মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে।

অরূপের ঐ রূপকলা রবীন্দ্রচিত্রপটে বারে বারেই প্রতিবিম্বিত হয়েছে

জানি। কিন্তু, এ কোনো বিলাস বা বিপরীত প্রতিক্রিয়া নয়। কী জানি, নিগূঢ় এক তপস্যার, নূতন এক তন্ত্রসাধনার হয়তো অঙ্গস্বরূপ। দুঃখ এবং মৃত্যুর ভিতর দিয়ে, মুহূর্তে মুহূর্তে রক্তাক্ত পদে পদে তার দুর্গম বন্ধুরতার পরিচয় নিঃশেষ ক'রে, অবশেষে উত্তীর্ণ হওয়া যাবে দুঃখ এবং মৃত্যুর পরপারে। সেই দুঃসহ অভিজ্ঞতা বা তিক্তরসাস্বাদ কাব্যে ও কলায় নানাভাবে প্রতিফলিত হয়ে থাকলেও, আসলে কবিতা বা চিত্রের নয়— জীবনেরই সাধনা।

নিজের প্রতি নিজের মায়ামমতা যেটুকু আজও আছে তারই কারণে যদিবা বলা যায় 'হে ছলনাময়ী' ('মনে আছে গো, একদিন বলেছি জীবনদেবতা ও মহিমালক্ষ্মী')— একনিষ্ঠ যে সত্যসাধনা ও মহত্ত্ব, ঐ ছলনা তাকে চিহ্নিত করলেও প্রবঞ্চিত করতে পারে না, কবির অন্তিম বাক্যেই এ সত্য উদ্‌ঘোষিত। যার সেই নিঃসীম মহত্ত্ব

লোকে তারে বলে বিড়ম্বিত।
সত্যেরে সে পায়
আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে।··
অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার।

পরম বীর্য এবং পৌরুষের এই এক অন্তর্লীন সাধনা। সেই সাধনারই বিশেষ একটি চরমতা বা ক্রান্তির আভাস পাই রোগোত্তীর্ণ বা রোগ-শয্যাশায়ী বৃদ্ধ কবির নানা কাব্যে— প্রান্তিকে, রোগশয্যায়-আরোগ্য-জন্মদিনে এবং শেষ কয়েকটি কবিতায়। তারই দুর্জ্ঞেয় প্রক্রিয়ার অঙ্গীভূত মনে হয় রবীন্দ্রচিত্রকর্ম। জীবনব্যাপী ভাব এবং কর্ম -সাধনার শেষে যে সংহত সংবৃত সিদ্ধি আর নবতর সাধনা জীবনান্তরের জন্য নিয়ে গেলেন কবি, তারই কিছু কিছু অভিজ্ঞান যেমন কাব্যে তেমনি চিত্রে ইতস্ততঃ খুঁজে পাওয়া গেলেও, আভা

দেখা গেলেও, তার সকল রহস্য জানা যায় নি, হয়তো জানবার নয়। কে জানে, হয়তো ভিন্নতর তার প্রকৃতি হবে। ভারতের মহনীয় যে যুগ ছিল বিস্মৃতপ্রায় অতিদূর অতীতে, আজও আছে লক্ষের মধ্যে এক-আধজনের ধ্যানে কল্পনায় বিধৃত, হয়তো তারই উপযোগী হবে। যে মহাজীবনের বৃত্ত পূর্ণ হয়ে চলেছে জীবন-জীবনান্তরে, আমরা জানি কি কে তার কবি, কেই বা শিল্পী!

জোড়াসাঁকো
১০ বৈশাখ ১৩৬৮

মানবজীবনের উদ্দেশ্য কী, সার্থকতা কোথায়, এ নিয়ে চরম অধ্যাত্ম-তত্ত্বেরও অবতারণা করা যেতে পারে, যাতে লেখক আর পাঠক উভয়েই বিব্রত হবেন আর আদবেই যা প্রাসঙ্গিক হবে না। অথচ বিজ্ঞান দর্শন যোগশাস্ত্র নিয়ে অনধিকার চর্চা নাই বা করা গেল, একটু নিম্ন সোপানে দাঁড়িয়ে একটু নিচু সুরে বলতে দোষ কী— নিখিল জীবনে ও জগতে সৌন্দর্য এবং প্রীতি ব্যাপ্ত করে দেওয়া এতেই মানুষ সুখী হতে পারে, কাজেই সার্থকও হয়। এ এক-রকম সর্ব-পেয়েছি'র দেশ যা হয় নি, কোনোদিন হয়তো হবে, তখন তারই সর্বজনপ্রিয় কবি বলে গণ্য হবেন রবীন্দ্রনাথ— রাজকবি বলা চলে না; কেননা থাকবে না রাজা অথবা রাজ্য, থাকবে না রাষ্ট্র। এই-যে সর্বব্যাপী সৌন্দর্য এবং প্রীতি, জীবনে এবং ভুবনে, অন্তরে আর বাহিরে— এর আশ্রয় কোথায়? আকার-প্রকার বা কেমন? আধার বা আশ্রয় হল বিশ্বপ্রকৃতি, যা মানুষের অসংযমে এবং অনাচারে বিকৃত বিপর্যস্ত কিম্বা ক্ষতবিক্ষত হয় নি। এর শ্রেষ্ঠ প্রকাশ হল গানে। সে গান যে রবীন্দ্রনাথের গান, এমন বললেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি হবে না। অন্তত রবীন্দ্রনাথের গানেই প্রথম তার পরিপূর্ণ আভা ও আনন্দ ফুটে বেরিয়েছে।

সঙ্গীতশাস্ত্রের বর্ণপরিচয় যার হয় নি, সা থেকে রে'র তফাত যে জানে না, রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে তার বলবার কী আছে —এ কথা স্মরণ হলে আর কলম চলে না। আপনাকে বা অন্যকে আশ্বাস দেবার এইমাত্র কৈফিয়ত আছে যে, বুনো জাতি বা বনের হরিণ তারাও তো গান ভালোবাসে, কেন ভালোবাসে জানে না বা জানতে চায় না, হয়তো তাদেরই প্রতিনিধিরূপে বর্তমান লেখকেরও কিছু বলবার থাকতে পারে।—

রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির কবি, রবীন্দ্রনাথ মানবহৃদয়ের কবি। কথাটা অনেক পুরোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু আজও অর্থের অথবা চিত্ত-চমৎকারের শেষ পাওয়া যায় নি। সেই কারণেই পুনরুক্তি হয়তো দোষাবহ হবে না। বিশ্বপ্রকৃতিতে দিবারাত্রি এবং বিচিত্র ঋতুর আবর্তন, কালের নিরন্তর নৃত্যছন্দ, যেন তার এমন কোনো ভাব ভঙ্গী বা ব্যঞ্জনা নেই যা রবীন্দ্রনাথের গানে, কথায় ও সুরে, ব্যক্ত বা আভাসিত হয়ে ওঠে নি। তেমনি বলা যায় মানবহৃদয়ের চিরবিচিত্র চিরপরিবর্তমান ভাবগুলি সম্পর্কে— তার অহেতুক বিষাদ আর সুখ, আশা এবং আকাঙ্ক্ষা— বুকের হারে বা কোলের কাছটিতে যা-আছে, যা নেই, অথবা ছিল যেন জননান্তরসৌহৃদানি-রূপে, সে-সব নিয়েই এক পাওয়া না-পাওয়ার আনন্দ-বেদনা-মিশ্রিত অপূর্ব আকুলতা— এ-সবই কবির গানে কী আশ্চর্য ভাবেই না ব্যক্ত হয়েছে! অনির্বচনীয়ের তো বাচন হয় না কোনো কালেই, কবিতায় থাকে মনে-মনে-গুঞ্জিত সুরের আকূতি আর ইঙ্গিত— সেখানেই তার আসল কবিত্ব। গানে যখন সেই সুর মুখর হয়ে ওঠে, সুদূর স্বর্গের দিকে উধাও হয়ে চলে, সমস্ত আকাশ পৃথিবী আর মানবমন ছুঁয়ে ছুঁয়ে অদৃশ্য শীকরবর্ষণে আর অধীর তরঙ্গলীলায় কেবলই সোহাগ ও সুখ বিস্তার করে চলে, তখন আর বলা চলে না যে, অনির্বচনীয়কে বুঝলেম না বা পেলেম না। অথবা, আমি পেলাম না সে কথা ঠিকই, আমাকে সে পেয়ে গেছে, আমাকে নিমগ্ন করেছে অপূর্ব এক ভাবের ভুবনে অলৌকিক ইন্দ্রজালে।—

গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি
তখন তারে চিনি আমি তখন তারে জানি।
তখন তারই আলোর ভাষায়
আকাশ ভরে ভালোবাসায়,
তখন তারই ধূলায় ধূলায় জাগে পরম বাণী।

তখন সে যে বাহির ছেড়ে অন্তরে মোর আসে,
তখন আমার হৃদয় কাঁপে তারই ঘাসে ঘাসে।
রূপের রেখা রসের ধারায়
আপন সীমা কোথায় হারায়,
তখন দেখি আমার সাথে সবার কানাকানি।

এ তো রবীন্দ্রনাথেরই ভাষা, আর এটি অবিমিশ্র সত্য। নিখিল বিশ্বপ্রকৃতি আর মানবপ্রকৃতি উভয়ের আনন্দময় পরিপূর্ণ মিলন ও অনন্ত লীলাবিলাস— রবীন্দ্রপ্রতিভায়, বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের গানে। বিশ্বপ্রকৃতি অলক্ষে রঞ্জিত রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে নিমেষে নিমেষে, দিনে দিনে, সুন্দর, সুকুমার, সংবেদনশীল মানবহৃদয়ের স্পর্শলাভে; আর, প্রকৃতির স্পর্শে এবং প্রেমে মানুষও আর সে মানুষ নেই। এ গান যেখানে সত্য সেখানে দ্বেষ হিংসা নেই, লালসা নেই, কুশ্রী কিছু নেই— হয়তো মৃত্যুই হয়ে উঠেছে অমৃত। প্রাচীন ঋষি-কবির ভাষায় বলতে গেলে, আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি তাকেই উপলব্ধি করেছেন ও প্রকাশ করেছেন গীতিকবি। কালে কালে ষোলো-আনা সাধনা দিয়ে আর হৃদয় দিয়ে আবার যারা গাইবে এই গান, যারা শুনবে, তাদেরও হতে পারবে ঐ একই উপলব্ধি।

ফলতঃ, রবীন্দ্রনাথের গানে কী এক কল্পভুবন জেগে ওঠে মনে। তার নৃত্যতরঙ্গিত প্রবাহে সকল সত্তা যেন ডুবে যায়। গাওয়া শেষ হলেও কিছুক্ষণ মোহমায়া ছেয়ে থাকে বাইরের আর ভিতরের আকাশ, পরে হয়তো অজানিত দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হয় 'কোথায় সে হারিয়ে গেল' ব'লে। কেননা, আসল কথা হল এই যে, সে জগৎ বা সে জীবন সত্য কিন্তু বাস্তব নয়।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, দৈনন্দিন জীবনে বা লোকব্যবহারে যেমনই হোক, কবিতায় কখনো তিনি মিথ্যা বলেন না, মিথ্যাচরণ করেন না। এ কথা সত্য সন্দেহ নেই আর শতগুণে অধিক সত্য তাঁর গান

এসো আমার ঘরে।
বাহির হয়ে এসো তুমি
যে আছো অন্তরে।
স্বপন দুয়ার খুলে এসো
অরুণ আলোকে
মুগ্ধ এ চোখে;
ক্ষণকালের আভাস হতে
চিরকালের তরে
এসো আমার ঘরে॥

দুঃখ সুখের দোলে এসো,
প্রাণের হিল্লোলে এসো।
ছিলে আশার অরূপ বাণী
ফাল্গুন বাতাসে
বনের নিঃশ্বাসে,
এবার ফুলের প্রফুল্ল রূপ
এসো বুকের পরে,
এসো আমার ঘরে॥

ফাল্গুন ১৩৩২

আমার মুক্তি গানের সুরে
এই আকাশে।
আমার মুক্তি ধুলায় ধুলায়
ঘাসে ঘাসে॥

সেই মনের সুদূর পারে
হারিয়ে ফেলি আপনারে,
দিগ্বিদিকে ছড়ায় আমায়
কোন্ বাতাসে॥

মন মেশে মোর শ্যামল বনের
মর্মের সাথে।
ফুল-ফোটানোর নিবিড় বেলায়
পরান মাতে।
কচি পাতার ব্যাকুলতা
বক্ষে আমার কয় যে কথা,
স্বপ্ন আমার মেঘের লীলায়
শূন্যে ভাসে॥

[illegible]
১৭ সেপ্টেম্বর
১৯২৩

সম্পর্কে। সমুদয় কবিসত্তার সারসত্য নিয়ে নিমেষে নিমেষে উদ্‌বারিত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে এই গান আমাদের পরম সৌভাগ্যে। আমাদের সৌভাগ্য এই যে, আমরাও সেই উপলব্ধির অংশী হয়েছি, সেই আশ্চর্যসত্তার একেবারে সামিল হয়ে পড়েছি।

সত্য কেন? যেহেতু একমুখী অন্তঃকরণের নিবিড়, গভীর, সত্য উপলব্ধির প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন—

'এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণতরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায়
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্বদিগ্বিজয়ে,
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে
নাচিছে ভুবনে'

তখন তা নিতান্ত বাক্যালংকার হয় না, কথার কথা হয় না; এ কথাই তিনি বলেছেন প্রবন্ধে আর চিঠিপত্রে; এ তাঁর যথার্থ অনুভূতি; এ যখন সুরের পাখায় আকাশবিহারে উড্ডীন হয়েছে তখনই ঠিক ঠিক জেনেছি এ-যে কত সত্য। রবীন্দ্রসঙ্গীতের ব্যর্থ অনুকরণচেষ্টা করেন নি কোনো কবি বা সুরকার এমন নয়। রবীন্দ্র-রচনারই ভাব ভঙ্গী ও শব্দাবলী হয়তো ব্যবহার করা হয়েছে— শব্দ তো বাংলাভাষারই শব্দ, রবীন্দ্রনাথ নিজে রচনা করেন নি— সুরের খোঁচ-খাঁচ আরোহ-অবরোহ মেলা-মেশা তাও হয়তো কুড়িয়ে-বাড়িয়ে কিছু একত্র করা হয়েছে— তবু হাস্যজনক হয়েছে সমস্ত প্রযত্ন হার্দ তন্ময়তার অভাবে, উপলব্ধির অভাবে। বাওয়া ডিম থেকে যেমন পক্ষীশাবক জন্মে না, সদ্‌গুরুর-শক্তি-সঞ্চারিত মন্ত্র না হলে যেমন ইষ্টদর্শন করাতে পারে না, এরকম ক্লেশসাধ্য 'সৃষ্টি'ও তেমনি অনাসৃষ্টি বা অসত্য যে তাতে আর সন্দেহ নেই। শুনেছি পরিস্রুত তপ্ত রস, শান্ত হতে হতে, শীতল হবার মুখে, মিছরির আকারে দানা বাঁধে একটি সূত্র ধরে। উৎকৃষ্ট শিল্পসৃষ্টিও তো তেমনি স্ফটিকাকার

সংহত জিনিষ, তেমনি তার থেকে আলো ঠিকরে পড়ে দিকে দিকে, তার অলক্ষ্য সূত্র হল সবেদন এবং সচেতন শিল্পীসত্তা মাত্র। সেখানে কোনো ফাঁকি চলে না।

সঙ্গীতশিল্পী রবীন্দ্রনাথের অনুভূতিতে কথা এবং সুর প্রায় সমান মর্যাদা পেয়েছে। কবিচেতনায় একই কালে যদিবা না এসে থাকে দুটি, তবু যে এক হয়ে উঠেছে সে আমরা সকলেই জানি। কথায় যা আছে কথার-অতীত তার সকল স্বরূপ ঝলকিত হয় সুরে সুরে, আর নিরাকার নিরাধার সুর অনিন্দ্যমনোহর বাক্যে ও শব্দে প্রাণ পায়, দেহ পায়। ওস্তাদি গানের বিশেষ একটি সাধনা বা সিদ্ধি আছে, যেখানে কথার মর্যাদা নেই, কবিত্বের কোনো সার্থকতা থাকতে পারে না। নিছক কসরত হলে সে তো সার্থক শিল্পসৃষ্টির এলেকা ছেড়েই গেল— আর না হলেও, সে হল একেবারেই abstract, দেহহীন, সূক্ষ্ম। মানুষের কণ্ঠ সেখানে বীণা বেণুর মতোই বাক্যহীন— মানুষের কাছে, মানুষের ভাষায় কিছু তার বলবার নেই। এ জিনিষে বাঙালি হয়তো ষোলো-আনা খুশী হয় না, পরিতৃপ্ত হতে পারে না। অন্তত বাঙালির বাউল ভাটিয়ালি -আদি লোকসঙ্গীতে আর কীর্তনে— যে কীর্তনে সুর-তাল-ভাবভঙ্গীর বহু বৈচিত্র্য এবং অজস্র ঐশ্বর্য আছে শুনতে পাই— এ কথাই যুগ যুগ ধরে প্রমাণিত হয়ে এসেছে দেখা যায়। বাঙলায় প্রচলিত আর রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক আদৃত বা গৃহীত ধ্রুপদ টপ্পা প্রভৃতি বৈঠকী গানের যে চাল, যে স্বভাব, তাতেও ভাব ভাষা কবিত্বকে চাপা দেওয়ার দাবি নেই— উজ্জ্বল এবং পরিস্ফুট করবারই প্রেরণা আছে। রবীন্দ্রনাথে এসে সে চেষ্টা যে বিস্ময়কর সিদ্ধি ও সার্থকতা পেয়েছে তা হয়তো পূর্বে আর কোনোদিন পায় নি। কারণ, রবীন্দ্রনাথ একাধারে শ্রেষ্ঠ কবি আর অতুলনীয় সুরকার। বাঙালিজাতির সঙ্গীতপ্রতিভার যে বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে তারই যেন পরাকাষ্ঠা দেখা যায়।

জগৎ তাঁর কাছে বাণীময় আর সুরময়। 'মরণ রে তুঁহুঁ মম শ্যামসমান' আর 'কৃষ্ণকলি' কবিতাতেও তিনি সুর দিয়েছেন, নিছক গদ্যছন্দকেও সুরে উন্মুখর করে তুলতে অকৃতকার্য হন নি— এ প্রতিভা এবং এ প্রবণতা বৈষ্ণব মহাজন বা সুরকারদের মধ্যে ইতিপূর্বে দেখা গিয়েছিল। বাঙালি সাধক বা সুরকারের সাধনা নিরাকার নিয়ে নয় আর কেবল আকার নিয়েও নয়। কেননা—

সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে,
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা।

ঋষিকবির অনুসরণে বুঝি এমনও বলা যায় যে, নিরাকার 'অসম্ভূতি'র উপাসনায় মানুষ অনেক বেশি ভুল করে, যত না ভুল হয় শুধু আকারে শব্দে বা শব্দার্থে আবদ্ধ থেকে। কথা এবং সুর, বচন এবং অনির্বচনীয়, রূপ এবং অরূপ বা অপরূপ, এদের প্রেমময় মিলনে এবং বিচিত্র লীলাবিলাসে রবীন্দ্রসঙ্গীতের অপরূপ সৌন্দর্য এবং মাধুরী। সে আমাদের বিস্মিত বিমুগ্ধ আনন্দিত এবং আত্মবিস্মৃত করে; কোন্ এক দিগন্তের দিকে ইশারা মেলে দেয় যেখানে এ জীবনে কোনোদিন পৌঁছুনো যাবে না। শান্তি দেয়, সুখ দেয়, অপূর্ব বিষাদে অভিভূত করে— সুখের বিষয় অথবা আক্ষেপের কারণ তা বলা যায় না যে, তেমন প্রাণ-মন-ঢালা বা প্রাণ-খোলা রবীন্দ্রসঙ্গীত আজ আর তেমন শোনা যায় না। বিচিত্র আয়োজন আড়ম্বর আর উত্তেজনা যতই হোক, পরমকারুণিক মাঈক না হলে বহু গায়ক-গায়িকার কণ্ঠস্বর তেমন শোনা যায় না; বিকল্পে ঘরে ব'সে গ্রামোফোন রেকর্ডের পুনঃপুনঃ আবর্তনে অথবা রেডিয়োর

কল খুলে দিয়ে, তবে, পরিমিত সুরের গণ্ডুষজলে কাকস্নান সেরে নিতে হয়। সবই সত্য। তবু, সঙ্গীতঅজ্ঞ অথচ সঙ্গীতমুগ্ধ জনসমাজের একজন হিসাবে সব শেষ কথা এই বলতে পারি, এ দেশ ধন্য, এ কাল ধন্য যে রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন। আমরা ধন্য, মহৎ রবীন্দ্র-জীবনের এই পরম দান আমরা অনায়াসে পেয়েছি। এ পাওয়া যে কতখানি আজ তা বোঝা না গেলেও, পরবর্তী যুগে যুগান্তরে তার তাৎপর্য অবশ্যই উদ্‌ঘাটিত হবে।

জোড়াসাঁকো
চৈত্র ১৩৬৬

আলোচনা-সমালোচনা

শ্রীঅমল হোম -প্রণীত : পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথকে যখন আমরা মনে মনে প্রণাম নিবেদন করি, স্মরণ করি— জীবনের এমন একটা দিনও তো দেখি নে যখন তাঁকে ভুলে থাকা যায়— তাঁরই ভাষায় তাঁকে সম্বোধন করে বলতে পারি : স্বদেশআত্মার বাণীমূর্তি তুমি। সেই স্বদেশের বাণীমূর্তি কবি, তাঁরই জীবনের ও চরিত্রের কয়েকটি দিক, লেখক এই গ্রন্থে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাতে যেমন আছে সক্ষম সাংবাদিকের নিপুণ তথ্য- সন্ধান ও পরিবেশন তেমনি দেখতে পাই বিদগ্ধ মনের সুরুচি ও সদ্‌বিচার। অর্বাচীন ছাড়া কেউ মনে করবে না— রবীন্দ্র-নাথের প্রতি প্রীতি ও ভক্তি আছে ব'লেই লেখক রবীন্দ্রচরিত-আলোচনায় অনধিকারী। আমাদের দেশের সংস্কার এই যে, আদৌ শ্রদ্ধা। নইলে সত্যই যা মহান্ ও বিরাট তাকে ধারণা করা যায় না, চেনা যায় না। রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব ও বিশালতা সম্পর্কে আজও কোনো সন্দেহের অবকাশ কোথাও আছে কি ? অবশ্য, মহাজনের কাছে ঋণ-অস্বীকারের জন্য অনেক অধমর্ণ অনেক কুটিল ও অপকৃষ্ট কৌশল অবলম্বন করে সন্দেহ নেই, কিন্তু ঋণস্বীকারের পন্থা সকলেরই অনিন্দনীয় না হলেও— ঋণপরিশোধের কোনো প্রশ্নই ওঠে না— রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ স্বদেশবাসী রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সেরূপ কোনো অস্বাভাবিক অস্বীকারের মনোবিকারে পীড়াগ্রস্ত নন। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা সম্পর্কে, সমাজ সম্পর্কে, স্বদেশ সম্পর্কে, মহান মানবভাগ্য এবং সেই ভাগ্যকে অধিকার করার পন্থা সম্পর্কে যে-সব উক্তি করেছেন বা যে দিক্ নির্দেশ করেছেন তাতে প্রায়শই আশ্চর্য ভবিষ্যদ্‌দৃষ্টি প্রকাশ পেয়েছে, এবং তার সত্যতা বা উপযোগিতা আজও তো নিঃশেষিত হয়ে যায় নি— এমন-কি, সব কি তাঁর দেশের

লোকের, জ্ঞানী ও গুণী-গণের, ধারণার মধ্যেও এসেছে ? যে সূর্যের উদয় দেখা যায় নি দিক্‌চক্রবালে তারই প্রথম আলোকস্পর্শ এসে পড়ে পূর্বাভিমুখী তুঙ্গ গিরিশিখরে। তেমনি তো যথার্থ যিনি কবি ও মনীষী, তাঁরই ধ্যানধারণায়, উপলব্ধিতে এবং জীবনে। তার এই একটা দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হবে যে, সমসাময়িক ভারতের আর-একজন বিরাট পুরুষ মহাত্মা গান্ধী, নিজের জীবনে ও জাতির জীবনে 'সত্যের যে অভিনব পরীক্ষা'য় অগ্রসর হয়ে মানবসমাজে এক যুগান্তরের সূচনা করে গিয়েছেন, তার অনেক তত্ত্ব ও তাৎপর্য রবীন্দ্র-রচনায় তৎপূর্বেই বাঙ্ময় ও মূর্ত হয়ে উঠেছিল। কেননা, কবি যে স্বদেশ-আত্মারই বাণীমূর্তি, আর মানব-আত্মারও।

আলোচ্য গ্রন্থের পরিমিত আয়তনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে পাঁচটি, বা ঠিক বলতে গেলে চারটি, প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে। পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ, কেরাণী রবীন্দ্রনাথ, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর রবীন্দ্রনাথের চিঠি, অমৃতসর কংগ্রেস ও রবীন্দ্র-নাথের চিঠি এবং সাম্প্রতিক রবীন্দ্র-সমালোচনা। তৃতীয় ও চতুর্থ প্রসঙ্গকে বস্তুতঃ একটি প্রসঙ্গই বলা চলে এবং গ্রন্থের এই অংশেই আমাদের নয়ন ও মন, আগ্রহ ও অভিনিবেশ, সর্বাগ্রে আকৃষ্ট হয় এবং বার বার ফিরে আসে। প্রথম ও শেষ প্রবন্ধের মধ্যে এই যোগ আছে যে, উভয়ত্রই রবীন্দ্রনাথের কাছে আমাদের অপরিশোধ্য ঋণ আর সেই ঋণ আমরা কী ভাবে শোধ করছি অথবা কী ভাবে করা উচিত তারই নিপুণ আলোচনা আছে। অধিকাংশ আলোচনাই সারালো এবং ধারালো হয়েছে বহু টীকা-টিপ্পনী এবং 'সংযোজনী'র সমাবেশে। সুদক্ষ সাংবাদিকের নিকট আমাদের যা সংগত প্রত্যাশা তার কিছুই তিনি অপূর্ণ রাখেন নি।

পঞ্জাবের কুখ্যাত হত্যাকাণ্ডে রবীন্দ্রনাথের যে উদ্‌বেগ, আবেগ, অভিজাত রোষ এবং সুদূরসম্ভাবনাপূর্ণ প্রতিক্রিয়া তার একটি প্রোজ্জ্বল

চিত্র এঁকে তুলেছেন অমল হোম— এজন্য লেখকের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা সীমাহীন। দেশব্যাপী নিদারুণ দুঃখের রাত্রিতে কেউ যখন কথা খুঁজে পায় নি, আর কথা বলতে সাহসও করে নি, তখন একলা দেশের কবি কথা বলেছেন ; দেশের চরম লজ্জা ও অপমানের মধ্যে দাঁড়িয়ে তার ঊর্ধ্বে যেখানে তাঁর স্বদেশের শাশ্বতমহিমা, তাঁর আরাধ্য মানবতার নিরঞ্জন রূপ, তার দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চেয়েছেন— রবীন্দ্রনাথের এই সাহস ও এই অপ্রমত্ততার কথা ভাবলে আজও সত্যই আমাদের বুক দশ হাত হয়ে ওঠে এবং (মাপ কোরো কবি !) আমরা বাঙালি ব'লেও একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করি। রবীন্দ্রনাথ সেদিন সমস্ত ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন, অবমানিত মানবতারও প্রতিনিধিত্ব করেছেন— উভয়েরই বাণীমূর্তিরূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তাঁর নির্ভীক সত্তা।

পূর্বেই আমরা বলেছি— প্রথম ও শেষ প্রবন্ধে আছে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশবাসীর, বিশেষতঃ বাঙালির, রবীন্দ্রচর্যার চর্চা। হরির ভজনা হয় মিত্রভাবে আর শত্রুভাবেও, পুরাকথা স্মরণ ক'রে এটুকুই শুধু বলতে পারি। শত্রুভাবের ভজনায় শীঘ্র তাঁকে পাওয়া যায় অথবা আদৌ পাওয়া যায় কি না, তা ঠিক বলতে পারব না। রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবনকালে বিরূপ সমালোচনা সহ্য করেছেন অজস্র এবং আজও যে তার অন্ত হয়েছে তা অবশ্য নয়। এক-প্রকার অপ-সমালোচনা আছে যা পুকুরের পানার মতো (আশা করি কলিকাতাবাসী বাঙালিরও একেবারে অপরিচিত নয়)— যতই না জলে ঢেউ তুলে দূর করে দাও, কিছুক্ষণ বাদে আবার চারি দিক থেকেই ঘিরে আসে। আরএক-প্রকার সমালোচনার ভাবখানা সেই তারকার-মুখে-ছাই-দিয়ে-আসা হাউইয়ের মতো। শেষ উপমাটি অবশ্য আংশিক। কারণ, এই-সব বাক্যের তুবড়িবাজি আর বিভ্রান্তমতির হাউইগুলি নিবতে কিছু সময় লাগে (ইতিমধ্যে ভালো ছাপা ও চক্‌চকে

বাঁধাইয়ের গুণে— ভাষাও ঝক্‌ঝকে সন্দেহ নেই— হাতে হাতে ফেরে এবং 'কৃষ্টি'বানের সোফায় টেবিলে বিরাজ করে) এবং সূর্যনক্ষত্রের জ্যোতির কিছু হ্রাসবৃদ্ধি না ঘটালেও হাট-বাটের মানুষের চোখে অদ্ভুত ধাঁধা লাগায় সন্দেহ নেই— তাই, প্রতিবাদেরও প্রয়োজন আছে স্বীকার করি। সে প্রতিবাদ উচ্চারণ করেছেন গ্রন্থকার যথোচিত জোর দিয়ে এবং যোগ্যতার সঙ্গে। জানি সব কথাই সার্থক নয় আর সব কর্ম নয় অবন্ধ্য। কালের পুতুল কলের পুতুলের মতোই দম ফুরিয়ে নিষ্ক্রিয় ও নির্বাক্ হয়ে যাবে— যেমন তার আগে তেমনি তার পরেও সেই বাণী ধ্বনিত হতে থাকবে যার উদ্ভব মানবআত্মার অতল-স্পর্শ উপলব্ধিতে এবং আকাশস্পর্শী ধ্যানে। অতল মানেই 'রসাতল' নয় এবং আকাশ নয় শূন্য। সুতরাং, বিকৃত বা ভ্রান্ত রবীন্দ্র-সমালোচনার অমল হোম যা উত্তর দিয়েছেন তাই যথেষ্ট মনে করা যেতে পারে। অখিলপাণ্ডিত্য, এমন-কি তার ভাণটুকু পর্যন্ত না থাকাতে, আমাদের এই বিতর্কে যোগ দেওয়া অনাবশ্যক ছিল। যোগ দিতেও চাই নে। তবে একটি পুরাতন কথা স্মরণ করা যেতে পারে। সে হল এই যে, আজ যা উগ্রভাবে 'আধুনিক', কালই তা বাসি ও বস্তাপচা'র পর্যায়ে গিয়ে পড়ে। কতকগুলি আছে ক্ষণকালীন রুচি প্রবৃত্তি মনোভাব ও 'ভঙ্গী'— একান্তভাবে তার উপরেই নির্ভর করলে কোনো বড়ো সাহিত্য বা শিল্পই বেশিদিন টিকত না— শত শত বৎসর উত্তীর্ণ হয়ে আজও আমাদের আনন্দ দিত না। শেক্‌স্‌পীয়রের সমাজ নেই, রবীন্দ্রনাথের সমকালীন সমাজ বা রীতিনীতিও থাকবে না— তাঁরা, অর্থাৎ তাঁদের কৃতি, আছে ও থাকবে সেই গুণেই যাতে তাঁরা শাশ্বত মানবকে, মানবের প্রাণ মন আত্মাকে, ধারণা করেছেন ও রূপ দিয়েছেন। তাঁদের সৃষ্টির একটি বাইরের নাম রূপ পরিচয় অবশ্যই আছে, সেটি তার পরিহিত বসন-ভূষণ মাত্র— আর-একটি আছে স্থায়ী সত্তা, অজর অমর দেহ ও আত্মা; সেটি চিরমানবের সজীব সত্তার

সঙ্গে অভিন্ন।

'দাদা'ভাইরা 'মোনা লিসা' চিত্রের প্রতিচিত্রে চীনা কালী দিয়ে যুগল গুম্ফ এঁকে যদি মনে করেন মহতী সৃষ্টি হল, তা মনে করুন— কোষ্ঠপরিষ্কারের জয়গানে মুখর হতে চান কেউ সমুদ্রের ও পারে, দেখাদেখি তাই এ পারেও, সেও তাঁদের 'মৌলিক' রুচি বা প্রবৃত্তি— এরূপ মৌলিকতায় রাঁচীর প্রাচীর-ঘেরা স্থানবিশেষের অধিবাসীদের অতিক্রম করা বোধ করি 'প্রতিভাবান' অত্যাধুনিক কবিগণেরও অসাধ্য— দূরব্যাপী দেশ কাল ও মনুষ্যসমাজ তবু এসব মতিচ্ছন্নতায় সত্যই বিভ্রান্ত হবে এমন মনে হয় না। মনুষ্যসত্তার, তথা কাব্য ও সাহিত্যের, ধ্রুব সামগ্রী কতকগুলি আছে-- পূর্বেই বলেছি, তার বিনাশ নেই, পরিবর্তন নেই।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা উঠেছে র‍্যাবো-রিল্‌কের। এ প্রসঙ্গে দু দিকের সৃষ্টিই যিনি সাক্ষাৎভাবে ও সার্থকভাবে জানেন সেই বিদেশী অধ্যাপক (বিদেশী কেন বা বলব? কেউ আছেন সব-দেশী। কেউ বা স্বদেশেই প্রবাসী, তাই ভাবেন বিলেতের আঁতুড়ঘরে আপন মনের নাড়ী-কাটা, বিলেতী ধাই-মা'র স্তন্যেই প্রাণধারণ) পিয়ের ফালোঁ এস. জে. যা বলেন, পরবর্তী অনুচ্ছেদে তারই সারকথা সংকলন করে দিই—

এই 'মহত্তর ব্যক্তিত্বের সংশ্লেষ'[১] র‍্যাবোর সাহিত্যে নেই বলেই তিনি রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ নন। মানবীয় সত্তার উপলব্ধি তাঁর কাব্যের মধ্যে সামগ্রিক ও পূর্ণাঙ্গীণ রূপে রূপায়িত হয়ে ফুটেনি। ·· নরক যেমন সত্য স্বর্গও তেমনি সত্য, বীভৎসের চাইতে সুন্দর অবাস্তব নয়, মানবীয় জীবনের অসংলগ্নতা ও অশান্তির অভিজ্ঞতা যে অর্থে অতলস্পর্শ হতে পারে পূর্ণতা ও শান্তির অভিজ্ঞতা সেই অর্থে অতলস্পর্শ হবে না কেন?··· আশা ও বিশ্বাস, পুণ্যের উপলব্ধি ও মানসিক স্থিতপ্রজ্ঞতা যে কত দীর্ঘ সাধনার সাপেক্ষ, কত বাস্তব পূর্ণতার

পরিচায়ক, সেই কথা অনেকে হয়তো বোঝেন না।·· র‍্যাঁবো এমন অনেক-কিছু লিখেছেন যা রবীন্দ্রনাথ লেখেন নি, লিখতে হয়তো পারতেন না। পিকাসো এমন অনেক ছবি এঁকেছেন মাইকেল আঞ্জেলো যা আঁকতে পারতেন না, এজরা পাউণ্ড্ ও জয়্স্ এমন কাব্য ও উপন্যাস রচনা করেছেন দান্তে বা বাল্‌জাক যা রচনা করতে পারতেন না। তাঁরা মহৎ শিল্পী কবি বা ঔপন্যাসিক হলেও বিশ্বভূমিকায় তাঁদের স্থান কি মাইকেলআঞ্জেলো দান্তে ও বাল্‌জাকের ঊর্ধ্বে?··· র‍্যাঁবো ···শ্রেষ্ঠতম ফরাসী কবিদের মধ্যে গণ্য নন; রাসিন উগো বোদলের ভালেরি ক্লোদেল র‍্যাঁবোর ঊর্ধ্বে। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু যে বিশ্বসাহিত্যের ভূমিকায় শ্রেষ্ঠতম কবিদের মধ্যে গণ্য, এই কথা কি অগ্রাহ্য হতে পারে? কেবল বহুমুখীনতা ও প্রাচুর্যের গুণেই নয়, **মানবীয় জীবনের অখণ্ড ও "অতলস্পর্শ" অভিজ্ঞতার গুণেও।**[২]

কথা উঠেছে, রবীন্দ্রনাথের সংগীতসৃষ্টির মূল্য কী। যাঁরা 'সৃষ্টিকর্তার কাঁধের উপর চ'ড়ে ব্যায়ামকর্তার বাহাদুরি'[৩] দেখলেই বাহবা দেন, তান-বাটের মালসাট -ব্যতীত গান মাত্রই যাঁদের কাছে অনাদরণীয়, অন্তত অপাংক্তেয়, তাঁরা বলেন— যথার্থ মূল্য, স্থায়ী মূল্য কিছু নেই। হবেও বা। সংগীততত্ত্বে আমরা আনাড়ি। অবসরে বা অনবসরে অ্যামেচারী চর্চায় বা চর্যায় এ বিষয়ে পরিপক্কতা লাভ করব তাও তো হয়ে ওঠে নি। সুতরাং জ্ঞানী ও গুণী -জন এ বিষয়ে কী বলেন সেইটে প্রথমে জানা দরকার। সকল মুনির অভিমত অবশ্য একরূপ হবার নয়। না হলেও, পরবর্তী অনুচ্ছেদে সংকলিত উক্তির কী ইঙ্গিত, কী তাৎপর্য সেটি অধিকারী ব্যক্তিরা ভেবে দেখবেন—

আমাদের দেশের যথার্থ সঙ্গীত কেবল ধ্রুপদ ও কীর্ত্তনে আছে, আর সব ইসলামী ছন্দে গঠিত হইয়া বিকৃত হইয়া গিয়াছে। আমাদের সঙ্গীতে খুবই উন্নতি হইতেছিল, এমন সময়ে মুসলমানেরা

আসিয়া সেটিকে এমনভাবে করতলগত করিল যে সঙ্গীততরুটি আর বাড়িতে পারিল না। ·· ধ্রুপদ খেয়াল প্রভৃতিতে বিজ্ঞান রহিয়াছে, কিন্তু সত্যকার সঙ্গীত রহিয়াছে কীর্ত্তনে— মাথুর বিরহ প্রভৃতি রচনাবলীতে। কেননা উহাতে ভাব আছে। ভাবই সঙ্গীতের প্রাণ, সকল বিষয়ের গোপন উৎস। লোক-সঙ্গীতে গীতি-মাধুর্য অধিকতর। ধ্রুপদের বিজ্ঞান কীর্ত্তনের সঙ্গীতের সহিত মিলিত হইয়া আদর্শসঙ্গীতের সৃষ্টি করিবে। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় ধ্রুপদ গানই একমাত্র উপযোগী।[৪]

সংগীতজ্ঞ ব্যক্তিগণ অপরাধ নেবেন না, আমি তো স্বামী বিবেকানন্দের এবংবিধ উক্তিতে আশ্চর্য ভবিষ্যদ্‌বাণী এবং রবীন্দ্র-সঙ্গীতেরই দ্ব্যর্থরহিত সমর্থন ও প্রাণ-খোলা প্রশস্তি শুনতে পাচ্ছি। যে 'আদর্শ সঙ্গীতের' আকাঙ্ক্ষা ছিল এই মহাপ্রাণ ভাবুকের, প্রধানতঃ ধ্রুপদের দেহ ও কীর্তনের প্রাণ একত্র ক'রে, লোকসঙ্গীতেরও রস আকর্ষণ ক'রে, রবীন্দ্রগীতিই তার উদ্দীপ্ত জীবন্ত প্রতিমা হয়ে উঠেছে। বদ্ধমূল সংস্কার একান্তই দুস্ত্যাজ্য না হলে, সঙ্গীতরসিক ও সঙ্গীতজ্ঞ-গণ স্বামীজির কথাগুলি নিয়ে একটু ভেবে দেখতে পারেন। তাতে দেখা যেতেও পারে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুকরণ হয়তো ভয়াবহ (কোন্ অনুকৃতিই বা বিকৃতিতে গিয়ে শেষ হয় না?)— তবু, রবীন্দ্রসঙ্গীত (তার স্বভাবে ও স্বধর্মে) পরম আদরণীয়।

১৩৬৪

উত্তমপুরুষের এক-বচন, হয় উদ্ধত নয়তো স্বভাবতই অতিশয় লাজুক। অস্বস্তিজনক। অথচ অগৌরবে বহুবচনের প্রয়োগও শাস্ত্রে লেখে না। তবে, বলাই বাহুল্য, এ ক্ষেত্রে কানাইয়ের যা অভিজ্ঞতা তার সঙ্গে বলাইয়েরও মিলবে না এমন কোনো কথা নেই। বস্তুতঃ যদু বিধু নিধু নজরুল নলিনী অনেকেরই মিলবে— বিশেষ ক'রে বিংশ শতাব্দের প্রথম দশকে বা কাছাকাছি সময়ে এই বাংলাদেশে যে জন্মেছে। রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি সামনে রেখে অন্যূন অর্ধ শতাব্দের এই স্মৃতিচারণ, ব্যক্তিবিশেষের মনোমুকুরে ধৃত হলেও অনেকেরই জীবনপ্রতিবিম্ব বলা যেতে পারে। 'আমি' পদটি সত্যই সর্বনাম, 'তুমি'র থেকে তার আত্যন্তিক কোনো ভেদ নেই।

শৈশব অতিবাহিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের উদার উন্মুক্ত পল্লী-পরিবেশে। গ্রামের জমিদার-বাড়িতে ছিল বারো মাসে তেরো পার্বণ— বেশি বৈ কম হবে না। শাক্ত শৈব বৈষ্ণব মতের কোনো বার-ব্রত পূজা-অর্চনাই অবহেলিত ছিল না। বিশেষ বিশেষ পর্ব-উপলক্ষ্যে যাত্রা-থিয়েটারের আসরে, রাসতলায় বা ঠাকুবাড়িতে, যত না আকর্ষণ ছিল, মন্ত্রমুগ্ধ ও স্তব্ধ করে রাখত কথকঠাকুরের সুললিত আখ্যানকথন— মাস-ব্যাপী সেই অনুষ্ঠান হ'ত প্রসন্নসুন্দর শরৎসন্ধ্যায় দিনের পর দিন। কৃত্তিবাসী রামায়ণ আর কাশীদাসী মহাভারতের সঙ্গেও অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটেছিল বটতলায় ছাপা বহুপঠিত বহুআদৃত জীর্ণ পুঁথির মধ্যবর্তিতায়। আবহমান কালের সঙ্গে শিশুচিত্তের অতিনিবিড় এই পরিচয় অতিসহজে আর সুন্দরভাবে। দূরপ্রসারিত বর্তমান দেখা দিয়েছিল একখানি স্কুল-পাঠ্য কাব্যসঙ্কলনের সহজ সাধারণ বেশে। উচ্চতর শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট সে বই আমার 'পাঠ্য' ছিল না ব'লেই তার আদ্যন্ত আমার পড়া হয়ে গিয়েছিল, আমায় মুগ্ধ

করেছিল— নামী কবিদের ছবিও ছিল, ছিল তাঁদের সকলেরই সংক্ষিপ্ত পরিচয়। বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিলেন মধুসূদন। কথার পর কথা সাজিয়ে, একটু চেষ্টা করলেই কবিতা লেখা যায় —এ বোধ কবে কেমন করে বালকের মনে উদয় হয়েছিল আজ বলা যায় না, তবে কৈকেয়ী-কর্তৃক দশরথভর্ৎসনে উৎসাহিত বা উত্তেজিত হয়ে 'পরম-অধর্মাচারী রঘুকুলপতি'কে বালকণ্ঠে সম্বোধন ক'রে কী যেন দীর্ঘ ছন্দোবন্ধ রচনা করেছিলাম মনে পড়ে। মেবার পাহাড়ের সাক্ষাৎ ঘটে নি, চুনার পাহাড় লক্ষ্য ক'রে (দ্রুতগামী মেল ট্রেনের জানলা থেকে)— 'চুনার পাহাড় ! চুনার পাহাড় ! যুঝেছিল যেথা কোন্-সে বীর' (কে যে সেদিন জানা ছিল না আর আজও নেই) এই কবিজনোচিত বিস্ময় ও সংবেদন প্রকাশ করেছি। অলক্ষ্যে বাগ্‌দেবী হয়তো স্মিত কৌতুকে হেসেছিলেন, সুখের বিষয় অভিভাবকেরা কিছুই জানেন নি। সে যাই হোক, যথার্থই বিমুগ্ধ বিস্মিত এবং আনন্দে উদ্দীপিত করেছিল এই অপূর্বমধুর অমৃতময় কবিকণ্ঠ—

আজি কী তোমার মধুর মূরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে !
হে মাত বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ
ঝলিছে অমল শোভাতে।
পারে না বহিতে নদী জলধার,
মাঠে মাঠে ধান ধরে নাকো আর,
ডাকিছে দোয়েল গাহিছে কোয়েল
তোমার কাননসভাতে।
মাঝখানে তুমি দাঁড়ায়ে, জননী,
শরৎকালের প্রভাতে।

অকল্পনীয় সত্যত্রেতায় বা অস্পষ্ট সুদূর অতীতে নয় আর, অগোচর অযোধ্যায় মিথিলায় বা রাজস্থানেও নয়, ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ জল স্থল

আকাশের পটভূমিকায় দেখা গেল অতীন্দ্রিয়সুন্দর লাবণ্যে উদ্ভাসিত এ কার মূর্তিখানি! হরিৎহিরণের মধুর মহিমায়, কনককিরণের কিরীটে, কুসুমভূষণজড়িত চরণে, আলোকে শিশিরে ঝলোমলো ছলোছলো না জানি এ কে! আকারে-আকারে-নিরাকারা নিঃসীমা প্রকৃতি যেমন, রবীন্দ্রপ্রতিভায় মূর্তিমতী মানসসরোজবাসিনী শুভ্র-হাসিনী ভারতী ইনি সন্দেহ নেই— তমসার তীরে পুণ্যতপোবনে বাল্মীকিকে যিনি একদিন দেখা দিয়েছিলেন। আরএক অলোক-সামান্য কবির ললাটে জড়িয়ে দিলেন আজ প্রসাদপূত তাঁর অম্লান পারিজাতের একগাছি মালিকা। মন্ত্রতুল্য কবিবাক্ যে কেমন তার প্রথম আভাস পেয়েছি যেমন দত্তকুলোদ্ভব শ্রীমধুসূদনের ওজঃপূর্ণ উদাত্তমধুর কবিতাবলীতে, একান্তঅনুভূত পরম পরিচয় পেয়েছি পরে রবীন্দ্রপ্রতিভার অজস্র অপূর্ব সৃষ্টিতে। সে-পরিচয়ের শেষ হল না আজও, হবে না কোনোদিন। রবীন্দ্রপরবর্তী কালে যে প্রবল আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়েছেন নবজাগ্রত বাংলার প্রত্যেক ভাবুক, কবি, সাহিত্যিক, সে যে সরলপ্রাণ এক পল্লীবালককেও আকৃষ্ট অভিভূত ও অপূর্ব এক জগতে জাগ্রত করবে তার আর আশ্চর্য কী! বালকের পক্ষে অপূর্ব অভিজ্ঞতা হলেও, অনন্যতা এ ব্যাপারে কিছুমাত্র নেই।

ঋতুচক্রের আবর্তনে বৎসরের পর বৎসর গিয়েছে, বালক হয়েছে কিশোর, কিশোর ক্রমশ যুবাবয়সে উত্তীর্ণ হয়েছে। দিনে দিনে রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিচয়-লাভ হয়েছে নিবিড় গভীর ও ঐকান্তিক। কত কবিতা, কত গান, কত প্রবন্ধ, কত-যে কাহিনী ও কল্পকথা, যা কবি পূর্বেই সৃজন করেছেন আর সবে-মাত্র রচনা করলেন— ছড়িয়ে দিলেন বিবিধ গ্রন্থে, বিচিত্র মাসিকপত্রে ও সাপ্তাহিকে! সবই পরমপ্রাজ্ঞ সমঝদার অথবা সমালোচকের মতোই বিচার বিশ্লেষণ করে বুঝেছি বলতে পারি নে— কবিকে গ্রহণ করবার সেইটেই একমাত্র পথ কখনোই নয়, খোওয়া-বাঁধানো পীচ-ঢালা পথ হলেও

হতে পারে— সবই অন্তরে প্রবেশ করেছে, পুলকে রোমাঞ্চিত করেছে, জেনেছি আমাদের অসীম সৌভাগ্যে এই কবি জন্মেছেন এ দেশে আর এই কালে। যেন এমন ভাব নেই, এমন অনুভূতি নেই, প্রকৃতির এমন কোনো রূপ নেই, মানবমনের এমন কোনো রহস্য নেই যা কবি ছন্দে সুরে কথায় ব্যক্ত করেন নি— অব্যক্তের ধ্বনি প্রতিধ্বনি ও ব্যঞ্জনা, অলৌকিক অনির্বচনীয়ের পরিমণ্ডল, সঙ্গে সঙ্গেই জেগে উঠেছে। সাধনায়, বঙ্গদর্শনে, সবুজ পত্রে, স্রষ্টা নিজেকে বারে বারেই নূতন করে সৃষ্টি করেছেন— সোনার তরীতে, চিত্রায়, ক্ষণিকায়, খেয়ায়— তেমনি আবার বলাকায়, পূরবীতে, পরিশেষে, তারও পরে পুনশ্চে। লেখকের জন্মপূর্বের সঞ্চিত সৌভাগ্য যেগুলি, যেগুলিব জন্মলগ্নের অশ্রুত শঙ্খধ্বনি দূর থেকে স্বকর্ণে শুনেছি এমনও বলা যেতে পারে। চিরস্মরণীয় এক বৈশাখের সকালে বা আশ্বিনের দিনে প্রবাসীর অঙ্গীভূত হয়ে মুক্তধারা বা রক্তকরবী কলিকাতা শহরে প্রচারিত হতে না হতেই, নিকটতম চৌমাথায় গিয়ে এক প্রতি সংগ্রহ করে এনেছি, এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলেছি, বন্ধুজনের সঙ্গে মিলে আরও কতবার পড়েছি ও আলোচনা করেছি— আর, কালাতিক্রম ক'রে বলি, উপস্থিত পেশার অনুরোধে (নেশা থেকেও অবিচ্ছিন্ন) কাজের টেবিলে বসে প্রমাদভূয়িষ্ঠ প্রুফের শ্রীহীন কাগজে আজও মাঝে-মাঝে পড়তে হয়, পড়ে আনন্দ পাই, নূতন ভাব নূতন অনুভূতি মনে জেগে ওঠে, মনে মনে অনুপস্থিত কবিকে বলি (এ ঘরে একদিন সশরীরেই ছিলেন তিনি)— 'তুমি কি পুরোনো হতে জানো না!' না, আমার কাছে কোনোদিন, আরও অনেকের কাছেই, পুরাতন হলেন না রবীন্দ্রনাথ— পথরোধ করলেন জীবনের তাও নয়, হাত ধ'রে নিয়ে গেলেন সকল দেশের সকল কালের কবিকল্পলোকে— যে নিরন্ত ধারায় 'ছুটেছে রূপের বন্যা গ্রহে গ্রহে তারায় তারায়' সেই বিশ্বছন্দের নিগূঢ় আনন্দে। যেমন নিখুঁত করে তেল নুন লকড়ির

কেনা-বেচার হিসাব মিলিয়ে দেওয়া যায় তেমন তো নয়ই, যেমন প্রাঞ্জল এবং যুক্তিযুক্ত ভাব ভাষা -বিন্যাসে মেধাবী ছাত্র কূট প্রশ্নেরও উত্তর লিখে যায় পরীক্ষার খাতায় তেমনও নয়— ছোটো হোন বড়ো হোন, খ্যাত বা অখ্যাত, এ দেশে আর এই কালে যে-কোনো মরমী সাহিত্যিকের জীবনেই রবীন্দ্রনাথ কী ও কেমন, কত গূঢ়সঞ্চারী ও দূরপ্রসারী তাঁর প্রভাব, কোনো প্রকারেই তা বলা যায় কি ? হয়তো বলতে পারেন অন্য লেখক অন্য কালের সমুচিত পরিপ্রেক্ষণীতে।

যে মেধাবী ছেলেটি মা-কালীর প্রসাদী ফুল-বিল্বপত্র বুক-পকেটে সংগ্রহ ক'রে, অথবা না ক'রেই, কিছুটা বিশ্বস্ত আর কিছুবা চকিত-চিত্তে পরীক্ষার হলে প্রবিষ্ট, তারই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল ওই পথে আমার পা পড়ে নি কোনোদিনই। কবিগুরুর অননুকরণীয় মহদ্‌দৃষ্টান্ত কতটা দায়ী, কতটাই বা গান্ধীজির অসহযোগ-আন্দোলন, তা হয়তো বলা যায় না। যা হোক, অলক্ষ্য ভাগ্যের উদ্দেশে অনুযোগ করি এমন ফাঁক পাওয়া যায় নি— কাকতালীয়ন্যায়ে কবিগুরুর সঙ্গে কবিশিষ্যের যৎসামান্য একটা সাদৃশ্যই যখন ঘ'টে গেল, বেকার বেখবর জীবনে কবিতারচনা এবং কাব্যঅনুশীলন এইমাত্র সারাদিন এবং সকল ঋতুর মুখ্য 'কর্তব্য' হয়ে উঠেছে। এক কালে প্রশস্ত পাঠপদ্ধতির পাশ কাটিয়ে পড়ার বই থেকে ক্যাশাবিয়াঙ্কা কবিতার কাব্যঅনুবাদ করতে গিয়ে কর্ণমূলে করুণ নিপীড়ন সহ্য করতে হয়েছিল ; এখন মেনে নিয়েছেন বিবেচক অভিভাবক— 'ছেলেটার লেখাপড়া বিশেষ হল না। আপনার খেয়াল নিয়েই থাক্ ; ঝাণ্ডা উঁচিয়ে ১৪৪ ধারা অমান্য ক'রে জেলে না গেলেই যথেষ্ট।'

জেলে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না। দোতলার একখানি ঘরের এক-মাত্র অধীশ্বর থেকে কবিতা লিখি এবং কবিতা পড়ি, সন্ধ্যায় বা গভীর রাত্রে ছাদে ও বারান্দায় অকারণ পায়চারি করি, দ্বিতীয় শেলী বা কীট্‌স্ হবার উচ্চাশা না থাক্ বা দূর হয়ে থাক্— মনোবাক্যের

একাগ্র যত্নে (সে আর কতটুকু) রবীন্দ্রপ্রতিভার অনুধ্যান ও অনুবর্তন করি। বহু বৎসর এইভাবে অতিবাহিত হয়েছে নিরুদ্‌বিগ্ন পল্লীজীবন। শ্রীঅরবিন্দ-গোষ্ঠীর বিশিষ্ট প্রভাবও কাজ করেছে নিভৃত ভাবনায় ও অনুভবে— যোগী বা সাধক হয়ে ওঠার সম্ভাবনা তবু কোনোদিন দেখা দেয় নি। রবিপ্রদক্ষিণপথেই আমার পর্যটন অনিবার্যভাবে নির্দেশ করে দিয়েছেন আমার ভাগ্যবিধাতা। সেজন্য তাঁকে সাধুবাদ দিই।

মনে পড়ে অস্পষ্টতাঅপবাদে নিন্দিত ছিল একদিন রবীন্দ্রসাহিত্য, বিশেষতঃ রবীন্দ্রকাব্য। আজ রবীন্দ্রনাথেব ভাবনা ও অনুভবের কথা ও সুর এ দেশে ও এই কালে জাতীয় মানসের অণু-পরমাণুতে এমন ভাবেই প্রবেশ করেছে লক্ষ্যে ও অলক্ষ্যে (যাঁরা রবীন্দ্রবিপক্ষ তাঁরাও কম রবীন্দ্রপ্রভাবিত নন)— পরম আশ্চর্যজনক মনে হয়, কী করে এ অভিযোগ সত্য হতে পারে? স্বচ্ছ গভীর দ্যুতিময় ও অবাধ-প্রসারিত রবীন্দ্রমানস ও তার অনাবিল প্রকাশ, যেমন এই মানব-জীবন-ঘেরা অসীম আকাশ ; হাতের মুঠোয় ধ'রে বাক্সবন্দী করা যায় না ব'লেই অস্পষ্ট বা অদ্ভুত বলতে হবে কি? ফলতঃ, জাতীয় মনের কালান্তর ও ভাবান্তর হয়ে গিয়েছে। আজ রবীন্দ্রকাব্য আমরা সহজেই বুঝি, বিচার-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যদি বা আবোল-তাবোল বকে যাই। অথবা, সহজ-সুন্দরকে বুঝতে হলেও যে আকর্ষণ বা যে অভিনিবেশ প্রয়োজন তার একান্ত অভাবে, স্থান-কাল-পাত্র-বিশেষে, বিশেষ চাতুরী -সহকারে বলতে বাধ্য হই 'না বুঝেও আমি বুঝেছি তোমারে কেমনে কিছু না জানি'! অনেক সময় একই উক্তিতে মুখর হয়ে ওঠে সত্য এবং সত্যের ভাণ। রবীন্দ্রকাব্য আমাদের কিছুমাত্র অসরল বা অস্পষ্ট মনে হয় নি, কেননা রবীন্দ্রযুগেই আমাদের জন্ম এবং মনোবুদ্ধির ক্রমিক বিকাশ। বিস্মৃত বাল্যকাল থেকে রবীন্দ্রনাথের সুরেই সুর বাঁধা হয়েছে মনোবীণার সবগুলি

তারে। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ না হতেই তাঁকে মনে হয়েছে নিকটতম আত্মীয়, সমবয়সী এবং বন্ধু। এতটুকু অত্যুক্তি নেই এই উচ্চারণে। সুবিশাল উত্তরাধিকার রেখে গেছেন আমাদের সকলকেই আপন মনে ক'রে— যার যতটুকু শক্তি ইচ্ছামত ভোগ করি ভাগ না ক'রেও, সুখী হই সার্থক হয়ে।

কথা হল এই যে, এক দিনে এক বৎসরে না হলেও, সহজেই জেনেছি, বুঝেছি, পেয়েছি রবীন্দ্রনাথকে।—

সহজ হবি, সহজ হবি
ওরে মন, সহজ হবি···
সহজে তুই দিবি যখন
সহজে তুই সকল লবি।
সকল 'কথা'র বাহিরেতে
ভুবন আছে হৃদয় পেতে,
নীরব ফুলের নয়ন-পানে
চেয়ে আছে প্রভাত-রবি।

এ ক্ষেত্রে 'কথা' বলতে, অবশ্য, প্রাচীন বা আধুনিক নৈয়ায়িক, তথা ব্যাখ্যা-ব্যবসায়ী অধ্যাপক অথবা সমালোচক, এঁদেরই 'কথা'।

পল্লীর শান্ত পরিবেশে এক নিস্তরঙ্গ জীবন আর নিভৃত দোতলার ঘর। মনে পড়ে, সকালে সন্ধ্যায়, দুপুর দিনে আর দ্বিপ্রহর রাত্রে, উচ্চকণ্ঠের কবিতাআবৃত্তিতে, এমন-কি স্বরচিত সুর-সংযোগে গান ক'রে পড়ায়, বাহবা দেবে বা নিন্দা করবে আশেপাশে এমন লোক প্রায় কেউই ছিল না। এই সুরেলা আবৃত্তিতে মানসী, কল্পনা, ক্ষণিকা, খেয়া, এমন রবীন্দ্রকাব্য অল্পই ছিল যার স্বভাবসংগীতময় ছন্দোবদ্ধ পদরাজি নিশিদিন অমৃত বর্ষণ করে নি ভাববিমূঢ় আবৃত্তি-কারের কানে এবং প্রাণে। সুরে ও কথায় রচিত ক্ষণিকা-খেয়ার অজস্র নিসর্গচিত্র পরিচিত জগৎকেই কী-যে অপরিচিত অলৌকিক

সৌন্দর্যে ও ভাবব্যঞ্জনায় প্রকট করে তুলেছে দিনে দিনে— বিশ্লেষণ ক'রে তার কিছুই বলা যাবে না। সে শুধু অলস কাব্যসম্ভোগ নয়, দিনে দিনে পূর্ণ হয়ে উঠেছে জীবন, উপচে পড়েছে ভাব ও অনুভূতির অমৃত মন প্রাণ প্লাবিত ক'রে। তার কতটুকু প্রতিদান আর পরিচয়-বা দেওয়া হয়েছে অসার্থক অসম্পূর্ণ সাহিত্যসাধনায়? অথবা বলা যায়, সার্থক বা অসার্থক আমি তা জানি নে, জানবার প্রয়োজনও নেই। দিতে পাবে কজন? নিতে যে পেরেছি সে সৌভাগ্যেরই তুলনা হয় না।

এখানে বলে নিই, গীতাঞ্জলি গীতালি প্রবাহিণীতে নাহয় সুরেরই সুরধুনীধারা, খেয়াব প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যে সুখে গান গেয়ে পড়েছি তানলয়হীন উচ্চকণ্ঠে তারও অংশী ছিল না কেউ এ কথা ষোলো-আনা সত্য নয়। তখন রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের শেষ সীমায় ট্রামের ঘড়্‌ঘড়ানি এসে পৌঁছয় নি মনে হয়, আমাদের নতুন-তৈরী বাড়ির উত্তর-পশ্চিমে ছিল নারিকেলের বাগান আর পুষ্করিণী, আশে-পাশে অন্য পাকা বাড়ি কখানাই বা ছিল— শহরে এসেও সারে নি আমার আশৈশবের দুরারোগ্য ব্যাধি। তেমনি দোতলার ঘরে থাকি, ছাদে বেড়াই, শিরীষ-সারির মাথায় মাথায় আর নারিকেল-বাগানের সচকিত পাতায় চেয়ে চেয়ে দেখি প্রভাতসন্ধ্যার অস্থির দ্যুতিবিলাস। রবীন্দ্রকাব্য পাঠ করি বা গান করি। পাড়ার কাপড় কাচে যে বেহারী ধোপা, বিনা ভূমিকায় হঠাৎ একদিন ব'লে বসল— এই গানে নাকি কী জানি কী তার মনে হয়, বড়োই ভালো লাগে। হায় রে, অনাদিদাদা অথবা শৈলজাবাবুর সার্টিফিকেট তো নয়, এ নিয়ে আমার লাভ কী! রজকনন্দনের সুরজ্ঞান আছে কে বা শুনেছে, যদিও সর্বসঙ্গীতের মূলাধার যে স্বর তার উদ্ভব না কি তারই ঘরে। সে যা হোক, কবি যে বলেছেন তাঁর লিপিকাতেও সুর দেওয়া যায় আবিষ্ট চিত্তের অবলীলা-ক্রমে, বর্তমান লেখকের তা সম্পূর্ণই বিশ্বাস

হয়। নিহিত সুরটি উচ্ছ্রিত উচ্ছ্বসিত ক'রে দিতে সক্ষম ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। অন্যেরও লোভ হয় প্রচুর। দুঃখের বিষয় সে সুর আরও পাঁচজনে নেবে না, গায়ে হয়তো ধুলো দেবে। জানি, আমার চেয়ে প্রাচীন এবং বিমুগ্ধ এক ভক্তকে কবি হেসে বলেছিলেন একদিন, 'শশী, এ সুর আর কাউকে শিখিয়ো না যেন।' কী যে সুর, টেপ রেকর্ড্ করালেও জানা যাবে না।—

আমার এ গান শোনাই যাঁরে
বেসুর শুনে হাসেন তিনি,
বুক ভরে সেই হাসির পুরস্কারে।
· সুর রয়েছে প্রাণের গভীর তলায়,
বেসুর কেবল পাগলের এই গলায়।

অপ্রত্যাশিত ঘটনাক্রমে শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার পরিচয়। তেমনি অহেতুক সৌভাগ্যে আচার্যশ্রেষ্ঠ নন্দলালের স্নেহ এবং সাহচর্য-লাভ। অপরিচিত পথে অলক্ষ্যে কে আকর্ষণ করে এনেছে জানি নে, বাস্তব ঘটনা দেখি এই— ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে বা ৩৮'এর সূচনায় বোলপুরে স্বগৃহে স্থান দিয়েছেন পিতৃপ্রতিম বন্ধু শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। সেই পরিবেশ এবং সদ্যসঞ্জাত সেই অতুলনীয় স্নেহের বিচিত্র আখ্যান হয়েছে আমার তৎকালীন বহু কবিতায়। আপন পর না হলেও, 'পর হৈল আপন' এ কথা বর্ণে বর্ণে সত্য হয়ে উঠেছে। এ কেবল কবিতার সত্য নয়, এ যে বাস্তব জীবনের ঘটনা—

তুমি মায়ের বেশে ভায়ের বেশে
এই নিখিলে দিলে দেখা,

যাঁদের প্রথম সাক্ষাৎ পাওয়া গেল জন্মের ছাব্বিশ-সাতাশ বৎসর পরে। কঙ্করস্তূপীকৃত খোয়াইডাঙায় আর শান্তিনিকেতনের ধূলিওড়া রাঙা রাজপথে ভাঙাপথে দাঁড়িয়ে মন বললে—

রবীন্দ্রের এ কবিব্রজের
অরুণ রজের
স্পর্শ লইলাম ললাটে আমার।

রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিবেশের সঙ্গে সেই নিবিড় পরিচয় আর রবীন্দ্র-প্রতিভার মুখ্যতম লীলাক্ষেত্রে নিত্য আনাগোনা, বহু বৎসর হল, আজও একেবারে ছিন্ন হয় নি।

প্রশ্ন হতে পারে— 'তীর্থের কথাই সাত কাহন করে বলছ, তীর্থের ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হল কৈ ?' দেখা হয়েছে বৈকি, দূর থেকে। বিজয়া-দশমীর দিনে হয়তো পা ছুঁয়ে প্রণাম করেও এসেছি— কথা হয় নি, হলেও মনে পড়ে না। মনে মনে আলাপ-পরিচয় হয় নি কি বাল্য-কাল থেকে ? সেই 'প্রত্যক্ষ' পরিচয়ের নিবিড়তা ও সত্যতা কম কী ? কুণো স্বভাবের মানুষের পক্ষে সেই হল আকাঙ্ক্ষার অতিরিক্ত, প্রয়োজনের শতগুণ বেশি। যার যেমন স্বভাব তার তেমনি তো লাভ। তাতেই তার পরম আনন্দ। কাজেই, দূর থেকে দেখেছি, নিকটে যাই নি। নূতন ক'রে এবং সাক্ষাৎভাবে কোনো প্রশ্নের কোনো উত্তরের প্রয়োজনই হয় নি। উদয়নে আহূত সভাস্থলে একবারই প্রশ্ন তুলেছিলাম বিভিন্ন আর্টের সম্পর্ক ও সংগতি নিয়ে। প্রশ্নটি এ যুগেরই, তার উত্তরও অতিশয় ডালপালাওআলা, হয়তো-বা গোলমেলে। সভান্তিক দু-পাঁচ মিনিটে ভালো করে বলাও যায় না, বোঝাও মুশকিল। মনে পড়ে শ্রীঅজিতচন্দ্র চক্রবর্তী আমার কবিতা বিচিত্রায় ছাপিয়েছিলেন এবং গুরুদেবের কাছে উপস্থিত করেছিলেন তাঁর স্বভাবসংগত আগ্রহে। কবি উৎসাহবাক্যই বলে-ছিলেন, এস্থলে তার পুনরুক্তি অনাবশ্যক। আরও কিছু পূর্বে শ্রীমান্ সুধাংশু পালিত (হায়, এই অনুজপ্রতিম বন্ধুও অকালে চলে গিয়েছেন) ছাত্রছাত্রীদের একটি সাহিত্যসভার আয়োজন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে সভাপতি ক'রে। সভাস্থলে আমার কবিতা-পাঠ সেই

জ্ঞাতব্যপঞ্জী

সংকলিত যে-কোনো তথ্য কিম্বা মন্তব্যের সূচনায় প্রথমেই গ্রন্থে ব্যবহৃত অঙ্কচিহ্ন, পরে গ্রন্থের পৃষ্ঠাঙ্ক দেওয়া হয়েছে ; এরই সাহায্যে কোন্ তথ্য বা মন্তব্য কোন্ বক্তব্য সম্পর্কে তা সহজেই জানা যাবে। কয়েকটি মন্তব্যের ক্ষেত্রে পৃষ্ঠাঙ্কের উল্লেখমাত্র আছে, গ্রন্থের ভিতরে যথাকালে যথোচিত স্থানে অঙ্ক বসানো হয় নি।

কবিতা

১॥৬॥ সমুদ্রে যেভাবে বরফের উদ্ভব, তেমনি নিরাকারে আকার-সৃষ্টি, এ উপমা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের।

২॥৭॥ সতেরো খণ্ডে প্রচারিত 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধমালার অষ্টম খণ্ডেব প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ ওঙ্কাবেব এই অপূর্ব ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

শা-জাহান

১॥১৫॥ বালক মাসিক পত্রের ১২৯২ পৌষ-সংখ্যায় প্রথম প্রকাশ। আশ্বিন-কার্তিক-সংখ্যায় 'রুদ্ধগৃহ' প্রবন্ধে অথবা অগ্রহায়ণ-সংখ্যায় 'পথপ্রান্তে' রচনায় রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক এই একই চিন্তাধারার বিবৃতি। 'বিচিত্র প্রবন্ধ' দ্রষ্টব্য।

১২৯২ সনে প্রকাশিত লেখায় ও ১৩২১-২২ বঙ্গাব্দে রচিত বলাকা কাব্যে এই আশ্চয ভাবের, কখনো বা ভাষার, সাদৃশ্য বা সাজাত্য প্রথম আমাদের চোখে পড়ে ১৩৫০ বঙ্গাব্দে সঞ্চয়িতার নূতন-সংস্করণ-সম্পাদনার সময়ে। 'উত্তর প্রত্যুত্তর'এব অংশবিশেস তাই উক্ত গ্রন্থের গ্রন্থপরিচয় অংশে (পৃ ৮০৯ ৮১০) সংকলন করা হয় , অধুনা-প্রচলিত সঞ্চয়িতায় অন্য দুটি প্রবন্ধেরও বক্তব্যের সামান্য আভাস দেওযা হযেছে। বর্তমানে বলাকার যে নূতন শতবর্ষপূর্তি সংস্করণ (১৯৬১) প্রচাবিত হল, সে ক্ষেত্রে সব ক'টি প্রবন্ধেরই প্রচুরতর অংশের সংকলন-উপলক্ষ্যে (পৃ ১৭১-১৭৩) আশা করি আমরা অণুমাত্র অত্যুক্তি করি নি যে— 'বলাকাব ভাবধারা-যে রবীন্দ্র-চিত্তের চিরপ্রবাহিণী ধারা মাত্র, প্রকাশের বিস্ময়কর অপূর্বতা সত্ত্বেও, কবির ধ্যানধাবণায় বা মননে একেবারে নূতন নয়, এই স্বল্পসংকলন হইতেই তাহা বুঝা যাইবে।'

কমলা

'কমলা' চরিত্রের বাস্তবতা, 'স্বামী' এই আইডিয়ার পদেই তাহার আত্ম-নিবেদন, ইহারই সত্যতা-বিচারে অদূর কালের একটি সত্যকার জীবন-চিত্রে দৃষ্টিক্ষেপের বিশেষ উপযোগিতা আছে। শ্রীমনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা -রচিত 'মনোরমার জীবন-চিত্র' হইতে সংকলন করা গেল—

চপলতাহীন বালিকা বধূটি অল্প সময়ের মধ্যে আমার উদ্দাম হৃদয়কে বশীভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। সে কোনো দিনও ভালবাসা দেখায় নাই, কিন্তু সে যে আমাকে সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্গ করিয়াছিল এবং আমাতে আপনাকে একেবারে ডুবাইয়া দিয়াছিল তাহা আমি অল্পদিনেই বুঝিলাম। আগে ভাবিতাম পূর্ব্বরাগ না হইলে বিবাহ সুখের হয় না, এখন বুঝিলাম হিন্দুবধূ বিবাহের আসনে বসিয়াই স্বামীকে আত্মসমর্পণ করে, পতিকে ভালবাসিতে সতীর পূর্ব্বরাগের প্রয়োজন হয় না, "পতিই সর্ব্বস্ব" এই জ্ঞানই তাঁহাকে পতিগতপ্রাণা করে। "রূপজ মোহ" এই "সতীত্বের" নিকট রাণীর কাছে চাক্‌রাণীর মতন গৌরবহীন।

—মনোরমার জীবন-চিত্র, প্রথম খণ্ড (আষাঢ় ১৩২১) পৃ ৫৭

ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, বিবাহকালে (বাংলা ১২৮৩) মনোরঞ্জনের বয়স ১৮, মনোরমার ১২ ছিল— মনোরমা, বিক্রমপুর কুকুটিয়ার 'দাতা কালীকুমার দত্তে'র কন্যা।— এই ভগবদ্‌ভক্ত দম্পতি কিছুকাল শান্তিনিকেতন আশ্রমের অতিথি-রূপে ছিলেন।

১॥২৮॥ 'চোখের বালি' উপন্যাসে।

২॥৩২॥ 'গোরা' উপন্যাসের পানুবাবু।

উত্তীয়

১॥৭৩॥ মূল রচনায়, সংকলিত শেষ ছত্র দুটি আছে দ্বিতীয় ছত্রের পরে।

জীবনের কবি

এই প্রবন্ধের উদ্ধৃতিসমূহে যেখানে যেখানে অতিপ্রকট অক্ষরপংক্তি ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলি যে মূলে ঐরূপ ছিল এমন নয়।

জ্ঞাতব্যপঞ্জী

জীবনের কবি

১॥৮৪॥ প্রাণের আশ্রয় ও আধার জড়প্রতীয়মান অথচ নিহিতচৈতন্য বহিঃপ্রকৃতি। প্রাণের সহজ স্বাভাবিক স্ফূর্তি ফুলে-পাতায়, বৃক্ষে-লতায়, প্রাণীমাত্রে, শিশু ও নারীতে— এদের প্রত্যেকেরই ধ্যানে-বিধৃত, অনুরাগরঞ্জিত, অন্তরের অন্তরঙ্গ অপূর্ব রূপ রবীন্দ্রসাহিত্যের সর্বত্র— কাব্যে কাহিনীতে শুধু নয়, প্রবন্ধে ভাষণে ও চিঠিপত্রে— উজ্জ্বল মধুর ভাবে ফুটে উঠেছে। ঊর্ধ্বলোকের চেতনায় উদ্ভাসিত রূপ, লাবণ্যের সীমা পরিসীমা নেই। প্রাণের প্রতি-ফলনে জড়প্রকৃতিও সর্বদাই প্রাণময় বোধ হয়েছে। প্রাণ ও প্রকৃতির মর্মদর্শী কবি -সমাজে রবীন্দ্রনাথের তুলনা অতিশয় বিরল। দৃষ্টান্তচয়নের লোভ সংবরণ করতে হল, কেননা সে ব্যাপারে শুরু করা যত সহজ শেষ করা তেমন নয়।

২॥৯১॥ শ্রীঅরবিন্দ-রচিত *The Vedantin's Prayer* কবিতার কয়েক ছত্র। বলা একেবারেই বাহুল্য, আমাদের 'স্বচ্ছন্দ' ভাষান্তরে কায়ার ছায়া মাত্র পাওয়া যাবে। কৌতূহলী পাঠক অনুসন্ধান-পূর্বক মূল কবিতার পুরোপুরি রসাস্বাদন করলে বিশেষ পরিতৃপ্ত হবেন।

৩॥৯৬॥ এই চরিত্রটি 'বিসর্জন' নাটকের প্রথম-প্রকাশ-কালে থাকলেও পরবর্তী সংস্করণসমূহে পরিত্যক্ত।

৪॥১০৪॥ একটিমাত্র মুখর চরিত্রে এবং উদ্ধৃত দশটি মাত্র ছত্রে একটি সম্পূর্ণ দৃশ্যের অবতারণা নাট্যরসসৃজনের দিক দিয়ে সার্থক এবং তুলনারহিত হয়েছে সন্দেহ নেই।

৫॥১০৫॥ এই তত্ত্বের (অথবা 'সত্যের' বলাই ভালো) প্রযোগ ও পরীক্ষা করে গেছেন গান্ধীজি নিজের এবং জাতির জীবনে।

৬॥১০৫॥ বিগ্রহের কী দোষ! যার যেমন ভাব তার তেমনি লাভ। এই একই কালিকার আরাধনায় রামপ্রসাদ তাকে চিন্ময়ী মাতৃরূপে ও কন্যারূপে পেয়েছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের ভগবদ্দর্শন বা সচ্চিদানন্দস্বরূপের উপলব্ধি এবং ব্রাহ্মীস্থিতিলাভ হয়েছিল— সৃজন-পালন-প্রলয়-কারিণী বরাভয়দায়িনী উলঙ্গিনী কালীমূর্তির অন্য তাৎপর্য, পরাৎপর অন্য রূপ ভক্তের অন্তর্দৃষ্টির অগোচর থাকে নি আর প্রাণ-মন-বুদ্ধিকেও উদ্ভাসিত করেছিল।

৭॥১০৭॥ 'এবার' ইত্যাদি পাঠ রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপির প্রমাণে মুদ্রিত, যদিও 'এবারে' ১৩৬৬ চৈত্র বা ১৯৬০ সাল পর্যন্তই ছাপা হয়েছে। বিভিন্ন রবীন্দ্র-রচনার বিচিত্র পাঠ-বিচার বর্তমান গ্রন্থকারের নেশা না হলেও পেশা, এ কথা স্বীকার করতেই হয়। যাঁরা বিসর্জনের শেষ দৃশ্যের এই শেষ অংশ বিচার ক'রে দেখতে চান তাঁদের বিবেচনার্থে এই বাহুল্য তথ্যটুকু এখানে দেওয়া যেতে পারে যে, বিসর্জনের মুদ্রণ বা পুনর্মুদ্রণ -সূত্রে যতবারই এই অংশের প্রুফ দেখতে হয়েছে, একটি পূর্বাগত মুদ্রণপ্রমাদের বোধ আমাদের বারে বারেই বিব্রত করেছে। অথচ 'এবারে দিয়েছে দেখা' স্থলে 'এবারে দিয়েছ দেখা' এই প্রত্যাশিত পাঠ কোথাও পাওয়া যায় নি। ১৯৬০ সালে বিসর্জনের পুনর্মুদ্রণ-কালে সুহৃৎ শ্রীপুলিনবিহারী সেন দেখিয়ে দিলেন রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখাতেই আছে 'দিয়েছে' —মন ষোলো-আনা প্রসন্ন না হলেও, মেনে নিতে হল। অভিনয়ভঙ্গী ও অর্থবিচারে শুধু নয়, 'এবারে' এবং 'দিয়েছে' পর পর দুটি পদেই একারান্ত উচ্চারণ এটাই যে সূক্ষ্মশ্রুতির অনভিমত, তাই অতিসূক্ষ্ম 'আপত্তি', এটা তখন বোঝা যায় নি। বর্তমান প্রবন্ধের রচনা-কালে পূর্বোক্ত পাণ্ডুলিপি পুনর্বার না দেখে থাকতে পারা গেল না— সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়-প্রকাশিত 'টালি' সংস্করণের বিসজনে সম্ভাবী নাট্যাভিনযের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট কাটাকুটি করেছেন পেন্সিলে এবং নাটকের শেষে পেন্সিলেব লেখায় যোগ করেছেন 'পুষ্প-অর্ঘ্য লইয়া রাজার প্রবেশ' থেকে অপর্ণার সর্বশেব উক্তি 'পিতা চলে এসো!' এই পর্যন্ত।[১]

[১] বিসর্জনের প্রথম প্রকাশ ১২৯৭ বঙ্গাব্দে আর সত্যপ্রসাদ-প্রচারিত কাব্যগ্রন্থাবলীতে (১৩০৩) তারই প্রথম সংস্কার বা সংস্করণ; উল্লিখিত বহুবিধ সম্পাদনা ও সংযোজনের আধারে "দ্বিতীয় সংস্করণ" প্রকাশিত হয় ১৩০৬ জ্যৈষ্ঠে। এ সম্পর্কে ১৩৬৬ চৈত্রের বিসর্জন গ্রন্থে গ্রন্থপরিচয় অংশ দ্রষ্টব্য। ১৩০৭ পৌষের বিশেষ অভিনয় সম্পর্কে তৃতীয়খণ্ড গীতবিতানের (শ্রাবণ ১৩৬৭) গ্রন্থপরিচয় (পৃ ৯৭৭) দ্রষ্টব্য।

জীবনের কবি

'এবারে দিয়েছে দেখা প্রত্যক্ষ প্রতিমা !' এই উক্তি আত্মগত হলেও সম্ভবতঃ প্রেক্ষাগৃহে সমাগত সামাজিকদের দিকেই ফিরে বলেছিলেন রঘুপতি (অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথ, ১৩০৭ পয়লা পৌষের অভিনয়-কালে) এটুকু অনুমান সহজেই করা যায়। সুতরাং ষোলো-আনা শ্রুতিগ্রাহ্য না হলেও— পাঠ ঠিকই আছে না মেনে নিয়ে উপায় কী! তবু পূর্বোক্ত কাব্যগ্রন্থাবলীর পাতা উল্‌টিয়ে আর-একবার দেখা ভালো। আশ্চর্য! ১৩০৬ সনের 'বিসর্জন' গ্রন্থে প্রথম মুদ্রণকালেই কি এই অংশে গোপনে একটি নিজস্ব 'অবদান' উপহার না দিয়ে থাকতে পারে নি মুদ্রাকর ? 'এবারে' তো নয়, কবি লিখেছিলেন 'এবার'— পেন্সিলের লেখা, ছোটো ছোটো অক্ষর, আর মুদ্রণ-প্রমাদের প্রত্যাশা করেছি এক পা এগিয়ে, তাই চোখে পড়ে নি। এখন বলা যায়— কবি একই কালে বিশেষ অর্থ আর শ্রুতিতর্পণ দু দিক সামলে চলেছেন (হিসাব ক'রে অবশ্য নয়) এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

পাঠক, একটি একারের উপর বর্তমান টীকা-টিপ্পনীব আকারপ্রকার দেখে বিস্মিত হবেন না। রবীন্দ্র-পাঠ-বিচারের দুরূহতা (পাণ্ডুলিপি এবং আধারগ্রন্থাদির দুর্লভতা তো আছেই)— তারই যৎকিঞ্চিৎ নিদর্শন-স্বরূপ এটুকু লিপিবদ্ধ হল। রবীন্দ্র-চর্চার ক্ষেত্র অসীম অপার (তার ভাবনা কল্পনা আইডিয়া এবং আদর্শের দিক দেখে বলছি না, তার বস্তুনিষ্ঠ সংকলন ও সম্পাদনার কথাই ধরা যাক্)— তা আরব্ধ হযে থাকতেও পারে, কিন্তু আজও বেশি দূর অগ্রসর হবার সুযোগসুবিধা পায় নি।

৮॥১১১॥ বিজ্ঞানের প্রসাদে পাবমাণবিক বিস্ফোরণ বা মহাজাগতিক অভিযান কবির জীবনকালে সম্ভব হয় নি সত্য— রক্তকরবীতে তার উল্লেখও থাকবার কথা নয়। অথচ রক্তকরবীর তৎপয-বিচারে আমাদের পক্ষে উল্লেখের অবিষয় ব'লে মনে হয় না।

৯॥ ১১৬॥ আমরা 'নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা'র আলোচনা করছি নে। সেটি চণ্ডালিকার পরবর্তী এবং চণ্ডালিকারই আদ্যন্ত-নৃত্যগীতে-গ্রথিত নূতন রূপ —মনোহারিতা ও বৈচিত্র্য সমধিক হলেও, নাটকীয়তা অধিক এমন নয়।

জীবনের কবি

আমাদের প্রবন্ধে 'দুটি দৃশ্য ও তিনটি[1] চরিত্র' যদিও বলা হয়েছে, আসলে একটি দৃশ্য বললেও অত্যুক্তি হয় না— মন্ত্রবলে সন্ন্যাসীকে আকর্ষণের সংকল্প -গ্রহণ ও আভিচারিক অনুষ্ঠান, উভয়ের মধ্যে উদ্যোগে আয়োজনে কিছুটা সময় গেছে এটি বোঝাবার জন্যই (তেমনি অভিনয়ের সুবিধার্থে) এই দৃশ্য-বিভাগ; নইলে ইতিমধ্যে নতুন ঘটনা কিছু যে ঘটেছে এমন নয়। নাট্যোচিত চরিত্রও আসলে দুটি, কেননা আনন্দের শেষ মঞ্চপ্রবেশেও তিনি চণ্ডালী বা চণ্ডালকন্যাকে স্পষ্টতঃ সম্বোধন ক'রে কিছুই বলেন না। আর, বর্তমান ক্ষেত্রে মা ও মেয়ে, তত্ত্বদৃষ্টিতে এরাও কি অভিন্ন নয়? নাটকের প্রয়োজনেই যেন এক হয়েছে দুই। চরিত্র এবং ঘটনা -সমাবেশে এ নাটকের পরিমিতি বা economy অতি অদ্ভুত— 'মালিনী' 'ডাকঘর' ও ও 'মুক্তধারা' থেকেও বহুগুণে বাহুল্যবর্জিত এবং সংহত।

১০ ‖ ১১৯ ‖ চণ্ডালিকা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩৪০ বঙ্গাব্দে; ত্রিশ বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথের পরমস্নেহভাজন সতীশচন্দ্র রায় আলোচ্য বৌদ্ধ কাহিনী অবলম্বনে 'চণ্ডালী' গাথাকাব্য রচনা করেন এবং রবীন্দ্র-সম্পাদিত বঙ্গ-দর্শনের ১৩১০ মাঘ -সংখ্যায় সেটি মুদ্রিত হয়। দুঃখের বিষয় অকালে-প্রস্থিত সতীশচন্দ্র আজ বিস্মৃত, তাঁর অপূর্ব কবিতাটিও অতি অল্প লোকের চোখে পড়বে। (রবীন্দ্রনাথের দৈনন্দিন সান্নিধ্যে থেকেও কতটা স্বতন্ত্র প্রতিভার স্ফুরণ সম্ভবপর সতীশচন্দ্রই তার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।) চণ্ডালকন্যা 'অম্বিকা' (রবীন্দ্রনাথের উদ্ভাবিত বা আবিষ্কৃত, ঠিক জানি না, 'প্রকৃতি' নামটি যার-পর-নেই তাৎপর্যপূর্ণ) তরুণ কবি -কৃত তারই রূপবর্ণন এ স্থলে অংশতঃ সংকলন করা হয়তো অনুচিত হবে না—

অম্বিকা চণ্ডালবালা কোথা হতে পেল এত রূপ—
মোহনিয়া এ চিকুর, এমন নয়ন রসকূপ?
এমন কপোলযুগ, লাবণ্যললিত ঠোঁট-দুটি,
এমন মোহনগ্রীবা— অনঙ্গের যেন ফুলমুঠি?

[1] মুদ্রণপ্রমাদে 'তিনটি' শব্দ ভ্রষ্ট হয়েছে

জীবনের কবি

অলাজে বিচরে বালা সঙ্গিসাথে বাহিরে কি ঘরে—
কিবা রঙ্গময় ছাঁদে পা-ছুটি মাটিতে তার পড়ে।
বাহুটি বেড়িয়া তার বলয় নাহিক একখানি—
অভূষণ এ রূপেরে বড়ো আমি ভয়ংকর মানি
একি এ বলয়বন্ধবিমুক্ত প্রমত্ত রূপোচ্ছ্বাস—
এ যেন চুম্বিতে চায় বায়ুবহ সকল আকাশ !

‘শিশু’

সূচনায় উৎকলিত ইংরেজি কয় ছত্রের কবি A E. বা George Russell এ উল্লেখ বাহুল্য নয় কি ?

১॥:২৬॥ হয়তো তেমনি বাহুল্য এ কথা বলা, যে, অনুপ্রাস-অনুরোধেই ‘কায়াময়ী’ শব্দের আমদানি নয়। টীকায়, প্রচ্ছন্ন আগুনে ফুঁ পেড়ে যদি নিহিতার্থ বোঝাতে হয়, তবে তো বলতেই হবে— হা ধিক, কেন এই প্রবন্ধ লেখা !

২॥১২৬॥ ‘কড়ি ও কোমল’ থেকে ‘কাঙালিনী’ কবিতা কেন যে সংকলিত হয় নি বলা যায় না। অদ্ভুত দরদের তুলিতে মাতৃহারা বালিকার রূপটি ফুটেছে, অন্যান্য ছেলেমেয়েদের এক সারিতেই তাকেও দেখতে ইচ্ছা হয়। ‘শিশু’ কাব্যের ‘পূজার সাজ’ কবিতাটি মোটের উপর হিতকথামূলক বলা চলে ; রূপকে অপরূপ ক’রে তোলার বিশেষ জাদু, রবীন্দ্রপ্রতিভার যা সহজসিদ্ধি, এ ক্ষেত্রে অনুপস্থিত।

৩॥১২৬॥ নদী, শীত, শীতের বিদায়, সূর্য ও ফুল (অনূদিত কবিতা), ফুলের ইতিহাস।

৪॥১২৭॥ এক নজরে ধরা পড়ে— আরও কিছু পুরাতন রচনা এসেছে নূতন বেশে, তন্মধ্যে ‘নদী’ ‘বিম্ববতী’ ‘নবীন অতিথি’ ‘পূজার সাজ’ ‘সুখদুঃখ’ ‘স্নেহস্মৃতি’ এগুলি অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের রচনা। ‘কাগজের নৌকা’ সম্পর্কে প্রবন্ধের ভিতরে পূর্বেই বিশেষ বক্তব্য বলা হয়েছে।

৫॥১৩০॥ তখন তাঁর জীবনের ৩০ বৎসরও পূর্ণ হয় নি ; রবীন্দ্রনাথ ৪১ বৎসর পার হয়েছেন।

'শিশু'

৬॥১৩০॥ কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ; মায়ের মৃত্যুকালে বয়স সম্ভবতঃ আট বৎসর ছিল। কবিতাগুলির রচনাকালে শমীন্দ্রনাথ কবির কাছে ছিলেন না।

৭॥১৩২॥ এগুলি ১৮৯৪ জুলাই-অগস্টের তিনখানি চিঠি থেকে সংকলন। দ্রষ্টব্য 'ছিন্নপত্রাবলী'।

৮॥১৩৫॥ 'যাত্রী' বা 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি'। ৭ অক্টোবর ১৯২৪। স্থূলাক্ষর আমাদের।

৯॥১৩৮॥ আরও পরবর্তী কালে ক্রমশ লেখা হয় বা প্রকাশলাভ করে— ভানু-সিংহের পত্রাবলী, সহজ পাঠ, চিত্র-বিচিত্র, খাপছাড়া, সে, ছড়ার ছবি, ছেলেবেলা, গল্পসল্প, ছড়া। ছেলেবেলা রবীন্দ্রনাথের বাল্যকৈশোরের স্মৃতিচিত্র, বালক-কিশোরদের উপযোগী করে লেখা। সহজ পাঠের দুটি ভাগ কেবল 'পাঠ্যপুস্তক' হলে, এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হ'ত না— কিন্তু অনেকগুলি কবিতা আছে যা সত্যই শিশুমনোহর। স্বপ্নে-দেখা চলন্ত কলিকাতার রোমাঞ্চকর চিত্র কিংবা—

নদীর ঘাটের কাছে নৌকো বাঁধা আছে···

বাবা কেন আপিসে যায়, যায় না নতুন দেশে

অবশ্যই 'শিশু' কাব্যে বেমানান হত না। 'চিত্র-বিচিত্র' মোটের উপর সংকলনগ্রন্থ হলেও 'হনু-চরিত' প্রভৃতি কয়েকটি কবিতা আছে যা নূতন এবং প্রাকৃতিক বর্ণনায় বা রোমাঞ্চকরতায় শিশুউপভোগ্য। যে কৌতুকী হাল্কা চালে ভানুসিংহ পত্র লিখেছিলেন বালিকা রানুকে, গদ্যে, তেমনি স্বচ্ছ সুন্দর সাবলীল ও সুস্মিত ভঙ্গীতে, বহুস্থলে অন্তগত বাল্যকৈশোরের বহু বর্ণচ্ছটায় বিচিত্র ক'রে 'ছড়ার ছবি'র প্রায় সব কবিতাই লেখা— কবিতা ব'লেই এগুলির আরও বেশি সার্থকতা। 'শিশু' অথবা 'শিশু ভোলানাথ' কাব্য, সুবিশাল রবীন্দ্রসাহিত্যের অন্তত এই পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে দেখলেই ভালো বোঝা যাবে। রাজর্ষি, শারদোৎসব, ডাকঘর, লিপিকা প্রভৃতি আরও কোনো কোনো রচনার কথাও সম্পূর্ণ ভুললে চলবে না।

১০॥১৩৮॥ Blessed be childhood, which brings down some thing of heaven into the midst of our rough earthliness. These

জ্ঞাতব্যপঞ্জী

'শিশু'

80,000 daily births, of which statistics tell us, represent as it were an effusion of innocence and freshness, struggling not only against the death of the race, but against human corruption, and the universal gangrene of sin. ··· ··· Suppress this life-giving dew, and human society would be scorched and devastated by selfish passion. ·· Blessed be childhood for the good that it does, and for the good which it brings about carelessly and unconsciously, by simply making us love it and letting itself be loved. 26. 1. 1868.

—Amiel's Journal

প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রপতি হার্বার্ট হুভারকে আশি বছরের জন্মদিনে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কর্মক্ষমতার প্রেরণা কোথা থেকে সব চেয়ে বেশি পেয়েছেন তিনি। উত্তরে তিনি যা বলেছিলেন তারও সারমর্ম—

বয়স যত বেড়েছে ততই বেশি করে আমি শ্রদ্ধা জানাতে শিখেছি শৈশবকে, ভালোবাসতে শিখেছি শিশুদের। পৃথিবীর সুন্দরতম জিনিষ শিশুরাই। ঈশ্বরের কাছ থেকে সদ্য এসেছে ওরা। একটু খেয়ালী ওরা, হয়তো একটু দুষ্টুও; কিন্তু পৃথিবীটা আনন্দে-উল্লাসে ভরিয়ে রেখেছে তো ওরাই। আমরা যারা বয়স্ক, আমাদের যত চিন্তা তো ওদের নিয়েই। ওরা আমাদের সম্পর্কে কী ভাবে তাই ভেবে আমরা অস্থির। ওদের প্রাণশক্তির বন্যায় আমরা বিপর্যস্ত। ওদের আশাকে সার্থক করতেই আমাদের প্রাণান্ত পরিশ্রম। দিনের শেষে ওদের ঘুম পাড়িয়ে তবে আমাদের স্বস্তি। দিনের শুরুতে ওদের হাসিভরা মুখ দেখে তবে আমাদের শান্তি। প্রতিদিন ওরা নতুন কিছু আবিষ্কার করছে, আমাদের ঈর্ষা হয় ওদের এই সৌভাগ্যে। ওদের জন্যেই তো আমাদের বেঁচে থাকবার আনন্দ ও সার্থকতা। ওরাই আমাদের কর্মশক্তি যোগায়, বয়স হলেও আমাদের মনকে জরার আক্রমণ থেকে রক্ষা করে।

—আনন্দবাজার পত্রিকা। ১১ বৈশাখ ১৩৬৭

'শিশু'

১১॥১৩৮॥ ভালো করিয়া দেখিতে গেলে শিশুর মতো পুরাতন আর কিছুই নাই। দেশ কাল শিক্ষা প্রথা অনুসারে বয়স্ক মানবের কত নূতন পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু শিশু শত সহস্র বৎসর পূর্বে যেমন ছিল আজও তেমনি আছে ; সেই অপরিবর্তনীয় পুরাতন বারম্বার মানবের ঘরে শিশুমূর্তি ধরিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে— অথচ সর্বপ্রথম দিন সে যেমন নবীন, যেমন সুকুমার, যেমন মূঢ়, যেমন মধুর ছিল আজও ঠিক তেমনি আছে। এই নবীন চিরত্বের কারণ এই যে, শিশু প্রকৃতির সৃজন ; কিন্তু বয়স্ক মানুষ বহুল পরিমাণে মানুষের নিজকৃত রচনা।

—রবীন্দ্রনাথ। ছেলে-ভুলানো ছড়া। লোকসাহিত্য

১২॥১৩৯॥ sensation

১৩॥১৪০॥ পঞ্চভূত। মন। জ্যৈষ্ঠ ১৩০০। স্থূলাক্ষর আমাদের।

১৪॥১৪১॥ বলা বাহুল্য এ হল রূপকের ভাষা আর আইডিয়াল টাইপেরই কথা। নইলে নারীনয়ন নিয়েই দেশে দেশান্তরে কত-না কাব্য লেখা হয়েছে, কটাক্ষবাণবিদ্ধ কোনো প্রেমিক কখনো স্বপ্নেও ভাবে নি তার প্রেয়সী বুঝিবা অন্ধ।

১৫॥১৪২॥ গীতিমাল্য। রচনার স্থানকাল : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ২৮ পৌষ ১৩১৯।

১৬॥১৪৩॥ পলাতকা। ঠাকুরদাদার ছুটি। ১৩২৫।

১৭॥১৪৩॥ ঠিক সেই উক্তিটি এখন খুঁজে পাব না। অতএব অন্য একটি উক্তি তুলে দিতে দোষ কি ?—

Women wish to be loved without a why or a wherefore ; not because they are pretty, or good, or well-bred, or graceful, or intelligent, but because they are themselves. 17. 3. 1868

রবীন্দ্রনাথও একবাক্যে সায় দিয়ে বলেন : In my love I pay my endless debt to thee for what thou art.

রবীন্দ্রনাথেরই ভাবান্তর—

'শিশু'

তুমি যে তুমিই ওগো, সেই তব ঋণ
আমি মোর প্রেম দিয়ে শুধি চিরদিন।

১৮॥১৪৫॥ পুনশ্চ। শিশুতীর্থ। শ্রাবণ ১৩৩৮।

কবির মৌলিক ইংরেজি রচনা *The Child*এর রূপান্তর। মূল রচনা কবি ১৯৩০ খৃস্টাব্দে জর্মনির মিউনিক শহরে থাকবার সময় লেখেন; বিশেষ প্রেরণা পেয়েছিলেন জর্মনিতে খৃস্টজীবনের অপূর্ব নাট্যরূপ-দর্শনে। 'শিশুতীর্থ' ১৩৩৮ ভাদ্রের বিচিত্রায় প্রকাশিত; বিচিত্রা মাসিক পত্রে শিশুতীর্থের শিরোনাম ছিল:

সনাতনম্ এনম্ আহুর্ উতাদ্যস্যাৎ পুনর্নবঃ।
ইনি সনাতন ইনিই অদ্য পুনর্নব।

—অথর্ববেদ

১৯॥১৪৬॥ লিপিকা। আগমনী। প্রকাশ: মহালয়া ১৩২৬।

যে-কোনো প্রসঙ্গ সুবিশাল রবীন্দ্র-সাহিত্যের অপ্রত্যাশিত দূরে দূরান্তরে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত দেখা যায়। প্রাণমনের দ্বন্দ্বটি লিপিকার 'প্রাণমন' রচনাতেও প্রকারান্তরে পরিস্ফুট। পঞ্চভূতের 'মন' পূর্বেই উল্লেখ করা গেছে। লিপিকার 'মুক্তি' কাহিনীতে দেখা যায়, বিচ্ছেদব্যথায় বিচ্ছিন্ন 'বিরহিণী'কে সকল মানুষের মেলায় নিয়ে এল, হাতে ধরে মুক্তিতে নিয়ে গেল ছোটো একটি ছেলে। পূর্ণ রবীন্দ্রপ্রতিভার রচনা নাই হল, 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'এ 'বালিকা'র ভূমিকাটিও কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়— সন্ন্যাসীকে সেই ফিরিয়ে আনল প্রলয়ের দিক থেকে সৃষ্টির অভিমুখে, অন্ধকার থেকে আলোকের দিকে, প্রাণ দিয়ে প্রাণে-প্রাণে বুঝিয়ে দিল সীমার মধ্যেই অসীমের আনন্দ রয়েছে— সীমাবিলুপ্ত কোনো শূন্যের মধ্যে নয়।

এ বিষয়ে 'জীবনের কবি' প্রবন্ধেও নানা দিক থেকে আলোচনা করা হয়েছে।

১॥১৪৭॥— উপহার

শ্রীমতী হে[১]——————————

১

হৃদয়ের বনে বনে সূর্যমুখী শত শত
ওই মুখপানে চেয়ে ফুটিয়া উঠেছে যত।
বেঁচে থাকে বেঁচে থাক্, শুকায় শুকায়ে যাক্,
ওই মুখপানে তারা চাহিয়া থাকিতে চায়।
বেলা অবসান হবে, মুদিয়া আসিবে যবে
ওই মুখ চেয়ে যেন নীরবে ঝরিয়া যায়।

২

জীবনসমুদ্রে তব জীবনতটিনী মোর
মিশায়েছি একেবারে আনন্দে হইয়ে ভোর।
সন্ধ্যার বাতাস লাগি ঊর্মি যত উঠে জাগি
অথবা তরঙ্গ উঠে ঝটিকায় আকুলিয়া,
জানে বা না জানে কেউ জীবনের প্রতি ঢেউ
মিশিবে— বিরাম পাবে— তোমার চরণে গিয়া।

৩

হয়তো জানো না, দেবি, অদৃশ্য বাঁধন দিয়া
নিয়মিত পথে এক ফিরাইছ মোর হিয়া।
গেছি দূরে, গেছি কাছে, সেই আকর্ষণ আছে,
পথভ্রষ্ট হই নাকো তাহারি অটল বলে—
নহিলে হৃদয় মম ছিন্নধূমকেতু-সম
দিশাহারা হইত সে অনন্ত আকাশতলে।

নেপথ্যবর্তিনী

৪

আজ সাগরের তীরে দাঁড়ায়ে তোমার কাছে,
পরপারে মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার দেশ আছে।
দিবস ফুরাবে যবে সে দেশে যাইতে হবে,
এ পারে ফেলিয়া যাব আমার তপন শশী—
ফুরাইবে গীতগান, অবসাদে ম্রিয়মাণ,
সুখশান্তি অবসান— কাঁদিব আঁধারে বসি।

৫

স্নেহের অরুণালোকে খুলিয়া হৃদয় প্রাণ
এ পারে দাঁড়াযে, দেবি, গাহিনু যে শেষ গান
তোমারি মনের ছায় সে গান আশ্রয় চায়—
একটি নয়নজল তাহারে করিয়ো দান।
আজিকে বিদায় তবে, আবার কি দেখা হবে-
পাইয়া স্নেহের আলো হৃদয় গাহিবে গান ?

১ এক প্রবন্ধে শ্রীসজনীকান্ত দাস মহাশয় বলেন— 'অলীক বাবু' নাটকে 'হেমাঙ্গিনী'র ভূমিকায় কাদম্বরীদেবী অভিনয় করেন এজন্যই 'হে' এরূপ ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথের কাছে উপস্থিত করায় তিনি অস্বীকার করেন নি ; অতএব 'হে', 'হেমাঙ্গিনী' নামেরই সূচক সন্দেহ নেই। অথচ অন্য সূত্রে আমরা অন্যরূপ জানি ; এ সম্পর্কে নিম্নসংকলিত পত্রাংশ দ্রষ্টব্য।—

আমি কবির কাছে 'শ্রীমতী হে—' কে জিজ্ঞাসা করে ধমক খেয়েছিলাম। 'হেকেটি' শোনা ইন্দিরাদেবীর কাছ থেকে। ... 'মালতী পুঁথি' বা ওই ধরণের পুঁথিতেও 'হেকেটি' শব্দটি আছে। সজনীবাবুর লেখা আমি দেখি নি। ... deflect করবার জন্য 'হেমাঙ্গিনী' সৃষ্টি বলেই মনে হয়।

বোলপুর ১১।৭।১৯৬০

—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের পত্র

নেপথ্যবর্তিনী

২॥১৪৮॥ এ প্রসঙ্গে ছিন্নপত্র বা ছিন্নপত্রাবলীর ২ আষাঢ় ১২৯৯ তারিখের চিঠিখানি বিশেষভাবে প্রণিধানের যোগ্য। বর্তমান গ্রন্থের ২০৬-২০৭ পৃষ্ঠায় অনেকাংশ উৎকলিত।

৩॥১৫০॥ এ কথাও বলা হয় ইনি অতিপ্রাচীন দেবীগণের অন্যতমা, নূতন ত্রিভুবন-পতি জিহোবার রাজত্বকালেও এঁর প্রভা ও প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। বিচিত্র কাহিনীতে এঁকে চন্দ্রলোকের, মর্তের আর পাতালের দেবী -রূপেও বর্ণনা ক'রে অবশেষে বলা হয়েছে ইনি ত্রিমুখিনী, ত্রিমূর্তি।

৪॥১৫৭॥ সন্ধ্যাসঙ্গীত (১২৮৮-৮৯ বঙ্গাব্দ, কবির বয়স ২১-২২) সেকালে কত দূর আদৃত হয়েছিল বুঝতে হলে স্মরণ করা দরকার (রবীন্দ্রনাথের ভাষায়)— 'এই সন্ধ্যাসঙ্গীতের দ্বারাই আমি একজন বন্ধু পাইয়াছিলাম যাঁহার উৎসাহ অনুকূল আলোকের মতো আমার কাব্যরচনার বিকাশ-চেষ্টায় প্রাণসঞ্চার করিয়া দিয়াছিল।' ইনি প্রিয়নাথ সেন; রবীন্দ্রনাথ এঁকে দেশ বিদেশের সাহিত্য সম্পর্কে 'সাত সমুদ্রের নাবিক' বলেছেন। 'তৎপূর্বে ভগ্নহৃদয় পড়িয়া তিনি আমার আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন।' এই প্রসঙ্গে এটিও উল্লেখযোগ্য, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র সন্ধ্যাসঙ্গীত-পাঠে এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, রমেশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহসভায় সম্মানের পুষ্পমাল্য নিজের কণ্ঠে না নিয়ে তাড়াতাড়ি সেটি রবীন্দ্রনাথের গলায় পরিয়ে দিয়েছিলেন এবং সন্ধ্যাসঙ্গীতের সম্পর্কে রমেশচন্দ্রের নিকট বহু প্রশংসা করেছিলেন।

৫॥১৬৫॥ কাদম্বরী [কাদম্বিনী] দেবী। জন্ম ২১ আষাঢ় ১২৬৬, ৪ জুলাই ১৮৫৯, ১৬।৫০।০। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহিত বিবাহ ২৩ আষাঢ় ১২৭৫, ৫ জুলাই ১৮৬৮। মৃত্যু ৮ বৈশাখ ১২৯১, ১৯ এপ্রিল ১৮৮৪। পিতা শ্যামলাল গঙ্গোপাধ্যায়, নিবাস কলিকাতা।

৬॥১৬৬॥ 'আবহাওয়া', শনিবারের চিঠি, আশ্বিন ১৩৪৮।

৭॥১৬৬॥ 'ভারতীর ভিটা', বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৫১। 'ভারতী' বন্ধ হওয়ারই উপক্রম হয়েছিল, এমন সময়ে স্বর্ণকুমারীদেবী তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

নেপথ্যবর্তিনী

৮॥১৬৯॥ 'সরোজিনী-প্রয়াণ', ভারতী, শ্রাবণ-অগ্রহায়ণ, ১২৯১। এই রচনায় যে পরিমাণ প্রগল্ভতা বা পরিহাসপ্রবণতা প্রকাশ পেয়েছে তাতে 'রবীন্দ্র-জীবনী'কার প্রভাতবাবুও বিভ্রান্ত হয়েছেন, অথচ মূল প্রবন্ধটি মনোযোগ দিয়ে পড়লে অথবা লেখা ছত্রের ফাঁকে ফাঁকে অলিখিত মর্ম অনুধাবন করলে কোনো সন্দেহই থাকে না, যে, এই হাস্যপরিহাস, এই প্রগল্ভতা, মাত্রাতিরিক্ত এই চাপল্য একটা আবরণ মাত্র— কোনো কারণে হৃদয় জুড়ে আছে একটা হাহাকার। সে কারণ আমাদেব অজ্ঞাত নয়।

৯॥১৬৯॥ 'পুষ্পাঞ্জলি', ভারতী, বৈশাখ ১২৯২। দ্রষ্টব্য গ্রন্থপরিচয় · সপ্তদশখণ্ড রবীন্দ্র-রচনাবলী বা বিশেষসংস্করণ জীবনস্মৃতি (১৩৬৬)

১০॥১৬৯॥ 'ঘাটের কথা', ভারতী, কার্তিক ১২৯১। বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছোটো গল্প, অতি সার্থক রচনা— রবীন্দ্রনাথের মাত্র কুড়িটি গল্প বেছে নিতে হলেও, বর্তমান লেখকের অভিমতে, এটি বাদ দেওয়া চলে না। এই গল্পে নায়িকাব জীবনের যে পবমবেদনাপ্লুত ঘটনা বিবৃত করা হয়েছে অপরূপ কবিত্বের এবং দরদেব ভাষায়, তাতেই রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন ব্যথিত হৃদয়েব সম্যক্ ব্যঞ্জনা।

১১॥১৬৯॥ 'রাজপথের কথা', নবজীবন, অগ্রহায়ণ ১২৯১। একই ব্যথাতুর হৃদয়ের ভিন্নতর প্রকাশ, কতকটা 'লিপিকা'ব সগোত্র বলা চলে— যদিও অবিকল সেরূপ সুমিতি বা সংহতি আশা করা চলে না।

১২॥১৬৯॥ 'রুদ্ধগৃহ', বালক, আশ্বিন-কার্তিক ১২৯২।

১৩॥১৬৯॥ 'পথপ্রান্তে', বালক, অগ্রহায়ণ ১২৯২।

১৪॥১৬৯॥ 'উত্তর প্রত্যুত্তর (রুদ্ধগৃহ সম্বন্ধে)', বালক, পৌষ ১২৯২। 'শ্রী অঃ'র পত্র-সংকলনের পর, সোলাপুর থেকে ২৬ আশ্বিন [১২৯২] তাবিখে লেখা রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ চিঠি। দ্রষ্টব্য বর্তমান গ্রন্থের পঞ্চদশ পৃষ্ঠায় আংশিক সংকলন, এবং জ্ঞাতব্যপঞ্জীর পৃ ৩৭৭।

১৫॥১৬৯॥ আংশিক সংকলন—

তোরা বসে গাঁথিস মালা তারা গলায় পরে।
কখন যে শুকায়ে যায়, ফেলে দেয় রে অনাদরে।…

নেপথ্যবর্তিনী

প্রাণের ব্যথা প্রাণে রেখে,
প্রাণের আগুন প্রাণে ঢেকে
পরান ভেঙে মধু দিবি অশ্রু-ছাঁকা হাসি হেসে,
বুক ফেটে কথা না কয়ে শুকায়ে পড়িবি শেষে।

—ভারতী, শ্রাবণ ১২৯১। অখণ্ড গীতবিতান

১৬॥১৬৯॥ 'পুরাতন', ভারতী, চৈত্র ১২৯১।

১৭॥১৬৯॥ 'নূতন', ভারতী, বৈশাখ ১২৯২।

১৮॥১৬৯॥ 'কোথায়', ভারতী, পৌষ ১২৯১।

১৯॥১৬৯॥ দ্রষ্টব্য : বর্তমানে প্রচলিত 'চিত্রা' কাব্য, অপিচ কাব্যগ্রন্থাবলী (১৩০৩) বা চতুর্থখণ্ড রবীন্দ্ররচনাবলী।

২০॥১৬৯॥ 'দুঃসময়' এবং 'মৃত্যুর পরে' কবিতা দুটি যেন কাদম্বরীদেবীর মৃত্যুর অল্পকাল পরেই লেখা হয়, অথচ অপ্রকাশিত থাকে— এতদিন পরে (১৩০১ বৈশাখে, পূর্বোক্ত ঘটনার দশ বৎসর পরে) কিছু কিছু সংস্কার ক'রে ছাপা হল এরূপ অনুমান করা খুব অসংগত হয় কি? 'দুঃসময়' ১৩০৩ কাব্য-গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত 'চিত্রা' কাব্যে, তেমনি অধুনা-প্রচলিত 'চিত্রা'য় সংকলিত। 'মৃত্যুর পরে' পূর্বাপর ঐ কাব্যে পাওয়া যায়।

২১॥১৬৯॥ রবীন্দ্রনাথ প্রায় প্রত্যেক আত্মীয় বন্ধু অথবা গুরুজনের নামে এক, কখনো একাধিক, গ্রন্থ উৎসর্গ করেছেন। নতুনবৌঠানের দেহত্যাগের পূর্বে, বিশেষতঃ পরে, তাঁর উদ্দেশেও বহু কাব্য নাটক উৎসর্গীকৃত— বিশেষত্ব এই যে, এ-সব ক্ষেত্রে স্পষ্ট নামোল্লেখ নেই। আমাদের বিশ্বাস বা অনুমান-অনুযায়ী এরূপ গ্রন্থের একটি তালিকা এখানে দেওয়া গেল—

।১। ভগ্নহৃদয় ১২৮৮

।২। সন্ধ্যাসঙ্গীত ১২৮৮-৮৯

।৩। ছবি ও গান ১২৯০ ফাল্গুন

।৪। প্রকৃতির প্রতিশোধ ১২৯১

।৫। শৈশবসঙ্গীত ১২৯১

।৬। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ১২৯১

জ্ঞাতব্যপঞ্জী

নেপথ্যবর্তিনী

। ৭ । মানসী ১২৯৭ পৌষ

উল্লিখিত তালিকার সংখ্যানুক্রমে বিশেষ জ্ঞাতব্য—

১। দ্রষ্টব্য বর্তমান প্রবন্ধের সর্বপ্রথম টীকা।

২। কাব্যশেষের 'উপহার' কবিতা দ্রষ্টব্য। বর্তমান প্রবন্ধে আলোচিত।

৩। 'উৎসর্গ··· যাঁহার নয়ন-কিরণে প্রতিদিন প্রভাতেই এই ফুলগুলি একটি একটি করিয়া ফুটিয়া উঠিত'···

৪। 'তোমাকে দিলাম'

৫। 'এ কবিতাগুলি তোমাকে দিলাম। বহুকাল হইল তোমার কাছে বসিয়াই লিখিতাম, তোমাকেই শুনাইতাম। তাই, মনে হইতেছে, তুমি যেখানেই থাক না কেন, এ লেখাগুলি তোমার চোখে পড়িবেই।'

৬। 'ভানুসিংহের কবিতাগুলি ছাপাইতে তুমি আমাকে অনেকবার অনুরোধ করিয়াছিলে। তখন সে অনুরোধ পালন করি নাই। আজ ছাপাইয়াছি, আজ তুমি আর দেখিতে পাইলে না!'

৭। 'উপহার' কবিতার অংশ—

বাহিরে পাঠায় বিশ্ব কত গন্ধ গান দৃশ্য
সঙ্গীহারা সৌন্দর্যের বেশে,
বিরহী সে ঘুরে ঘুরে ব্যথাভরা কত সুরে
কাঁদে হৃদয়ের দ্বারে এসে।···
সেই মোহমন্ত্রগানে কবির গভীর প্রাণে
জেগে ওঠে বিরহী ভাবনা···
সেই আনন্দমুহূর্তগুলি তব করে দিনু তুলি
সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণের প্রকাশ।

—জোড়াসাঁকো। ৩০ বৈশাখ ১২৯৭

১২৯১ বৈশাখে কাদম্বরীদেবীর মৃত্যু, ১২৯২ বৈশাখে 'পুষ্পাঞ্জলি'-প্রকাশ, আর, ১২৯৭ বৈশাখেই কবি তাঁর বিশিষ্ট কাব্যগ্রন্থ 'মানসী' উদ্দেশে নতুনবৌঠানকেই উৎসর্গ করবেন যে, গ্রন্থপ্রকাশে বিলম্ব থাকলেও (কার্যতঃ

আট মাস পরে প্রকাশিত হয়) —কোনো বিরুদ্ধতথ্য না পাওয়া পর্যন্ত, এ আমাদের অস্বাভাবিক মনে হয় না। আরও কয় বৎসর পরে (১৩০১ বৈ শা খে) 'মৃত্যুর পরে' কবিতা যে তাঁরই বিয়োগব্যথার স্মরণে, এ তো প্রায় সকলেই অনুমান করেন।

২২॥১৮২॥ রবীন্দ্রনাথ ১২৯১ বৈশাখে ২৩ বছর পার হয়ে ২৪ বছর বয়সে পা দিলেন। 'চব্বিশ বছর বয়সের সময়' নতুনবৌঠান ইহলোক ত্যাগ করেন, 'জীবনস্মৃতি'তে এ প্রকার উক্তি মোটের উপরে ঠিক বলা যায়। অথচ 'লিপিকা'য় যখন লেখেন রবীন্দ্রনাথ 'সতেরো বছরের জানা' বা 'পঁচিশ বছর বয়সের শোক' (কাদম্বরীদেবীরই পঁচিশ পূর্ণ হতে চলেছিল) তখন অঙ্কের হিসাব ঠিক-মত মেলে না। কবি ভুল করুন বা সজ্ঞানে এরূপ লিখে থাকুন, সুধীজন সহজেই বুঝবেন— তাতে ক'রে উল্লিখিত রচনাবলীর অমূলকতা প্রমাণিত হয় না।

২৩॥১৮৬॥ অল্প একটু 'সাহস' করেছিলেন ১৩২৬ আশ্বিনের ভারতীতে 'প্রশ্ন' কথিকার প্রকাশ-কালে। প্রচলিত লিপিকা গ্রন্থের গ্রন্থপরিচয় অংশ দেখা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে আবৃত্তির মনোমত গতি-প্রকৃতির বশে কোনো কোনো বাক্যাংশকে ছত্র ভেঙে সাজানো হয়েছে। প্রথম প্রকাশকালে লিপিকার প্রথম অংশের বহু কথিকায় বাক্যের বিভিন্ন 'দল'গুলির মধ্যে বেশি বেশি ফাঁক রেখে ধীমান পাঠককে ইঙ্গিতে রচয়িতার অভিরুচি জানানো হয়েছিল।

২৪॥১৮৭॥ শেষ সপ্তকের অন্তর্গত দশটি গদ্য কবিতার ছন্দোবদ্ধ পূর্বতন রূপ উক্ত গ্রন্থের 'শতবর্ষপূর্তি' (১৩৬৭) সংস্করণের পরিশিষ্টে সংযোজিত; বিশ্বভারতী-কর্তৃক প্রকাশিত অষ্টাদশখণ্ড রবীন্দ্ররচনাবলীর 'শেষ সপ্তক -সংযোজনে'ও পাওয়া যাবে। অধুনা-সংযোজিত এই কবিতাগুলি কবি স্বচ্ছন্দচিত্তে বর্জন ক'রে থাকলেও, সমকালীন দুটি কবিতার ছন্দোবদ্ধ রূপকেও তিনি আদর ক'রে প্রান্তিকে স্থান দিয়েছেন— শেষ সপ্তকের তেইশ ও চৌত্রিশ -সংখ্যক কবিতার সঙ্গে প্রান্তিকের পঞ্চদশ ও ষোড়শ তুলনীয়— এ ক্ষেত্রে একই কবিতার আদিরূপে আর রূপান্তরে তুল্য রসধ্বনি জেগেছে সে বিষয়ে

নেপথ্যবর্তিনী

কবি এবং কাব্যরসিক একমত ব'লেই মনে হয়।

২৫॥১৮৮॥ বাংলা ১৩৪৭ আষাঢ়ে প্রকাশিত 'সানাই' কাব্যেও তার সুপ্রচুর সাক্ষ্য রয়েছে। দ্বিতীয়খণ্ড গীতবিতানে (মাঘ ১৩৪৮) কবির শেষ দিকের যে গানগুলি রয়েছে, কবিতাআবৃত্তির ছন্দ-অনুরোধে তারই নানারূপ পরিমার্জনা ক'রে[১] কাব্যে সংকলন করা হয়েছে— অধিকাংশই যে মূলতঃ এবং মুখ্যতঃ 'গান' এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ১৩৪৫ সনে নৃত্যনাট্য 'মায়ার খেলা'র জন্য রচিত বহু নূতন গান, ১৩৪৬ সনে ডাকঘরের উদ্দেশে রচিত কতকগুলি গান, তা ছাড়া—

'একদিন যারা মেরেছিল তাঁরে গিয়ে' ২৫.১২.১৯৩৯
'আলোকের পথে প্রভু' ২.১১.১৯৪০
'বারে বারে ফিরে ফিরে তোমার পানে' ভাদ্র ১৩৪৬
'যবে রিমিকি ঝিমিকি ঝরে' ভাদ্র ১৩৪৬
'আজি কোন্ সুরে বাঁধিব' চৈত্র ১৩৪৬
'প্রেম এসেছিল নিঃশব্দ চরণে' ২৮.১২.১৩৪৬
'নির্জন রাতে নিঃশব্দ চরণপাতে' চৈত্র ১৩৪৬
'এসো এসো ওগো শ্যামছায়াঘন দিন' ১৬. ৫. ১৩৪৭
'শ্রাবণের বারিধারা ঝরিছে বিরামহারা' ২০ ৫.১৩৪৭
'যারা বিহানবেলায় গান এনেছিল' ৩.১১.১৯৪০
'পাখি, তোর সুর ভুলিস নে' ডিসেম্বর ১৯৪০
'আমার হারিয়ে যাওয়া দিন' ডিসেম্বর ১৯৪০
'ওই মহামানব আসে' ১ বৈশাখ ১৩৪৮
'হে নূতন' ২৩ বৈশাখ ১৩৪৮

সুরে কথায় ছন্দে এবং আনন্দবেদনার বিচিত্র আবেদনে রসিকের কাছে রবীন্দ্র-সংগীতপ্রতিভার অম্লান অক্লান্ত প্রাণ ও চেতনার নিত্যনূতন পরিচয়

---

[১] ব্যতিক্রমও আছে। যেমন, 'কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা' গানে এবং কবিতায় অভিন্নরূপ বললেই হয়।

এনে দিচ্ছে। নিখুঁত কবিতার ছন্দ, শিথিল 'ভাঙা' ছন্দ, আর গদ্য, যে-কোনো আধারেই অতি সহজে উচ্ছলিত হয়ে উঠেছে অপরূপ কবিচিত্ত আর অপূর্ব সুরের সুধা।

২৬॥১৮৯॥ গীতবিতান দ্রষ্টব্য : সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে ইত্যাদি। 'তুলনাহীনা' যে নিখিলরূপের ঘনীভূত প্রতিমাই নয়, এ কথা নিশ্চিত ক'রে কেউ বলতে পারবে না। কেননা রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলেন—

'আজ চলেচি রেলগাড়িতে চড়ে মাদ্রাজের দিকে।··· জানলার বাইরে আমার দুই চক্ষের অভিসার আর থামে না।··· মন বলচে দেখে নিলুম।··· যারা এতকাল দেখেচে এবং চিরকাল দেখবে তাদেরই দেখাকে সংগ্রহ করে নিয়ে গেলুম— সেই সঙ্গে একটা কবিতাও লেখা গেল :

সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে
দেখেচি পথে যেতে তুলনাহীনারে।'

ইত্যাদি। ২ মার্চ ১৯৩০

—রবীন্দ্রনাথ। বিচিত্রা, চৈত্র ১৩৩৬, পৃ ৪৫৬-৫৭

পৃষ্ঠা ১৭৫ ॥ 'নতুনবৌঠানের একখানি প্রতিকৃতি ছিল', তারই উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ লেখেন : তুমি কি কেবল ছবি শুধু পটে লিখা?

এ তথ্য যেমন শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের লেখায় জানা যায়, তেমনি রবীন্দ্রনাথের পরমাত্মীয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কৃপালানির মুখেও শোনা। আমাদের মনে লেশমাত্র সংশয় ছিল না, অন্যেও যাতে নিঃসংশয় হতে পারেন এজন্য সম্প্রতি তাঁকে চিঠি লিখে এই উত্তর পাওয়া গেছে—

I had once asked Gurudev directly as to whether the poem "Chhabi" in *Balaka* was inspired by Mrinalini Devi's portrait. He replied, "No. The poem was addressed to Notun Bouthan's photograph."···

8th June 1961 K. R. Kripalani

পৃষ্ঠা ১৭৬ ॥ 'বলাকা' কবিতা : পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ।

কবি রবীন্দ্রনাথের অভিনব গতিবাদ— অভিনব শুধু এই অর্থে যে, যা চির-

দিনই তাঁর অন্তরঙ্গ প্রতীতির বিষয় এখানে তারই নূতনতম, প্রবলতম, আশ্চর্যতম স্ফুরণ বা অভিব্যক্তি— জগৎপ্রকৃতির শাশ্বত গতিধর্মের বন্দনা, বলাকা কবিতাতেই মন্ত্রবৎ অব্যর্থ ভাষা ও ছন্দ লাভ করেছে। আশ্চর্যের বিষয় আরও এই যে, এই একই ভাব, একই প্রেরণা বিদেশী অন্য এক কবির লেখনীতে প্রায় একই ভাষার প্রাণপূর্ণ প্রবাহে তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে প্রবাহিত হয়ে গেছে। তারই অংশবিশেষের সংকলন এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।[১]—

The rocks flow and the mountain shapes flow,
and the forests swim over the lands like cloud-shadows.
The lines of the seeming-everlasting sea are changed,
and its waves beat on unmapped phantom shores :
'Not here, not here !'
All creatures fade from the embraces of their names.
[And you and I, slow, slowly disentangling,]
the delicate hairbells quivering in the light,
the gorse, the heather, and the fox-gloves tall,
the meadows, and the river, rolling, fade :

১ *The Songs of the Birds, Who Hears*
এই কবিতাটি Edward Carpenter-এর Towards Democracy কাব্যের চতুর্থ ভাগে ১৯০২ খৃস্টাব্দে (১৩০৮-১৩০৯ বঙ্গাব্দে) প্রথম মুদ্রিত হয়। রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন পড়েছিলেন কিনা নিঃসংশয়ে বলা যায় না, আর পড়ে থাকলেও এক যুগের বেশি সময়ে তাঁর সদাসচল মানসে কোন্ বিস্মৃতির তলে তলিয়ে গিয়েছিল কে জানে। 'বর্ষশেষ' কবিতা -রচনাকালে 'Ode to the West Wind' মনে রেখেছিলেন ভাবতে যতটা কল্পনাপরায়ণ হতে হয়, এ ক্ষেত্রে অনুরূপ মন্তব্য করতে গেলে তার থেকেও অনেক বেশি কল্পনা বা কষ্টকল্পনার শক্তি থাকা অবশ্যই দরকার।

fade from their likenesses : fade crying 'Follow !
Follow, for ever follow !'

Who hears, who sees ?
Who hears the word of Nature ?
The word of her eternal breathing, whispered wherever
one shall listen,
the word of the birds in the high trees calling,
of the wind running over the grass,
the word of the glad prisoners, the tender footless
creatures, the plants of the earth,
rising too, bright-eyed, out of their momentary masks ?
'Not here ! not here !'

But over all the world, shadowing, shadowing :
the dream ! the vast and ever present miracle of all time !
The long-forgotten never-forgotten goal !
Over your own heart, out of its secretest depths :
in crystalline beauty !···
Thousand-formed, One,
the ever-present only present reality, source of all illusion,
the Self, the discloser, the transfiguration of each creature,
and goal of its agelong pilgrimage !

সমুদ্রের এ-পারে ও-পারে ভিন্ন সময়ে আর ভিন্ন পরিবেশে একই ভাব, একই প্রেরণা যে বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথ আর ইংরাজ কবি এডোয়ার্ড্ কার্পেণ্টারকে আকুল উদ্বুদ্ধ করেছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। (কার্পেণ্টারের

কবিতার শেষ স্তবকে ঔপনিষদিক প্রভাব অতিশয় স্পষ্ট সে কথাও বলাই বাহুল্য।) বিচার্য বিষয় এই যে, তত্ত্বউপলব্ধিতে আর দার্শনিক চিন্তার সুডৌল সম্পূর্ণতায় কবি কার্পেণ্টারের শ্রেষ্ঠতা দেখা গেলেও, গদ্যে, এমন-কি বৃত্তগন্ধি গদ্যেও আমাদের মন প্রাণ চেতনাকে তেমন অনায়াস ঊর্ধ্বগতিতে দূরতম লক্ষ্যের দিকে উধাও করে নিয়ে যেতে পেরেছে কি, যেমনটি হয়তো হতে পারত রসাবিষ্ট প্রাণস্পন্দিত ধ্বনিময় সংগীতময় ছন্দের প্রসাদে? যেমনটি হয়েছে দেখতে পাচ্ছি রবীন্দ্রনাথেরই 'বলাকা' কবিতায়। এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথের ভাবনা-বেদনা-অনুভূতির সকল স্তর, সকল তাৎপর্য, আদি এবং অন্ত, ছন্দোবদ্ধ হয়েছে তা হয়তো বলা যায় না— কার্পেণ্টার বরং তাঁর ভাবনা ও উপলব্ধির সবটাই আমাদের গোচর করতে পেরেছেন, যতটা মানুষের মুখের ভাষায় পারা যায়— কিন্তু, সকল কথা নিঃশেষে বলতে হবে তারই বা এমন কী প্রয়োজন? তবে কেন ব্যঙ্গ্য বা ধ্বনি -ময় হবে কবিতা? ভাব যেখানে পৌঁছুতে পারে না, ভাষাও পারে না, সেখানে হয়তো পৌঁছিয়ে দেয় সুর। সংগীতেই সকল রূপকলা ও কবিতার উৎপত্তি এবং অবসান। কার্পেণ্টার এবং রবীন্দ্রনাথের স্বতন্ত্র (স্বরূপে এক) কবিতা দুটিব তুলনা-দ্বারা এ কথা স্পষ্টই বোঝা যাবে।

পুনরুক্তি ক'বে বলি: তত্ত্বউপলব্ধির সুডৌল সম্পূর্ণতা দেখা যায় কার্পেণ্টারের কবিতায় আর 'বলাকা'য় আছে রূপকল্প শব্দসঙ্গীত রসধ্বনি ও ছন্দের বিস্ময়কর অনন্যতা— কবিতা হিসাবেই অতুলনীয় সিদ্ধি এবং সার্থকতা।

ছিন্নপত্রাবলী

ছিন্নপত্রাবলীর ছিন্ন বাক্যাংশ ব্যতীত অন্য সমুদয় উদ্ধৃতির সূচনায় ০-চিহ্ন এবং শেষে ক্ষুদ্রাক্ষরে গ্রন্থে-মুদ্রিত পত্রসংখ্যা দেওয়া হয়েছে।

কতকগুলি উদ্ধৃতি ছিন্নপত্রাবলীর তারিখের সঙ্গে মিলিয়ে ছিন্নপত্রেও সন্ধান করা যেতে পারে। তবে, ছিন্নপত্রে কখনো কখনো যে প্রসঙ্গ সংক্ষিপ্ত ভাবে লিপিবদ্ধ, ছিন্নপত্রাবলীতে তার পূর্ণতর পাঠ পাওয়া যায়;

ছিন্নপত্রাবলী

ছিন্নপত্রের পাঠ প্রায়শঃ অতিশয় নৈর্ব্যক্তিক, ছিন্নপত্রাবলীতে তেমন নয়। কতকগুলি পত্র ছিন্নপত্রে আদৌ সংকলিত হয় নি।

১॥২০০॥ দ্রষ্টব্য : য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি (রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি সংস্করণ ১৩৬৭) পৃ ১৭৭, ১৭৮, ১৮৬, ১৯০।

২॥২০১॥ 'Anna Karenina পড়তে গেলুম, এমনি বিশ্রী লাগল যে পড়তে পারলুম না— এরকম সব sickly বই পড়ে কী সুখ বুঝতে পারি নে। আমি চাই বেশ সরল সুন্দর মধুর উদার লেখা— কূটকচালে অদ্ভুত গোলমেলে কাণ্ড আমার বেশিক্ষণ পোষায় না।' আলোচ্য পত্রের এই কয় ছত্রের (পৃ ১৪) সাহায্যে টলস্টয়ের বিশ্ববিখ্যাত উপাখ্যানের উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার করার প্রয়োজন না থাকতে পারে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মানসিক গঠন ও তৎকালীন মনোভাব -নির্ধারণের যথেষ্ট সুযোগ আছে। এ চিঠি লেখা হয় ১৮৮৯ খৃস্টাব্দের জুনে।

৩॥২০২॥ গ্রন্থের প্রথম প্রকাশকালে সংকলিত, পরে বর্জিত—

'মা গো, আমার লক্ষ্মী' ইত্যাদি
'বসে বসে লিখলেম চিঠি' ইত্যাদি
'জলে বাসা বেঁধেছিলেম' ইত্যাদি
'দামু বোস আর চামু বোসে' ইত্যাদি

৪॥২০২॥ প্রথমপ্রকাশিত 'কড়ি ও কোমল' কাব্যে মুদ্রিত, পরে বর্জিত—

'চিঠি লিখব কথা ছিল' ইত্যাদি

৫॥২০৪॥ য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি (১৩৬৭), 'খসড়া'-অংশ পৃ ১৫০-১৫২।

৬॥২১০॥ তদেব, পৃ ১৮২।

৭॥২১৩॥ সাহিত্যের স্বরূপ। সূচনা।

৮॥২১৩॥ সাহিত্যের পথে। ভূমিকা।

৯॥২১৫॥ লেখন। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ।

১০॥২১৭॥ ছিন্নপত্রাবলীর আকর-পুঁথি স্থানে স্থানে জীর্ণ হওয়ায় এই চিঠিতে এই শব্দ এবং অন্য কয়েকটি শব্দ বা শব্দাংশ 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থের পাঠ দেখে অথবা অনুমান ক'রে বসানো হয়েছে বন্ধনী-মধ্যে— ছিন্নপত্রাবলী গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

আমরা অনাবশ্যক-বোধে ঐ-সকল জটিলতা পরিহার করেছি। অর্থাৎ, বন্ধনীবদ্ধ শব্দ বা শব্দাংশ বিনা বাধা-বন্ধনেই গ্রহণ করেছি।

১১॥২২৬॥ ছিন্নপত্রে (১৩৬৫ সংস্করণ) সংযোজন-অংশ দ্রষ্টব্য।

১২॥২২৭॥ ১৩ আগস্ট ১৮৯৪ তারিখের চিঠি। সংকলিত বাক্যটির ছিন্নপত্রে মুদ্রিত পাঠ অন্যরূপ। এ স্থলে সংকলিত পত্র বা অন্যান্য সংকলন, ছিন্নপত্র গ্রন্থে অনেকটাই সংক্ষেপে ও নৈর্ব্যক্তিক আকারে পরিবেশন করা হয়েছে —এটুকু লক্ষ্য করবার বিষয়।

১৩॥২৪০॥ সকল 'সৌন্দর্য' চয়ন করা অসম্ভব সন্দেহ নেই। অনেক প্রকার মুড বা মেজাজের চিঠি আমাদের প্রবন্ধে সংকলন করা হয়েছে ; কিন্তু কৌতুককর অনেকগুলি পত্র আছে (ছিন্নপত্রেও কয়েকটি আছে) মূল প্রবন্ধে সেগুলি বাধ্য হয়েই উপেক্ষা করতে হয়েছে, এস্থলে পূর্বে প্রকাশিত হয় নি এমন একখানি মাত্র চিঠির কতক অংশ আহরণ করে আমাদের সেই ত্রুটি সংশোধন করতে চাই। অন্য কৌতুককর পত্রের মধ্যে ছিন্নপত্রাবলী গ্রন্থের ১, ২, ৪, ৫, ৬ ও ১২৭ -সংখ্যক পত্র কয়খানি উল্লেখযোগ্য।—

কলকাতা। ১৬ মার্চ। ১৮৯৩। স্থ··· বেশ রীতিমত পাকা স্টাইলে আলাপ চালাচ্ছিল। কাছে ঘেঁষে ঝুঁকে প'ড়ে খুব সমনোযোগ অথচ সপ্রতিভ ভাবে ঈষৎ-হাস্য-মুখে বক্র-গ্রীবায় ইংরাজি ভাষায় কথোপকথন, অ্যাল্‌বম খুলে ছবি দেখানো ইত্যাদি ঠিক-দস্তুর-মত চাল চালছিল। বাঙালি ঘরের ছেলে এরকম অবস্থায় যেরকম লজ্জাভিভূত সংকুচিত ভাব ধারণ করে এতে তার তিলার্ধ মাত্র প্রকাশ পেল না।

আমার দেখে ভারী কৌতুক এবং বিস্ময় বোধ হচ্ছিল। আমি বোধ হয় আমার এই প্রায় বত্রিশ বৎসর বয়সেও অমন নিতান্ত সহজ মধুর সুনিশ্চিত ভাবে অবলাজাতির সঙ্গে বাক্যালাপ করতে পারি নে। চলতে গেলে হুঁচোট খাই, বলতে গেলে বেধে যায়, হাত দুটো কোথায় রাখি ভেবে পাই নে, লম্বা পা দুখানা সম্বন্ধে একটা কোনো ব্যবস্থা করা কর্তব্য বোধ করি অথচ কিছুই করে ওঠা হয় না— দুটোকে গুটিয়ে রাখব কি ছড়িয়ে রাখব কি আগুপিছু করে রাখব তার মীমাংসা করতে করতে ঠিক কথার

২৬

ঠিক জবাবটা দিয়ে ওঠা হয় না। ঘরে তিনটে গ্যাসের শিখা এবং এক-ঘর লোক থাকতে যে সট্ করে চুম্বকাকৃষ্ট লৌহখণ্ড-বৎ বিনা দ্বিধায় কোনো কিশোরীর পার্শ্বসংলগ্ন হয়ে অটল প্রতিষ্ঠা লাভ করা সে আমাদের মতো সংশয়াতুর ভীরু প্রাণীদের দ্বারা হওয়া অসম্ভব ॥ পত্রসংখ্যা ৮৯

রবীন্দ্রপ্রতিভার নেপথ্যভূমি

এই প্রবন্ধের অধিকাংশ উদ্‌ধৃতির বানান এবং বিরামচিহ্ন প্রচলিত-রীতি-সম্মত করা হয়েছে— স্তবকভাগ বা ছত্র সাজানো আমাদের প্রয়োজন-মত।

১॥২৫০॥ মূলে কোথায় কোন্ পাঠ পরিষ্কার লিখে পরে কেটে দেওয়া হয়েছে, সচরাচর সে আমরা দেখাতে চেষ্টা করি নি। অর্থাৎ, কবি এই পাণ্ডুলিপিতে যে পাঠ রক্ষণযোগ্য মনে করেছেন শুধু সেটি আমরা উদ্ধার করেছি। অন্যের (বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের ?) হাতের সংশোধন বা পরিবর্তন গ্রহণ করি নি। মদনভস্মের কাব্যানুবাদে, [ ] বন্ধনীর অন্তর্গত শব্দ বা অক্ষর আমাদের অনুমান মাত্র; পাণ্ডুলিপি জীর্ণ হওয়াতে স্থানে স্থানে লেখা অবলুপ্ত এবং ৭০-সংখ্যক শ্লোকানুবাদের দ্বিতীয় ছত্রে কবির অনবধানে একটি শব্দ আদৌ লেখা হয় নি। ৭১-সংখ্যক শ্লোকে 'ক্রদ্ধ' বা 'দুপ্রেক্ষ্য' পাণ্ডুলিপিতে থাকলেও, এ দুটিকেও আমরা লেখার ক্ষণ-কালীন অনবধান ব'লেই গণ্য করেছি। তৃতীয়সর্গ কুমারসম্ভবের মূলানুযায়ী শ্লোকসংখ্যা এই উদ্‌ধৃতিতে আমরা বসিয়েছি।

মদনভস্মের তিনটি অনুবাদ তুলনায় আলোচনার সুবিধার জন্য জানানো উচিত— (১) আমরা যেটিকে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ভাষান্তর মনে করি সেটি এই প্রবন্ধে দেওয়া গেল, (২) মালতী-পুঁথি-গত যেটি সম্ভবতঃ দ্বিজেন্দ্রনাথের রচনা সেটি 'বিশ্বভারতী' মাসিক পত্রের ১৩৫০ বৈশাখ -সংখ্যায় সংকলিত, আর (৩) দ্বিতীয়েরই ঈষৎ পরিবর্তিত পাঠ ১২৮৪ মাঘের ভারতী পত্র হতে তুলে 'রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়' পুস্তিকায় (১৩৫০) ধরে দিয়েছেন (পৃ ৮২-৮৫) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম ভাষান্তরটি

নেপথ্যভূমি

প্রবন্ধে সংকলন করাই আমাদের যথেষ্ট মনে হয়েছে; এটিই যে রবীন্দ্ররচনা তার পারিপার্শ্বিক প্রমাণগুলির উল্লেখ করতেও অবহেলা করা হয় নি— আভ্যন্তরীণ প্রমাণ-সংগ্রহ সচরাচর সন্দেহসঙ্কুল ও বিতর্কজনক হলেও, বোধ করি এ ক্ষেত্রে তেমন নয়। রবীন্দ্রাগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথের ভাষা ও ভঙ্গীর অতিশয় স্পষ্ট ছাপ যে-কোনো অনুসন্ধিৎসু পাঠক বা গবেষক দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অনুবাদে যত্রতত্র সহজেই খুঁজে পান যদি (আশা করি পাবেন), আমরা (স্বভাবতঃ গবেষক যখন নই) কেন আর অনাবশ্যক পরিশ্রম করি? কেবল আলোচ্য মদনভস্মের শেষ (৭২-সংখ্যক) শ্লোকেরই প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কাব্যানুবাদ নিম্নে যথাক্রমে দেওয়া গেল—

রবীন্দ্রনাথ

ক্রোধ সম্বরহ প্রভু ক্রোধ সম্বরহ
স্বর্গ হতে দেবতারা কহিতে কহিতে
হইল মদনতনু ভস্ম-অবশেষ।

—মালতী-পুঁথি। প্রথম অনুবাদ

দ্বিজেন্দ্রনাথ (?)

বাহিরিল সহসা জ্বলন্ত হুতাশন
ক্রোধ প্রভু সংহর সংহর এই বাণী
দেবতা সবার হোতা চরুক বাতাসে
হেতায় মদনতনু ভস্মঅবশেষ।

—মালতী-পুঁথি। দ্বিতীয় অনুবাদ

"ক্রোধ প্রভু সংহর সংহর" —এই বাণী
দেবতা সবার হোথা চরিছে বাতাসে,
হেথায় সে হুতাশন ভবনেত্র-জাত
করিল মদনতনু ভস্ম-অবশেষ।

—সম্পাদকীয় বৈঠক। ভারতী ১২৮৪ মাঘ

দ্বিতীয় অনুবাদে 'হোতা' 'হেতায়' 'চরুক বাতাসে' বিশেষভাবে লক্ষণীয় এবং অনুবাদ কয়টি মূলের সহিতও তুলনীয়—

ক্রোধং প্রভো সংহর সংহরেতি
যাবদ্‌গিরঃ খে মরুতাং চরন্তি
তাবৎ স বহ্নির্ভবনেত্রজন্মা
ভস্মাবশেষং মদনং চকার ॥

—কুমারসম্ভবম্‌ ॥ ৩ ॥ ৭২

২॥২৫৫॥ ঈষৎ রূপান্তরে সমগ্র কবিতাটি ১২৯২ চৈত্রের 'বালক' পত্রে 'অবসাদ' শিরোনামে "বালক"এর রচিত ব'লে মুদ্রিত। বাৎসরিক সূচীপত্রে পাই: অবসাদ। (বাল্যকালের লেখা) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।—১৩৬৭ বৈশাখের 'শনিবারের চিঠি'তে বিচক্ষণ সম্পাদক-মহাশয় বর্তমান প্রবন্ধে সংকলিত রচনাকাল সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করে থাকলেও, 'মালতী-পুঁথি'র অত্যন্ত বিশদ এবং স্পষ্ট লেখা সেরূপ সংশয়ের অবকাশ রাখে না। কবিতাটি কবির মাননীয়া সম্পাদিকার উৎসাহেই বালকে ছাপা হয় কি না জানা যায় না; তবে এটুকু জানি যে, ১২৯১ বঙ্গাব্দে 'তেরো হইতে আঠারো বৎসর বয়সের কবিতাগুলি' কিঞ্চিৎ দ্বিধা-সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ নিজেই 'শৈ শ ব - সঙ্গীত' এই বিতর্কজনক অভিধানে প্রকাশ করেছিলেন।

৩॥২৬৮॥ মোট ৯০টি গানের হিসাব পাওয়া যাচ্ছে, তন্মধ্যে কয়েকটি পূর্বাভাস মাত্র বা অসম্পূর্ণ অবস্থায় আছে। এই তালিকার মধ্যে [ ] বন্ধনী বদ্ধ তথ্য বা কাল-নির্দেশ, আলোচ্য পাণ্ডুলিপির না হলেও, অন্যত্র নিশ্চিতভাবে জানা গিয়েছে।

৪॥২৬৮॥ জোড়াসাঁকোয় 'যেতে নাহি দিব' কবিতা লেখা শেষ হয় ১৪ কার্তিক ১২৯৯ তারিখে— তার পর বলেন্দ্রনাথ-সহ উড়িষ্যায় ঠিক কোন্‌ সময়ে যান ও কত দিন থাকেন রবীন্দ্রনাথ, সেটি আমাদের অজ্ঞাত।[১] অন্য দিকে

---

[১] ছিন্নপত্রাবলীতে মুদ্রিত বা খাতায় লিপিবদ্ধ শ্রীমতী ইন্দিরাদেবীকে লেখা চিঠিগুলির মধ্যেও এই কাল-নির্ণয়ের উপায় নেই— ২০. ৮. ৯২

জ্ঞাতব্যপঞ্জী

নেপথ্যভূমি

১৬ অগ্রহায়ণ ১২৯৯ তারিখে রামপুর বোয়ালিয়ায় 'প্রতীক্ষা' কবিতার সূচনা। মজুমদার-পাণ্ডুলিপি দেখে মনে হয় উভয়ের অন্তর্বর্তী কালে এই গানের রচনা। অর্থাৎ, ১২৯৯ কার্তিকের শেষার্ধ আর অগ্রহায়ণের প্রথমার্ধের মধ্যে। অথচ, শ্রীমতী ইন্দিরাদেবীর বাঁধানো 'গানের বহি ও বাল্মীকিপ্রতিভা' (বৈশাখ ১৩০০) গ্রন্থে অনেকগুলি সাদা পাতায় রবীন্দ্রনাথ স্বহস্তে এক গুচ্ছ গান লিখে দিয়েছেন, তার মধ্যেও এটি দেখা যায়; সেখানে কাছাকাছি অন্যান্য গানের রচনাকাল ১৩০০-১৩০১ বঙ্গাব্দ। এই গান 'গানের বহি'তে সংকলিত হল না কেন? প্রমাদবশতঃ? অথবা ১২৯৯ চৈত্রের মধ্যে সুর-সংযুক্ত না হওয়ায়? তেমন আমাদের মনে হয় না।

পাণ্ডুলিপিতে গানের শেষে তারিখ ছিল, লুপ্ত হয়েছে (আমরা উপস্থিত যে আলোকচিত্র ব্যবহার করছি তাতে ফোটে নি) এমন যদি হয়, তা হলে প্রকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এই তথ্যের সন্ধান করা যায়।

৫॥২৬৮॥ যে পৃষ্ঠায় ২৭ অগ্রহায়ণ ১২৯৯ তারিখে 'প্রতীক্ষা' শেষ হয়েছে, তারই তলায় তিনটি অনুমান-যোগ্য রচনার এই ক'টি শব্দ ছাড়া আর-কিছু পাওয়া যায় না এবং তারই পরপৃষ্ঠার রচনায় তারিখ তো— ৫ আশ্বিন ১৩০২। আমাদের মনে হয়, যে তিনটি গানের পূর্বাভাস এই তিনটি ছত্র সে হল যথাক্রমে—

ওহে নবীন অতিথি। কাব্যগ্রন্থাবলী : আশ্বিন ১৩০৩
ঝরঝর বরিষে বারিধারা। কাব্যগ্রন্থাবলী : আশ্বিন ১৩০৩
এসো এসো ফিরে এসো, বঁধু হে. ফিরে এসো। সাধনা : আশ্বিন-কার্তিক ১৩০১

আমরা প্রথমোক্ত রচনা কবির হস্তাক্ষরেই সম্পূর্ণ আকারে দেখেছি শ্রীমতী ইন্দিরাদেবীর 'গানের বহি'তে আর অন্য সূত্রে জানি তৃতীয় গানটি -রচনার স্থানকাল : শিলাইদহ, ভাদ্র ১৩০১। তিনটি গানই আছে

(শিলাইদহ, ৫ ভাদ্র ১২৯৯) তারিখের পরে ও ১৮. ১১ ৯২ (বোয়ালিয়া, ৪ অগ্রহায়ণ ১২৯৯) তারিখের পূর্বে কোনো চিঠি পাওয়া যায় না।

অধুনা-প্রচলিত গীতবিতানে।

৬॥২৬৮॥ এ গানের জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-লিখিত স্বরলিপি (কার্ড্-পাণ্ডুলিপি) আমরা শ্রীমতী ইন্দিরাদেবীর সংরক্ষিত কাগজ-পত্রের মধ্যে এক কালে দেখেছি। দুঃখের বিষয় এই যে, পরে কোথায় আত্মগোপন করেছে বলা যায় না।

৭॥২৬৯॥ গীতবিতান গ্রন্থে দ্রষ্টব্য গান : ওঠো রে মলিন মুখ। মুলতান সুর। কারও স্মৃতি-বিধৃত না থাকায় 'হিন্দিভাঙা' কি না বলা যায় না। খাতায় রচনাকালের পারম্পর্যে পাওয়া গেল না। এমন হতে পারে যে, ১৩০২ বিজয়াদশমীর পর রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় ফিরে পূর্বতন রচনাটি শ্রীমতী ইন্দিরাদেবী বা অন্যের স্মৃতি থেকে অথবা খাতা থেকেই নিজের পকেট-বইয়ে (মজুমদার-পাণ্ডুলিপিতে) কুড়িয়ে রাখলেন। বস্তুতঃ, আমাদের তালিকার ৮ এবং ৯ -অঙ্কিত এই দুটি গান ঠিক এই পারম্পর্যে কবি নিজে লিখে রেখেছেন শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরাদেবীর পূর্বোক্ত 'গানের বহি'তে।

৮॥২৬৯॥ বর্তমান গানের তালিকায় ১ থেকে ২৩ পর্যন্ত ক্রমিক সংখ্যাগুলি যথাযথ পাণ্ডুলিপি থেকে গৃহীত। ১৩০২ কার্তিকের শেষে বা অগ্রহায়ণের প্রথমে, জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বা কলিকাতায়, কোনো গীতোৎসবের অনুষ্ঠান হয় কি না এটি বিশেষ অনুসন্ধানের বিষয়।

৯॥২৬৯॥ সহজ পাঠের খসড়া কি জোড়াসাঁকোর বাড়িতে লেখা হয়? নানা দিক থেকে এটি মনে করার কারণ আছে যে, 'হিন্দি গান ভাঙা'র সময় সুযোগ বা উপলক্ষ ঘটত সাধারণতঃ কলিকাতায়। শিলাইদহ সাজাদপুর কালীগ্রাম পতিসর ছিল কবির স্বতন্ত্র মনের ডানা মেলে স্বচ্ছন্দ ওড়ার উপযুক্ত পরিবেশ। গানের ওস্তাদের সঙ্গ সুলভ ছিল না, আর সেজন্য বিশেষ আকাঙ্ক্ষাও ছিল না সেখানে।

১০॥২৭১॥ এ গান এ খাতায় সম্পূর্ণ হয় নি। দ্রষ্টব্য গীতবিতান : লহো লহো তুলি লও হে।

১১॥২৭১॥ কল্পনা বা গীতবিতান : কে এসে যায় ফিরে ফিরে।

১২॥২৭৯॥ মূল গান স্বরলিপি-সহ শ্রীরামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় -প্রণীত 'সঙ্গীত-মঞ্জরী'তে (১৩১৪) মুদ্রিত আর 'সংশোধিত' দ্বিতীয় সংস্করণেও (১৩৪১)

জ্ঞাতব্যপঞ্জী

নেপথ্যভূমি

পাওয়া যায় এই তথ্য আমরা শ্রীক্ষিতীশ রায়ের সৌজন্যে জেনেছি। পূর্বোক্ত দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠ এখানে উদ্ধৃত করি—

রাজদুলারিকা বনরা আইলো মা
রাতা চোলেরা সোঁধ ভিনি মেরোরি অঙ্গনবা মা।
ধন রি তেরো ভাগ জো ঐসো বর পায়া
নিরখি রহি কাহুকো সজনবা মেরোরি অঙ্গনবা মা।

—সাহানা-আড়াঠেকা। অদারঙ্গ

ওগো মা, রাজদুলালীর বর এল লালরঙা পিরুনি প'রে—
মৃদু স্নিগ্ধ গন্ধ তাতে— আমার এই অঙ্গনে।
ধন্য (অথবা 'ও ধনী' ?) তোর ভাগ্য যে এমন বর তুই পেয়েছিস।
চেয়ে চেয়ে দেখি কার এ স্বজন এল আমার অঙ্গনে।

—ইতি মর্মানুবাদ

এই অনুবাদের জন্যও আমরা বন্ধুবর শ্রীক্ষিতীশ রায়ের নিকট ঋণী। ধরা যেতে পারে সমস্ত গানটি কুমারী মেয়ে ও মায়ের আলাপন আর এমন মনে করলেও কষ্টকল্পনা হবে না যে, সবটাই একজনের উক্তি, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে ভাগ্যবতী রাজকুমারীর উদ্দেশে বলা হয়েছে মাত্র। রবীন্দ্রনাথ ওস্তাদের গাওয়া গানের যে পাঠ (স্মৃতি থেকে ?) উদ্ধার করতে পেরেছেন আর যেটি মুদ্রিত গ্রন্থে পাওয়া গেছে উভয়ের মধ্যে প্রভেদগুলি স্পষ্টই ধরা পড়ে। এমন হতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথ ভুল শুনেছেন ব'লেই তাঁর অসামান্য কবিকল্পনা স্বতন্ত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে একেবারে স্বচ্ছন্দ হয়েছে। অপর পক্ষে, গানটির মর্ম আমরা যেরূপ অনুমান করেছি (প্রাচীন ঠাটের এই হিন্দির জ্ঞান আমাদের আছে তা বলতে পারি নে) রবীন্দ্রনাথও প্রশ্ন ক'রে যদি তাই শুনে থাকেন বা বুঝে থাকেন, তাতেও যে তাঁর প্রতিভার স্বচ্ছন্দ সৃষ্টির কোনো অসুবিধা হয়েছে অথবা সুর বিহনে যা ধুলামুঠি মাত্র তাকেই সোনামুঠি ক'রে তুলতে কোথাও বেধেছে এমন নয়। অর্থাৎ, লোকোত্তর প্রতিভা একটা উপলক্ষ্য চায়— একটু উস্‌কানি যদি পায় তাতেই নিজস্ব পথ আর অভীষ্ট রসপরিণাম সহজেই খুঁজে নিতে পারে।

নেপথ্যভূমি

১৩॥২৮১॥ মজুমদার-পাণ্ডুলিপিতে রবীন্দ্রনাথের যে কবিতাগুলি অল্পাধিক খসড়া-আকারে অথবা প্রায় আমাদের পরিচিত রূপে বর্তমান, এখানে তার একটি তালিকা দেওয়া যেতে পারে। রচনার স্থান-কাল-সূচক তথ্য সবই বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে সংকলিত থাকায় এখানে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

এক দিক থেকে :

যেতে নাহি দিব। সোনার তরী
প্রতীক্ষা। সো. ত.
মন্ত্রে সে যে পূত। উৎসর্গ
ভোরের পাখি ডাকে কোথায়। উ.
না জানি কারে দেখিয়াছি। উ.
ওরে আমার কর্মহারা। উ
আমার খোলা জানালাতে। উ.
পাগল বসন্তদিন কতবার অতিথির বেশে। স্মরণ
আজিকে তুমি ঘুমাও। স্ম.
আমি যারে ভালোবাসি। উৎসর্গ
দেখো চেয়ে গিরির শিরে। উ.

অন্য দিক থেকে :

প্রথম পৃষ্ঠায় কবি ভবভূতির সুবিখ্যাত শ্লোকের অনুবাদ—
কী জানি মিলিতে পারে মম সমতুল
সময় অসীম আর পৃথিবী বিপুল।
সোনার তরী : গগনে গরজে মেঘ। সোনার তরী
শৈশবসন্ধ্যা। সো. ত.
বিম্ববতী। সো. ত.
রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে। সো. ত.
বৈষ্ণবকবিতা। সো. ত.
খাঁচার পাখি। সো. ত.

নেপথ্যভূমি

আকাশের চাঁদ। সো. ত.

গানভঙ্গ। সো. ত.

পুরস্কার। সো. ত.

ধূলি। চিত্রা

সিন্ধুপারে। চি.

শেষ। ক্ষণিকা। ছয় ছত্রে পূর্বাভাস মাত্র—

থাকব না ভাই থাকব না— | থাকবে না ভাই কিছু
সেই আনন্দে চল্‌ রে ধেয়ে | কালের পিছু পিছু,
বইতে কভু হবে না ভাই | শুধু একই প্রাণ

তুমি মোর জীবনের মাঝে। স্মরণ

ভালো তুমি বেসেছিলে। স্ম.

দেখিলাম খানকয় পুরাতন চিঠি। স্ম.

এ সংসারে একদিন নববধূবেশে। স্ম.

স্বল্প-আয়ু জীবনের যে-কয়টি আনন্দিত দিন। স্ম.

তোমার সকল কথা বল নাই, পার নি বলিতে। স্ম.

মৃত্যুর নেপথ্য হতে আরবার এলে তুমি ফিরে। স্ম.

হে লক্ষ্মী, তোমার আজি নাই অন্তঃপুর। স্ম.

আপনার মাঝে আমি করি অনুভব। স্ম.

বজ্র যথা বর্ষণেরে আনে অগ্রসরি। স্ম.

সংসার সাজায়ে তুমি আছিলে রমণী। স্ম.

জাগো রে জাগো রে চিত্ত জাগো রে। স্ম.

জ্বালো ওগো জ্বালো ওগো সন্ধ্যাদীপ জ্বালো। স্ম.

বহুরে যা এক করে, বিচিত্রেরে করে যা সরস। স্ম.

গোধূলি নিঃশব্দে আসি আপন অঞ্চলে ঢাকে যথা। স্ম.

অসম্পূর্ণ রচনা—

তোমার বিচ্ছেদ-সাথে আমি আজ পেতেছি আলয়
যতদিন যায় তত পাই তার গাঢ় পরিচয়।

রবীন্দ্রপ্রতিভা

নেপথ্যভূমি

চিনি তার কণ্ঠস্বর শুনি তার বিস্ময় বাণী,
হৃদয়ে জানিতে পাই পরশি রয়েছে তার পাণি।
কত যে গোপন পথ জানে
সে আমারে লয়ে যায় বিশ্বের মর্মের মাঝখানে
যেথা সর্ব গতি স্তব্ধ

এসো বসন্ত, এসো আজ তুমি। স্মরণ
যে ভাবে রমণীরূপে আপন মাধুরী। স্ম.
আমাদের এই পল্লিখানি পাহাড় দিয়ে ঘেরা। উৎসর্গ
হে জনসমুদ্র, আমি ভাবিতেছি মনে। সংযোজন : উ.
হে নিস্তব্ধ গিরিরাজ, অভ্রভেদী তোমার সংগীত। উ.
আজি হেরিতেছি আমি, হে হিমাদ্রি, গভীর নির্জনে। উ.
হে হিমাদ্রি দেবতাত্মা, শৈলে শৈলে আজিও তোমার। উ.
তুমি আছ হিমাচল ভারতের অনন্তসঞ্চিত। উ.
ক্ষান্ত করিযাছ তুমি আপনারে, তাই হেরো আজি। উ.
ভারতসমুদ্র তার বাষ্পোচ্ছ্বাস নিঃশ্বসে গগনে। উ.

রূপসৃষ্টি : মায়ার খেলার রূপান্তর

১॥২৮৫॥ ঈশ্বরের এই আশ্চয সৃষ্টিতে প্রত্যেক বস্তুটি, প্রত্যেক মুহূর্তটি, প্রত্যেক ঘটনা অদ্বিতীয়, অপূর্ব, পরস্পরে মিল আছে— মিল নেই। কিছুর সঙ্গে কিছুর মিল যা নিয়ে আর মিল ত্রিভুবনের যেখানে যেখানে তারই চকিত আভাসে চিত্তকে চমৎকৃত করা আর মনকে বিশালতায় মুক্ত করা, বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত করা —এইমাত্র উপমাপ্রয়োগের সার্থকতা। এ ভাষা না হলেও, এ কথাটা রবীন্দ্রনাথের।

২॥২৮৬॥ প্রকাশ : ভারতী : পৌষ ১২৮৭

৩॥২৮৭॥ প্রকাশ : ফাল্গুন ১২৯০

৪॥২৮৮॥ রচনা : ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২

৫॥২৮৯॥ রচনা : ১৭ বৈশাখ ১৩৩৮

মায়ার খেলার রূপান্তর

৬॥২৯০॥ রচনা : ২৭ আষাঢ় ১৩৪৬

৭॥২৯০॥ বর্ষামঙ্গল ১৩৪৬

৮॥২৯২॥ রচনা : ১৪ শ্রাবণ ১৩৪৬

৯॥২৯২।২৯৩॥ নবীন : ফাল্গুন ১৩৩৭

১০॥২৯৩॥ নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা : ফাল্গুন ১৩৪২

১১॥২৯৩॥ নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা : ১৩৪৫

১২॥২৯৩॥ বলা বাহুল্য, উদ্‌ধৃত শেষ ছত্রটি প্রথমে রাখলেই মূলানুগ হয়।

১৩॥২৯৫॥ প্রকাশ : বৈশাখ ১২৯২। এ কথা ঠিকই, রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রৌঢ়িমা তখনো কিঞ্চিৎ দূরবর্তী। কড়ি ও কোমলে কবির কাব্যভূমগুলের 'ডাঙা' জেগে ওঠার সূচনা হয়েছে মাত্র।

১৪॥২৯৮॥ রাজা : পৌষ ১৩১৭

১৫॥২৯৮॥ রচনা : পৌষ ১৩০৯

১৬॥২৯৮॥ রচনা : ১৪ শ্রাবণ ১৩১২

১৭॥২৯৯॥ রচনা : ১১ পৌষ ১৩০৯

১৮॥২৯৯॥ রচনা : ১৬ কার্তিক ১৩৩১

১৯॥২৯৯॥ আমাদের এই অনুমান বা বিশ্বাস।

২০॥৩০০॥ আমাদের বিশ্বাস পূরবীতে অন্তত আরও একটি কবিতা স্থান পেয়েছে মৃণালিনীদেবীর স্মরণে।

২১॥৩০২॥ প্রকাশ : ভারতী, শ্রাবণ ১২৮৮। কিছুকাল পূর্বে গ্রামোফোন রেকর্ডে শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র গেয়েছেন। গানটি বিশেষভাবেই শোনবার যোগ্য।

২২॥৩০৪॥ আর্টের objectiveness।

২৩॥৩০৪॥ subjectiveness।

২৪॥৩০৮॥ ব্যুৎপত্তিগত অর্থই আমাদের অভীষ্ট।

২৫॥৩১৪॥ প্রাচীন আলঙ্কারিকদের অভিমতে আধুনিক গল্প উপন্যাস গদ্যে রচিত হলেও কাব্য ব'লেই গণ্য হবে।

২৬॥৩১৪॥ উভয় গ্রন্থেরই প্রকাশকাল : শক ১৮০৩ বা বাংলা ১২৮৮ (আষাঢ় ?)।

২৭॥৩১৫॥ দ্রষ্টব্য অধুনাপ্রচলিত অখণ্ড অথবা তৃতীয়খণ্ড গীতবিতান।

মায়ার খেলার রূপান্তর

২৮॥৩১৮॥ একটি পদের পরিবর্তন সুধীজন মার্জনা করবেন।

২৯॥৩২০॥ তুলনীয় শব্দ : দিনমজুর।

৩০॥৩২০॥ অমর শান্তা প্রমদা প্রভৃতি নামগুলির প্রত্যেকটি বিশেষ-তাৎপর্য-পূর্ণ।

৩১॥৩২০॥ 'পাঠক ও দর্শকদিগকে বুঝিতে হইবে যে, মায়াকুমারীগণ এই কাব্যের অন্যান্য পাত্রগণের দৃষ্টি বা শ্রুতি -গোচর নহে' —এরূপ রবীন্দ্রনাথ 'বিজ্ঞাপনে' বলেছেন। তবে প্রেক্ষাগৃহে সমাগত সামাজিকদের দৃষ্টি ও শ্রুতি -পথবর্তী সে তো বলাই বাহুল্য।

৩২॥৩২১॥ শ্যামা (১৩৪৫) নৃত্যনাট্য থেকে গৃহীত।

৩৩॥৩২৩॥ 'সখী, প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে' (১০ আশ্বিন ১৩০৪)— এখানে এ গানের প্রয়োগ নূতন।

৩৪॥৩২৪॥ গানগুলি—। ১। আমার নিখিল ভুবন হারালেম আমি যে ।২। ভুল কোরো না গো ।৩। ভুল করেছিনু, ভুল ভেঙেছে ।৪। ডেকো না আমারে ডেকো না ।৫। যে ছিল আমার স্বপনচারিণী ।৬। হায়, হতভাগিনী ।৭। কোন্ সে ঝড়ের ভুল ।৮। শুভ মিলনলগনে বাঁজুক বাঁশি ।৯। আর নহে, আর নহে ।১০। ছিন্ন শিকল পায়ে নিয়ে ।১১। যাক ছিঁড়ে, যাক ছিঁড়ে ।১২। দুঃখের যজ্ঞ-অনল-জ্বলনে

১-৬ -সংখ্যক গান ষষ্ঠ দৃশ্যে; অবশিষ্ট গানগুলি সপ্তম বা শেষ দৃশ্যে। ৪ ও ৫ -সংখ্যক গান গ্রামোফোন রেকর্ডে গাওয়া; তেমন অপরিচিত নয়। ২, ৮ ও ১১ -সংখ্যক গানের স্বরলিপি বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত।

১, ২, ৩, ৪, ৫, ৭, ৮, ৯, ১২ -সংখ্যক রচনার পূর্বপাঠ—

।১। সেই শান্তিভবন ভুবন ।২। দেখো সখা, ভুল ক'রে ভালোবেসো না ।৩। ভুল করেছিনু, ভুল ভেঙেছে (প্রথম ছত্র অভিন্ন) ।৪। ওই কে আমায় ফিরে ডাকে ।৫। আমি কারেও বুঝি নে ।৭। আহা, আজি এ বসন্তে (আমূল পরিবর্তিত বলা চলে) ।৮। চাঁদ, হাসো, হাসো ।৯। আর কেন, আর কেন ।১২। দুখের মিলন টুটিবার নয়

নূতন গান রচনার প্রেরণা প্রথম থেকেই আসে নি। পুরাতন অথচ মায়ার খেলার পরবর্তী কতকগুলি গান স্থানে স্থানে সন্নিবিষ্ট ক'রে কাজ

মায়ার খেলার রূপান্তর

সারবার ইচ্ছা ছিল। ক্রমে তার অধিকাংশই বর্জন করেছেন। নূতন সৃজন-বেদনার জোয়ার এসেছে। (মহুয়া কাব্যের উৎপত্তি কী-ভাবে স্মরণ করা যেতে পারে।) মায়ার খেলার পুরাতন আরও দুটি গানের নূতন রূপ দিয়ে শেষ পর্যন্ত বর্তমান নৃত্যনাট্যে নেন নি— অধুনা গীতবিতানের সর্বশেষ খণ্ডে সংকলিত। বর্তমান প্রবন্ধের রচনাকালে বলা হয়েছিল বটে 'কবির অন্তর্ধানের এক যুগ পরে', এখন বলা উচিত— 'রচনাব বাইশ-তেইশ বৎসর পরে'। এই নূতন গানগুলির রচনাকাল জানা যায়, কবি ছিলেন মাটির বাড়ি 'শ্যামলী'তে— । ১ । ৯.১২.১৯৩৮ । ২ । ১২.১২.১৯৩৮ । ৩ । ১২.১২.১৯৩৮ । ৪ । ৯.১২.১৯৩৮ । ৫ । ৮.১২.১৯৩৮ । ৭ । ৯.১২.১৯৩৮ । ৯ । ১০.১২.১৯৩৮ । ১০ । ১০.১২.১৯৩৮

৩৫॥৩২৬॥ ঋতু-উৎসব। সুন্দর। রচনা : ২৪ ফাল্গুন ১৩৩১

৩৬॥৩২৭॥ ক্ষমা কোরো পাঠক! কালিদাস-ভবভূতির সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় নেই বলা চলে। রবীন্দ্রনাথের ভাবব্যাখ্যা ধ'রেই রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে চাই। গঙ্গাজলেই গঙ্গাপূজা।

৩৭॥৩২৮॥ আলোচিত নৃত্যনাট্যে এ রীতির বিরল প্রয়োগ। শেষ দৃশ্যের সুগম্ভীর অবসানে মায়াকুমারীগণ সমস্বরে গেয়েছেন।

৩৮॥৩২৯॥ একটু অত্যুক্তি তো হলই। এই দৃশ্যকাব্য পড়তে, কিম্বা সুরে-তালে শুনতেও যেমন লাগে, দেখতে তার থেকে বহুগুণে ভালো লাগবে, রসিক সামাজিকের আগ্রহ উদ্দীপিত করে তুলবে সন্দেহ নেই।

৩৯॥৩২৯॥ বসন্ত। রচনা : অপরাহ্ণ, ২৮ মাঘ ১৩২৯

৩০৯ পৃষ্ঠাঙ্কে 'নটীর পূজা' নৃত্যের প্রসঙ্গ আছে। এ বিষয়ে প্রশ্ন করায় শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী গৌরী ভঞ্জ (বসু) জানিয়েছেন—

নটীর পূজার 'ক্ষমো হে ক্ষমো' গানটির সঙ্গে যে নাচ, সেটি আমার নিজের প্রেরণা থেকেই নিজে রচনা করেছিলাম সে কথা ঠিকই। ওটা রচনার আগে নবকুমার ঠাকুরের কাছে মণিপুরী নাচ না শিখলে বোধ হয় এত সফল হতে পারতাম না।··· শান্তিনিকেতন। ২৯.৫.১৯৬১

৩২০ পৃষ্ঠাঙ্কে : 'কলাকারের কোনো লোভ মোহ থাকে না'। ব্যতিক্রম-রূপে

রবীন্দ্রপ্রতিভা

মায়ার খেলার রূপান্তর

কেউ বা উল্লেখ করতে পারেন— শ্যামা নৃত্যনাট্যে, উত্তীয়কে হত্যা করবে যে ঘাতক তার হিংসোন্মত্ত উল্লাসের নৃত্যটি ঐ নৃত্যগীতরূপের অপরূপ সমগ্রতার মধ্যে অনেকটা বেখাপ নয় কি? এ প্রশ্নের প্রত্যয়যোগ্য উত্তর, অবশ্য, রসিক বিশেষজ্ঞজনই দিতে পারবেন। তবে, নৃত্যনাট্যের ঐ স্থলে ঐ নৃত্যযোজনার কল্পনা যে কবির পুত্রবধূ শ্রীমতী প্রতিমা ঠাকুরের এই তথ্য অনেকেই জানেন। নাট্যরসের পরিস্ফুটনে, sense of conflict সৃষ্টির উদ্দেশে, ঐ নৃত্যযোজনার প্রস্তাব করা হলে রবীন্দ্রনাথ এটির উপযোগিতা স্বীকার করেন —শ্রদ্ধেয়া প্রতিমাদেবীর মুখেই আমরা শুনেছি।

রবীন্দ্র-চিত্রকলা

১॥৩৪১॥ বর্ণরুচির বৈশিষ্ট্যে রবীন্দ্রনাথের ছবিগুলি প্রাচ্য বা এদেশীয় নানা চিত্ররীতির থেকে পৃথক্। বলা যেতে পারে তাবৎ বর্ণমালার আছে দুই কুল, দুই কোটি— আলো এবং অন্ধকার। মানসিক সংজ্ঞায় নির্দেশ করতে গেলে —চেতনা আর মূর্ছা, আনন্দ আর বিষাদ। রবীন্দ্রনাথের বর্ণরুচি বয়ে চলেছে আঁধারের কূল ঘেঁষে। বিচিত্র বর্ণ তিনি ব্যবহার করে থাকলেও তামসী রাত্রিব একটি কালো ছায়া প্রায় সর্বত্র পড়েছে; প্রায়শই একটি বিষাদ বেদনা বা অভিভূতির ভাব বর্ণব্যবহারের গুণেও ফুটে উঠেছে। সামগ্রিক বর্ণ-ব্যঞ্জনার বিচারে বলা যায়, পাশ্চাত্য তৈলচিত্র-রীতির ক্ষেত্রে তুলনা মিললেও প্রাচ্য 'জলরঙের' ছবির সঙ্গে এর তেমন মিল নেই। প্রাচ্যশিল্পী যে-ভাবে যে রঙ ব্যবহার করেছেন কবি তা করেন নি। কিন্তু, এটা নেহাতই ঘটনাচক্রে বা দৈবক্রমে নয়। জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রতিভা নিজের উপযোগী বিশেষ কালী কলম আর প্রকরণপদ্ধতি বেছে নিয়েছে বা উদ্ভাবন করেছে, এমন মনে করা অনুচিত হবে না।

২॥৩৪২॥ দ্রষ্টব্য শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত -প্রণীত রবীন্দ্র-চিত্রকলা (১৯৪৯), পৃ ৩২

৩॥৩৪৪॥ বিশেষ ক'রে এ কথা তো বলেন নি: রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং
তেন মাং পাহি নিত্যম্।

রবীন্দ্র-সঙ্গীত

১॥৩৫৫॥ হাঁ, লেখকের নিজের অভিজ্ঞতা-অনুযায়ী বিষাদই বলতে হবে। যে-প্রকার উপলব্ধি থেকে সম্ভবতঃ জানকীবল্লভ শ্রীরাম বলেছিলেন : সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা! রবীন্দ্রসঙ্গীতে মাদৃশ 'অসুর'জনও যে নিবিড় গভীর মর্মস্পর্শী ও অপরূপ আনন্দ লাভ করে তার তো তুলনাই হয় না— সঙ্গে সঙ্গে মিশ্রিত থাকে এক 'অপূর্ব' বিষাদ। কী জানি কেন! যে সত্যের আভাস পাওয়া যাচ্ছে, আমাদের এ জীবনের পক্ষে তা স্বপ্নই, এই বোধ থেকেই কি? অথবা অপ্রাপণীয়ের সঙ্গে বাস্তবের, তার শ্রীহীন দীনতার ও জীর্ণতার, নিজের অজ্ঞাতসারেই মনে-মনে একটা তুলনা ক'রে?

আলোচনা-সমালোচনা

১॥৩৬১॥ জীবনানন্দ দাশের উক্তি।

২॥৩৬২॥ ছিন্নবাধা বালক : শারদীয় দেশ, ১৩৬৩, পৃ ১৮৩

উদ্ধৃতির ভিতর স্থূলাক্ষর আমাদের।

রবীন্দ্রনাথ কতটা সামাজিক রীতিনীতির ঊর্ধ্বে ছিলেন, কিরূপ সংস্কারমুক্ত, তারই যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা হয়েছে 'দামিনী' প্রবন্ধে।

৩॥৩৬২॥ 'পারস্যভ্রমণ' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি। দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্র-রচনাবলী ২২, পৃ ৪৮২

৪॥৩৬৩॥ ভূমিকায় সংকলিত স্বামী বিবেকানন্দের অভিমত : শ্রীরামকৃষ্ণ শত-বার্ষিক স্মৃতিগ্রন্থ : সাধন-সঙ্গীত (১৩৪৩)। দুঃখের বিষয়, কী-ভাবে কোথা থেকে স্বামীজির এই অভিমত সংকলন করা হয়েছে গ্রন্থসম্পাদক তা জানান নি।

॥ পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ॥